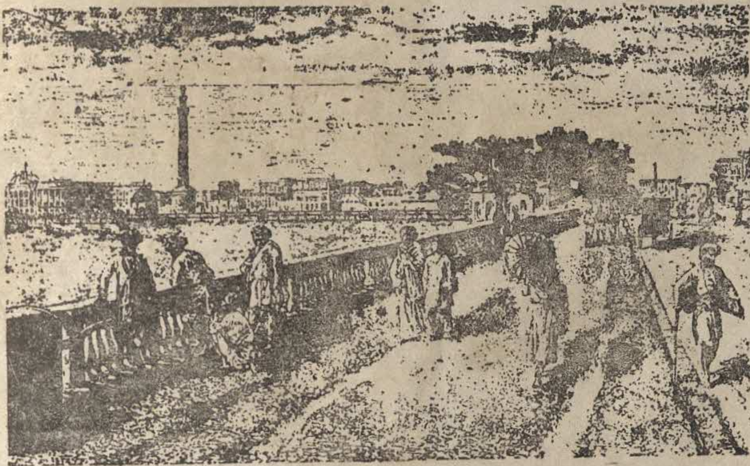
পূর্ণেন্দু পত্রী

পুরনো কলকাতার কথাচিত্র





পুরনো কলকাতার কথাচিত্র

PURANO KOLKATAR KATHACHITRA
by
PURNENDU PATREE
Dey's Publishing c/o Dey Book Store
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 73

পুরনো কলকাতার কথাচিত্র

পূর্ণেন্দু পত্রী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ :
কার্ত্তিক ১৩৮৬, নভেম্বর ১৯৭৯
প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম : ৩০ টাকা

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে,
দে'জ পাবলিশিং, ৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯
মুদ্রাকর : শ্রীগৌর মজুমদার,
শঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৬১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৭০০০০৬

শ্রীপান্থ
যার ছদ্মবেশ,
সেই
নিখিল সরকারকে

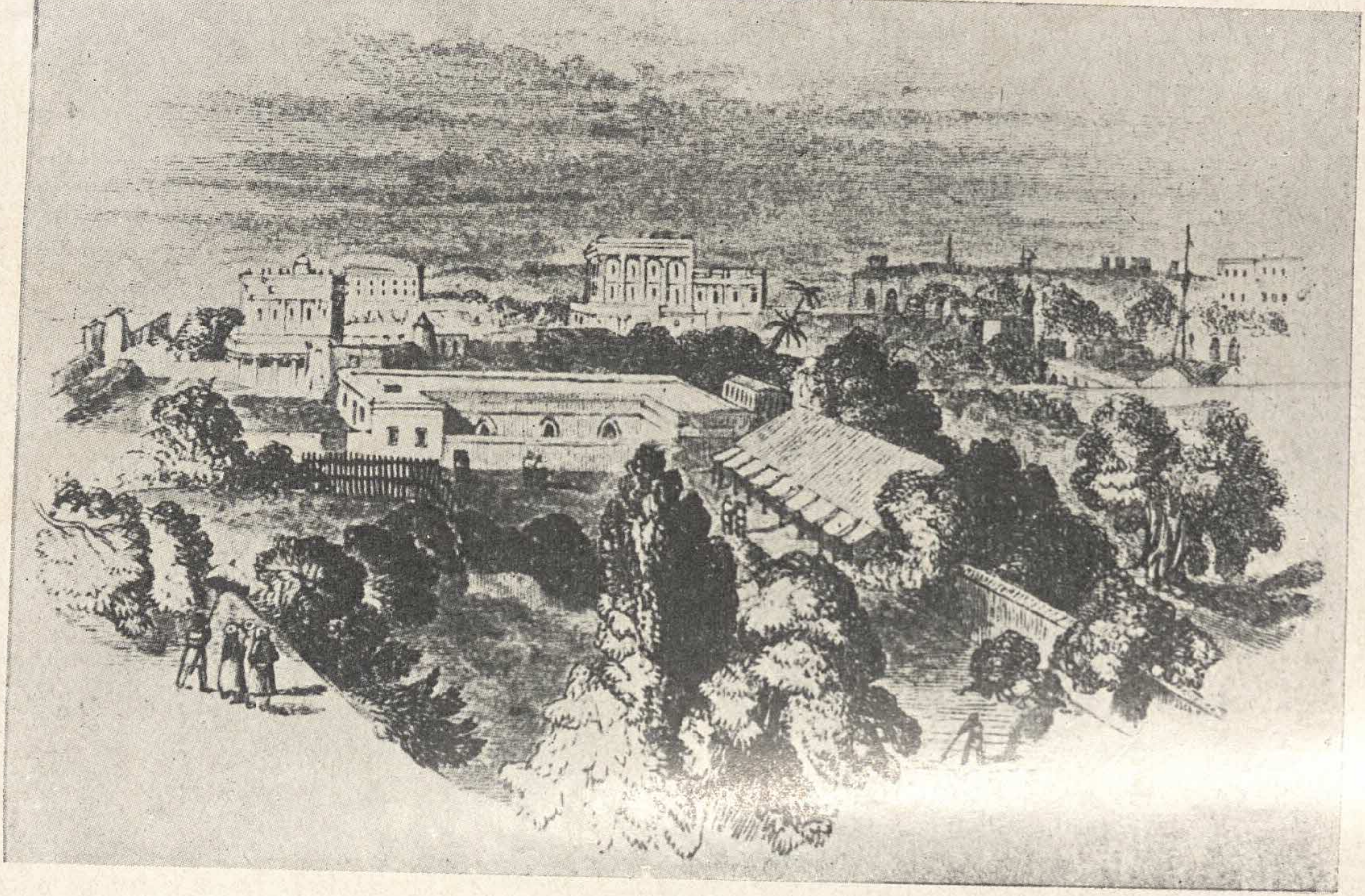
বছর চব্বিশ আগে কী করে যেন
একটা বই লিখে ফেলেছিলুম কলকাতাকে নিয়ে।
নাম ছিল, শহর কলকাতার আদিপর্ব।
বইটা সমাদরও পেয়েছিল কিছুটা !
বেশ কয়েকটি মুদ্রণের পর
দীর্ঘকাল অমুদ্রিত পড়ে ছিল সে বই।
নতুন করে ছাপতে দেওয়ার সময় মনে হল,
গোটা বইটাই নতুন করে লেখা দরকার।
ফলে নামটাও পাল্টালো,
আকৃতিও বদলালো।

সবিনয়ে বলে রাখি, আমি গবেষক নই।
যা পড়ি, তাই লিখি।
কলকাতার বিষয়ে পড়তে আনন্দ পাই। সেই
আনন্দের টানেই লেখা। ইতিহাসের
জটিল বিষয়কে কতটা সহজ এবং
সুখপাঠ্য করে লেখা যায় সেটাই
আমার লক্ষ্য। কলকাতা বিষয়ে নানা মুনির
নানা মত। মোটামুটি সমস্ত
মতকে সামনে রেখেই গল্প বলার মত
করে ইতিহাস বলেছি বা বলতে
চেয়েছি। ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে তার মধ্যেও।
তবুও যেহেতু ইদানীংকালে
কলকাতার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস
নিয়ে কেউ মাথা ঘামান নি,
নিজেকে অযোগ্য জেনেও, সে দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছি,
এইটুকুই আমার দুঃসাহস।


FRANCISCVS DRAECK NOBILISSIMVS EQVES ANGLIAE ANNO AETATIS SVAE 43.

ফ্রান্সিস ড্রেক

কলকাতা
শহর
হতে
চলেছে

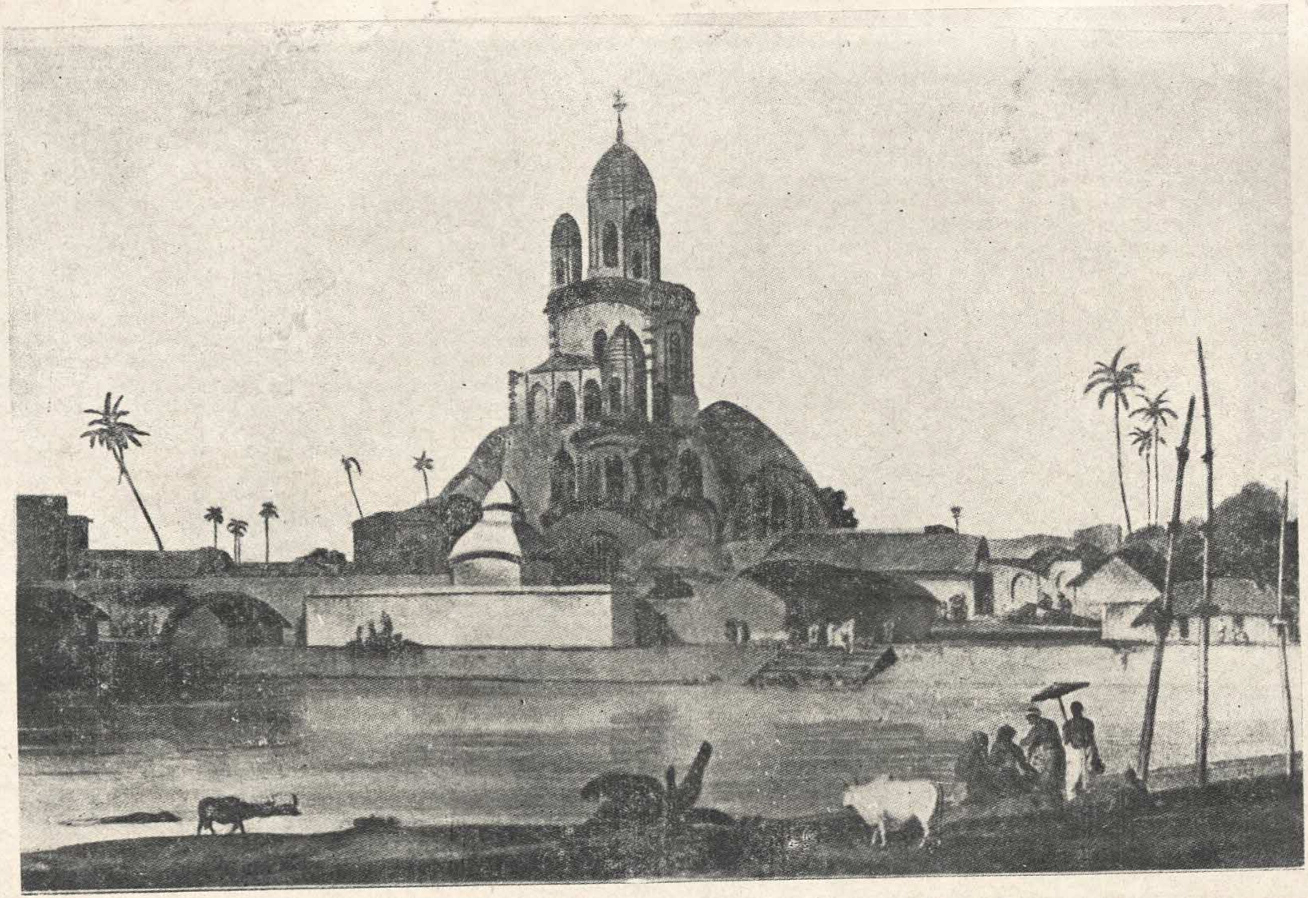




জামোরিনের
দরবারে
ভাস্কো-ডা-গামা

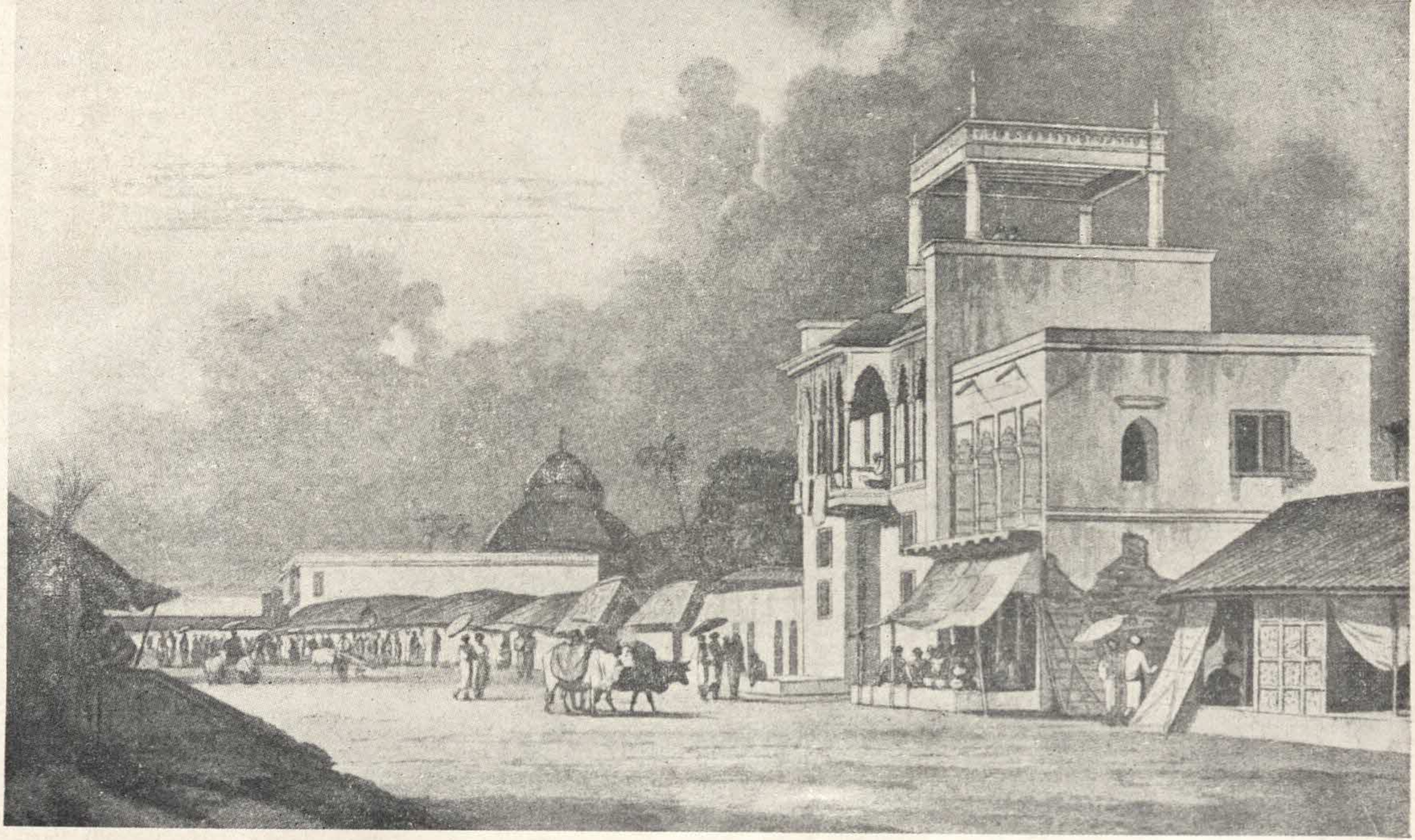


সুরাট
বন্দর



গোবিন্দরাম
মিত্রের
নবরত্ন
মন্দির

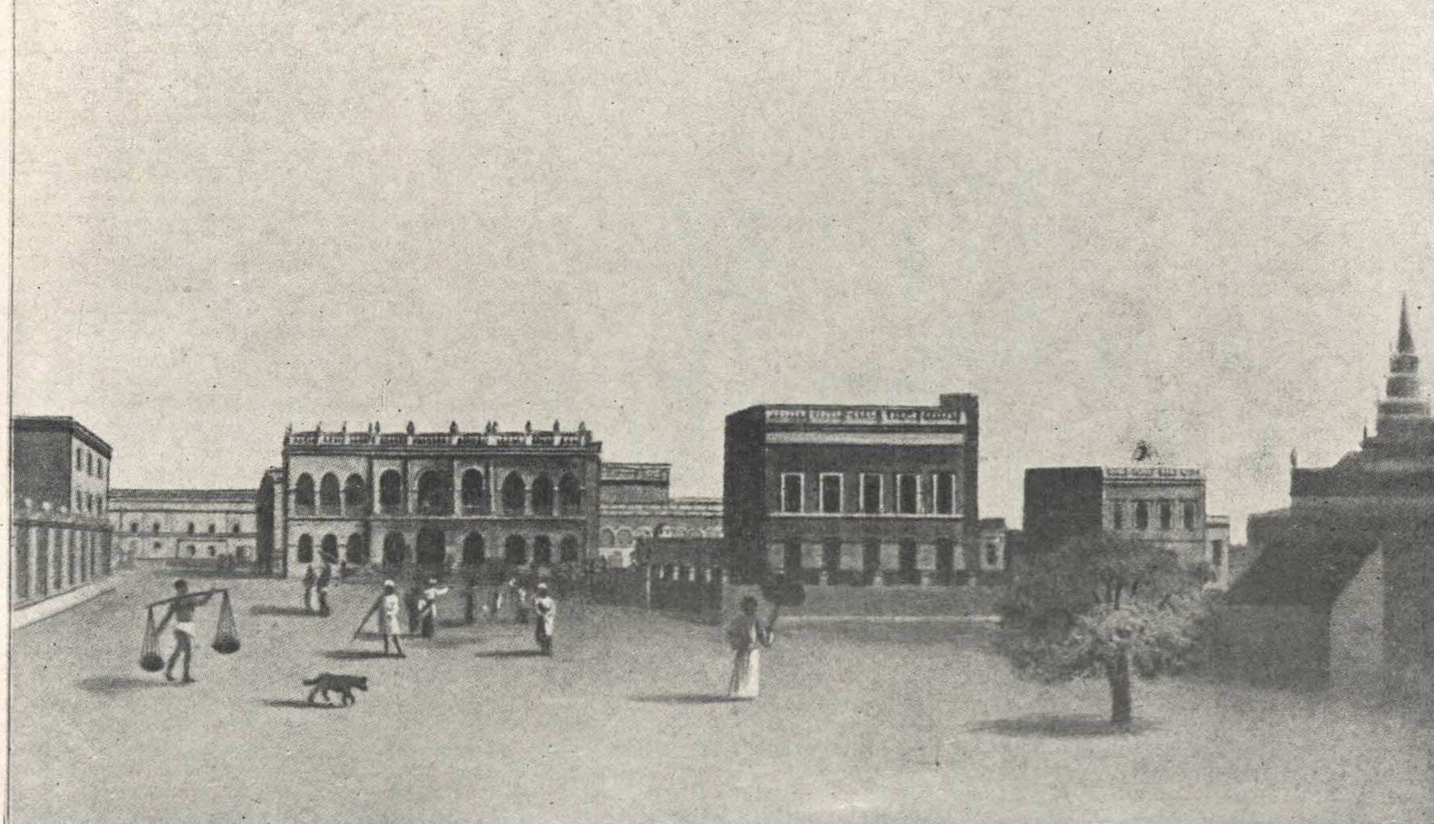
কলকাতার
বাঙালী
পাড়া,
১৭৯২



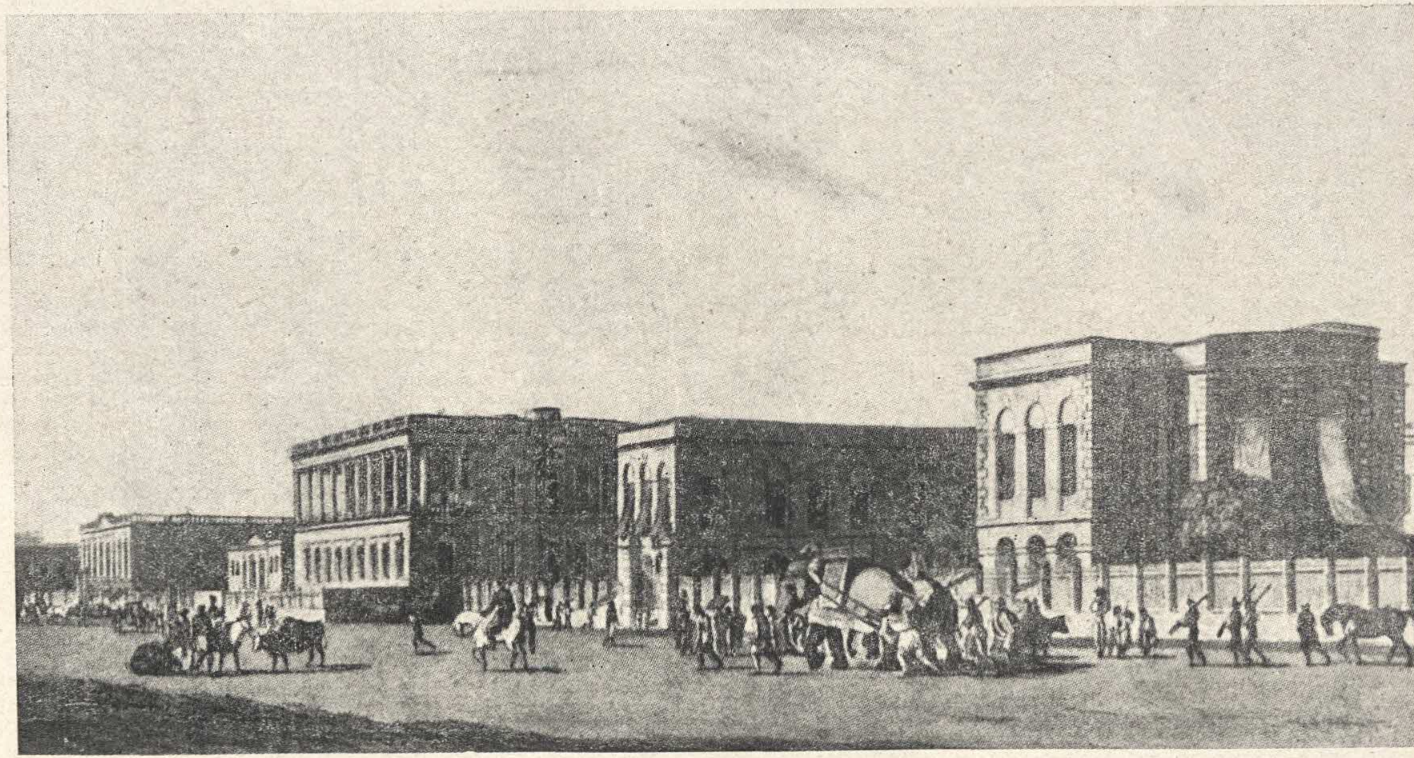


টলির নালা

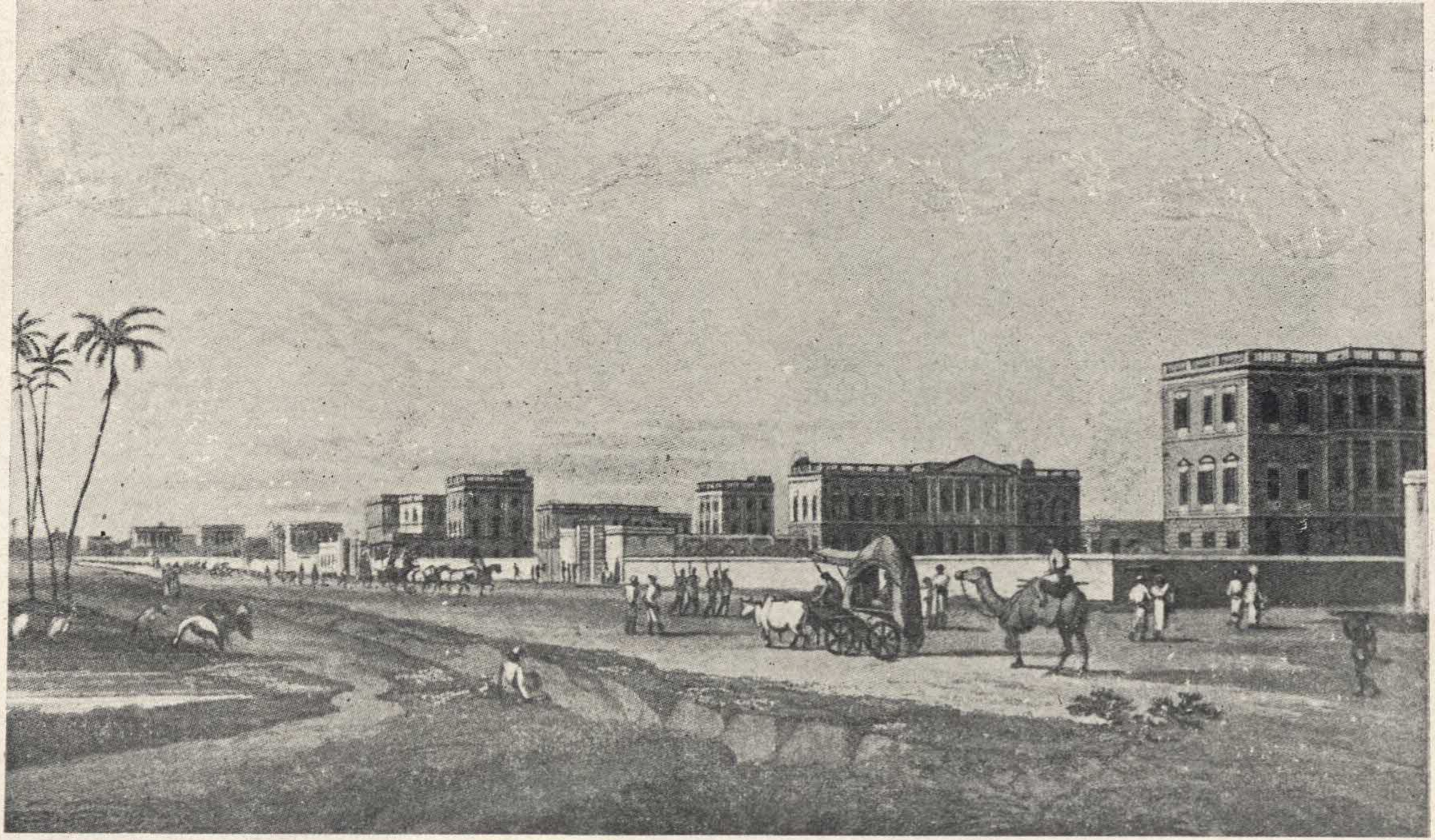
ওল্ড
কোর্ট
হাউস,
১৭৮৪



এসপ্ল্যানেড,
১৭৯২



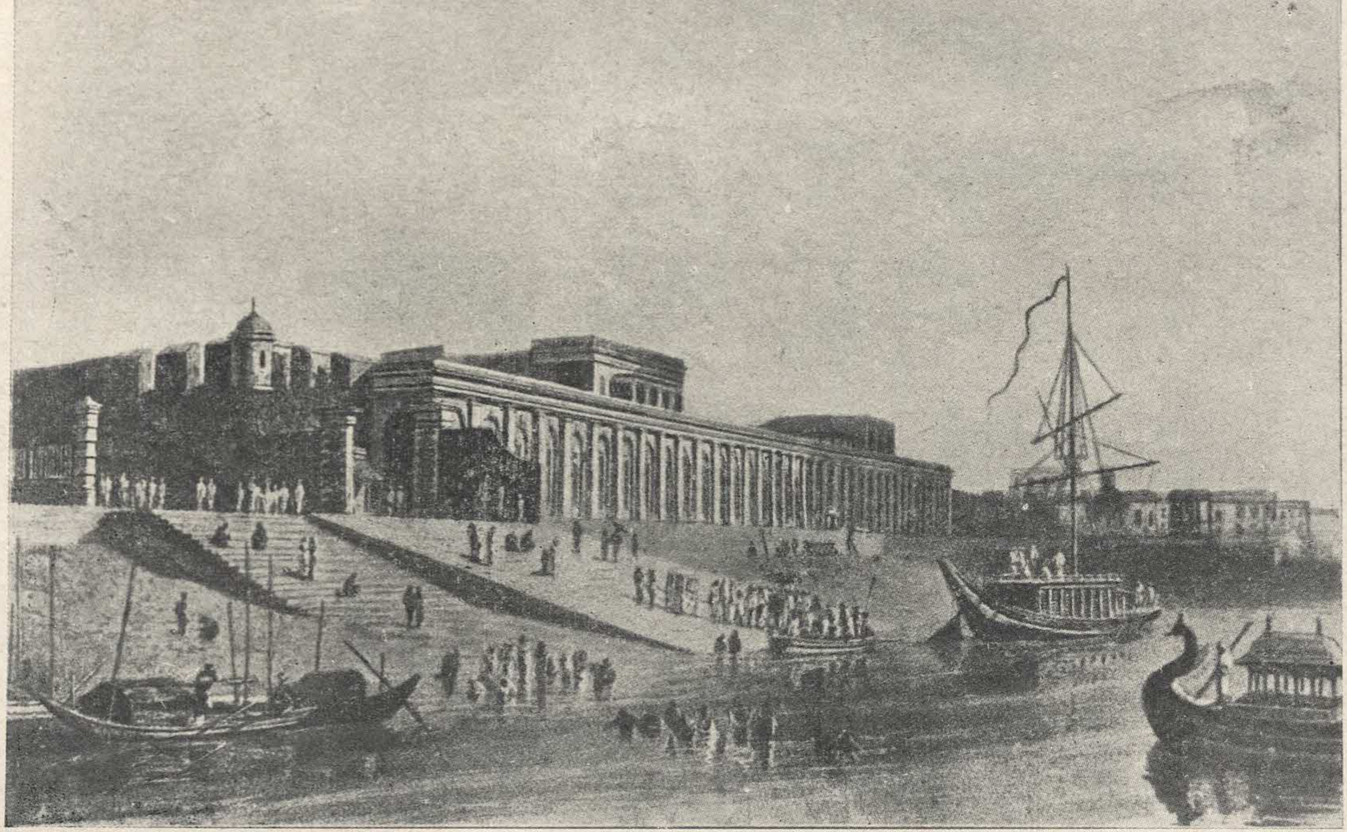
চৌরঙ্গী,
১৭৯২

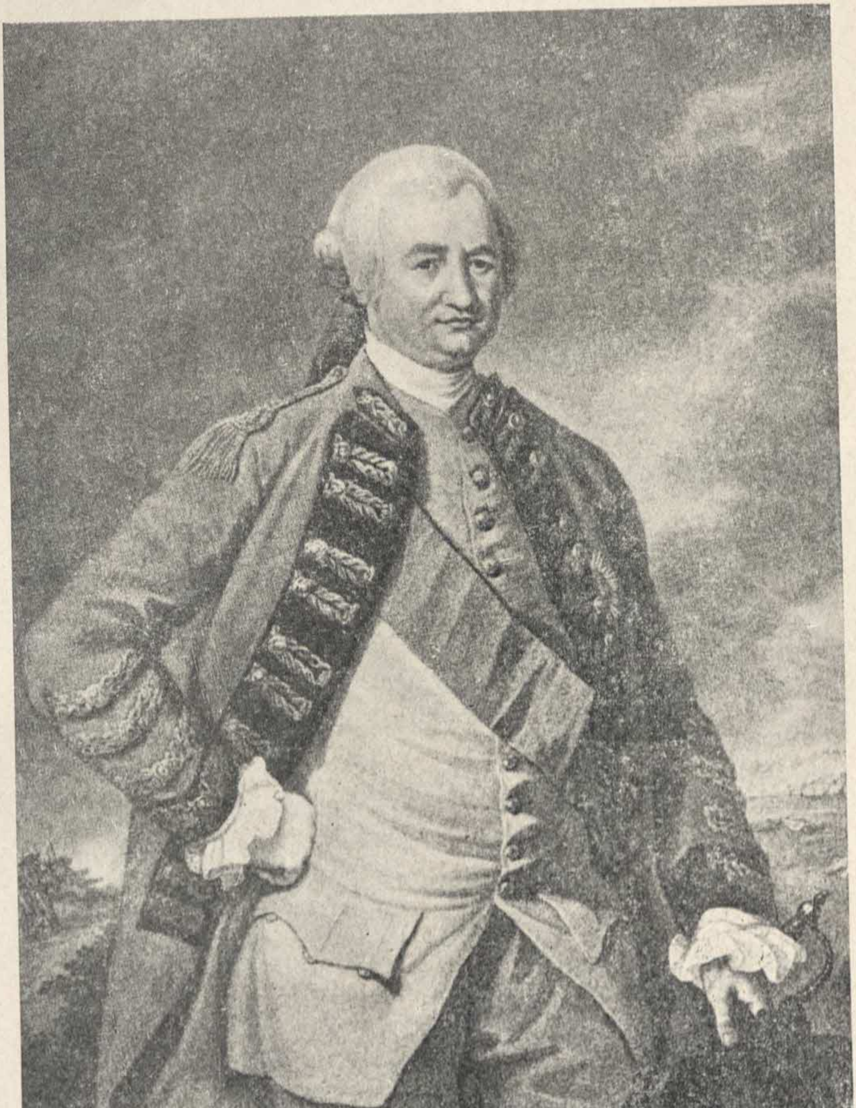




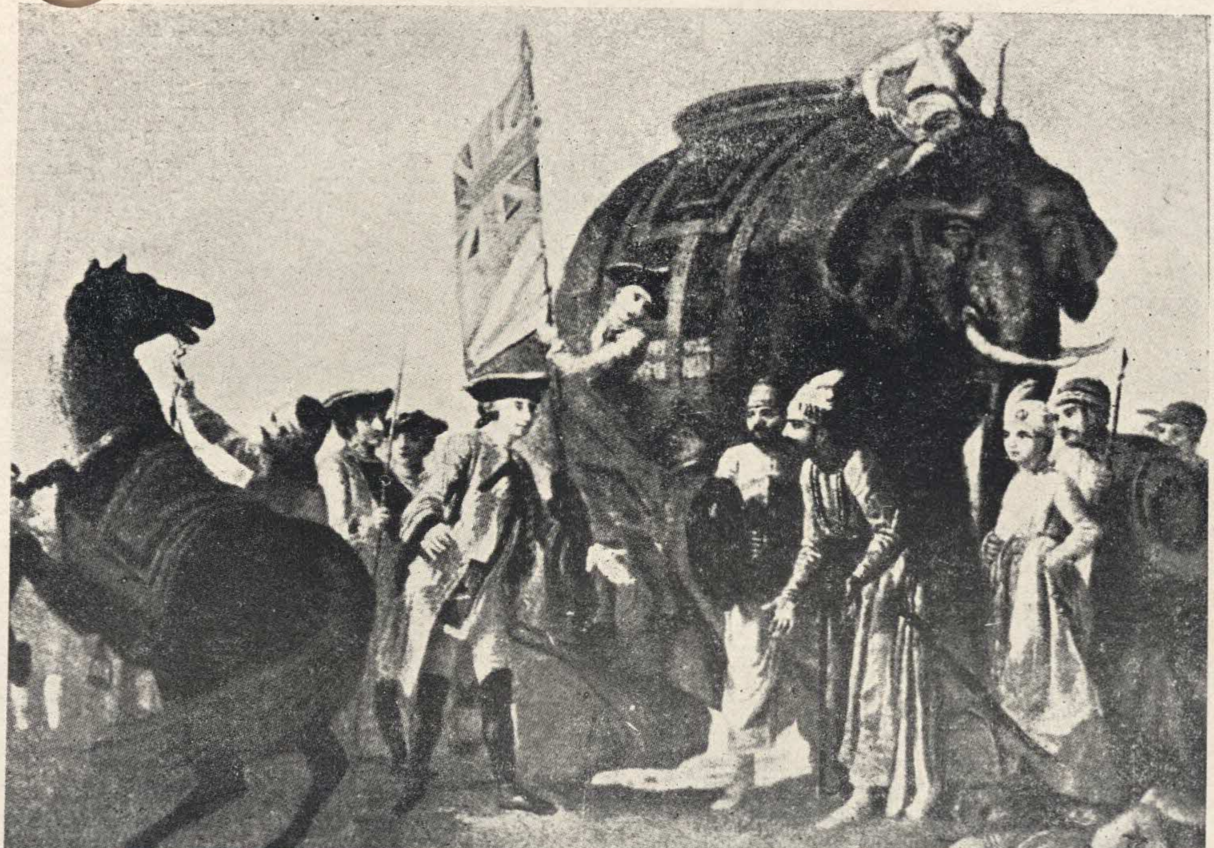
ওল্ড কোর্ট স্ট্রীট

গঙ্গার ঘাট

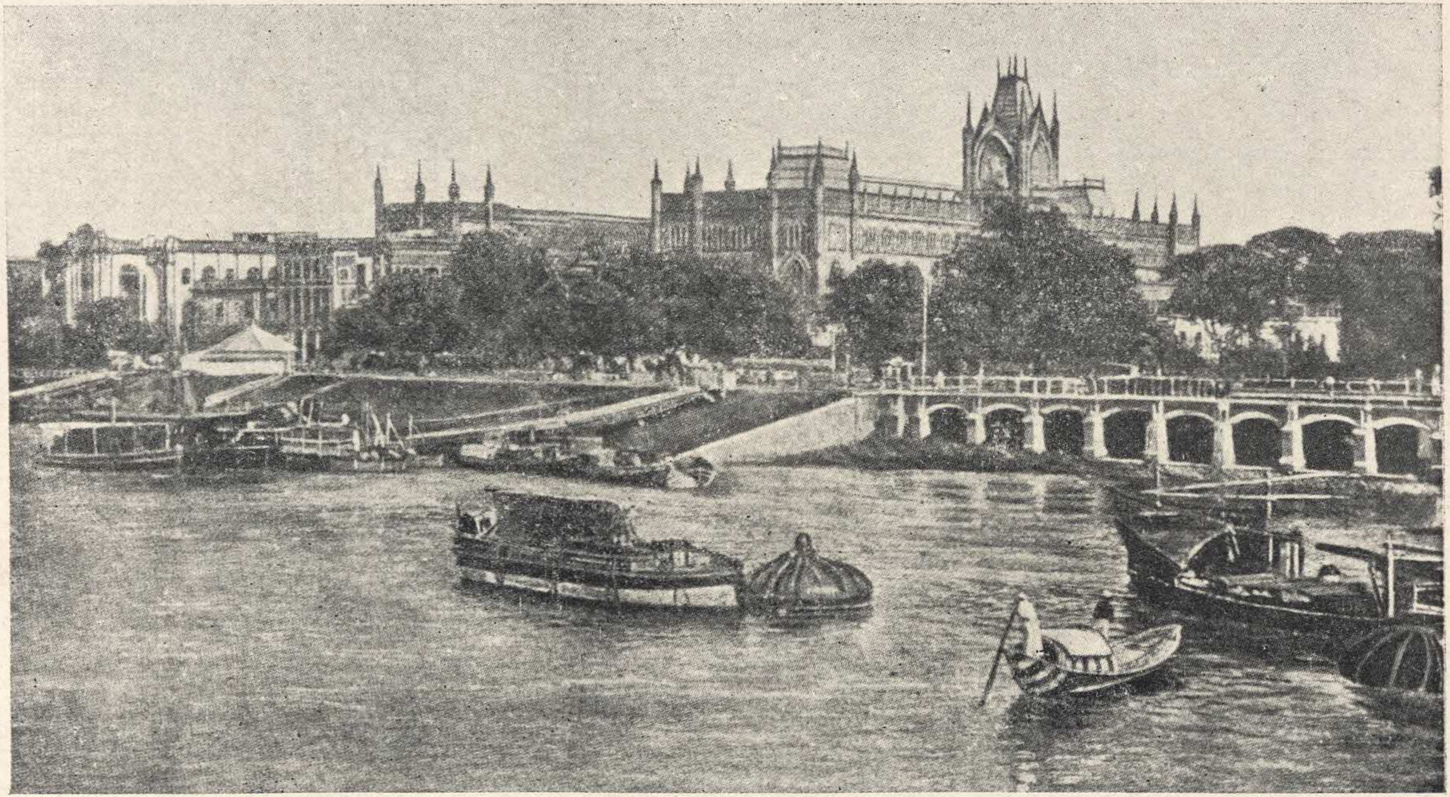




লর্ড ক্লাইভ



পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ ও মীরজাফর



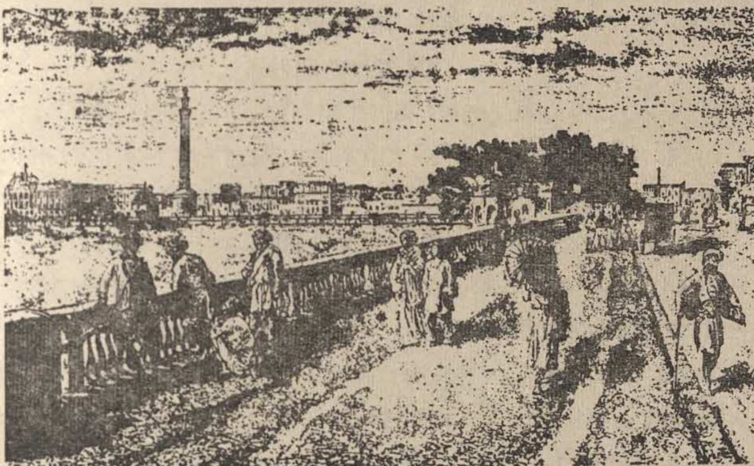
স্ট্রাণ্ড,
১৯০০



সিরাজদ্দৌলা



জব চার্ণক



॥ হীরে মানিকের খোঁজে ॥

ভারতবর্ষ সোনার দেশ। রত্ন-প্রসবিনী তার বিশেষণ। তার ধুলোয় মাটিতে সোনার ছড়াছড়ি। মাটির নীচে খনি। খনিতে হীরে পান্না মুক্তো। মাটির ওপরে গাছ। গাছে রূপোর পাতা আর সোনার ফুল। রাজা-বাদশারা রাজ্যপাট চালায় সোনার সিংহাসনে বসে।

একদিন শুধু ইউরোপ নয়, সারা পৃথিবীর লোক এই কথা ভাবত। তাদের স্বপ্নে-কামনায় ভারতবর্ষ ছিল একটা 'কল্পতরু'। যার একটু ছোঁয়া লাগলেই সব সোনা!

ভারতবর্ষের পণ্য কিনলেও লাভ। বেচলেও লাভ। যেন মাটির দরে কেনা আর সোনার দরে বেচা। ব্যাবিলন থেকে মিশর, মিশর থেকে গ্রীস, গ্রীস থেকে রমণীয় রোম—সবাই ভারতবর্ষের লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে সংগ্রহ করেছে তাদের সৌভাগ্য আর সম্পদ। এককালে, খ্রীষ্ট জন্মেরও বহু বছর আগে, ভারতবর্ষের প্রধান পণ্যশালা ছিল মিশর। যে মিশর মৃতদেহকে বাঁচিয়ে রাখার কারুকার্যময় কৌশল আবিষ্কার করে গোটা পৃথিবীর বিস্ময়, প্রথম আদি যুগে তার উপকরণ যুগিয়েছে এই ভারতবর্ষ। খ্রীষ্ট জন্মের দুশো বছর আগে গ্রীসের হাটে বাজারে বিক্রি হয়েছে ভারতবর্ষের কার্পাস।

প্রাচীন কালের ইহুদী রাজা সলোমন যে অলৌকিক ঐশ্বর্যে ঝলমলানো সাজগোজের জন্যে ইতিহাসের পাতায় ছবি হয়ে ফুটে আছেন—অজস্র মুদ্রার বিনিময়ে সেও এই ভারতবর্ষ থেকে কেনা।

আর বাংলা ? সে তো দেশ নয়। সোনার খনি। না, তাও নয়। মর্তভূমিতে যেন স্বর্গ। মোগলদের 'জিন্নেত-উল-বেলাৎ'। তার –

"হাজার বাণিজ্য নায়
সাগর বাহিয়া যায়।"

তার নদীর তটভূমিতে প্রতিটি বালির বিন্দুর ফাঁকে ঝিক্ ঝিক্ করে সোনা। সোনা দিয়ে ঘরের মাথা মুড়োনো। সোনায় গাঁয়ের রূপসী বধূর গা-মোড়া। আর সোনার চেয়ে দামে ভারী, ওজনে হাল্কা, মসলিন তারা হাত দিয়ে বোনে। চীনে যায়, তুরস্কে যায়, আরবে যায়, সিরিয়া, ইথিওপিয়া আর পারস্যে যায় সেই মসলিন। মসলিন নয়, 'হাওয়ার ইন্দ্রজাল'।

রোমের কী নেই ? সে তো ঐশ্বর্যের সমারোহে টলমল। তবু রোমের মেয়েরা মসলিনের একটা টুকরো পেলে হাতের চাঁদ ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে ধুলোয়। অনেক ষড়ৈশ্বর্যময়ী সম্রাজ্ঞীর মনেও ঐ একই আকাঙ্ক্ষার আগুন। একখণ্ড মসলিনের অভাবে তুচ্ছ হয়ে যায় সারা জীবনের রাজসুখ-ভোগ।

শুধু রানীর অন্দর-মহলে নয়, প্রকাশ্য রাজ দরবারেও সে মসলিন পেয়েছে তার যোগ্য আসন। বিদেশ থেকে অসংখ্য দূত এসেছে এদেশের রাজার কাছে মসলিনের একখণ্ড নিদর্শন সংগ্রহের জন্যে। বিদেশে বিজিত রাজা বিজয়ী রাজাকে শ্রদ্ধা বা সম্মান জানাবার জন্যে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু মনে করত ভারতের মসলিন।

সুদূর গুপ্তযুগ থেকে বাইরের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য। এখানকার বণিকরা যেত আলেকজান্দ্রিয়া, পালমিরা প্রভৃতি বন্দরে। আর বিদেশী বণিকরা, যেমন রোমের, গ্রীসের, আসত গুজরাট বন্দরে। গুজরাটের ব্রোচ বন্দর থেকে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী পর্যন্ত ছড়ান ছিল বাণিজ্যের সীমা।

মোগল যুগের শুরুতে আরও নতুন বন্দর গড়ে উঠল। পশ্চিম উপকূলে গুজরাটের সুরাটে। আর মালাবার প্রদেশের কালিকটে। পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ আর বাংলাদেশ। তখনকার কালের সবচেয়ে বড় বন্দর, সুরাট। সুরাটে এসে জমা হত সারা ভারতের সেরা পণ্য সামগ্রী। যেমন গুজরাটের কার্পাস। বাংলার সিল্ক-মসলিন, মালবারের গোলমরিচ, আগ্রার নীল, পাটনার কস্তুরী। এ ছাড়া সিংহল, সুমাত্রা, জাভা থেকেও আসত আরো নানাবিধ সুগন্ধী মশলা।

এই সব পণ্য কিনে জাহাজ বোঝাই করত যে-সব সওদাগরেরা বিদেশ-বিভূঁয়ে চালান দেওয়ার জন্যে, তাদের বেশীর ভাগই আরব ও মিশর দেশের

মুসলমান। সাধারণভাবে তাদের বলা হত মুর। নানা পথ ঘুরে এসব পণ্য গিয়ে জমা হত ইতালীর ভেনিস, জেনোয়া আর ইস্তাম্বুলে। সেখানকার ব্যবসায়ীরাই ছিল ভারতীয় পণ্যের পয়লা নম্বরের খদ্দের। তারপর তারাই সারা ইউরোপের বাজারে বেচে বেড়াত মোটা দামে, চড়া দরে। এই ব্যবসায়ীদের বলা হত লম্বাদ।

মোটা দামের মূলে ছিল, ভারতীয় মশলা সম্পর্কে সারা ইউরোপের লোভ। তখনকার ইউরোপের প্রধান খাদ্য ছিল মাংস। আনাজপাতি ফলমূল এখনকার মত জন্মাত না। ভারতীয় মশলার কদর এই জন্যে যে, এতে একঘেঁয়ে মাংস ভরে ওঠে নানান রকম সুগন্ধী স্বাদে। তার চেয়েও বড় কথা, এই মশলার ব্যবহারে মাংসকে সংরক্ষণ করা যায়, দুর্গন্ধহীন মাংস আহারযোগ্য থাকে দীর্ঘদিন।

মশলার সঙ্গে আরও এক আকর্ষণ, ভেষজ। ইউরোপ তখন চিকিৎসা শাস্ত্রে আদৌ উন্নত নয়। চিকিৎসা বিদ্যার আদি জনক হিন্দুস্থান। এখান থেকেই আরবরা শেখে এবং ইউরোপকে পরে শেখায়। এই চিকিৎসা বিদ্যার মূলেও ছিল ভারতীয় লতাগুল্ম এবং মশলাপাতির অশেষ গুণ। হিন্দুস্থান থেকে বাণিজ্যের সূত্রে যে-সব জিনিষ ইউরোপের বাজারে গিয়ে জমা হত, তার মধ্যে ছিল গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, জায়ফল ও জয়ত্রী, তেঁতুল, চন্দনকাঠ, ভাং, আফিম, সিল্ক আর কার্পাস বস্ত্র।

হিন্দুস্থানের মশলা বেচে ভেনিস বন্দর যে ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধিতে লাল হয়ে উঠছে, এ সংবাদ একদিন কানে এল পর্তুগালের রাজা ম্যানোয়েলের। আর মনে পড়ল পাশের রাজ্য স্পেন এইতো মাত্র ক'বছর আগে আবিষ্কার করে এল একটা নতুন দেশ, আমেরিকা। স্পেনেরও বরাত ফিরছে দিনকে দিন। স্পেন পেয়েছিল একটা দক্ষ নাবিক, কলম্বাস। পর্তুগালে সে-রকম সাহসী নাবিক কি একজনও নেই? থাকলে, উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে এখুনি আমাদের দেশের জাহাজকে পাড়ি দিতে পাঠাতাম, হিন্দুস্থানের মশলার বাজারে। বাজারটাতো পুরোপুরি বেদখল করে আছে মুরগুলো। আমাদের চক্ষের বিষ। অমৃত শুধু ওরা একাই ভোগ করবে?

মধ্য যুগের ইউরোপ তখন অন্ধকারে। ধর্মে সে উন্মাদ। লালসায় সে উৎক্ষিপ্ত। সে চায় সুখ, ঐশ্বর্য, প্রভুত্ব আর ধর্মের বিস্তার। ভারতবর্ষের কল্পতরু প্রতিদিন হানা দেয় তার স্বপ্নে জাগরণে। সুদূর সমুদ্রপারের জলপথ আবিষ্কারের নেশা ক্ষেপিয়ে তোলে তার রক্ত। ঐশ্বর্য চাই। সুখ চাই। চাই অবারিত প্রভুত্বের অধিকার।

অতলান্তিক মহাসাগরের তীরে ছোট্ট আর স্বতন্ত্র একটা রাজ্য পর্তুগাল। লোকসংখ্যায় সে ক্ষীণ। শিক্ষা-সভ্যতায় হীন। রোম-সাম্রাজ্যের দীন প্রজা তারা। কিন্তু কব্জি আছে হাতের। আছে বুকের পাটা। আর লড়াই করার দাপট। আর দেশ থেকে মুসলমান ধর্মকে উচ্ছেদ করার সময়ে তারা শিখেছে যুদ্ধ-জাহাজ চালানোর কায়দা-কানুন। তবে আর কি? এবার জয় মা বলে ভাসা তরী।

১৪৯৭ সালের ৮ জুলাই। শনিবার। টেগস নদীর কিনারে শুধু মানুষের ঢেউ। হাসি-খুশিতে উচ্ছল। ঢেউ ছলছল করছে মানুষের মনেও।

প্রথমে রাজার আদেশপত্র পাঠ করে শোনান হল। তারপর বাজল নদী-তীরের মন্দিরের ঘন্টা। জলের কল্লোল আর মানুষের কোলাহলের সঙ্গে মিশে গিয়ে সেই ঘন্টার ধ্বনি অনেকক্ষণ ধরে বাজতে থাকল চারপাশের আলোয় হাওয়ায়। স্বদেশের মাটিকে চুমু দিয়ে, দেশবাসীর শুভেচ্ছায় বুক বেঁধে পর্তুগীজ সেনা নায়ক ভাস্কো-ডা-গামা চাপলেন তাঁর জাহাজে। সঙ্গে আরো তিনটে জাহাজ। ১০৬ জন নাবিক। কিছু অস্ত্র-শস্ত্র। কিছু খাদ্য। কিছু সংশয়-অবিশ্বাস। কিছু আশা-উদ্দীপনা।

মধ্য যুগের ইউরোপীয় সমাজে তখন এরকম একটা ধারণা চালু ছিল যে অতলান্তিক মহাসাগরের পশ্চিমে বা দক্ষিণে কেবল জল আর জল। আর জলের যেখানে শেষ সেখানে মরুস্থল। ধু-ধু, শূন্য খরতপ্ত নৈঃশব্দ্যের দেশ। মানুষ নেই। সভ্যতা নেই।

ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজে যে সমস্ত নাবিক ছিল তাদের মন থেকে মধ্য যুগের সে-সংস্কার ঘোচেনি। তাই তারা মাঝে মাঝে হাতের হাল ছেড়ে বেঁকে বসত ঘরে-ফেরার আগ্রহে। ভাস্কো-ডা-গামার এতবড় আবিষ্কারের সাধনা তাদের কাছে মাঝে মাঝে মনে হত নিছক খেয়ালিপনা। জাহাজের বাইরের চেয়ে জাহাজের ভেতরকার বিদ্রোহের ঝড়ে গামার উদ্যম ছিন্নভিন্ন হয়েছে বহুবার।

তবু তরী একদিন সত্যিই পেল তীর। চোখের সামনে তমালতালীবনরাজি নীলার অপরূপ ছবি। দূরে আকাশ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল পাহাড়। এ কোথায়? এ কাদের দেশ?

এই সেই মালাবার উপকূল। খ্রীষ্ট আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই যেখানে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের জয়-জয়কার। পারস্য, আরব, মিশর যে যেখানে যাক, যেখান থেকে আসুক, মালাবারে এসে একবার থামতে হবেই তাকে।

এখানে বহু জাতির বসবাস। যে এসে মেলে, সেই মিলে যায়। দেয় আর নেয়। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে রাজা-রাজড়া, সম্রাট-শাহজাদার উত্থান-পতনের আলোড়ন থেকে দূরে, দুর্ভেদ্য পাহাড়-প্রাচীরের আড়ালে এই উপকূল। শান্ত, স্নিগ্ধ, নয়নাভিরাম। বিদ্বেষ, বিবাদ, বিসম্বাদের লেশমাত্র নেই এখানে। এখানে কেবল বাণিজ্য আর বাণিজ্য। লক্ষ্মী চির-অচঞ্চলা।

আগে এখানে আরও অনেক বাণিজ্য বন্দর ছিল। তাদের আজ আর কোন চিহ্ন নেই। শুধু কালিকট বন্দর তখনো হারিয়ে যায়নি সমুদ্রের তলায়, বিস্মৃতির অতলে।

১৪৯৮ সালের ২০ মে।

ভারতবর্ষের সোনার ধুলোয় পদার্পণ করলেন পর্তুগীজ-সেনাপতি। কালিকট বন্দর। পরিধি আট মাইল। রাজা হিন্দু। শ্রেণীতে নায়ার। পদবী জামোরিন। গোটা মালাবারের তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর অধীনে কিছু সামন্ত রাজা। যেমন কোচিনের রাজা। দামী ঝলমলে পোশাকে সেজে, মহামূল্য উপঢৌকনের ডালা হাতে তিনি চললেন কালিকটের রাজা জামোরিন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অভিপ্রায়ে। উপঢৌকনের তালিকায় ছিল ডোরাকাটা সূতীর কাপড়, প্রবালের মালা, চিনি, তেল, মধু, আর সিঁদুর রঙের শিরস্ত্রাণ। রাজপথে রাজ্যসুদ্ধ লোকের ভিড়। এ আবার কোন্ দেশের মানুষ গো! কী জোয়ান চেহারা! কী ছাতি! মাটি কাঁপছে চলার ভারে।

রাজা আর প্রজা সকলের মনেই খুশির আবেশ। এবার দেশের বাণিজ্য বাড়বে। নতুন ক্রেতা এসেছে সমুদ্রপারের নতুন দেশ থেকে। আদর অভ্যর্থনার তাই ত্রুটিটুকু নেই কোথাও।

কেবল খুশি হয়নি আরব দেশের বণিকরা। এত জল ঘেঁটে সাতসমুদ্র পার হয়ে এরা কি এসেছে শুধুই বাণিজ্যের জন্যে? এহ বাহ্য। তবে কি ধর্ম-প্রচারের, মুসলমান উচ্ছেদের অভিপ্রায়ে?

আরব-বণিকদের সেই সামান্য সন্দেহের চারা গাছটা কাণ্ডে শিকড়ে অসংখ্য ডালপালায় আশঙ্কা-উদ্বেগের মহীরুহ হয়ে উঠল সেদিন, যেদিন তারা পর্তুগীজ বাণিজ্য তরীতে নিমন্ত্রণে গিয়ে দেখতে পেলেন যুদ্ধের অস্ত্র আর বারুদ-বন্দুকের বিপুল আয়োজন। ভাস্কো-ডা-গামা এসেছিলেন মাত্র চারটি বাণিজ্য-জাহাজ নিয়ে। সে জাহাজগুলো কিছুদিনের মধ্যেই নানান পণ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আর ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরের রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমস্ত গোপন তথ্যও তাঁর যোগাড় করা হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের খ্রীষ্টানরাই সেদিন

তাঁকে এসব গোপনীয় খবর যুগিয়েছিল। মোটামুটি কাজ হাঁসিল করে গামা আবার নাবিকদের নির্দেশ দিলেন গৃহ-যাত্রার আয়োজন করতে।

পালে লাগল হাওয়া। দাঁড়ে উঠল সমুদ্রে সাঁতার কাটার ঝপ্‌ঝপ্ শব্দ। জাহাজ ঘুরল ঘরমুখো।

সেদিনও বিপুল জনোচ্ছ্বাস টেগস নদীর পাড়ে। জলোচ্ছ্বাস বাজছে জনতার বুকের ভেতরে। ভারতবর্ষ বিজয় করে ফিরে এসেছে দেশের ছেলে। জাহাজ বোঝাই পণ্য। পণ্য নয়, রত্ন। এক টাকার জিনিষ বেচে ষাট টাকা লাভ।

এই রত্ন কেনা-বেচার সোরগোল উঠল পর্তুগালের বাজারে বন্দরে। যে স্বপ্ন এতদিন স্বপ্নের মত ধূসরতা নিয়ে মনের আনাচে কানাচে ছড়িয়েছিল, প্রত্যক্ষ দিবালোকে দিনের আলোর মত তাকে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরে সারা ইউরোপ বিস্ময়ে অধীর।

পোপের তখন সর্বময় কর্তৃত্ব। পোপ বললেন, 'ওহে, পর্তুগাল অধীশ্বর, এতদিন তুমি ছিলে ইথিওপিয়া, আরেবিয়া আর পারসিয়ার রাজা। আজ থেকে তামাম ভারতবর্ষের মালিকও হলে তুমি। আর এই নবাবিষ্কৃত জল-পথের একমাত্র স্বত্বাধিকারী।' ব্যস! আর যায় কোথায়। গোলা বারুদ, কামানভর্তি জাহাজ নিয়ে দলকে দল গাছ-কোমর বেঁধে বেরিয়ে পড়ল ভারত অধিকারে। মালাবারের উপকূলে বন্দরে-বন্দরে উঠল দ্বন্দ্বের আলোড়ন। ফিরিঙ্গী বণিকের বারবার আক্রমণে, অত্যাচারে, ধর্মপ্রচারের নির্মম খড়্গের ঘায়ে তার শান্ত নীড়, স্বচ্ছন্দ জীবন উত্যক্ত, উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল দিনে দিনে। বণিকের নাম হল দস্যু। জলদস্যু।

এল পিড্রু। পুরো নাম পিড্রু এলভারেজ ক্যাব্রাল। ১৫০০ সালে কালিকটে ফ্যাক্টরী তৈরি করলেন তিনি। আগে কেবল ছিল রপ্তানীর কারবার। এখন আমদানী রপ্তানী দুই ব্যবসাই চালু হল।

পিড্রুর তিন বছর পরে পর্তুগীজ সেনানীর অধিনায়ক হলেন অলফান্সো আলবুকার্ক। তিনি দেখলেন ঘুঘু জুটেছে। ঘুঘুর ফাঁদ নেই। ফ্যাক্টরী হয়েছে। তাকে রক্ষা করার দুর্গ নেই। সুতরাং দুর্গ গড়া শুরু হয়ে গেল। কালিকটের দুর্গই ভারতবর্ষে প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ।

আবার পিড্রু এসে তিন বছর কাটিয়ে চলে গেলেন। আবার এলেন ডা-গামা। এক যায় আরেক আসে। কিন্তু অত্যাচার বাড়ে বৈ কমে না। আজ হাজার জনের নাক কাটা গেল তো কাল কাটা হল হাত। এর দাঁত ভাঙছে কাঠের বাড়ি মেরে। ওর নাক কেটে সেখানে জুড়ে দিচ্ছে কুকুরের কান। শুয়োরের

মাংস বেঁধে দিচ্ছে মানুষের মুখে। আর মুসলমান হল তাদের পরম শত্রু। কালিকট রাজকে তারা সরাসরি জানিয়ে দিলে মুসলমানরা কালিকটে থাকলে কালিকট ধ্বংস হবে।

পর্তুগীজরা যে রাতারাতি এমন নৃশংস অত্যাচারী হয়ে উঠতে পারল, তার মূলে ছিল জামোরিনের সঙ্গে কোচিনের রাজার বিরোধ। এই গৃহ বিবাদের ফাঁক দিয়ে তারা সুযোগ করে নিয়েছিল নিজেদের প্রাধান্য এবং প্রভুত্ব বিস্তারের। পিছনে ছিল পর্তুগাল রাজ ম্যানোয়েলের প্রেরণা। যেমন করে পারো হিন্দুস্থানকে খ্রীষ্টান বানিয়ে ফেল। যে সব মুসলমান বা মুরদের হত্যা করা হচ্ছে, তাদের বিধবা স্ত্রীদের বিয়ে দাও পর্তুগীজ সৈন্যদের সঙ্গে। এদের সন্তান হবে একই সঙ্গে এবং পর্তুগীজ এবং খ্রীষ্টান। বিধবারা যাতে বিয়ে করতে উৎসাহী হয়, তার জন্যে রাজকোষ থেকে যৌতুক দাও। জমি-জমা, সুযোগ সুবিধা দাও।

গামা মোট তিনবার এসেছিলেন ভারতবর্ষে। শেষবার এসে আর ফিরে যেতে পারেননি নিজের দেশে। ১৫২৪-এর ২৪ ডিসেম্বর। কোচিনে দেহত্যাগ করলেন। এর ১৪ বছর পরে তাঁর দেহাবশেষকে নিয়ে যাওয়া হয় পর্তুগালে, নতুন করে, মহাসমারোহে, সমাধিস্থ করার জন্যে।

গামা নেই বলে পর্তুগীজদের পরাক্রম কিন্তু কমেনি। ক্রমশ বেড়েই চলেছিল দিনকে দিন।

এমনি যুদ্ধ, বিগ্রহ, অত্যাচার আর হত্যালীলার মাঝখান দিয়ে পর্তুগীজ আধিপত্য ক্রমশ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এগোতে লাগল। ভারত-উপকূলে তাদের দখলে এল গোয়া, দমন, দিউ। গোয়া হল অধিকৃত রাজ্যের রাজধানী। এই সব রাজ্যলাভের পিছনে তাদের পরম সহায় ছিল খ্রীষ্টান পাদরী। সম্রাট আকবরের দরবারে তাদের হরবখত্ যাওয়া-আসা। কী দারুণ দোস্তালী। বুঝিবা তারাও এক একটা ক্ষুদে সম্রাট।

আকবরের মোহ আর খ্রীষ্টান পাদরীর মুদ্গর এই দুইয়ের যোগফলে পর্তুগীজদের প্রভুত্ব বিস্তারের সীমা বাংলাদেশের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল। চাঁটগা-র মাটিতে বসে গেল তাদের একটা সেরা বাণিজ্যের ঘাঁটি।

এইবার চাঁটগা থেকে সাত গাঁ পর্যন্ত পর্তুগীজদের বাণিজ্য বিস্তারের যে কাহিনী —সে আরেক মহাভারতের মতই অমৃত সমান। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার দুই প্রান্তে দুটি বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র তখন খুব নামজাদা। একটি চট্টগ্রাম। অন্যটি সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের চেয়ে চট্টগ্রামে বাণিজ্য করার সুবিধেটা বেশী। জলপথটা খুব কাছে। জাহাজ চলাচলের মস্ত সুযোগ। পর্তুগীজরা রতন চেনে। বাংলায়

এসে তাই সবার আগে দখল করলে এই চট্টগ্রাম। দু-জায়গার নাম রাখলে দুটো। চট্টগ্রাম হচ্ছে 'পোর্ট-গ্রাণ্ডী'। অর্থাৎ বড় স্বর্গ। আর সপ্তগ্রাম হচ্ছে 'পোর্ট-পিকানো'। অর্থাৎ ছোট স্বর্গ।

আকবর সাতগাঁ-কে বলতেন– 'বুলখক থানা।' অর্থাৎ বিদ্রোহীদের আড্ডা।

আকবরের সময়ে পর্তুগীজরা বাংলাতেই বাণিজ্য করত। হুগলীর উপকণ্ঠে ব্যাণ্ডেল-এ তাদের প্রথম আশ্রয় ভূমি। তৎকালীন মোগল সুবাদারের অনুমতিতে হুগলীতেই প্রথম তৈরি হয় বাণিজ্য কুঠি। এখনও ব্যাণ্ডেলের উঁচু মাথা গির্জাটার দিকে তাকালে হয়ত মনে পড়বে সেদিনকার জলদস্যু ফিরিঙ্গী বণিকদের স্মৃতি। পর্তুগীজরা যখন হুগলীতে বন্দর জাঁকিয়ে বসেছে, সপ্তগ্রামের তখন একটু একটু করে পতন শুরু হয়ে গেছে। আর এদিকে পর্তুগীজদের দাপট, দম্ভ, দুঃসাহসের মাত্রা ক্রমশ ডিগ্রী পেরিয়ে চলেছে। মোগল-শাসন-কর্তাদের হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলা। উগরোতেও পারে না। গিলতেও পারে না। হাতের মুঠোয় যতই জোর থাক না, মাথার টিকি যে আকবরের মুঠোয়। আর আকবর শাহ যখন এত দেখে শুনেও চোখ বুজে আছেন, তখন আমাদেরই বা এত হুটো-চাপটা, হুঁশিয়ারীর কি দরকার ?

আকবরের রাজ্য-শাসন খুব বিচিত্র। কোন দেশ তিনি লুণ্ঠন করেন না। জোর জবরদস্তি দেখিয়ে কারো সম্পত্তি গ্রাস করেন না। শত্রুকে উৎকোচ দিয়ে প্রয়োজনমত বাধ্য করান। এমন কি শত্রুর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলতেও তিনি গররাজী নন। এমনি কোমল। কিন্তু প্রয়োজন হলে তাঁর কঠোরতার সীমা সমুদ্রের মত অসীম। তখন 'বজ্রাদপি কঠোরাণী'। একদিকে তিনি ধর্মের অনুরাগী। তিলক পরেন। নিরামিষ খান। ব্রাহ্মণরা হাতে রাখি বেঁধে দিয়ে যায়। রাজঅন্দরে 'হোম'-এর আগুন জ্বলে, মন্ত্রপাঠ হয়। আবার খ্রীষ্টান পাদরীদেরও তিনি বিশ্বাস করিয়েছেন, যে তাঁদের ধর্মের প্রতিও তাঁর অনুরাগ যৎকিঞ্চিৎ নয়। এই বিশ্বাসের ফলেই তাঁর দরবারে খ্রীষ্টান পাদরীদের অতিমাত্রার প্রভাব। আর সম্রাট যেখানে পাদরীদের অনুরক্ত সেখানে পাদরীদের চেলাচামুণ্ডারা অর্থাৎ পর্তুগীজ জলদস্যুরা যে বেশ কিছুটা বুকের ছাতি ফুলিয়েই দিনে ডাকাতি করবার সাহস পাবে সেটা ভাবা সভ্যতার দিক থেকে খুব বেশী যুক্তিযুক্ত না হোক দস্যুবৃত্তির দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

আকবরের রাজত্বকাল থেকে শায়েস্তা খাঁর আমল অর্থাৎ ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত জলে ডাঙায় এদের অবাধ অত্যাচার, লুণ্ঠন সর্বনাশের পর্ব চলেছে। তাদের নাম হয়েছে তখন হার্মাদ। কথাটা এসেছে 'আরমাডা' থেকে। আর হার্মাদ

বললেই বাংলাদেশের মানুষের মনে, মন থেকে শরীরের ভাঁজে ভাঁজে একটা নিষ্ঠুর আতঙ্ক, ভয় কেঁপে কেঁপে উঠত। হার্মাদদের যত বিক্রম জলপথে। একটা দুটো নয়, অসংখ্য জাহাজ এক সারে সাজিয়ে তাদের লুণ্ঠনাভিযান শুরু হত। জাহাজগুলোকে বলা হত 'বহর'। বহরের যিনি ক্যাপ্টেন–তাকে বলা হত 'বহরদার'। বিষাক্ত অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই থাকত জাহাজ। অস্ত্রশস্ত্রের চেয়েও মারাত্মক যা, তা হল ঐ বহরের যাত্রীরা। স্নেহ, মায়া, মমতা আর মনুষ্যত্বহীনতায় তারা অস্ত্রের চেয়েও ভীষণ।

তাদের আক্রমণের প্রধান প্রধান ঘাঁটি ছিল চট্টগ্রাম, খুলনা, ২৪ পরগণার উপকূল, নোয়াখালি, সন্দীপ, বরিশাল ইত্যাদি। এইসব জায়গায় পর্তুগীজদের ঘর বাড়িও ছিল। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গীবাজার নামই সেটা প্রমাণ করছে। এ ছাড়া কক্সবাজার আর সুন্দরবনের হরিণঘাটার মোহানাও ছিল ফিরিঙ্গী এলাকা। ফিরিঙ্গী কথাটা এসেছে পর্তুগীজ Francez থেকে।

রাজারাজড়ার সঙ্গে তাদের যুদ্ধ, যেমন আরাকান রাজের সহায়তা নিয়ে শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে, কিংবা প্রতাপাদিত্যের দলভুক্ত হয়ে মোগলদের সঙ্গে–এসব বড় বড় সংবাদ ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলেই বেরুবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ, গরীব জেলে-জোলা ইত্যাদির সঙ্গেও তাদের যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হয়েছে তার কিছু প্রমাণ শুধু আক্ষরিক নয়, ছন্দোবদ্ধ হয়ে আছে বিভিন্ন লোক-কবিতায়। কোন কোন কবিতায় চাষীদেরও উল্লেখ।

এক পল্লীগীতিতে আছে–সমুদ্রকূলবর্তী জেলেরা একসঙ্গে মিলে হার্মাদ দস্যুদের আক্রমণ করল। সেনাপতির নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে তারা পেছন থেকে ছুটে গিয়ে দস্যুদের চোখে ছুঁড়তে লাগল মুঠো মুঠো লঙ্কা আর মরিচের গুঁড়ো।

'কয়েকজন জাইল্যা তথায় সাইগরে মাছ ধরে।
জাইল্যার লুকায় ডাকুরা সব উড়িল দলে বলে॥
কেহ লৈল পালর বাঁশ, কেহ লৈল পই।
কেহ কেহ উজাইল ধামাদাও লই॥
ডাঙার শুরু হৈলরে সেই ধূ ধূ বালির চরে।
কারো মাথা ফাড়ি গেলগে, কেহ গেল মরে॥
হাইল্যার মধ্যে একজন বয়সে সেই বুড়া।
তড়াতড়ি আইল্ লগই মরিচের গুঁড়া॥
মরিচের গুঁড়া আনি কি কাম করিল।
মুট করি ডাকাইতের চোখে মেলা দিল॥' ইত্যাদি

হার্মাদরা কখনো ছোট ছোট ডিঙিতে তীরের বেগে ছুটে এসে চারপাশ থেকে ঘিরেছে বণিকের জাহাজ। কখনো একশ মাইল হেঁটে হঠাৎ কোন কলরব-মুখর উৎসব বাড়িতে, কি বাজনা-বাজা বিয়ের আসরে ঢুকে স্ত্রী-পুরুষ ভুলে যথেচ্ছ অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে। সুন্দরী মেয়েরা ঘাটে স্নান করছে, হঠাৎ এসে তাদের ওপর জোর-জুলুম, নারীত্বের অবমাননা ঘটিয়ে নিয়ে চলল জাহাজে, ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করবে আরাকানে। পূর্ববঙ্গের পল্লীগাথায় তাদের বহু বিলাপ গাঁথা হয়ে আছে—

> 'অভাগিনীরে মনে রাখিও। ঘাটে আমার কলসী পড়িয়া রহিল, আমার হাতের কঙ্কন ফেলিয়া আসিয়াছি; আমাকে মনে করিয়া দুঃখ হইলে কঙ্কন ও কলসী তোমার হাত দুখানি দিয়া ছুঁইও—তাহাতে আমি জুড়াইব। আর সুন্দরী দেখিয়া একটি মেয়ে বিবাহ করিও। আমি যে আদর ও স্নেহের জন্য পাগল ছিলাম, তাহা তাহাকে দিও, হত-ভাগিনীর অদৃষ্টে তাহা নাই।'

লৌকিক ছড়া বা গান ছাড়াও আমাদের মঙ্গলকাব্যেও এই হার্মাদ-আতঙ্কের পয়ার-বন্ধ চিত্র।

> 'ফিরিঙ্গী দেশখান বহে কর্ণধার
> রাত্রিদিন বহে যায় হার্মাদের ডরে।'

গামার আমলে পর্তুগীজরা জলযুদ্ধে যে জামোরিনকে জব্দ করতে পারেনি, তার কারণ জামোরিনের জাহাজগুলো ছিল অনেক হাল্কা আর ক্ষিপ্রগতি। কিন্তু পর্তুগীজদের হাতে মস্ত বড় অস্ত্র। সে হল বন্দুক!

বংশীদাশের কাব্যে তার নমুনা—

> "মগ ফিরিঙ্গী যত　　　বন্দুক পলিতা হাত
> একবারে দশ গুলি ছোটে।"

সরস্বতী মজে যাওয়ার ফলে সপ্তগ্রামের রাজকীয় সমৃদ্ধি যখন অস্ত যাওয়ার পথে, হুগলীতে নতুন বন্দরের জন্ম, পর্তুগীজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের দফা রফা, তখনও কিন্তু তারা এদেশের নদীতে নদীতে বোম্বেটেগিরি করতে ছাড়েনি। যাত্রীবাহী নৌকোর ওপর লুটপাট চালানো, মেয়ে চুরি, এসব সমানেই চালিয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'য় রয়েছে তার উল্লেখ। "পর্তুগীজ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল।" আরেক জায়গায় অধিকারীর মুখ থেকে কপাল-

কুণ্ডলার জন্ম বিবরণের সূত্রে জানতে পারি—"ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্র-তীরে ত্যক্ত হয়েন।"

সমুদ্রোপকূলের গ্রাম-নগর থেকে মেয়েদের চুরি করে আনা এবং ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করা ছিল পর্তুগীজদের একটা একচেটে ব্যবসা। বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এই ব্যবসার কেন্দ্র। ছোট ছোট শিশুদেরও ধরে এনে খ্রীষ্টান করত। ক্রীতদাস করে বিক্রি করত তারপর।

পর্তুগীজরা মূলধনের জোরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে আসেনি কখনো। তারা ভেবেছিল গায়ের জোরটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জোর। সেই জোরে ব্যবসা জাঁকিয়ে তুলবে। কিন্তু ইতিহাস তাদের সেই অবারিত বাহুবললীলার মাঝ-খানে জুড়ে দিলে এক নতুন অধ্যায়।

আকবরের মৃত্যুর পর সম্রাটের সিংহাসন পেলেন জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর সম্রাট হলে কি হবে পিতার মৃত্যুর পর পুরো এক বছর তাঁর কেটে গেল এক গভীর দুঃস্বপ্নে, দুঃসহ যন্ত্রণায়। সে যন্ত্রণা প্রেমের। সে দুঃস্বপ্ন আকাশ ভরা চাঁদের চেয়েও লাবণ্যময় একটি মুখের। সে মুখ মেহেরুন্নেসার। একদিন এক নিমন্ত্রণ সভায় দেখেছিলেন তাঁকে মাত্র এক পলকের জন্যে। আর সারা বছর ধরে সেই একটি মাত্র পলকপাতের আগুন ঝলকে ঝলকে পুড়িয়ে মারছে তাঁকে। মেহেরুন্নেসা বর্ধমানের শের আফগানের স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত শের আফগানকে হত্যা করেই জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নেসাকে নিজের বেগম করলেন।

সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হবার পর থেকে মেহেরুন্নেসার নতুন নামকরণ হল নূরজাহান। মেহেরুন্নেসা মানে রমণীকুলের সূর্য। আর নতুন নামকরণে তিনি হলেন জগতের আলো।

পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে যে সেলিম সিংহাসন লাভ করে সম্রাট জাহাঙ্গীর হলেন—তাঁর কিন্তু সিংহাসনে সুখ নেই। ভারতবর্ষ তাঁর সাম্রাজ্য নয়। তাঁর সাম্রাজ্য ভালবাসা। তাঁর মনোজগৎ, 'জগতের আলো' নূরজাহান। রাজকীয় দলিল-দস্তাবেজে, স্বর্ণমুদ্রায় যেখানে জাহাঙ্গীর, সেইখানেই নূরজাহান। স্বর্ণমুদ্রার একপিঠে লেখা থাকতো—

'বহুক্ত শাহ জহাঙ্গীর যাফৎ সদ জেবর
বনামে নুরজঁহা বাদসহে বেগম অর॥'

জাহাঙ্গীরের আমলে যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে অনেক। অনেক শত্রুকেই দমন করেছেন তিনি। কিন্তু পর্তুগীজ দমনে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ পায়নি।

জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহ সিংহের চেয়েও প্রচণ্ড। তিনি যখন দ্বিতীয় বার বাংলায় এলেন দ্বাদশ ভৌমিক বা বারো ভূঁইয়ার বিদ্রোহ দমন করতে—সেই সময় পর্তুগীজরাও সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের পক্ষে অস্ত্রধারণ করল। ফ্রান্সিস কার্ভালো, রডা, গঞ্জালেস প্রতাপাদিত্য-পক্ষের নৌ সেনাপতি।

এদিকে আবার হুগলীতে ঠিক সেই সময়েই হামলা চলেছে তাদের। হুগলীর কাছ দিয়ে কোন জাহাজ বা বাণিজ্যতরী গেলে তার জন্যে তারা শুল্ক আদায় করতে আরম্ভ করেছে। মুসলমান তীর্থযাত্রীদের মক্কাগামী জাহাজে লুঠপাট চালাচ্ছে হরদম। দেবমূর্তি ভাঙছে। এমনি নানা উৎপাত।

জাহাঙ্গীর বাপের মতই শান্ত। কিন্তু রেগে গেলে তিনিও অসাধারণ নিষ্ঠুর। পর্তুগীজরা দরবারে সুন্দরী মেয়ে উপহার পাঠায়। সম্রাট সে-সব সাদরেই গ্রহণ করেন। এই রমণী-ব্যবসার পরাকাষ্ঠার জন্যে তাদের 'ফকর অলতোজার' অর্থাৎ বণিক-গৌরব উপাধি দিতেও তাঁর কোথাও বাধে না।

কিন্তু অত্যাচারের নেশা যখন এই জলদস্যুদের জন্তুর চেয়েও নৃশংস করে তুলল জাহাঙ্গীর হুকুম দিলেন—সমস্ত পর্তুগীজদের জেলখানায় পুরতে, তাদের খ্রীষ্ট ধর্মের অনুষ্ঠানও বন্ধ হয়ে গেল। তিনি উল্টে ডাচ্‌দের সঙ্গে বাণিজ্যের সন্ধি করলেন।

আর এই সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে উঠে এল ঢাকায়। নাম হল 'জাহাঙ্গীর নগর।'

তবুও যেন একটা 'কিন্তু' রয়ে গেল। পর্তুগীজরা বেঁচে রইল মরতে মরতেও। আর তাদের বাঁচা মানেই বাংলার মরণ।

জাহাঙ্গীর তখনো বেঁচে। তাঁর প্রিয় এবং তৃতীয় পুত্র সাজাহান হঠাৎ সিংহাসনের দাবীতে বিদ্রোহ জানিয়ে বসলেন। তিনি বিয়ে করেছেন মমতাজ বেগমকে। মা নূরজাহানের ভাইঝি। সাজাহান ভাবলেন মায়ের যখন আমার প্রতি অনুগ্রহ—তখন মাভৈঃ। সিংহাসন তো আমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু সব তালগোল পাকিয়ে দিল ছোট ভাই শাহ্‌রীয়র। তিনি বিয়ে করলেন একেবারে মা নূরজাহানের মেয়েকেই। অবিশ্যি এই কন্যা শের আফগানের ঔরসজাত।

নূরজাহানের সামনে দুটি দিক। একদিকে তাঁর জামাই। অন্যদিকে তাঁর ভায়ের জামাই। কাকে তাঁর বেশী ভালবাসা উচিত। তিনি নিজের জামাতার দিকেই অনুগ্রহ এবং মতামত জানালেন। তবু সাজাহানের মনে একটি মাত্র প্রত্যাশা। সে সিংহাসনের।

১৬২২ সালে তিনি প্রকাশ্যে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয় ঘটল তাঁর। পরাজিত হয়ে তিনি পালিয়ে এলেন বর্ধমানে।

সম্রাট-পুত্র স্বয়ং বিদ্রোহী। এই তো মওকা। যদি এতে আমাদের কিছু উপকার হয়—এই ভেবে পর্তুগীজ গভর্নর এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু হা কপাল! ভেবেছিলাম সম্রাট-পুত্রের সেনাবল বোধ হয় খুব ভারী। সম্রাটের সঙ্গে যুঝতে পারবে। এখন দেখছি একেবারে উল্টো। আমাকেই ডেকে বলে—কিছু কামান আর কিছু সৈন্য দিয়ে সাহায্য করুন না। শুভদিন এলে আপনার ঋণ পরিশোধ করব।

গভর্ণর সাহেব চোখে ঝাপসা দেখলেন এই প্রস্তাবে। সাজাহান আজ দাপট মারছেন। কাল থাকবেন হয়তো গারদে। অথচ মাঝখান থেকে সম্রাটের কুনজরে পড়লে—একেবারে কুপিয়ে সাবাড়। সাজাহান পর্তুগীজদের সাহায্য পেলেন না।

তিনি একাই দারুণ দুঃসাহসে ভর করে বেশ কিছু সৈন্য সামন্তে ভারী হয়ে আচমকা বাংলার মোগল সুবাদারকে আক্রমণ করে বসলেন। সুবাদার প্রাণ হারালেন। সাজাহান বাংলার সিংহাসনটিতে পা ছড়িয়ে বসলেন দু-বছরের মত। জাহাঙ্গীর আবার ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে দুর্ধর্ষ সেনাদল পাঠিয়ে সাজাহানকে বন্দী করে নিয়ে এলেন দিল্লীতে। ১৬২৫ সালে সন্ধি হল দু-পক্ষের। ১৬২৭ সালে মারা গেলেন জাহাঙ্গীর। সাজাহান পিতার শূন্য সিংহাসনে ঘোষণা করলেন নিজের সুদৃঢ় অধিকার।

সিংহাসনে বসেই মনে পড়ল পর্তুগীজদের। বিপদের দিনে, তাঁর জীবনের চরম নিঃসহায়তার দিনে তারা এতটুকু সাহায্য করেনি।

কাশেম খাঁকে তিনি বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠালেন এই নির্দেশ দিয়ে, পর্তুগীজদের ওপর, তাদের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কার্যকলাপের ওপর তুমি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। আমার সুখ আমার প্রজার সুখে। পর্তুগীজরা কোন রকম বিধিবিগর্হিত কাজ করলেই তখনি সরকারে 'এতেলা' করবে। কাশেম খাঁ ভীষণ কড়া লোক। ক্রুদ্ধ বাজের মত অনেক দূর থেকেই তাঁর সূক্ষ্ম, সূচ্যগ্র দৃষ্টি পর্তুগীজদের প্রতিটি-অঙ্গচালনার পিছু পিছু ছায়ার মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। বেশী দিন গেল না। দু-বছর পরেই সম্রাটের কাছে এক বিরাট 'এতেলা' এসে হাজির।

১। পর্তুগীজরা গায়ের জোরে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করছে।

২। সম্রাটের বিন্দুমাত্র অনুমতি না নিয়ে তারা বিরাট বিরাট দুর্গ তৈরি করছে এখানে ওখানে।

৩। তাদের বাণিজ্য ঘাঁটির সামনে দিয়ে কোন জাহাজ ইত্যাদি গেলেই শুল্ক আদায়ের জন্যে তারা সব রকম অত্যাচার চালাচ্ছে।

৪। বাদশাহের প্রধান বাণিজ্য বন্দর সপ্তগ্রামের ক্ষতি সাধন করছে তারা নানা ভাবে।

সাজাহান নিজে যখন বাংলায় ছিলেন তখন তো সবই দেখেছেন। তাই কাশেম খাঁর সব কথার পেছনেই যে খোদার কসম রয়েছে সেটা সহজেই বিশ্বাস করা যায়। তখনি কাশেম খাঁর ওপর আদেশ হল পর্তুগীজদের বাংলা থেকে একদম হটাও। যেন একটি পর্তুগীজও বাংলার আকাশের নীচে, আর মাটির ওপরে হেঁটে না বেড়ায়। ওদের নিশ্চিহ্ন করে খেদিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সম্রাটের খেদ মিটবে না।

কিন্তু হটাবো বললেই হটানো সহজ নয়। পর্তুগীজরা বড় বড় শক্ত, মজবুত দুর্গ তৈরি করেছে এদিকে ওদিকে। সেগুলি আবার নদী, নালা, ঝিল আর পরিখার পাকে পাকে ঘিরে রাখা। দুর্গের বুরুজে বুরুজে কামান। মোগলদের চেয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, রণকৌশল, অনেক বেশী আধুনিক।

দু-পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চলল। এ ওকে অবরুদ্ধ করে। ওর ক্রুদ্ধ আক্রমণে একে কাটাতে হয় রুদ্ধশ্বাস দিন। শেষ পর্যন্ত নগরের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে তাতে বারুদ পুরে রাতারাতি পর্তুগীজদের পাড়াকে পাড়া, অট্টালিকাকে অট্টালিকা উড়িয়ে-পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে দেবার একটা পরিকল্পনা যখন কাজে পরিণত হল – তখন দেখা গেল বাঘের ঘায়ে ঘোগ ঘায়েল হয়েছে। পর্তুগীজদের সৈন্য মরল এক হাজার। ধরা পড়ল ৪,৪০০ নারী-পুরুষ। তার মধ্যে থেকে বেছে বেছে ৪০০টি সুন্দর পুরুষ আর রমণীকে নিয়ে আসা হল সম্রাটের দরবারে।

পর্তুগীজদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সপ্তগ্রামেরও রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য সম্পদের ভাঙন শুরু হল। বন্দরের বাণিজ্য উৎসবের ভেতরে একটু একটু করে চলেছে ছন্দপতন। সম্রাট আদেশ দিলেন – সপ্তগ্রাম থেকে সমস্ত কাছারী বা রাজকার্যের যা কিছু দপ্তরখানা হুগলীতে উঠিয়ে নিয়ে এস।

সপ্তগ্রামের হারানো জৌলুস হুগলীতে যখন একটু একটু করে জ্বলতে শুরু করছে – ঠিক সেই সময়ে পরাজিত পর্তুগীজদের পাদপীঠে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের এক নতুন বাণিজ্য নাট্যের শুভ উদ্বোধন পর্ব চলেছে পুরোদমে।

এই প্রসঙ্গে শাহজাদা সুজার একটি মন্তব্য খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন,

"এক হাতে কৃপাণ, আরেক হাতে ক্রুশকাঠ নিয়ে পর্তুগীজরা প্রবেশ করেছিল ভারতবর্ষে। অজস্র হীরে মুক্তো মানিকের খোঁজ পেয়ে তাঁরা প্রথমে ক্রুশকাঠ ফেলে দিয়ে কেবল থলি ভরাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এক হাতে না পেরে কৃপাণটাও ফেলে দিলে। তারই ফলে পরবর্তীকালে যারা এল তারা পর্তুগীজদের সহজে দমন করে নিজেদের অধিকার বিস্তৃত করতে পারল।"

পর্তুগীজরা ব্যবসায়ী হিসেবে মরল। সেটা তাদের অতিরিক্ত বজ্জাতির ফল। কিন্তু জাত হিসেবে বাংলাদেশের মাটি থেকে তাদের শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা গেল না। তাদের অনেক কিছু ভাল, অনেক কিছু মন্দ, আমাদের সমাজ আর সংস্কৃতিকে মিশিয়ে নিতে হল রক্তের সঙ্গে। আজও মিশে আছে।

মগের বা ফিরিঙ্গীর ঔরসজাত ব্রাহ্মণ-সন্তান 'মগ ব্রাহ্মণ' আজও রয়ে গেছে বাংলায়, বিক্রমপুরে।

মেয়েরা মাথায় করে নিয়েছে 'ফিরিঙ্গী খোঁপা'।

আনারস যতই আমাদের জানা রস হোক, জানা আছে কি সেটা ফিরিঙ্গীদেরই আমদানী এদেশে ? পেঁপে, পেয়ারা, কামরাঙা, রাঙা আলু, জামরুল, নোনা আতা—এগুলোও।

আজ যখন কথা বলি, লিখি, পড়ি– তখন জানতে পারি না যে বাংলাভাষায় পর্তুগীজরা যুগিয়েছে তার কত শব্দ। যেমন জানতে পারি না যে আজকের কত বাঙালী সন্তানের শিরা-উপশিরায় বয়ে চলেছে পূর্বপুরুষ পর্তুগীজের রক্ত। যে 'সাবান' রোজ মাখি, যে 'জানলায়' আকাশকে কাছে পাই, যে 'আলমারি'তে থাকে থাকে সাজাই অনেক মূল্যে কেনা আদরের বইগুলো, 'বেহালার' কান্নায় নিজের কান্না শুনে কাঁদি যখন, যখন স্নানের জল তুলি 'বালতি'তে, 'তোয়ালে' দিয়ে গা মুছি, 'বোতাম' লাগাই জামায়, পা ছড়িয়ে জিরিয়ে নিই 'কেদারা'য় বসে, তখন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমরা পর্তুগীজদের সম্পদকেই নিজেদের ব্যবহারে খাটাচ্ছি। পর্তুগীজদের 'মাস্তুল' আমাদের জাহাজে। আমাদের জামা কাপড়ে তাদের 'ইস্ত্রী।' তাদের 'আলপিন' আমাদের কাগজে কাগজে জোড়া লাগায়। আমাদের নদীর 'তুফানে' তারা। তুফানের 'বজরায়' তারা। বজরার 'কামান', 'পিস্তল', 'লোক-লস্কর' সবই তাদের। আমাদের জন্মমুহূর্তের 'আয়া'টিও যুগিয়েছে তারা।

এ ছাড়াও আরও শব্দ আছে। যেমন– বাসন, বিস্কুট, বোতল, কামিজ, বাল্প,

আলকাতরা, কাকাতুয়া, নোনা, চা, বয়া, গরাদ, গির্জা, ছাপ, কোচ, ফর্মা, নিলাম, পাদ্রী, তামাক, চাবি, কম্পাস, ফিতা, গুদাম, লণ্ঠন, আচার, পেরেক, রেস্তো, সায়া, টোকা, বারান্দা, ইস্পাত, বরগা, কম্পাস, কামরা, সাবু।

আরো, অনেক ফল-ফুল এদেশে তাদেরই আমদানি করা। যেমন সফেদা, চীনেবাদাম, কমলালেবু, কৃষ্ণকলি ফুল।

পরিব্রাজক বার্ণিয়ের দেখেছেন, বাঙালীর সঙ্গে মিশে পর্তুগীজরা নানারকম সুস্বাদু মিষ্টান্নও তৈরি করেছে সেকালে। তবে তার ইতিহাস মেলে না।

তামাক শব্দই নয় শুধু, তামাক খাওয়ার নেশাটাও তাদেরই এদেশে আমদানী করা। তামাক সেকালে এমনই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, তাই নিয়ে পুঁথি পর্যন্ত রচনা হয়েছে। নাম 'তামাকু মাহাত্ম্য।'

"দিবা নিশি যেই নরে, তামাকু ভক্ষণ করে।
অন্তকালে চলে যায় কাশী।"

পুঁথি-পাটার যুগে তারা এসেছিল আমাদের দেশে। অথচ প্রথম বাংলা বই ছেপেছিল তারাই। যদিও তা রোমান হরফে। পরে বেরিয়েছিল একখানা বাংলা ব্যাকরণ। প্রথম বাংলা বইটির নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।' লেখকের নাম পাদরী ফাদার মনোএল-দা-আসসুম্পশা। ১৭৩৪ সালে ঢাকার কাছাকাছি ভাওয়ালে বসে লিখেছিলেন এই বই। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকেও কিছু গদ্যের বই লেখা হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ।' ১৭৪৩ সালে এই বই লেখেন ভূষণার জমিদার বংশের ছেলে। আরাকান দস্যুরা তাঁকে চুরি করে ছেলেবেলায়। জনৈক পর্তুগীজ পণ্ডিত তাঁকে টাকা দিয়ে কিনে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। নাম হয় দোস অ্যান্তোনিও।

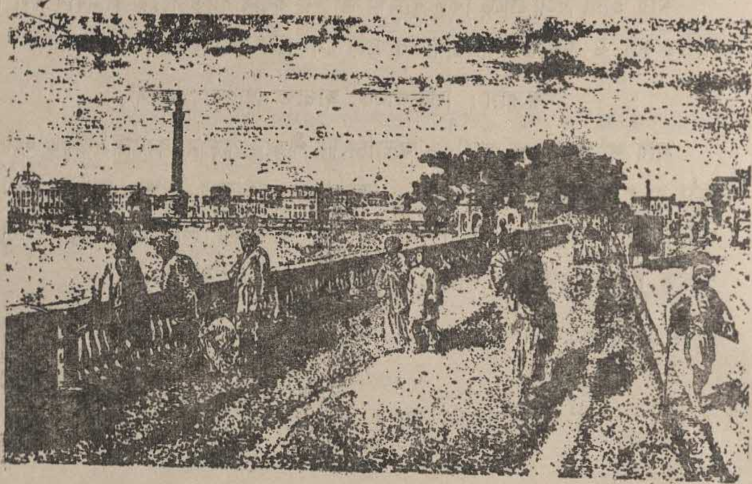
খারাপ পর্তুগীজের সঙ্গে কিছু ভাল পর্তুগীজও এসেছিলেন আমাদের দেশে। তার মধ্যে একজন হলেন সেন্ট জেভিয়ার। ইনি ছিলেন সৎ এবং যথার্থ সন্ন্যাসী। পোপের আশীর্বাদ নিয়ে গড়া যীশু সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। রাজনীতি নয়, ধর্মই ছিল এঁর আদর্শ। এদেশে পর্তুগীজদের অত্যাচার ও অসংযত জীবনযাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে ইনি একসময় চলে যান লঙ্কায়। পরে জাপানে। মৃত্যুর পর তাঁর দেহাবশেষ এনে প্রোথিত করা হয় গোয়ায়।

জেভিয়ার এবং তাঁর সহযোগী সাধুদের চেষ্টায় তখনকার কালে কোচিনে যে লাইব্রেরী গড়া হয়েছিল তা দেখে অবাক হবার মত। ওলন্দাজরা এসে সে লাইব্রেরী ধ্বংস করে দেয়।

আর তারা দিয়ে গেছে কিছু ব্যাধি। তাদের অবাধ ব্যভিচারের অনিবার্য ফল। গলিত কুষ্ঠ ও অন্যান্য দুরারোগ্য রোগকে সেকালে বলা হত 'ফিরিঙ্গী' ব্যাধি।

"গন্ধরোগ : ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্"

আর আছে তাদের অবারিত অত্যাচারের পীড়নে পীড়নে বেদনায় মর্মরিত হয়ে ওঠা বাংলার বহু লোককবিতা। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের দু-কূল ছাপিয়ে ওঠা পল্লীগাথায় সেদিনের সেই সকরুণ আর্তি, আজকের আমরা ছাপার অক্ষরে পড়তে গিয়েও বার-বার আচ্ছন্ন হয়ে যাই কান্নার আবেগে।



॥ নতুন দেশের দূত ॥

এবার ইংরেজ-অভিযান পালা।

কিন্তু তার আগে আরও এক বণিক-জাত হিন্দুস্থানের দিকে ছুটে এসেছে জাহাজে চেপে। তারা ডাচ।

ডাচদের আরেক নাম ওলন্দাজ। পর্তুগীজ Hollandaz কথার অপভ্রংশ। মানে হল হল্যাণ্ডের লোক।

লিন্সকোটেন ছিলেন হল্যাণ্ডের মানুষ। গোয়ায় যখন পর্তুগীজদের খুব দাপাদাপি, সেই সময় গোয়ার একজন পাদরীর কাছে ছিলেন পাঁচ বছর। তারপর পর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রাচ্যের নানা দেশে। দেশে ফিরে লিখে ফেললেন এক ভ্রমণ কাহিনী। তার ভিতর দূর প্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জ, হিন্দুস্থান, লঙ্কা, চীন প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধে তাঁর যাবতীয় অভিজ্ঞতার ফসল। তারই মধ্যে একটা জায়গায় ছিল পর্তুগীজদের সম্বন্ধে তাঁর সাবধান বাণী। প্রাচ্যের সর্বত্রই পর্তুগীজদের অবস্থা এখন ঝিমিয়ে পড়ার মুখে। নড়বড় করছে তাদের খুঁটি। যে কেউ একটু সাহস করে ঘা মারলেই, ভেঙে পড়বে মাটিতে।

দেশের বণিকরা সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়ে লাগল একটা সমিতি গড়তে। ১৬০২। তৈরি হল 'দি ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অব নেদারল্যাণ্ড।' ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে চায় যারাই, তাদেরই কোম্পানীর নাম হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

বছর খানেক পরেই ডাচেরা এসে হাজির হল কালিকটে। জামোরিন তখন পর্তুগীজদের দাপটে অস্থির। তিনি ভাবলেন ডাচদের সাহায্য নিয়ে তিনি পর্তুগীজদের ঠ্যাঙাবেন। তিনি ডাচদের বললেন, তোমরা এখানে ঘাঁটি গড়ো। কিন্তু ডাচদের মনে হল কালিকটের চেয়ে দূর প্রাচ্যের দ্বীপগুলোই বাণিজ্যের পক্ষে বেশী ভাল। তারা কালিকটে না থেকে চলে গেল বাণ্টাকে। তারপর জাকার্তায়। অবশ্য পরে আবার তারা ফিরে এসেছিল হিন্দুস্থানে। সুরাটের বন্দরে বসে বেশ দাপটের সঙ্গেই বাণিজ্য চালাত। গোড়ার দিকে ইংরেজরা পাত্তা পায়নি এদের কাছে। ডাচদের টাকা-পয়সাও বেশী। ব্যবসা-বুদ্ধিও অনেক পাকা। গায়ের জোরটাও জবরদস্ত রকমের। তবুও ডাচদের হটিয়ে ইংরেজরা কি করে এদেশের মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল সে কথায় পরে আসছি।

রাজা সপ্তম হেনরী যখন সিংহাসনে তখন থেকেই ইংরেজদের মনের মধ্যে ভারতবর্ষ জয়ের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু জয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগা যতটা জলের মত সোজা, জয় করার জলপথ আবিষ্কার করাটা ততখানি সোজা নয়। ১৫৬৭ সালে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক বুকে খুব একটা দুঃসাহস আর দৃঢ় একটা সংকল্প নিয়ে প্লাইমাউথ বন্দর থেকে জাহাজে চেপে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি জমালেন। সাগরের ঢেউ ভেঙে-ভেঙে শেষ পর্যন্ত জাহাজ এসে ঠেকল জাভায়। মনে ভাবলেন—এইবার বুঝি ভারতবর্ষকে পাই পাই! কিন্তু যাই-যাই করে আরো বেশ কিছুটা এসেও তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছবার ঠিক পথ আবিষ্কার করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে হল ঘরমুখো।

১৫৮৬ সালে টমাস ক্যাভেনডিল নামের একজন সুদক্ষ নৌ-সেনাপতি আমেরিকার উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করলেন। অতলান্তিক মহাসাগরে জাহাজ কেবল ভেসেই চলেছে আর ভেসেই চলেছে। অনেক দিন, অনেক রাত্রির প্রতীক্ষার শেষে যে দেশের উপকূলে এসে জাহাজ জল ছেড়ে মাটির ছোঁয়া পেল সেটা ভারতবর্ষ নয়। লানড্রোন ও জাভা। Cape of Good Hope হয়ে জাহাজ ব্যর্থমনোরথ হয়ে পিছু ফিরল।

অবশ্য এঁদের আগে একজন ইংরেজ পরিব্রাজক বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন। তাঁর নাম র‍্যালফ ফিচ। ইনি একজন বণিক। সোনা-দানা হীরে-মুক্তোর লোভেই পা বাড়ানোর ইচ্ছে লেগেছিল ভারতবর্ষের দিকে। ১৫৮৩ সাল। ১২ ফেব্রুয়ারী। 'টাইগার' নামের এক জাহাজে চেপে বসলেন ফিচ। সঙ্গে তিন বন্ধু। জন নিউবেরী, উইলিয়ম লিড্‌স, ছবি আঁকিয়ে জেমস্ ষ্টোরী।

এই 'টাইগার' জাহাজকে বিখ্যাত করেছেন মহাকবি সেক্সপীয়র, তাঁর ম্যাকবেথ নাটকে। ফিচ-ই এদেশে প্রথম ইংরেজ পর্যটক। সোনার খোঁজে বেরিয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোনা নিয়ে ঘরে ফেরেননি। ফিরেছিলেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে। সে কাহিনী লিখেও গেছেন নিজের কলমে। ভারতবর্ষের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখেছেন দেশটা কেমন। গোয়ার জেলে তাঁকে বন্দী হয়েও কাটাতে হয়েছে মাস ছয়েক। শাসনকর্তার মনে সন্দেহ জেগেছিল, এরা বণিক নয়, ছদ্মবেশী গুপ্তচর।

ফিচ দেখা করেছিলেন সম্রাট আকবরের সঙ্গে, আগ্রায়। আগ্রা থেকে নৌকোয় চেপে প্রয়াগ, কাশী, পাটনা ঘুরে চলে এসেছেন বাংলাদেশের গৌড়ে। তারপর হুগলী, সপ্তগ্রাম, কুচবিহার, চট্টগ্রাম। তারপর ব্রহ্মদেশ ঘুরে ১৫৯১-এ তিনি ফিরে যান নিজের দেশে।

ইংলণ্ডে তখন তুমুল তোড়জোড় চলেছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গড়বার। ফিচ-এর দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনী তখনকার ভারতবর্ষের যে ছবি এঁকেছে, তা আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান। সেকালের সপ্তগ্রামের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

"কুচবিহার থেকে আবার ফিরে এলাম হুগলীতে। হুগলী পর্তুগীজদের অধীন। হুগলী থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামই হচ্ছে পর্তুগীজদের পোর্ট পিকানো। এখানকার রাজপথ নিরাপদ নয়, ডাকাতদের দাপটে। জলপথ অনেকটা নিরাপদ। গৌড়ের যে সব গ্রাম দেখেছি অধিকাংশই জনমানবহীন, নির্জন। সেখানে বাঘ, বুনো মোষ, শুয়োর আর হরিণের আখড়া। সপ্তগ্রাম খুব বড় বাণিজ্যকেন্দ্র। মুসলমানদের দখলে। এ দেশের প্রত্যেক গ্রামে হাট বসে। ২৬ দাঁড়ের নৌকোয় করে আসে হাটুয়েরা। এই দ্রুতগামী আর ভারবাহী নৌকোকে তারা বলে পেরিকোস। মাথায় ছাউনি নেই। এরা গঙ্গার জলকে মনে করে খুব পবিত্র। মাথায় ছিটিয়ে দিলেই পুণ্য।"

১৫৯৯। ২২ ডিসেম্বর। বিলেতের অলডারম্যানের বাড়িতে একদিন লণ্ডন শহরের সবচেয়ে নামজাদা, তাবড়ো-তাবড়ো ব্যবসায়ীদের নিয়ে বেশ একটা বড় গোছের জমায়েত। উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো। পৃথিবীর পূর্ব দিকের দেশগুলোকে তখন বলা হত ইষ্ট ইণ্ডিজ। সেই থেকেই এই কোম্পানীর নামকরণ করা হল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। অলডারম্যানের সেই বাড়িকে এখনও বলা হয় "ফাউণ্ডারস্ হল্।"

এরপর ঠিক হল যে, এই কোম্পানীর মোট ১২৫ জন সদস্যের ভেতর থেকে পঁচিশজন সদস্যকে নিয়ে একটা পরিচালক-বর্গ তৈরি করা হবে। এই পঁচিশ-জনের মধ্যে একজন হবেন গভর্নর। তিন বছর পরে পরে আবার নতুন নির্বাচন। পরিচালকবর্গ থাকবেন ইংলণ্ডেই। যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের কর্মচারীদের বেছে বেছে পাঠাবেন এদেশে। তা বলে তাঁরা নিজেদের খেয়াল-খুশি মত, মর্জি-মাফিক যা ইচ্ছে তাই করবেন, সেটি হবার উপায় নেই। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মতামতকে মাথায় নিয়েই কাজ করে যেতে হবে।

১৬০০। রানী এলিজাবেথ এদের একটা বাণিজ্যাধিকারের সনদ দিলেন।

১৬০১। ভারতের দিকে মুখ করে ইংলণ্ডের উপকূল থেকে চারখানা জাহাজ পালের অফুরন্ত হাওয়ায় তর্‌তরিয়ে ছুটে চলল। এই অভিযানের নায়ক স্যার জন মেলডেন হল্‌। চারখানা জাহাজের নাম, 'দি স্কার্জ', 'দি সুশান', "দি হেক্‌টর', 'দি এ্যাসেনশন'।

১৬০৩। তিনি হাজির হলেন আকবরের দরবারে। বিনীত, নম্র ভঙ্গী। সঙ্গে নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকন। মণিমুক্তো। কানের গয়না। আংটি। তেজিয়ান ঘোড়া ও আরও কত কি। কিন্তু সব কিছুতেই বাদ সাধল ভাষা। ইংরেজীর এক বর্ণও আকবর বা তাঁর সভাসদ কেউই ধাতস্থ করতে পারলেন না। এত ভেসে, এত কায়-ক্লেশের পর যদি-বা ভারতবর্ষে এসে পৌছলেন, সামান্য ভাষার জন্যে বুঝি ভেসে যায় এত দিনের পরিকল্পনা? মেলডেন হল্‌ শিখতে লাগলেন পার্শী ভাষা।

একটা দোভাষী জুটিয়েছিলেন আলেপ্পো থেকে। আরমেনিয়ান। কিন্তু জেসুইট পাদরীরা তাকে হাত করে নেয়। এবার রাখলেন একজন স্থানীয় মৌলভী। কাজ চালানোর মত ভাষা শিখলেন বটে। কিন্তু সমস্যা রয়ে গেল যে কে সেই। বাদশার মন পাওয়া ভার। আর তার মূলে রয়েছে পাদরীদের কান-ভারী-করা উপদেশ। সম্রাট আকবরকে তারা বুঝিয়েছে, লোকটা আসলে গুপ্তচর্। ওর কথায় কান দেবেন না হুজুর। শেষ পর্যন্ত মেলডেন হল্‌ একদিন ক্ষেপে উঠলেন। সরাসরি সম্রাটকে জানালেন, আমাকে এবার দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন। খুব আক্কেল সেলামী হয়েছে এখানে এসে।

সম্রাট বললেন, কেন?

কেন? আপনার মতো এমন একজন মহান সম্রাট, যার খ্যাতি আমাদের দেশের রানীর কানে পর্যন্ত পৌছে গেছে, কয়েকটা পাদরীর কথায় ওঠা-বসা করেন, এর চেয়ে আর আশ্চর্যের কি আছে!

আকবর বললেন, বেশ পাদরীরা তোমার কি ক্ষতি করেছে, সভায় এসো জানাও।

মিলডেন হল্ জানালেন একে একে সব কথা। তারা চক্রান্ত করেছে যাতে আমরা এখানে ঠাঁই না পাই। চোর বলেছে আমাকে আর আমাদের রানীকে। আমাদের সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলে কান ভারী করেছে আপনার। আর আপনার দরবারে কোনো বিদেশী দূতকে ঢুকতে দেয়নি। দিলে আপনি বহুবার বহু মহামূল্য উপহার উপঢৌকন পেতেন।

বিচক্ষণ আকবর পাদরীদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনারা তো বারো বছর ধরে রয়েছেন। এর মধ্যে ক'টা দেশ থেকে ক'জন দূত এসেছে আমার দরবারে? কি উপঢৌকন নিয়ে?

পাদরীদের মুখে রা নেই। সম্রাট বুঝলেন পাদরীদের চাতুরী। মেলডেন হল্‌কে জানালেন, অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে বাণিজ্যের ফরমান দিচ্ছি।

একমাস পরে ফরমান পেয়ে গেলেন মিলডেন হল্। অবশ্য এই ফরমান ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছিল কিনা, অথবা পেয়ে কোম্পানীর কি লাভ হয়েছিল, জানা যায়নি।

এরপর ১৬০৯। চার বছর আগে মারা গেছেন আকবর। ছেলে সেলিম জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সিংহাসনে। সেই সময় আর একজন ইংরেজ দূতের আবির্ভাব ঘটল স্থরাটে। নাম উইলিয়ম হকিন্স।

১৬০৭। মার্চ মাস। ইংলণ্ড থেকে তিনটে জাহাজ ভাসলো সমুদ্রে। যাবে হিন্দুস্থানে। রেড ড্রাগন। ৭০০ টনের জাহাজ। হেক্টর। ৫০০। সঙ্গে একটা ছোট ডিঙি। কনসেণ্ট। ১৫০ টনের। ব্যবসায়ীর দল আর নাবিক মিলিয়ে তিনটে জাহাজের লোকসংখ্যা ২৮০। অধিনায়ক হকিন্স। তিনি হেক্টরে।

জাহাজে আছে ২১ মাসের রুটি। ৩ মাসের মত 'শিপ বীয়ার'। ১ মাসের মত 'কড়া বীয়ার'। এ ছাড়া অন্যান্য খাদ্য।

১৬০৮। আগষ্ট ২৪। তাপ্তি নদীর তীরে স্থরাটে এসে ভিড়ল জাহাজ। এই প্রথম জাহাজ যার মাস্তুলে উড়ছে ইংরেজদের পতাকা। ডাঙায় পা দিয়ে হকিন্স বুঝলেন, ইংরেজদের আগমনে কারো মুখে হাসি ফোটেনি। মুকারাব খাঁ, যিনি তখন ঐ অঞ্চলের শুল্ক বিভাগের অধিকর্তা, তিনি হাসি মুখে এসে বললেন, ওহে ইংরেজ ভাই! তোমার জাহাজে ভাল-ভাল জিনিষ কি আছে বল। কিনব। কিনলেন প্রচুর। দাম? দাঁড়াও না। দিচ্ছি। তুমি তো

আর এখুনি চলে যাচ্ছ না। হকিন্স বললেন, তোমরা আমাকে এখানে একটা ফ্যাক্টরী বানাবার অনুমতি দাও। ফ্যাক্টরী না থাকলে ব্যবসা করা যায় না। এদেশে যখন যেটা চলে, তখন সেটা সস্তা দামে কিনে কোথাও তো জমা করে রাখতে হবে। মুকারাব বললে, সে অনুমতি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। দিতে পারেন স্বয়ং বাদশা। তুমি আগ্রায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর।

বেশ কিছু মালপত্র কিনে দুটো জাহাজ বোঝাই করে হকিন্স পাঠিয়ে দিলেন নিজের দেশের দিকে। কয়েকজন নামমাত্র কর্মচারীকে নিয়ে একা রয়ে গেলেন সুরাটে। যেই না একা হওয়া অমনি মুকারাব খাঁ-এর অন্যমূর্তি। প্রথমেই অস্বীকার করলেন কেনা জিনিষের দাম দিতে। বললেন, ও সব তো কেনা নয়। তুমিই দিয়েছ। উপহার। তারপর পর্তুগীজদের সাহায্য নিয়ে দিনে রাতে যত রকম ভাবে পারা যায় অত্যাচার চলতে লাগল।

১৬০৯। ১ ফেব্রুয়ারী। হকিন্স যাত্রা করলেন আগ্রার দিকে। সঙ্গে ভাড়া করা পাঠান সৈন্য। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। আগ্রা পৌছলেন এপ্রিলে।

আগ্রায় প্রথম যেদিন সম্রাটের দূত এসে সংবাদ দিল, ডাক পড়েছে রাজ-দরবারে, হকিন্স সাহেবের তো মাথায় হাত। এখুনি যেতে হবে? সাজ-গোজেরও সময় দেবে না? তার চেয়েও বড় সমস্যা, বাদশাহকে উপঢৌকন দেবে কি? মুকারাব খাঁ, বেছে-বেছে ভাল জিনিষগুলো নিয়েছেন হাতিয়ে। সব গিয়ে উপহারের জিনিষ বলতে এখন যা আছে, তা হল কয়েকটা কাপড়ের বাণ্ডিল, আর উলের দু-চারটে জিনিষ। অগত্যা তাই নিয়েই বাদশার দরবারে হাজির হলেন হকিন্স। হাতের উপহারের সঙ্গে এগিয়ে দিলেন পকেটের চিঠিখানাও। সে চিঠি আকবর বাদশাহকে সম্বোধন করে লেখা। অবশ্য সম্রাট আকবর তখন জীবিত নেই। চিঠিতে সম্রাটের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, যেন সুরাটে কুঠি গড়ার অনুমতি দেন ইংরেজদের। পর্তুগীজ পাদরীদের একজন সে চিঠি অনুবাদ করে শোনাচ্ছিল বাদশাকে। অনুবাদকের কথা শেষ হতে না হতেই সরোষে প্রতিবাদ জানালেন হকিন্স। মহামান্য সম্রাট, আপনি জানেন পর্তুগীজদের সঙ্গে আমাদের বনিবনা নেই। সম্পর্কটা আদায় কাচকলা। সুতরাং ইংরেজদের চিঠি পর্তুগীজদের দোভাষীকে দিয়ে পড়ানো চলবে না। যা নেই চিঠিতে, তাকেই ওরা সাতকাহন করে শুনিয়ে আপনার মন বিষোতে চায়।

এই সময়েই হকিন্সের মুখে অনর্গল পার্শী ভাষা শুনে মুগ্ধ হলেন সম্রাট। রাজদরবার ছাড়িয়ে নিজের নিভৃত গোপন কক্ষে ডেকে নিয়ে গেলেন তাকে। আলোচনার ফাঁকে বাদশা নিজেই জানালেন যে, সুরাটে মুকারাব খাঁ

তাঁর উপর যে অন্যায় আচরণ করেছে, তা তিনি জানেন। মুকারাবকে এজন্যে কঠিন তিরস্কার জানাবেন তিনি। অল্পদিনেই সম্রাটের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন হকিন্স। রাজদরবারে তাঁর আসন হল পাকা। তার উপরে তাঁকে করে দেওয়া হল চার হাজার মনসবদার। বছরে রোজগার তিন হাজার পাউণ্ড এই বাবদে। রাজানুগ্রহের এইখানেই শেষ নয়। সম্রাট একদিন হকিন্সকে ডেকে বললেন, আমার হারেম থেকে তুমি তোমার মনের মত একজন শ্বেতাঙ্গিনীকে বেছে নাও। আমি তাকে সব দেবো। দাস-দাসী। খাওয়া-থাকার, আরামের যাবতীয় উপকরণ। হকিন্স তো শুনেই অবাক। শেষ পর্যন্ত বললেন, ঠিক আছে। বিয়ের কনে আমি বেছে নিতে পারি। তবে সে মহিলা হবে জাত-খ্রীষ্টান। হঠাৎ বেঘোরে পড়ে খ্রীষ্টান হয়েছে, এমন মেয়ে হলে আমি রাজী নয়। জাহাঙ্গীর একটু ভাবলেন। তারপর তাঁর মনে পড়ল এক আর্মেনিয়ান যুবতীর কথা। আকবরের আমলের একজন ক্যাপ্টেনের মেয়ে। এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন হকিন্স। বিয়ে-সাদির পালা মিটলো। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারটা কি ধামা চাপা পড়ে থাকবে নাকি ?

মহামান্য বাদশা ! সবই তো দিলেন। কিন্তু বাকী রয়ে গেল যে আসল দেওয়াটাই।

কি হে ?

আমরা বণিক জাত। ব্যবসাই প্রাণ। সুরাটে একটা কুঠি গড়বো। সে অনুমতিটা তো আজও দিলেন না। কুঠি ব্যবসার খুঁটি।

জাহাঙ্গীর বললেন, তথাস্তু।

সম্রাট তথাস্তু বলেন ঠিকই, তাতে কাজের কাজ হয় না এক ছটাকও। সম্রাটের নির্দেশ সুরাটের সর্বেসর্বা মুকারাব খানের কাছে গিয়ে পৌঁছয় না। পৌঁছলেও মুকারাব সে নির্দেশ মানতে রাজী নয়। এই করে দিনের পর দিন কেটে চলেছে। সম্রাটের সঙ্গে মদ্যপান চলে। সম্রাটের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বেও কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। সেখানে উদার আতিথেয়তা। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে কোনও কিছুই এক পা এগোয় না। সুরাটের মুকারাব আর আগ্রার আসফ খাঁ পর্তুগীজদের পক্ষে। ইংরেজদের কানাকড়ি সুযোগ সুবিধে দিতে রাজী নয়।

মনের ক্ষোভ কতদিন আর চেপে রাখা যায় মনে। হঠাৎ একদিন জ্বলে উঠলেন হকিন্স। জাহাঙ্গীরের সামনে গিয়ে ফেটে পড়লেন ক্রোধে।

মহামান্য সম্রাট ! আপনার মন্ত্রী-সেনাপতিদের জ্বালায় আমার তো এদেশে

টেকা দায় হয়ে উঠলো। আপনি আমাকে চার হাজারি মনসবদারী দিয়েছেন। অথচ আপনার প্রিয় অমাত্য আসফ খানের দাপটে, দাপটে নয়, ষড়যন্ত্রে, তার থেকে কোনো স্থবিধেই আমি ভোগ করতে পারছি না। আমার বহুভাগ্য যে আপনার পাশে এসে দাঁড়ানোর এই সম্মানটুকু এখনো এঁরা কেড়ে নেননি। আপনি হয় আমাকে এখানে সসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করে দিন। নয়তো অনুমতি করুন, ঘরের ছেলে ফিরে যাই ঘরে।

হকিন্স চিরকালই একটু রগচটা মানুষ। খুব বেশী ভদ্রতা বা বিনয় তার ধাতে নেই। হকিন্স ভেবেছিলেন তার এই জ্বলন্ত অভিযোগে কাজ হবে। কিন্তু যা তার স্বপ্নেও ভাবা ছিল না, তাই ঘটল। সম্রাটের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল বরফের চেয়ে শীতল একটি উত্তর। তাহলে তুমি যেতে পার।

হকিন্সের দৌত্যগিরি এইখানেই শেষ।

আগ্রার রাজকীয় জীবনযাপনের পাট চুকিয়ে সস্ত্রীক যাত্রা করলেন নিজের দেশের দিকে। মাঝপথে চাকরী নিলেন অন্য এক কোম্পানীর। দেশে ফেরার পথেই আয়ারল্যাণ্ডের উপকূলে মৃত্যু হল তাঁর।

এক কথায় যাকে বলে ডানপিটে, হকিন্স ছিলেন তাই। নইলে হিন্দুস্থান যে পৃথিবীর কোন দিকে তার হদিশ-হদ্দ, ঠিক-ঠিকানা কিচ্ছুটি না জেনেই কেউ কখনো সমুদ্রে জাহাজ ভাসায়। সে জাহাজ, হেক্টর, যদি বা ভিড়ল স্থরাটের তীরে, শুরু হয়ে গেল একদিকে পর্তুগীজদের ষড়যন্ত্র অন্যদিকে মোগল শাসনকর্তাদের জোর জবরদস্তি। অন্য লোক হলে ভয়ে পিটটান দিত। হকিন্স অত সহজে মচকাবার মানুষ ছিলেন না। তবে বরাতটা তাঁর মন্দই। সফলতা বা সার্থকতার দোর গোড়ায় পৌঁছেও পিছু হাঁটতে হল তাঁকে।

হকিন্সের পর বছরখানেক চুপচাপ। স্থরাটে পর্তুগীজদেরই দাপট। এল ১৬১২। স্থরাটের তীরে এসে থামল দুখানা জাহাজ। একটার নাম 'ড্রাগন'। আর একটার নাম 'হোসিয়াণ্ডার'। দুই জাহাজেরই অধিনায়ক ক্যাপ্টেন বেষ্ট। ইংরেজদের জাহাজ চোখে পড়া মাত্রই পর্তুগীজদের রক্তে জ্বলে উঠলো আগুন। গর্জে উঠলো কামান বন্দুক। শুরু হয়ে গেল তুমুল জলযুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে ঘটে গেলো এক আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ঘটনা। পর্তুগীজরা হেরে গেলো গো-হারান। হেরে পালিয়ে গেলো গোয়ার দিকে।

দূতের মুখে এবং বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে সে সংবাদ গিয়ে পৌঁছল জাহাঙ্গীরের কানে। শুনে একই সঙ্গে স্তম্ভিত এবং পুলকিত হলেন তিনি। তাহলে ইংরেজ জাতটার হিম্মৎ আছে? পর্তুগীজদেরও পর্যুদস্ত করার ক্ষমতা

রাখে? বেজায় খুশিতে বিভোর হয়ে তখুনি সুরাটে পাঠিয়ে দিলেন এক ফরমান। এখন থেকে সুরাটে ইংরেজদের বাণিজ্য করার অধিকার পাকা।

কিছুদিন পরে বেষ্ট তাঁর ড্রাগনে চেপে নিজের দেশে পাড়ি দিলেন সগৌরবে। পিছনে রেখে গেলেন সুরাটের কুঠি। আর সেই কুঠি দেখাশোনার জন্যে পাঁচজন কর্মচারী।

এরপর ১৬১৪। এক সঙ্গে চারখানা জাহাজ এসে থামল সুরাটে। তাদের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ডাউটন। পর্তুগীজরা দেখল ইংরেজরা খুব বাড়াবাড়ি করছে। সাহসের আর শেষ নেই। একবার হেরেছি বলে ভেবেছে কি মরে গেছি? সাজানো হল ছ'খানা যুদ্ধ জাহাজ। আগের চেয়ে আরো অনেক গুণ বেশী সৈন্য-সামন্ত কামান-বন্দুক নিয়ে পর্তুগীজরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ডাউটনের জাহাজগুলোর উপর। ডাউটনের লোকবল সামান্য। কিন্তু তবুও, এবারেও ঘটল সেই অঘটন। পর্তুগীজরা দক্ষ এবং দুর্দান্ত হয়েও, প্রচণ্ড মার খেল ইংরেজদের হাতে। ইংরেজরা বুক ফুলিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার সাহস ফিরে পেল দ্বিগুণ আকারে।

এর পরের বছরে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস আগ্রায় পাঠালেন তাঁর নিজের দূতকে। ভারতবর্ষে এই প্রথম ইংরেজ দূতের আগমন। ফিচ ছিলেন ভ্রমণকারী। হকিন্স ব্যবসায়ী। স্যার টমাস রোই প্রথম সম্মানিত রাজদূত। আর সত্যি-সত্যি দূত হবার মত যোগ্য লোকই বটে। অক্সফোর্ডের ছাত্র। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। পার্লামেন্টের সদস্য। নিজের আত্মমর্যাদাবোধ সম্বন্ধে সচেতন। প্রিন্স হেনরী আর তাঁর বোন এলিজাবেথ অব বোহেমিয়ার ব্যক্তিগত বন্ধু। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিনয়ী।

টমাস রোর এদেশে আসার পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মোগল সম্রাটের সঙ্গে ইংরেজদের একটা পাকাপাকি বাণিজ্যের চুক্তি করা। কিন্তু মোগল বাদশারা চুক্তি জিনিষটা জানতেন না অথবা মানতেন না। তাঁরা একমাত্র জানতেন, ফরমান। খুশি হল, দিলেন। খুশি হলেন না, তুলে নিলেন। তখনকার রাজনীতি বা বাণিজ্যনীতি ছিল পুরোপুরি রাজা বাদশাদের নিজস্ব মর্জিমাফিক। আইন-কানুন যা কিছু, সব রাজা-বাদশাদের মুখে।

টমাস রো এদেশে কাটিয়েছেন চার বছর। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও ছিল বেশ গাঢ়। ইংরেজদের জন্যে তিনি খুব একটা বেশী কিছু আদায় করতে পারেননি সম্রাটের কাছ থেকে, একথা ঠিক। কিন্তু রোকে বিখ্যাত করে রেখেছে অন্য একটা জিনিষ। সেটা তাঁর দিন লিপি।

জাহাঙ্গীর-এর রাজত্বকালের নিখুত ছবি ফুটে আছে তাতে। তাঁর লেখা চিঠিপত্র আর ঐ বিখ্যাত দিনলিপি ঐতিহাসিকদের কাছে মহামূল্য সম্পদ।

জাহাঙ্গীর ছিলেন ছবির ভক্ত। একদিন কানে এল রো-এর সঙ্গে একজন বিখ্যাত চিত্রকর আছে। খবর পেয়েই তলব জানালেন রোকে। তোমার সেই চিত্রকরকে ডাক। ছবি আঁকাব। রো শুনে অবাক। বললেন, চিত্রকর আবার কে? মিঃ হিউজ নামে একজন আছে বটে, কিন্তু সে আবার চিত্রকর হল কবে থেকে! কাগজে আঁচড় মাচড় কাটে, এই যা। তবে আমার কাছে আমার বন্ধুর আঁকা একটা ছবি আছে। দেখাতে পারি। কই দেখি! রো ছবি দেখালেন। অপূর্ব ছবি। তখুনি বাদশা ডেকে পাঠালেন নিজের প্রধান চিত্রকরকে। এই ছবি তুমি আঁকতে পারবে। প্রধান চিত্রকরের চোখে মুখে এতটুকু ভয় ডর-এর ছাপ-ছোপ নেই। সোজা সাপটা উত্তর দিলে, এ আর এমন কি না-আঁকার। রো বললে, তাই নাকি? সহজ? ঠিক আছে এঁকে দেখাও।

পরের মাসে একদিন রো সাহেবের ডাক পড়ল বাদশার গোসলখানায়। পৌছনো মাত্রই জাহাঙ্গীর রো-র হাতে ছ'খানা ছবি তুলে দিয়ে বললেন, এবার তোমার নিজের ছবিটা বেছে নাও। রো-র দেওয়া সেই একই ছবির পাঁচটা নকল। তার মধ্যে কোনটা যে আসল, তা চিনে উঠতে রো-র সত্যিই প্রাণান্ত। শেষ পর্যন্ত চিনলেন যদিও। রো ভারতীয় চিত্রকরের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ। সেইদিনই তিনি সম্রাটের একটা প্রতিকৃতি চেয়ে বসলেন। রো-র ভাগ্য ভাল। জুটেও গেল কপালে। কত লোক কপাল চাপড়েও যা পায় না।

রো-র বর্ণনায় এমন অজস্র অন্তরঙ্গ কাহিনী আছে দরবারের। যেমন ধরা যাক বাদশার জন্মদিন। সেদিন বাদশাকে ওজন করা হয় দাঁড়ি পাল্লায় চাপিয়ে। পাল্লায় একদিকে থাকেন বাদশা। অন্যদিকে হীরে-মুক্তো-পান্না। সেটা শেষ হলে আবার ওজন করা হয় সোনা দিয়ে। সোনার পর রূপো। তারপর রেশম, ধান, ফল এমনি আরো জিনিসে।

ওজন করার পালা চুকলে রাজার অভিবাদন নেবার পালা। বিরাট বিরাট হাতির শোভাযাত্রা। প্রত্যেকটা হাতি রূপোর কাজ করা চাদর, সোনার অলংকার দিয়ে সাজানো। বাদশার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় শুঁড় তুলে জানিয়ে যায় অভিবাদন। বনের প্রাণীর এমন শিক্ষিত আচরণে রো হতবাক।

একবার জন্মদিনের রাত্রে রো-র ডাক পড়ল হঠাৎ। হীরে-মাণিক দিয়ে মোড়া

একটা ছোট্ট সিংহাসন। তাতে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছেন জাহাঙ্গীর। সামনে সোনার টেবিল। তার উপরে গোটা পঞ্চাশেক ডিস। সেও সোনার। গায়ে মণি-মুক্তোর কাজ। আহার পর্ব যখন শেষ, তখনই এলেন রো। এবার শুরু হবে পান পর্ব।

জাহাঙ্গীর একটা সোনার কাপ এগিয়ে দিলেন রো সাহেবের দিকে। আর সেই সঙ্গে অনুরোধ, রাত ভরে এবং প্রাণ ভরে আজ তাঁকে মদ খেতে হবে। আর এই যে সোনার কাপ, এটা হল বিদেশী অতিথির প্রতি বাদশার উপহার। রো নিজে গুনে দেখেছিলেন একটা সামান্য সোনার কাপে দুহাজার ছোট বড় পাথর। তার মধ্যে কিছু পাথর তুরস্কের। সেগুলোই সব চেয়ে দামী। পাথরের সঙ্গে আছে মুক্তোদানাও। সোনার পরিমাণ আউন্স কুড়ি।

রো শুধু ঐশ্বর্যই দেখেননি। দেখেছেন বাদশার বিচার ও শাস্তি। অপরাধীকে সিংহ দিয়ে খাওয়ানো। কিম্বা নিজের হাতে হত্যা করা। দেখেছেন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। চক্রান্ত। দেখেছেন নূরজাহানের প্রতিপত্তি, বাদশার উপর। আসফ খাঁর চক্রান্ত। দেখেছেন রাজ্য শাসনের পদ্ধতি। দেখেছেন বিদেশীদের কাছ থেকে উপহার পাবার লোভ, প্রত্যেক রাজ-কর্মচারীর। দেখেছেন ঘর-বাড়ি-আদব-কায়দা, আমোদ-প্রমোদ সব কিছুই।

এদেশে বসে নিজের দেশে যে সব চিঠি লিখেছেন তার মধ্যে কখনো ঝাঁঝালো রাগ, কখনো ভালবাসা, কখনো বিচার বিশ্লেষণ।

তাঁর লেখা চিঠিপত্রের কিছু কিছু অংশ:

"এ দেশ রাজদূতের মর্যাদা এখনো বুঝতে পারেনি। রাজদূত পাঠানোর পক্ষে এসব দেশ অনুপযুক্ত। কি করে রাজদূতকে মর্যাদা দিতে হয় জানে না।"

"বিরাট এই সাম্রাজ্য। কিন্তু রাজ্যে কোনো আইন নেই। রাজার আদেশই হল আইন। সপ্তাহে দুদিন বিচারে বসেন বাদশা। দেওয়ানী ফৌজদারী দুই-ই চলে একসঙ্গে। দুপক্ষেরই বক্তব্য শোনেন রাজা। তারপর বিচার। অপরাধীকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মারা হয়। বাদশা নিজে বসে এই দৃশ্য দেখেন। রক্তপাতের দৃশ্য দেখতে তাঁর বড় সুখ।"

'বিরাট রাজ্য কতকগুলো প্রদেশে ভাগ করা। প্রত্যেক প্রদেশের একজন করে শাসনকর্তা। বাদশা ফর্মান দিলে তবেই তারা শাসনকর্তা হতে পারেন। ফর্মান হল, কাগজে লেখা বাদশার হুকুম।"

"বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিজের চারপাশে এনে জড়ো করা বাদশাহের রীতি। এদের তিনি প্রসাদ দেন। মন্ত্রীসভা বলে আলাদা কিছু নেই। প্রধান কর্মচারী আর বিখ্যাত ব্যক্তিরাই পরামর্শ দেন বাদশাহকে। তবে বাদশা এক সঙ্গে সকলের পরামর্শ নেন না। নেন, আলাদা আলাদা করে।"

"এ দেশের বাদশার রাজস্ব, তুরস্ক কিম্বা পারস্যের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। তার অবশ্য কারণ আছে। কারণ বাদশাই এদেশে সারা দেশের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক। বাদশা যাকে যা সাজান, সে তাই হয়। যাকে যত ঘোড়ার মনসবদারী দেওয়া হয়, সমাজে তিনিই তত সম্মানীয় ব্যক্তি। এই মনসবদারেরা নিজেদের উন্নতির জন্যে বাদশাকে উপহার জোগায়। তোষামোদ করে। দেশে উত্তরাধিকার বলে কিছু নেই। কেউ মারা গেলে তার সব সম্পত্তি বাদশার। কেউ হয়তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধনী হয়েছে। বাদশা ইচ্ছে করলেই সব কেড়ে নিয়ে তাঁকে পথের ফকির করে দিতে পারেন।"

"বাদশার দরবারে রাজদূতের কোনো প্রয়োজন নেই। তার বদলে বছরে হাজার টাকা মাইনে দিয়ে একজন মোগল কর্মচারী রেখে দিলেই চলে। তার অধীনে থাকবে আর একজন কর্মচারী। সে থাকবে প্রাদেশিক শাসন-কর্তার কাছে। বিপদ আপদ সামলাবার জন্যে। এতে দশটা রাজদূতের কাজ হবে।"

"কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা করছে এ দেশে। এটা এখুনি বন্ধ করা দরকার। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোম্পানী। অবশ্য এদেশে কর্মচারীরা যা বেতন পায়, তাতে গোপন ব্যবসা না করলেও চলে না।"

রো-এর নিজের দেশের আধুনিক ঐতিহাসিকরা হকিন্স এবং রো-এর দৌত্যগিরি সম্বন্ধে কি ভাবেন, তার কিছুটা সন্ধান মিলবে ফিলিপ উডরুফ-এর মন্তব্যে :

"These men, Roe and Howkins, Terry and their fellows, were Elizabethians. They knew nothing, when they left their small green island, of the Asia they would find, nothing but tales of men with their heads bellow their arms, of men with their eyes in the midst of their chests, the marvels that they had read of in Sir John de Mandeville, the tales with which Othello won his wife. It is no wonder that Hawkins gives lists of diamonds, rubies and

elephant-trapping and compares the Mogul courtiers with nobles in Europe, saying that Khan signifies a Duke, that a commander of five thousand is a Marquis, comparisons that could hardly be more misleading. But Roe saw deeper, he begins a letter describing Mogul India with the one essential difference between English and Indian kingship."

রো-র দৌত্যগিরির ফলে বাণিজ্য করার অনেকখানি স্বাধীনতা পেল ইংরেজরা। স্থরাটের কুঠিও দিনে দিনে জেঁকে উঠতে লাগল। আগে যেখানে ছিল পাঁচজন কর্মচারী, দেখতে দেখতে সে সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল পঞ্চাশেরও বেশী। তাদের জন্যে কোম্পানী যে বাড়ি যোগাড় করেছে, তাতে সুখ সুবিধেরও অন্ত নেই। স্নানের ঘর, মদের পিপে, গুদাম ঘর, জলের ট্যাঙ্ক সব আছে। খানা পিনার ব্যবস্থাও সাহেবী ধরনের।

ইংরেজদের এই সুখ-সৌভাগ্যের খবর সাত সাগর পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা ইউরোপে। সকলের মনেই ঝাঁকুনী দিয়ে উঠল সুপ্ত বাসনা। হিন্দুস্থান, স্থরাট, সোনার দেশ। চল পাড়ি দিই। জাহাজ ভাসাও জলে।

এর পর একে একে আগমন ফরাসী দিনেমার বেলজিয়ানদের। এদের জাহাজ যখন স্থরাটের তীরে এসে ভিড়ল, ইংরেজরা তখন মোটামুটি শক্ত ঘাঁটি গড়ে ফেলেছে ভারতবর্ষের পশ্চিমে। কেবল মন পড়ে আছে পূবে। বাংলায়, হুগলীতে। যেমন করে হোক বাংলায় পৌঁছতে হবে। সোনার দেশ তো ঐখানেই।

ইংরেজদের স্থরাটের কুঠি খুব জেঁকে উঠছে দিনের পর দিন। তিরিশ হাজার পাউণ্ডের মূলধন নিয়ে অর্থাৎ তখনকার দিনের তিন লাখের মত টাকা নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেছিল। এখন এমন অবস্থা যে ফ্যাক্টরীর প্রধান অধ্যক্ষকে মাইনে দিতে পারে ৫০০ পাউণ্ড। অবশ্য এর মধ্যে আবার কথা আছে। পুরো মাইনে কেউ পেত না। কারো অর্ধেক, কারো সিকি কেটে নেওয়া হত। সেটা জমা পড়ত ইংলণ্ডের খাতায়। টাকাটা হচ্ছে জামিন। তুমি যে তহবিল তছরূপ করে কোম্পানীকে ডোবাবে না তার প্রমাণ কি? তোমার কোন অসদাচরণের ফলে কোম্পানীর যদি কখনো কোন ক্ষয় ক্ষতি হয়—সেইজন্যে জমা রাখা হচ্ছে। প্রথম দিকে ফ্যাক্টরীগুলো থাকতো এক একজন এজেণ্টের অধীনে। পরে হল প্রেসিডেণ্ট।

১৬২২ সালে স্থরাটের তৃতীয় প্রেসিডেণ্ট মারাঠার প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ

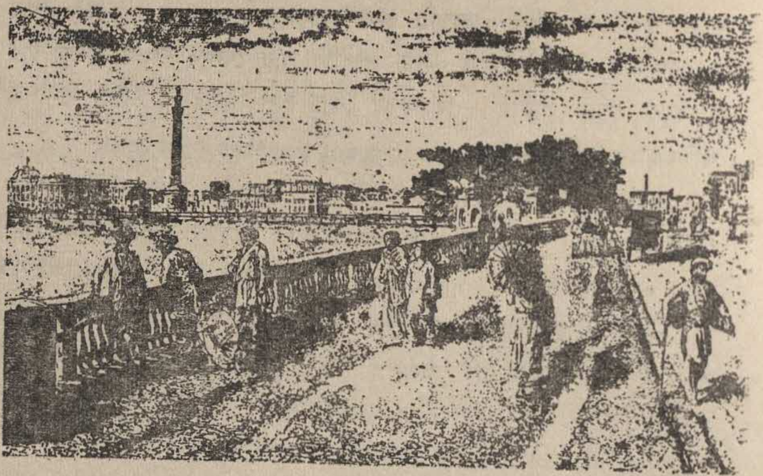
করে সুরাটকে অক্ষত অবস্থায় রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাই দেখে আওরঙ্গজেব অকসেনডেনকে একটা তরবারি আর খেলাৎ উপহার দিয়ে তাঁর বীরত্বকে সম্মান জানান। বিলেতের কোর্ট অফ ডিরেক্টররা তাঁকে মানপত্রে অভিনন্দন জানালেন – "Preserver is not less than conqueror."

১৬৩৯। ভারতের পূর্ব দিকের উপকূলে চন্দ্রগিরি ছোট্ট একটা রাজত্ব। লম্বায় ছ-মাইল। আর চওড়ায় এক মাইল। ইংরেজরা সেটাকে কিনে নিলে কুঠি বানাবার জন্যে। সামনে সমুদ্র। বাণিজ্যের পক্ষে তোফা জায়গা। তার বদলে ঠিক হল যে চন্দ্রগিরির রাজাকে বছরে ন-হাজার টাকা খাজনা দিতে হবে। রাজার নাম শ্রীরঙ্গ। তাই দানপত্রের এক শর্তানুসারে এই উপকূলের নাম হল শ্রীরঙ্গপত্তনম্। এইটেই পুরনো মাদ্রাজ। ভারতের মাটিতে ইংরেজদের প্রথম দুর্গ তৈরি হল এইখানেই। সেণ্ট জর্জ।

সুরাটে, মাদ্রাজে, ইংরেজরা কুঠী বানাতে লাগল। ব্যবসা ফেঁপে উঠছে বছরে বছরে। তবু মনে শান্তি নেই। বাংলাদেশকে দখলে আনতে হবে। বাংলার মসৃণ মসলিন, রেশম, চিনি, চাল, কাপড়—এসব জিনিষ পৃথিবীর হাটে সবচেয়ে সেরা দামে বিক্রি হয়। এ ছাড়াও আছে নানাজাতের সুগন্ধী মসলা। ডাচরা বাংলার বুকে খুব জমিয়ে বসেছে। জোঁকের মত টাকা শুষছে। এই বাংলাকে আমাদের চাই।

১৬৫০ সাল নাগাদ ইংরেজরা হুগলীতে একটা ছোট্ট কুঠি বানিয়ে টিম টিম করা ব্যবসার বাতি জ্বালিয়ে বসল। ডাচদের একাধিপত্যের ফলে রাতারাতি কিছু একটা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এরই দু বছর পরে এল একটা স্বর্ণ সুযোগ।



॥ সপ্তগ্রাম থেকে হুগলী ॥

একটা সময় ছিল যখন সব বিদেশী বণিকের চোখ হুগলীর দিকে। হুগলী-অন্ত প্রাণ সকলেরই। হুগলীই তখন বাংলার নতুন বন্দর! লাভের মাল, লোভের মালের ছড়াছড়ি চারপাশে। ঠিক যেমন ছিল সপ্তগ্রাম, ক'দিন আগে। বাণিজ্যের পক্ষে সেরা বন্দর, বাংলার। পূবে চট্টগ্রাম : পশ্চিমে সপ্তগ্রাম। বিদেশীদের কাছে সপ্তগ্রাম ছিল সোনার বন্দর। র‍্যালফ্ ফিচের কথা আগেই বলেছি। বাংলা ঘুরে নিজের দেশে ফিরে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—'Satgaon is a faire city very plentiful of all things'. তাঁর মুখে বাংলা দেশের ঐশ্বর্য এবং সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির সংবাদ শুনে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের চোখ উঠেছিল কপালে। রক্তে টগবগ করে ফুটে উঠেছিল বাণিজ্যের নেশা। "He thrilled London in 1591 with the magnificient Posibilites of Eastern commerce."

সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির সংবাদ প্রাচীন সাহিত্যে প্রচুর। বিপ্রদাসের 'মনসা-মঙ্গল' চাঁদ সদাগর চলেছেন বাণিজ্যে, সপ্তডিঙায় চেপে দূর দেশে পথে পড়ল সপ্তগ্রাম। চোখ ভরে দেখছেন তিনি।

"অভিনব স্থরপুরি দেখি সব সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের ঝারা
নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাচ ঢাল
রাজমুক্তা প্রবালের ধারা।"

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে—

"এই সব সহরে যত সৈদাগর বৈসে
কত ডিঙ্গা লয়্যা তারা বাণিজ্যায় আইসে।
সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।"

চৈতন্য চরিতামৃতে—

"হিরণ্য গোবর্ধন নাম দুই সহোদর
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর।"

বাংলা সাহিত্যে সপ্তগ্রামের সব শেষ উল্লেখ সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায়। সপ্তগ্রামের পতন সম্বন্ধে যে কারণ দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, সেটা কাল্পনিক নয়, সত্য। সরস্বতীর শীর্ণতাতেই সপ্তগ্রামের শোচনীয় ধ্বংস।

"পূর্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সংকার্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল; সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্য-বাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্য-গৌরব নগরের বাণিজ্য নাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলি গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলী নতুন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পর্তুগীজেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন।"

সপ্তগ্রাম নামের উৎপত্তি নিয়ে অনেক কাহিনী। এরই আগের নাম সাত গাঁ। প্রথমে মুহম্মদ ঘোরী তারপর বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী যখন বাংলাদেশে মুসলমানি শাসন কায়েম করতে চলেছেন, তখন এই দেশটা ছিল পাঁচ ভাগে ভাগ করা। রাঢ়, বগড়ি, বঙ্গ, বরেন্দ্র, মিথিলা। তার মধ্যে বঙ্গদেশে ছিল আরও তিনটে ভাগ। লক্ষণাবতী, সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম। সম্রাট সাজাহান এবং আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলাদেশের সীমানা বেড়ে যায়। হুগলীকেও সেই সময় ভাগ করা হয় তিন ভাগে। সরকার সাত গাঁও, সরকার সেলিমাবাদ, সরকার মান্দারণ।

কেউ মনে করেন, সপ্তগ্রাম নাম হয়েছে সূর্যের সপ্তাশ্ব থেকে। এখানকার মাটি খুঁড়ে সূর্যের প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে। কেউ মনে করেন সপ্তগ্রাম নাম

হয়েছে সাতজন ঋষি থেকে। খুব প্রাচীনকালে সাতজন ঋষি বাস করতেন এখানে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' আছে—

"এই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত ঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণীঘাট নাম॥
সেই গঙ্গা ঘাটে পূর্বে সপ্ত ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ॥
তিন দেবী এক স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সকল ভুবনে
সর্বপাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে।"

এই ঋষি-কাহিনীর পিছনে রয়েছে এক কিংবদন্তি। বহুকাল আগে কান্যকুব্জে ছিলেন এক রাজা। নাম প্রিয়বন্ত। তার ছিল সাত ছেলে। অগ্নিত্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিস্মান, সবন ও ভব্য। রাজার ছেলে হয়েও এদের কারও রাজসুখে মন নেই। তারা চায় সন্ন্যাসীর জীবন। একদিন রাজ অট্টালিকা ছেড়ে সাত ভাই বেরিয়ে এল বাইরে। এদেশ-ওদেশ ঘুরতে ঘুরতে তাদের পছন্দ হয়ে গেল গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে সাতটা গ্রাম। সাত ভাই বসে গেল নিজের-নিজের তপস্যায়। সেই সাত গ্রাম হল বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, খামারপাড়া, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, শিবপুর আর ত্রিশবিঘা। এই সাত গ্রাম নিয়েই, ত্রিবেণীর তীরে, সপ্তগ্রাম। গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতী, এই তিন নদী মিলেছে যেখানে সেটাই ত্রিবেণী হিসেবে প্রসিদ্ধ। ত্রিবেণীর উল্লেখ বহু কাব্যে। আছে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে—

"বহিত্র চাপায়ে কূলে — চাঁদ অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম
তথা সপ্তঋষি স্থান — সর্বদেব অধিষ্ঠান
শোক দুঃখ সর্বগুণধাম।
জ্যোতি হইয়া এক মূর্তি — ঋষিমুনি সেবে তথি
তপ জপ করে নিরন্তর
গঙ্গা আর সরস্বতী — যমুনা বিশাল অতি
অধিষ্ঠান উমা মহেশ্বর
দেখিব ত্রিবেণী গঙ্গা — চাঁদ রাজা মনে রঙ্গা
কূলেতে চাপায় মধুকর।"

ইংরেজের মুখে কখনো সপ্তগ্রামের নাম 'গ্যাঞ্জেস রিজিয়া'। কখনো 'সাতগাঁ রিভার'। পর্তুগীজদের আমলে সপ্তগ্রাম 'রয়্যাল পোর্ট'। রোমান পণ্ডিত প্লিনীর মন্তব্য, "That the ships near the Godaveri sailed from thence to cape Palimerous thence to tennigale opposite Fulta, thence to Tribeni."

ফিচ-এর ভ্রমণ কাহিনীতে সপ্তগ্রামের যে ছবি, তাতে ফুটে আছে মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের নানাদিক।

"একশো আশীখানা নৌকোর সঙ্গে বাংলাদেশের সপ্তগ্রামে পৌছলুম। এখানে হিন্দু এবং মুসলমান, তু'জাতেরই বণিক রয়েছে। ব্রাহ্মণরাই হিন্দুদের পুরোহিত। তারা জলে দাঁড়িয়ে গলায় সুতো লাগিয়ে তুই হাতে জল নিক্ষেপ করে। ঐ সব হিন্দুরা মাংস খায় না। প্রাণীহত্যা করে না। তণ্ডুল, তুধ, ঘি, মাখন, ফলমূল খেয়েই জীবনধারণ করে তারা। শীত এবং গ্রীষ্ম উভয়কালেই অবগাহন স্নান করা তাদের অভ্যাস। কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় জলে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে। উলঙ্গ অবস্থাতেই মাংসাদি রাঁধে এবং খায়। পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এরা মাটিতে শোয়। বারংবার সূর্যের দিকে হাত তোলে। পৃথিবীর মাটিকে চুম্বন করে। যখনই তারা শোয়, তখনই আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে কেটে নিজের সীমানা এঁকে নেয়। ব্রাহ্মণরা কপালে, কানে, গলায় পীতরঙের মাটি লেপে। বৃদ্ধেরা যখন পথে বেরোয়, হাতে থাকে বাটি ভর্তি ঐ মাটি। পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের মাথায় এবং গলায় ঐ মাটি ছুঁইয়ে দেয়। এঁদের পত্নীরা দশ বারো জন একত্রে দলবদ্ধ হয়ে নদীতে স্নান করতে আসে। স্নানাদি শেষ হলে ফেরার পথে গান গায়। দশ বছর বয়স হলেই মেয়েদের বিয়ে দেয় এরা। এক একজন পুরুষের সাতটি করেও স্ত্রী থাকে। এরা ইহুদীদের চেয়ে ধূর্ত।"

মহম্মদ বিন তুঘলঘের আমলেই বাংলাদেশ ভাগ হয়েছিল তিনটে 'ইক্তার' বা বিভাগে। লখনৌতি, সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম। সেই সময়ে আফ্রিকার মরক্কো থেকে এসেছিলেন একজন পর্যটক। নাম ইবন বতুতা। তাঁর লেখা ভ্রমণ কাহিনীতে রয়েছে সে-সময়ের বাংলার আর সপ্তগ্রামের বিশদ বর্ণনা।

"৪৩ দিন সমুদ্রে কাটিয়ে মালদ্বীপপুঞ্জের সাহাই দ্বীপ থেকে আমরা এসে পৌছলাম বাংলাদেশে। বিশাল দেশ। সব রকমের পণ্যই এখানে সস্তা। সবার আগে আমরা দেখি সাত গাঁ। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সাত গাঁ এক বিরাট বন্দর। কাছেই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। হিন্দুরা এখানে আসেন তীর্থস্নান

করতে। গঙ্গায় টহল দিয়ে বেড়ায় সুসজ্জিত সৈন্যরা। সপ্তগ্রামের সঙ্গে লখনৌতির যুদ্ধ হয় প্রায়ই। এখন বাংলার সিংহাসনে সুলতান ফকরুদ্দীন। দেশের শাসন-ভার গিয়াসুদ্দীন বলবনের ছেলে সুলতান নাসিরুদ্দীনের হাতে। সপ্তগ্রামে একটা রূপোর দিরামে পঁচিশ রিথল চাল। তার মানে এক মণ তিন পো চাল। এক দিরাম মানে প্রায় দশ পয়সা। আমাদের দেশের রূপোর দিরাম আর বাংলা-দেশের দিনার সমান। রূপোর তিন দিনারে আমি লোকজনকে কিনতে দেখেছি দুগ্ধবতী গাভী। এক দিরামে মেলে আটটি হাঁস ও মুরগী আর পনেরোটি পায়রা। এক রিথল গোলাপ জল আট দিরামে। ত্রিশ হাত লম্বা মসলিনের দাম দু দিরাম। পরমা সুন্দরী ক্রীতদাসীর দাম একটা সোনার দিরাম। আমি নিজে ঐ দাম দিয়ে কিনেছিলাম এক সুন্দরী বালিকাকে। তার নাম লালুয়া। আর আমার সঙ্গী কিনেছিল যে রূপসী যুবতীকে, তার নাম ছিল লুলু।

"ফকরুদ্দীন ফকিরদের শ্রদ্ধা করতেন। সেই শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে একজন ফকির সাতগাঁর শাসনকর্তা সেজে বসল। নাম সইদা। সুলতান তখন ছিলেন রাজধানীর বাইরে। বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত। সইদা সেই সময়েই সুলতানের একমাত্র ছেলেকে হত্যা করে গদীতে চেপে বসল। বিদ্রোহ দমন শেষ করে সুলতান ছুটে এলেন সপ্তগ্রামে। সইদার তখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো ছাড়া পথ নেই। কিন্তু পালাতে গিয়ে ধরা পড়লেন এবং মারা পড়লেন। আমি সপ্তগ্রামে পৌঁছে সুলতানকে দেখতে পাইনি। তিনি তখন দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত। দেখা করার চেষ্টা করিনি।"

ইবন বতুতা যখন ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স একুশ। ঘর ছেড়েছিলেন ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে। ঘরে ফিরেছিলেন ৫৩-য়। এর ফাঁকে ঘুরেছেন নানাদেশ। দিল্লীর সুলতানের নজরে পড়ে কাজী হয়েছিলেন অনেকদিন। তাঁকে চীন দেশে পাঠানো হয়েছিল দূত হিসেবে। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী থেকে তখনকার বাংলাদেশের অনেক ঘরোয়া খবর জানতে পারা যায়। একজন বৃদ্ধ বাঙালী মুসলমান নাকি বতুতাকে বলেছিলেন, তাঁর সংসার তিন-জনের। তিনি, তাঁর স্ত্রী আর এক চাকর। এই তিনটে মানুষের সারা বছরের খাওয়ার খরচ মাত্র এক টাকা।

তখন টাকা ছিল না। তার বদলে রূপোর দিনার। তখনকার ঐ দিনার এখনকার প্রায় এক টাকার মত। আট দিরহামে এক দিনার। দিরহাম তৈরি নানান ধাতু মিশিয়ে। দশটা রূপোর দিনারে একটা সোনার দিনার।

সমাজে মেয়েদের চলাফেরা ছিল দোলায় চেপে। দোলা অনেকটা পাল্‌কীর

মত। ঢাকা থাকত সিল্কের পর্দায়। বাড়িতে অতিথি এলে তাঁকে আপ্যায়িত করা হত পান দিয়ে। সুলতান যদি কাউকে নিজের হাতে পান এগিয়ে দেন, তার চেয়ে গৌরব আর কিছু নেই। এ-পান সোনার চেয়েও দামী।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী ফলত আম, জাম, পান, কমলালেবু, আঙুর, ডালিম, নারকেল। দেশে সতীদাহ ছিল। কিন্তু জোর করে বিধবাদের পুড়িয়ে মারা হত না। ইবন বতুতার মতে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের চেয়ে সস্তায় জিনিষ মেলে না কোথাও।

সপ্তগ্রামে যারা সোনা-রূপোর ব্যবসা করতেন, তাদের নাম হয়ে যায় সুবর্ণ বণিক। চলতি কথায় সোনার বেনে। কলকাতার আদি বাসিন্দা এরাই।

সপ্তগ্রামের পতন আর হুগলীর উত্থান একই সঙ্গে। হুগলী নাম এল কোথা থেকে তা নিয়ে নানা মত। হোগলা বন থেকে হুগলী এটাই হল বেশির ভাগের মত। অন্য মত হল হুগলী নাম হয়েছে 'ওগলি' থেকে। ওগলি পর্তুগীজ শব্দ। মানে গুদামঘর। সেকালের বইপত্র বা দলিল দস্তাবেজে হুগলীর নানা নাম। ওগোলি, ওগলি, গোলিন, হিউগলি, হাগলে, গুলি। হুগলী যে খুব প্রাচীন নাম নয়, সে বিষয়ে সব ঐতিহাসিকই প্রায় একমত। "Hugly is a modern name given to it, since the Town of Hugly rose into importance." এই মন্তব্য লং সাহেবের। ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব অনেক গবেষণা করেছিলেন হুগলী নামকরণের ঠিক সময়টিকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু পারেননি। তবে এটা যে পর্তুগীজদেরই হাতে গড়া তাতে সন্দেহ নেই। দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধনী কাব্যে' হুগলীর যে বর্ণনা, তাতে রয়েছে—

"হুগলী নগর অতি রমণীয় স্থান,
পর্তুগীজগণ আসি করিল নির্মাণ;
তাদের গিরিজা আজি বিরাজে তথায়
তেমন গঠন এবে দেখা নাহি যায়!
অপরূপ পথ ঘাট সুন্দর সোপান
মনোরম হর্মরাজী ছুঁয়েছে বিমান।"

পর্তুগীজরা আসার আগে হুগলী একটা সাদা মাঠা সাধারণ গ্রাম। সরস্বতী শুকোতে লেগেছে। জাহাজ আর ঢুকতে পারে না সপ্তগ্রামের বন্দরে। ওরা বেছে নিলে কাছাকাছি একটা জায়গা। গোলঘাটে তৈরি করলে একটা দুর্গ। ১৫৩৭। সাম্প্রায়ো নামে একজন পর্তুগীজ হুগলীতে কিনে নিলে খানিকটা

জায়গা। এর এক দিকে নদী। তিনদিকে বিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে তোফা জায়গা। অতএব এইখানেই হাঁকিয়ে জমিয়ে বসা যাক এবার।

হুগলীতে পর্তুগীজদের প্রধান ব্যবসা ছিল কাপড়ের। এখান থেকে কাপড় কিনে তারা বিক্রি করত কালিকটের বাজারে। 'ক্যালিকো' নাম দিয়ে। লাভ হত চারগুণ। বিখ্যাত ফরাসী ভ্রমণকারী বার্নিয়েরের বর্ণনায় আমরা তাদের আরও একটা পরিচয় পাই। বাঙালীদের সঙ্গে জুটে গিয়ে তারা নাকি মিষ্টিও বানাত নানান রকম। হতে পারে। তবে মুখরোচক ঐ মিষ্টির আড়ালে তাদের দুর্বিষহ বোম্বেটেগিরির বদনাম চাপা পড়েনি কোনদিন।

হুগলীতে প্রথম বিদেশী বণিক বলতে পর্তুগীজরাই। তারপর এসেছে ওলন্দাজ। তারপর ইংরেজ। তারপর ফরাসী। এছাড়াও বিদেশী বণিক এসেছে অনেক দেশ থেকে। তবে এরা চারজনই প্রধান। হুগলী এক সময় হয়ে উঠেছিল বিদেশী বণিকের তীর্থক্ষেত্র। এর এক এক জায়গায় একেকজনের আধিপত্য। যেমন পর্তুগীজদের ব্যাণ্ডেলে। ওলন্দাজদের চুঁচড়ায়। ইংরেজদের হুগলীতে। ফরাসীদের চন্দননগরে। জার্মানদের ভদ্রেশ্বরে। কোন্নগরে অষ্ট্রেলিয়ানদের। শ্রীরামপুরে দিনেমারদের।

ব্যাণ্ডেলের গীর্জা বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন গীর্জা। বাংলায় খ্রীষ্টানদের প্রথম উপাসনাগার। তৈরি হয়েছিল ১৫৯৯-এ। এখনো বেঁচে রয়েছে এই গীর্জা। এখনো পুণ্যলোভাতুর দর্শনার্থীর ভীড় সমানে বয়ে চলেছে সেখানে।

যুদ্ধ-বিগ্রহে বহুবার ধ্বংস হয়েছে এই গীর্জা। ভস্মীভূত হয়েছে আগুনে। আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। ১৬৩০। পর্তুগীজরা প্রচণ্ড মার খেল মোগলদের হাতে। ভাঙল তাদের দুর্গ, ভাঙল গীর্জা। দলে-দলে বন্দী হিসেবে তাদের নিয়ে যাওয়া হল আগ্রায়। সম্রাট জাহাঙ্গীর বন্দী পাদরী দা ক্রুজকে মত্ত হাতীর পায়ের তলায় ফেলে পিষে মারার আদেশ দিলেন। তাই করা হল। কিন্তু পরক্ষণে সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। পায়ের তলায় পিষে মারার বদলে সেই হাতী শুঁড় দিয়ে আদর করতে লাগল দা ক্রুজকে। দেখে জাহাঙ্গীর হতবাক। এবং মুগ্ধ। তিনি মুক্তি দিলেন বন্দীদের। সেই সঙ্গে অনুমতিও। ব্যাণ্ডেলের গীর্জাকে নতুন করে গড়বার। এর জন্যে খরচা লাগবে। ঠিক আছে। নিষ্কর জমি নিয়ে নাও যতটা দরকার। ব্যাণ্ডেলের গীর্জায় প্রতিবছর একটা বিশেষ দিনে 'ডোমিংগো দা ক্রুজ' নামে যে উৎসব হয়, সেটা ক্রুজের ঐ হাতীর হাত থেকে বেঁচে যাওয়াকে স্মরণে রেখেই।

হুগলীর গাঁয়েই চুঁচড়া ছিল অজ পাড়া গাঁ। ওলন্দাজরা এসে পেতে বসল

বাণিজ্যের পসরা। তারপর থেকেই চুঁচড়ার গ্রাম থেকে শহর হয়ে ওঠা। চুঁচড়া নাম হয়েছে 'ক্ষুদ্র' থেকে। পণ্ডিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মত তাই। "ক্ষুদ্র শব্দের রূপান্তরই চুঁচুড়া। ক্ষুদ্র, ছুটর, ছটরা, ছোট, ছোকরা, ছুকরী, খুচর, খুচরা, কচরা, চুঁচুড়া, কুর্চা, কচি, এই সকল পদই ক্ষুদ্র শব্দজাত। আমরা ক্ষুদ্র।" চুঁচড়ায় যখন ওলন্দাজদের আধিপত্য, তখন আর্মেনীয়রাও বাস করত সেখানে। ১৬৯৫-এ তৈরি আর্মেনিয়ান গীর্জা বাংলায় খ্রীষ্টান উপাসনার দ্বিতীয় প্রাচীন গীর্জা। নাম 'জন দি ব্যাপটিস্ট'।

ওলন্দাজদের সঙ্গে বাঙালীদের মেলামেশা ছিল খুবই। ওলন্দাজরা বেশ আরামপ্রিয়। বাবুগিরিতে পটু। কামিনীও চেনে। কাঞ্চনও চেনে। বাঙালী মেয়েদের রূপ চোখ ধাঁধিয়েছিল তাদের। অনেক ওলন্দাজই বাঙালী মেয়ে বিয়ে করে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়েছে এখানে। চুঁচড়ার জাগ্রত দেবতা শ্রীশ্রী ষণ্ডেশ্বর জীউ। পাকা মন্দিরে বাস। সেই মন্দিরে উৎসবের দিনে বাজে বজ্রগম্ভীর দুটো পিতলের ঢাক। হিন্দুর দেবতার উদ্দেশ্যে সে ঢাক দুটি এক ওলন্দাজ ভক্তের উপহার। এবং এই ভক্ত যে-সে লোক নয়। তখনকার ওলন্দাজ গভর্নর। এনথনি ওভারবেক। ঢাক উপহার দিয়েছিলেন ১৮২৪-এ। আর গীর্জা তৈরি করেছিলেন আর এক গভর্নর। মিঃ জি. ভারনেট। সেটা আরো অনেক আগে। ১৭৬৩তে। আরম্ভ করেছিলেন গভর্নর সিটারমান। শেষ করেন ভারনেট।

'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজে' বাংলাদেশে প্রাচীন ওলন্দাজদের বিষয়ে অনেক তথ্য।

"ওলন্দাজদিগের চুঁচুড়া উপনিবেশ ব্যাটাভিয়ার অধীন ছিল, এবং চুঁচুড়ার কোন পদ শূন্য হইলে ব্যাটাভিয়া হইতে উক্ত স্থানে কর্মচারী নিয়োগ হইত। একজন গভর্নর ও সাতজন কাউন্সিলের সদস্যের উপর চুঁচুড়া উপনিবেশ পরিচালনের ভার ছিল। উক্ত সাতজন সদস্যের মধ্যে মাত্র পাঁচজন সদস্য ভোট দিবার অধিকারী ছিলেন। বাকী দুইজন সদস্য ভোট দিতে না পারিলেও চুঁচুড়ার গভর্নরকে মন্ত্রণা দিতে পারিতেন। ওলন্দাজ গভর্নরগণ বিলাসিতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বার্ষিক এক লক্ষ টাকা তাঁহারা সংসার খরচ করিতেন। চুঁচুড়ার গভর্নরের 'তাঞ্জাম' একমাত্র গভর্নর ব্যতীত আর কাহারও ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ছিল না। গভর্নর যে সময় নগর ভ্রমণে বাহির হইতেন সেই সময় বাদ্যকরগণ বাজনা বাজাইয়া অগ্রে যাইত। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গভর্নর কর্তৃক টানা পাখার প্রথম প্রচলন এই দেশে হইয়াছিল। এবং বড় বড় তাল পাতার পাখাও তাহারা প্রথম ব্যবহার করিত। তৎকালে

কাঁচের শার্সির প্রচলন না থাকিলেও চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের বাড়িতে বেতের জাফ্রি লাগানো হইত। ওলন্দাজ গভর্নরদের মধ্যে ভার্লেট, ভিনসেন্ট, সিটারমান, ওভারব্রিকের নাম পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ওলন্দাজদিগের প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়া গীর্জার মধ্যে বহু গভর্নর এবং তাহার সহধর্মিণীদের তৈলচিত্র রক্ষিত ছিল। ওলন্দাজ কাউন্সিলের সাতজন সদস্যের উপর চুঁচুড়া পরিচালনের ভার ন্যস্ত ছিল। তন্মধ্যে একজনের উপর বিচার ও শাসনের ভার ছিল। তিনি জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল। এবং বেত্রাঘাত হইতে আরম্ভ করিয়া জেল ও ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত তিনি ধনী ব্যক্তিগণকে জরিমানা করিতে পারিতেন। এতদ্ভিন্ন নগরাধ্যক্ষ ও কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি আরও কয়েকটি উচ্চপদ ছিল। জমি হস্তান্তর করিবার জন্য ওলন্দাজদিগের দুইটি আদালত ছিল। একটি দেশীয় বা জমিদারী আদালত। আর একটি ইউরোপীয় আদালত।

"ইংরেজদিগের সহিত ওলন্দাজদিগের বিশেষ প্রীতি ছিল। এবং ইংরাজগণ ওলন্দাজ-রমণীদের সহিত নৃত্য-গীত করিবার জন্য চুঁচুড়ায় প্রায়ই যাইতেন। প্রথম ইংরাজ গভর্নর উইলিয়ম হেজ ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে আসিয়া ওলন্দাজ গভর্নরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে হেজ সাহেবের সহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট মিঃ গাইফোর্ডের মনোমালিন্য হইলে তিনি কিছুদিন চুঁচুড়ায় অবস্থান করেন।...ওলন্দাজরা এই স্থান হইতে বহুবিধ জিনিষ ইউরোপে চালান দিয়া ধনৈশ্বর্যে ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে তাহারাই প্রধান হইয়াছিল। তন্মধ্যে জাভায় আইফেন রপ্তানী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওলন্দাজগণ পাটনা হইতে আইফেন কিনিয়া জাভায় উহা চালান দিয়া বৎসরে চারলক্ষ টাকা লাভ করিত। এতদ্ব্যতীত বাগানে তাহাদের বিশেষ সখ ছিল। এবং কড়াইশুঁটির চাষ তাহারাই এই স্থানে প্রথম করিয়াছিল। 'ওলন্দাশুঁটি' নামক কড়াই আজ তাহাদের স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়।"

অবশ্য ইংরেজ-ওলন্দাজের এই মিল একদিনে হয়নি। গোড়ার দিকে সম্পর্ক ছিল আদায়-কাঁচকলায়। অনেক যুদ্ধ দাঙ্গার পর যে যার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে মিলে মিশে বাঁচতে শেখে। পলাশী যুদ্ধের পরে আবার শুরু হয়ে যায় বাঘে বলদে লড়াই।

ফরাসীরা এদেশে আসার আগে চন্দননগর ছিল না। "চন্দননগর নামের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয় ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১ নভেম্বরে এখানকার কর্তৃপক্ষ মার্টিন দেলান্দ এবং পেল্‌এ স্বাক্ষরিত তদানীন্তন প্যারিস্থ ডিরেক্টরকে লিখিত এক

পত্রে।" এ উদ্ধৃতি 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' থেকে। ঐতিহাসিকদের অনুমান কয়েকটা ছোট ছোট গাঁ-কে একজায়গায় জুড়ে চন্দননগরের জন্ম। নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত। চন্দ্রকলার ন্যায় শহরের আকৃতি। তার থেকেই বুঝি চন্দ্রনগর। পরে চন্দননগর। এ হল এক পক্ষের মত। আরেক পক্ষের মত নামটা এসেছে চন্দন থেকে। চন্দন কাঠের বিরাট ব্যবসা ছিল এখানে। তা থেকেই ঐ নাম। এ ছাড়াও অন্য মত আছে। নামটা এসেছে চাঁদ সদাগরের নগর থেকে। চাঁদ সদাগর ছিলেন বেনে। কাছাকাছি কোথাও বাণিজ্যের কুঠি ছিল তাঁর। সেই চাঁদ-এর নগর থেকেই চন্দননগর।

১৬৭৩। চল্লিশ হাজার টাকার বিনিময়ে ফরাসীরা পেয়েছিল চন্দননগরে কুঠি বানানোর ফরমান। ৯৬-৯৭-এ তৈরি করে দুর্গ। হুগলী ঘিরে বিভিন্ন বণিকদের ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠলেও ব্যবসা চলত সারা বাংলাদেশের পণ্য কিনে। ঢাকায়, কাশিমবাজারে, চট্টগ্রামে, চারদিকে তাদের কুঠি। যেখানকার যে পণ্য সেরা, সেটার দিকেই তাদের বাড়ান রয়েছে লোভের হাত, লাভের হিসেব।

বাংলার মসলিনের তখন পৃথিবী জুড়ে নাম। খ্যাতি যত, খাতির তত। মসলিন তৈরি হত ঢাকায়। রপ্তানী হত বিদেশে। ইউরোপের বাজারে তার বিস্তর চাহিদা। মসলিনের সূক্ষ্মতাও ছিল পৃথিবীর বিলাসী ব্যক্তিদের কাছে এক অপরূপ আশ্চর্য। ২০ গজ একটা মসলিন ভরে রাখা যেত ছোট্ট একটা নস্যির কৌটোর মধ্যে। দামও তেমনি। বর্ধমানের মেহেরুন্নেসা যখন আগ্রায় গিয়ে জাহাঙ্গীরের পত্নী হলেন নূরজাহান নামে, তখনই মসলিন প্রথম মাথা গলানোর সুযোগ পেল বাদশার অন্তঃপুরে। নূরজাহান বিদুষী মহিলা। তাই কদর বুঝে তাকে টেনে এনেছিলেন অন্দরমহলে এবং আপন অঙ্গে। তাঁর সময়ে একটা মসলিন কাপড়ের দাম ছিল চারশো টাকা।

'বাংলাদেশের ইতিহাসে' পাই, "মির্জা নাথান মালদহে ৪ হাজার টাকা দিয়া একখণ্ড বস্ত্র ক্রয় করেন। সে আমলে বাংলায় উৎকৃষ্ট বস্ত্রসমূহের মূল্য ইহা হইতে ধারণা করা যাইবে।"

মসলিনের আর এক নাম 'আব-ই-রওয়ান।' মানে হল চলন্ত জলধারা। আরো একটা নাম ছিল এর। বিয়েটিল্হা। সম্ভবত পর্তুগীজ শব্দ। বিয়েটা মানে সন্ন্যাসিনী। ঐ সময়ে সন্ন্যাসিনীরা পরত ওড়না। আর ওড়না হওয়ার পক্ষে মসলিন-এর চেয়ে বেশী মর্যাদা কার?

মসলিন ছাড়াও আরও যে সব সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি হত বাংলাদেশে, তাদের

নাম হল, সরস্বতী, মলমল, আলাবালি, তঞ্জীব, তেরিন্দাম, নয়নসুখ, শিরবান্ধানী, ডুরিয়া, জামদানী। শুধু যে জলের মত হালকা কাপড়ই বাংলার তাঁতীদের হাতে খুলত তা নয়। পাতলা, মোটা সবেতেই তাদের পটুত্ব। মসলিনের চেয়ে কম হালকা কাপড়-চোপড় 'ক্যালিকো' নাম নিয়ে চালান যেত বিদেশে। তাদের কিছু সাদা, কিছু রঙীন।

'কালিকট থেকে পলাশী'র মধ্যে এই জাতীয় বস্ত্র সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পাই, তা উল্লেখ করার মত।

"এই মোটা সুতী কাপড়ের কিছুটা অংশ কালিকট বন্দর থেকে 'ক্যালিকো' নাম নিয়ে চলে যেত দেশ-দেশান্তরে। ইংলণ্ডে এই ক্যালিকোর প্রথম আমদানি হয় ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। রঙীন ক্যালিকোর পরিচ্ছদ পরিধান করে রানী দ্বিতীয় মেরী নতুন ফ্যাসানের প্রবর্তন করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের ঘরে ক্যালিকোর মর্যাদা রাতারাতি বেড়ে যায়। রঙীন ক্যালিকোর পরিচ্ছদ, পরদা, শয্যা-আবরণী, কুশন ইত্যাদিতে দেশ ছেয়ে যায়। এর ফলে ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্পের ক্ষতি হয় অসামান্য। তাই ক্রমে আইন করে ইংলণ্ডে ক্যালিকোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। পরে এর আমদানি হত শুধু অন্যদেশে রপ্তানীর জন্য, বিশেষ করে হল্যাণ্ডের বন্দর আমস্টারডামে।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাংলার গৌরব' প্রবন্ধে মসলিন সম্বন্ধে জানতে পারি আরও কিছু।

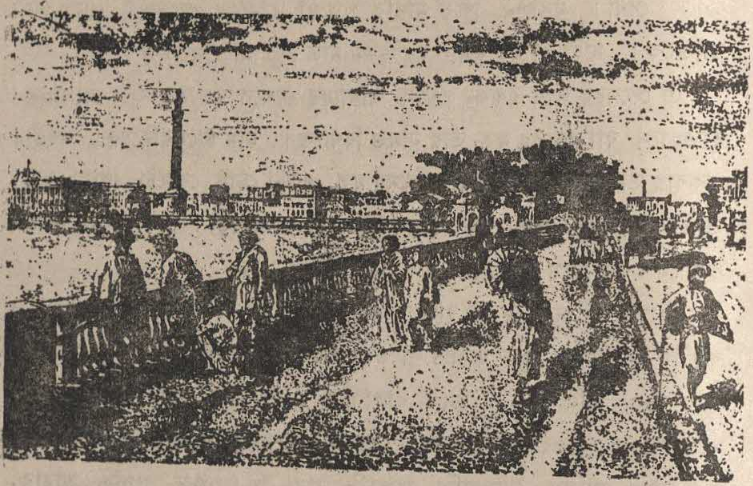
"ঢাকাই মসলিন ঘাসের উপর পাতিয়া রাখিলে ও রাত্রিতে তাহার উপর শিশির পড়িলে, কাপড় দেখাই যাইত না। একটা আংটির ভিতর দিয়া একখান্ মসলিন অনায়াসেই টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইত। তাঁতীরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া একটা বাখারির কাঠি লইয়া কাপাসের ক্ষেত্রে ঢুকিত। ফট্ করিয়া যেমন একটি কাপাসের মুখ খুলিয়া যাইত, অমনি বাখারিতে জড়াইয়া তাহার মুখের তুলাটি সংগ্রহ করিত। সেই তুলা হইতে অতি সূক্ষ্ম সুতা পাকাইত। তাহাতেই মসলিন তৈয়ার হইত। আকবর যখন বাংলা দখল করিয়া সুবাদার নিযুক্ত করেন, তখন সুবাদারের সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি বাংলার রাজস্ব স্বরূপ বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র লইবেন, কিন্তু দিল্লীর রাজবাড়ীতে যত মালদহের রেশমী কাপড় ও ঢাকার মসলিন দরকার হইবে, সমস্ত সুবেদারকে জোগাইতে হইবে।"

টেভানো নামে একজন পর্যটক বেড়াতে এসেছিলেন হিন্দুস্থানে। জাতে ফরাসী। বাংলা তিনি নিজের চোখে দেখেননি। তবে বাংলার মসলিন তাঁর

চোখে দেখা। মসলিন দিয়ে মাথার পাগড়ী বানাতে দেখেছেন প্রচুর ধনী ব্যক্তিকে। সাঁইত্রিশ গজ মসলিনের ওজন মাত্র চার আউন্সের মত।

ঐ দেশেরই আর একজন পর্যটক আমাদের দেশকে তন্ন তন্ন করে দেখেছেন। ইতিহাসে বার্নিয়েরের মত তাঁর নামও বিখ্যাত। নাম টাভেরনিয়ের। জহুরী। একবার তাঁর সামনে উট পাখীর ডিমের মত একটা ছোট্ট কৌটো খোলা হল। তা থেকে বেরুল একটা ষাট হাত লম্বা মাথার পাগড়ী। সে কাপড় এমনই সূক্ষ্ম যে হাতে নিয়ে তাঁর মনেই হল না যে ছুঁয়েছেন কিছু।

বিদেশী বণিকদের কাছে বাংলার মসলিন, পশমের কাপড়, সিল্ক ছাড়া আরও বহু জিনিষ ছিল যা কিনে ফলাও লাভের কারবার ফেঁদেছিল তারা। তার মধ্যে চাল ছিল, চিনি ছিল। নুনও বাদ ছিল না। ছিল পাটনার সল্টপিটার। মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের কাজ। পিতলের বাসন। ঢাকার শাঁখের কাজ। ছিল লাক্ষা, আফিম, মোমবাতি, মৃগণাভি, লঙ্কা, ঘি। গুড়, সুপুরি, তামাক, তেল, আদা, পাট। ছিল মাখন এবং মরিচ। আরও নানা রকমের মশলা। দিশি গাছ-গাছড়ার ওষুধ। আর কি? আর ক্রীতদাস।



॥ জলের বণিক ডাঙায় ॥

এক সময়ে সাজাহানের একটি মেয়ের (জাহানারা ?) সর্বাঙ্গ আকস্মিকভাবে পুড়ে যায় আগুনে। জীবনের কোন রকম আশা নেই। এই সময় গেব্রিয়েল ব্রাউটন নামে একজন ডাক্তার দিল্লীর দরবারে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। সম্রাটের সঙ্গে তাঁর মৌখিক পরিচয় ও সখ্যতা ছিল। তিনি উঠে পড়ে লাগলেন সম্রাট-কন্যাকে বাঁচাবার জন্যে। দীর্ঘ চিকিৎসার পর সত্যিই আবার সম্রাট-কন্যার চোখের আলো, চলার শক্তি, রক্তের চঞ্চলতা ফিরে এল। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, কী চান আপনি পারিশ্রমিক হিসাবে বলুন। তাই দেব।

ব্রাউটন ডাক্তার হলেও ইংরেজ। আর ইংরেজ বলেই আর সকলের মত তাঁর আকাঙ্ক্ষাটাও এক এবং অদ্বিতীয়। ব্রাউটন বললেন, বাংলা দেশে বাণিজ্য করার স্বাধীন অধিকার।

এ-কাহিনী কতটা খাঁটি তা নিয়ে অনেক ঐতিহাসিকের মনেই সন্দেহ। তবে সুরাটে ব্রাউটন নামে ইংরেজদের একজন ডাক্তার যে ছিলেন সেটা সত্যি।

রাজকুমারীর অগ্নিকাণ্ডটাও সত্যি। মেলে না কেবল সাল তারিখের হিসেব। তবে ইংরেজদের প্রতি সাজাহানের প্রসন্ন হবার পক্ষে হয়ত কারণ ছিল কিছু। অন্তত প্রধান কারণটা যে পর্তুগীজদের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা, তাতে সন্দেহ নেই। বাবা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে এক সময় বিদ্রোহ করেছিলেন সাজাহান। তখনো তিনি সাজাহান হননি। নাম ছিল খুররম্। আহম্মদনগরের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা মালিক অম্বর সেই আকবরের আমল থেকে

দাক্ষিণাত্যে মোগল বাদশাদের পয়লা নম্বরের শত্রু। মারাঠারা এই অম্বরের কাছ থেকেই গেরিলাযুদ্ধের কলাকৌশলে হাত পাকায়। জাহাঙ্গীর দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে কিছুটা দখল করতে পেরেছিলেন আহম্মদনগরের। পরে অম্বর আরও শক্তি সঞ্চয় করে সেটুকুও জয় করে নেয়। জাহাঙ্গীর নিজে যখন সিংহাসনে তখন পাঠালেন খুররম্কে। খুররমের হাতে বন্দী হলেন অম্বর। খুশিতে ডগোমগো হয়ে উঠল জাহাঙ্গীর, নিজের ছেলের এই রকম বীরত্বপনা দেখে। আদর করে নাম দিলেন সাজাহান। অর্থাৎ পৃথিবীর ঈশ্বর।

কিছুকাল বাদে এই সাজাহানই একদিন বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল, মালিক অম্বরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। সেই সময় তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হত নানা দেশে। কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল বাংলাদেশে। নিজের শক্তি বাড়ানোর প্রয়োজনে তিনি সাহায্য চেয়েছিলেন পর্তুগীজদের। পর্তুগীজরা তখন ক্ষমতায় প্রবল। কিন্তু সাজাহানের সাহায্যে এক পাও এগিয়ে এল না তারা। উল্টে ম্যানোয়েল ট্যাভারের কাছ থেকে যথেষ্ট খারাপ ব্যবহার পেলেন। এই হল রাগের এক নম্বর। দু' নম্বর যখন সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসলেন, চারিদিক থেকে এল পেশকষ্, অর্থাৎ উপঢৌকন। কিন্তু হুগলী থেকে এল না একটা কানাকড়িও। সাজাহান ক্ষুব্ধ হলেন পর্তুগীজদের এই বেয়াদপিতে। এরপর তৃতীয় কারণটা হল আরাকান রাজের সঙ্গে মোগলদের শত্রুতা। অথচ পর্তুগীজদের যত আদিখ্যেতা ঐ আরাকান রাজের সঙ্গে। জুগিয়ে যাচ্ছে গোলাবারুদ কামান বন্দুক। সম্রাট হয়েই তাঁর প্রথম কাজ হল, পর্তুগীজ ঠ্যাঙানো। হুগলীর শাসনকর্তা কাসিম খাঁকে কড়া হুকুম, বোম্বেটে পর্তুগীজদের হুগলী থেকে জল্দি হঠাও। পর্তুগীজদের প্রতি এই তিক্ত মনোভাব থেকেই হয়ত ইংরেজদের প্রতি সাময়িক অনুকম্পা জেগে থাকতে পারে তাঁর মনে।

ব্রাউটনের আদর আপ্যায়ন বাড়ল বাংলার নবাব সুজার দরবারেও। হঠাৎ একদিন সুজার মহিষী কঠিন অসুখে পড়লেন। ব্রাউটন রাজ অন্তঃপুরের সেই মহিষীকেও প্রাণপণে রোগমুক্ত করে তুললেন।

সুজা বললেন— কী চান পারিশ্রমিক হিসেবে বলুন।

ব্রাউটন চাইলেন, বাংলাদেশে বাণিজ্য করার স্বাধীন অধিকার আর আদেশ-পত্র। আর হুগলী-বালেশ্বরে কুঠি নির্মাণের অনুমতি।

সুজা সম্মত হলেন। ঠিক হল প্রতি বছর তিন হাজার টাকা খাজনা দিয়ে সারা বাংলাদেশে ইংরেজরা অবারিতভাবে বাণিজ্য করতে পারবে।

কাশিমবাজার, হুগলী, মালদা, পাটনা, ঢাকায় একে একে ইংরেজদের কুঠি উঠতে থাকল।

হুগলীতে যখন ইংরেজদের ব্যবসা ভরাদিঘীর মত কানায় কানায় টলমল, সেই সময়ে হুগলীর ফৌজদারের সঙ্গে চলল তাঁদের বাদ-বিসম্বাদ, রেষারেষি। এক আধ দিন নয়। হরহামেশাই। ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। তোমরা টাকা কামাচ্ছ, পয়সা পিটছ। অথচ ফৌজদারকে দুটো পয়সা দিতে হাত ওঠে না কেন? এ তো আর ঘুষ নয়। এ একটা সম্মান। নবাবকে 'নজরানা' দেওয়া যেমন। এ তো গেল একদিক। আরেকটা হল, এসেছ তো বাবা সাত ঘাট পেরিয়ে বিদেশ বিভূঁয়ে। আমাদেরই কৃপা-করুণায় যাই হোক্ দু-পয়সা করে খাচ্ছ। তা এত নাক উঁচু কেন সব সময়ে? আমাদের বুঝি মানুষ বলেই মনে হয় না?

সুলতান সুজার পর এতদিন বাংলার নবাব ছিলেন মীরজুমলা। ১৬৬৫ সালে মীরজুমলার মৃত্যুর পর বাংলার নবাব হলেন শায়েস্তা খাঁ। আওরঙ্গজেবের মামা। মীরজুমলা তাঁর জীবদ্দশায় কোচবিহার, আসাম ইত্যাদি অধিকারের জন্যে সব সময়েই যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। ফলে তিনি বাংলার ইংরেজদের দিকে খুব একটা নজর দিতে পারেননি।

শায়েস্তা খাঁও নবাবী পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই অতিমাত্রায় জড়িয়ে পড়লেন দক্ষিণ বাংলাকে মগ-পর্তুগীজদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করা, আর সেই সঙ্গে আরাকান-রাজকে সন্দীপ আর চট্টগ্রাম থেকে হটিয়ে সেটা দখলে আনার ব্যাপারে।

কিন্তু এসব যুদ্ধ-হাঙ্গামা মিটবার পর যখন শায়েস্তা খাঁ ব্যবসায়ী ইংরেজদের দিকে ভাল করে চোখ তুলে তাকালেন, তখন ইংরেজরা হুগলীর ফৌজদারের নামে আজ একটা, কাল দুটো, পরশু তিনটে—রোজই নানা রকম অভিযোগ ও অন্যায়ের বিবরণ পেশ করে যায়।

ফৌজদাররা আমাদের মাল আটকায়। যখন-তখন তাদের টাকাটা-সিকেটার আবদার। যত দিই, কিছুতেই খাঁই মেটে না। টাকা কি আমাদের গাছে ফলে? আমাদের ব্যবসায় এরকম বাধা দিলে আমরা এখনি এখান থেকে কুঠি-টুঠি সব উঠিয়ে নিয়ে যাব। তখন দেখা যাবে কে তোমাদের মুঠি ভরায়।

শায়েস্তা খাঁ ফৌজদারদের একটু-আধটু ধমকানি দিলেন। কিন্তু কোন কাজ হল না। যথাপূর্বং তথাপরং।

হুগলী কুঠির প্রেসিডেন্ট হেজেস সাহেব নিজে গিয়ে এবার নিজেদের সকরুণ আর্জি পেশ করলেন।

করলে কি হবে, শায়েস্তা খাঁরই তখন খাঁই দেখা দিয়েছে। টাকা চাই, টাকা চাই। প্রতিদিন যাঁর লাখ টাকার কাছাকাছি খরচ তাঁর ভাণ্ডারে সব সময়েই অকুলান। হাত-টান লেগেই আছে।

তাঁর মনেও সহসা প্রশ্ন জাগল—ইংরেজদের যখন আছে, তখন দেবে না কেন? ইংরেজদের জোর সুলতান সুজার ফরমানের জোর। শায়েস্তা খাঁ বললেন—তোমাদের ও ফরমানের পরমায়ু শেষ। যদ্দিন সুজা ছিল তদ্দিনই ওটার কার্যকাল। ওতো আর বাদশাহী ফরমান নয়। আর টাকা চাইলে দেবে নাই বা কেন? সুজার আমলে তোমাদের অবস্থা যা ছিল—এখন তো তার চেয়ে শতগুণে ভাল। যে দেশের যা রীতি, সেটা মানতে হবে বৈকি।

বাংলাদেশের ছেলে-বুড়ো, যে কখনো ইতিহাসের একটা পাতাও ওল্টায় নি সেও জানে, শায়েস্তা খাঁর নাম। সেটা অন্য কোন কারণে হয়। চালের দামের জন্যে। শায়েস্তা খাঁর আমলে চালের দাম ছিল টাকায় আট মণ। শায়েস্তা খাঁর আগে চালের দাম এর চেয়ে কম হয়নি কখনো। নিজের এই অভূতপূর্ব গৌরবে শায়েস্তা খাঁ বেজায় খুশি। ঢাকার পুবদিকে তৈরি করলেন এক তোরণ। তার শিরোভাগে দিব্যি দিয়ে লিখে দিলেন, যে রাজার আমলে চালের দাম এইরকম না হবে, সে যেন ঐ তোরণ দ্বার না খোলে।

খোলা হয়েছিল মাত্র একবার। সরফরাজের আমলে। কেউ বলেন, না। তারও আগে, শুজাউদ্দীনের সময়ে।

সে যাই হোক, শায়েস্তা খাঁ আরামপ্রিয় মানুষ। জাঁক-জমক, দান-দক্ষিণা, আমোদ-স্ফূর্তি ছাড়া তাঁর দিন কাটে না। দিনের গড়পড়তা আয়ের অঙ্ক, দু লাখ। নিজের খরচ এক লাখ। তাঁর হাতে যদি উৎকোচের টাকা না আসে, চলবে কি করে? তের বছরে এত সব খরচ-খরচা বাদ দিয়ে ৩৮ কোটি টাকা সঞ্চয় করেছিলেন তিনি। ইংরেজরা যদি তাঁর নবাবীয়ানার অ আ ক খ না-বোঝে, সে কি শায়েস্তা খাঁর দোষ?

ইংরেজরা তেমনি একগুঁয়ে। তারা ঐ পাওনা তিন হাজার টাকার বেশী একটা কানা-কড়িও দিতে নারাজ। ফলে অবস্থাটা একটু-একটু করে পেকে, দিনে-দিনে এমন একটা ঝড়ের মত থমথমে জায়গায় এসে পৌঁছল যে—দু-পক্ষেরই 'যুদ্ধং দেহি, রণং দেহি' হাবভাব।

সেই সময়ে আবির্ভাব ঘটল একজন সাহসী নেতার। তিনি জব চার্নক। কলকাতার আদি আবিষ্কারক। একদিকে অফুরন্ত স্বপ্ন, অন্যদিকে অবিরাম সংগ্রাম—এই দুই পারাপারের মাঝখানে উদ্বেল, উৎসাহী এবং দুঃসাহসী একটি জীবন।

পলাশীর ১০০ বছর আগে ১৬৫৫ কি ৫৬ সালে চার্নক প্রথম আসেন ভারতবর্ষে। কাশিমবাজারের জুনিয়ার মেম্বর। চতুর্থ সদস্য। মাইনে কুড়ি পাউণ্ড। ১৬৭১-এ মাইনে হল দ্বিগুণ। ৭৫-এ আরো কুড়ি পাউণ্ড বাড়ল গ্রাচুইটি হিসাবে। মাঝে বদলি হয়েছিলেন কাশিমবাজার থেকে পাটনায়। ১৬৮০-তে আবার কাশিমবাজার।

১৬৮৫ সালে হুগলীর চীফ্ এজেন্টের মৃত্যু হওয়ার ফলে কাশিমবাজার থেকে হুগলীতে ডাক পড়ল তাঁর। তখন কাউন্সিলে তাঁর স্থান প্রথম। হুগলীতে পা দিয়েও সুখ নেই। পাওনা টাকা অনাদায়ের ফলে কাশিমবাজারের দালাল গোমস্তারা কুঠির কর্তাদের নামে ৪৩ হাজার টাকার এক ডিক্রি জারী করে বসল। নবাবের হুকুম হল তাঁকে ঢাকায় আসবার জন্যে। কিন্তু চার্নক সেখানে না গিয়ে কাশিমবাজারেই কিছুদিন নজর-বন্দী হয়ে থাকার পর এক নিশুতি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পালিয়ে এলেন হুগলীতে। সঙ্গে ৩০৮ জন সৈন্য, কয়েকটা যুদ্ধ জাহাজ। ১৬৮৬ সাল।

মোগল সেনারা এদিকে কাশিমবাজার কুঠি দখল করে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরও বড় রকমের একটা অভিযানের কথা ভাবছেন।

চার্নক হুগলীতে এসে একটা কথা বেশ স্পষ্ট করেই বুঝলেন যে, ফরমান-টরমানের নজীর দেখিয়ে নবাবের সঙ্গে লড়া যাবে না। সর্ত-টর্ত নিয়ে আর আমাদের মত্ত থাকলে চলবে না। পায়ের জোর চাই। নিজেদের শক্তিতে নিজেদের দাঁড়াবার। চাই গায়ের জোর। তরবারির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে তরবারিই চাই আরেকখানা। কামানের জবাবে কামান।

চার্নক উপরওয়ালাদের সঙ্গে গোপনে চিঠি চালাচালি করে কেল্লা বানাবার কথা পাড়লেন। কোম্পানীর লোকেরা জানাল—এখনি সাত-তাড়াতাড়ি কিছু করার দরকার নেই। সরকার চটলে সমূহ বিপদ। তবে যেখানে যত ইংরেজ আছে, হুগলীতে এনে জড়ো করো। চারধার থেকে ইংরেজরা এসে চাক্ বেঁধে বসল হুগলীতে।

শায়েস্তা খাঁর তখন অসীম ক্ষমতা। স্বয়ং সম্রাট তাঁকে রাজ্যশাসনের জন্যে স্বাধীন অধিকার দিয়েছেন। হুগলীর এই লোক সংখ্যা, সেনা সংখ্যা

বৃদ্ধির খবর যেই এসে পৌঁছল তার কানে, রাগে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে হুকুম দিলেন, এখুনি সেনা সাজাও। ঘেরাও কর হুগলী।

হুগলীর ফৌজদার মনে মনে ভাবলেন, তিনিই বা নবাবের চেয়ে কম যাবেন কেন? হুকুম দিলেন—ইংরেজদের ব্যবসা বাণিজ্যের স্থবিধের জন্যে কেউ যেন বেচা-কেনা বা কেনা-কাটা না করে। এমন কি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যও নয়।

একদিন সকালে জনা-তিনেক ইংরেজ হুগলীর বাজারে এসেছে কেনা-কাটা করতে। দোকানদারেরা কেউ মাল বেচতে রাজী নয়। শুরু হল তর্কাতর্কি। এমন সময় কোতোয়ালের লোকেরা এসে ধরে নিয়ে গেল সেই ইংরেজ তনয়দের একেবারে ফৌজদারের কাছে। কেউ বলেন স্থানীয় মোগলদের হাতে উত্তম-মধ্যম জুটেছিল তাদের কপালে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ল ইংরেজ কুঠিতে। দলে দলে বেরিয়ে এল ইংরেজ সৈন্য।

ছাইচাপা আগুন উঠল গা ঝাড়া দিয়ে। সিংহের কেশরের মত ফুলে ফুঁসে উঠল ক্ষ্যাপা আগুনের শিখা। কামানে-কামানে, গোলায়-গোলায়, রক্তে-রক্তে মেতে উঠল এক ধ্বংসলীলা।

চন্দননগরে ছিল ইংরেজদের একদল সেনা। ঘোলঘাটের কাছে ফৌজদারের তোপখানা। তোপখানার পাশেই শাসনকর্তার আবাস। ইংরেজ সেনারা আরবথনটের নেতৃত্বে সেটা জয় করে যখন আরো এগোতে শুরু করেছে—ফৌজদার আবদুল গণি ছদ্মবেশে নৌকায় চেপে হুগলী ছেড়ে পালালেন। ইংরেজদেরই জয় হল যুদ্ধে।

বাতাসে বারুদের গন্ধ। সমস্ত শহরের ওপরে কামানের কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া। ধ্বংস আর নীরবতা। চার্নক এই যুদ্ধ-থমথমে হুগলীর কুঠিতে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন, এর পর কি?

৫৪ বছর আগে এই অক্টোবর মাসেই মোগলরা পর্তুগীজদের খুঁটি, কুঠি উপড়ে ফেলেছে বাংলা থেকে। তাদের মেয়েরা হয়েছে বাদশার হারেমের ক্রীতদাসী। পুরুষেরা ক্রীতদাস। কেউ মরেছে ছোরার ফালে। কেউ মরেছে জলে ডুবে। আর আমরা কি টিকে যাব? তার চেয়ে সাবধানের মার নেই। সাবধান হই।

যুদ্ধের পর মাস দুয়েকের মধ্যে জাহাজে কোম্পানীর মালপত্র চাপিয়ে লোক-লস্কর নিয়ে চার্নক হুগলী ছেড়ে পালালেন।

চার্নকের এই হুগলী আক্রমণ বা চন্দননগর ধ্বংস নিয়ে ইতিহাসে অনেক

রূপকথা। 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' তওয়ারিখ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে চার্নকের বিষয়ে বহু দুঃসাহসিক জনশ্রুতি।

"হুগলী বন্দরে ঘোলঘাট ও মোগলপুরার নিকটে পূর্বে ইংরেজদের কুঠী ছিল। একদিন কুঠীর সাহেবেরা আহারে বসিয়াছেন, এমন সময়ে ঐ কুঠী ভাগীরথী গর্ভে বসিয়া গেল। কেহ কেহ প্রাণ হারাইল। কয়েকজন কায়ক্লেশে রক্ষা পাইল। কিন্তু মালপত্র নষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর ইংরেজ সরদার চার্নক কোম্পানীর গোমস্তা বারানসীর বৃক্ষবাটিকায় নতুন কুঠীর স্থান নির্ণয় করিয়া তথায় এক প্রকাণ্ড গৃহ নির্মাণ আরম্ভ করিলেন। নবাবের অনুমতি না লইয়াই দোতালা-তেতালা ঘর, গড়খাত ও বুরুজ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কুঠী নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে নিকটস্থ মোগল অধিবাসীগণ ফৌজদারের নিকটে নালিশবন্দ হইল, 'ইংরেজদের কুঠীর উপর হইতে তাহাদের পর্দানশীন স্ত্রীগণকে দেখা যাইবে—অতএব কুঠী নির্মাণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।' ফৌজদার মীর নসির 'নবাব মুর্শীদকুলীর বিনা অনুমতিতে কিছু করিতে পারেন না' বলিয়া ঐ আবেদন পত্রে নিজ মন্তব্যসহ সদরে প্রেরণ করিলেন। মোগলেরা মুর্শিদাবাদে গিয়া সুবাদারের পদতলে টুপী রাখিয়া অনুনয়-বিনয় আরম্ভ করিল। মুর্শীদকুলী ফৌজদারের প্রতি পরোয়ানা পাঠাইয়া কুঠী নির্মাণ বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। ফৌজদার ইংরেজপক্ষকে সুবাদারের আদেশ জানাইলেন। রাজমিস্ত্রীরা তৎক্ষণাৎ কর্মত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। চার্নকের এই সময়ে একখানি মাত্র জাহাজ ও যৎসামান্য সৈন্য ছিল। কুলী খাঁর হুকুম বড়ই কড়া। মোগলগণের দলবল বেশী, ফৌজদারও তাহাদেরই অনুকূলে। সুতরাং বলপ্রকাশে অক্ষম হইয়া চার্নক জাহাজে উঠিলেন। জাহাজের উপর হইতে আতসী পাথর ধরিয়া নদীর ধারে হুগলী হইতে চন্দননগর পর্য্যন্ত স্থান দগ্ধ করিয়া জাহাজ ছাড়িলেন। ফৌজদার প্রতিফল দিবার জন্য মাথুয়ার থানাদারকে উহাদের গতিরোধ করিবার আদেশ দিলেন। থানাদার জাহাজ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এক একটি দশ সের করিয়া ভারী এমন কড়াওয়ালা এক প্রকাণ্ড শিকল নদীর উপরে দুই পার্শ্বে বাঁধিয়া দিলেন। জাহাজ শিকলে আবদ্ধ হইল। চার্নক ফিরীঙ্গী (ইউরোপীয়), তরবারি সাহায্যে অবহেলে ঐ শিকল কাটিয়া জাহাজ চালাইলেন।"

হেজেসের ডায়েরীতে এই কাহিনীর ভিন্ন চেহারা। সেখানে আতসী কাচের অগ্নিকাণ্ড নেই। তার বদলে ক্যাপ্টেন নিকলসনের তোপ।

ওদিকে তখন শায়েস্তা খাঁ রেগে টং হয়ে ইংরেজদের ওপর গায়ের ঝাল

মেটাচ্ছেন। পাটনার কুঠি লুঠ করা হল। কর্মচারীদের বেঁধে এনে আটকে রাখা হল জেলখানায়। ঢাকাতেও তাই। ভরমল নামে একজন ইংরেজ-হিতৈষীর মধ্যস্থতায় কোনমতে বন্ধ হল সেটা।

চার্নক তো পালালেন। কিন্তু পালিয়ে গিয়ে উঠতে তো হবে একটা জায়গায়। চল বালেশ্বরের কুঠিতে। চললেন।

আরে, আরে মাঝপথে ওটা কি? বনে-জঙ্গলে ঢাকা গ্রামটা কেমন দেখা যাক তো নেমে।

গ্রামের নাম সুতানুটি। একটা হাট আছে। আছে খড়ে-ছাওয়া দু-চারটে মাটির ঘর। মাস খানেক এইখানেই রয়ে গেলেন চার্নক। কিন্তু মন খুবই উদ্বিগ্ন। কি হবে, কি না হবে। নবাব শায়েস্তা খাঁর রাগ যে কিছুতেই পড়ছে না।

সুতানুটি ছেড়ে চার্নক আবার এগোতে লাগলেন। মন অস্থির। সুস্থির হয়ে কোথাও বসতেও পারছেন না। মেটেবুরুজ দিয়ে যাবার সময় পুড়িয়ে দিলেন নবাবের নুনের গোলাকে। শিবপুরের থানা দুর্গটাকে দখল করে নিলেন খুব সহজেই।

তারপরেই হিজলী। এখানে এসেও নিস্তার নেই। মোগলদের সঙ্গে একটা ছোট-খাট যুদ্ধ হয়ে গেল। তার ওপরে যা জংলী জায়গা। জলে বিষ। হাওয়ায় নরকের বীজাণু। জ্বর, ম্যালেরিয়ায় প্রতিদিন মানুষ মরাটা এখানে যেন একটা তুচ্ছ ঘটনা। সেকালের ছড়া এর সত্যাসত্য ব্যাপারে সাক্ষী দিচ্ছে—

“একবার খেলে হিজলী পানী
যমে মানুষে টানাটানি।”

প্রাচীন লোকগাথাতেও হিজলীর পরিচয় আছে অনেক।

“চৌদিকেতে লোনাপানি মধ্যেতে হিজলী
তাহাতে বাদশাহী করে বাবা মসন্দলী।”

মসন্দলী মানে ‘মসনদ-ই আলা’। এটা হল তাজ খাঁর উপাধি। অর্থ ‘যার আসন অনেক উঁচুতে’। তাজ খাঁ এক সময়ে ছিলেন হিজলীর অধিপতি। ছিলেন উদার এবং ধর্মপ্রাণ। তাই সেকালের ফকিরের মুখে মুখে মসন্দলীর গুণকীর্তন।

“exceeding pleasant and fruitful, having great store of wild hogs, deer, wild buffaloes and tigers.” উইলসন সাহেবের মন্তব্য হিজলী প্রসঙ্গে।

হিজলীতে বসবাস করতে গেলে অসুবিধে যেমন এতগুলো, সুবিধেও তেমনি বিস্তর। প্রচুর শস্য হয় এখানে। নুন তৈরি হয় আরও বেশী। সমুদ্র কাছে বলেই হয়তো। নুনের ব্যবসা মোগলদের একচেটে। লাভও তেমনি। তাছাড়া জায়গাটা চারদিকে ঘেরা। হুগলী কি ঢাকা থেকে এসে চট করে কেউ আক্রমণ করবে, সে ভাবনা নেই। ভাবনা নেই বলেই ইংরেজরা মোগলদের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ার তাল খুঁজছিল।

ইংরেজরা বালেশ্বরে নবাবের দুর্গ আর তোপখানাটা দখলে এনেছে সবে। নদী বেয়ে দু-খানা জাহাজে একদিন চারটে হাতী আসছিল। দুটো নবাব শায়েস্তা খাঁর। বাকী দুটো শাহজাদার। ইংরেজদের কি মতিভ্রম ঘটল, জাহাজ আক্রমণ করে হাতী চারটে দখল করে নিলে।

এই ঘটনায় শায়েস্তা খাঁর একরোখা মেজাজ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। ঘটনা তো একটা নয়। পর পর অনেকগুলো দস্যুপনা ঘটিয়েছে তারা। হুগলী লুঠ, বালেশ্বর দখল, থানা দুর্গ অধিকার, হিজলী দখল। এবার একটু উচিত মত শিক্ষা দিতে হবে।

আওরঙ্গজেব এতদিন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ বিগ্রহে ভয়ানক ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে তাই কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। হঠাৎ কোন গুরুতর খবর এলে তিনি শুধু বাংলাদেশের মানচিত্রটা চোখের সামনে নিয়ে ভুরু কোঁচকান। আবার নিজের যুদ্ধের ভাবনায় ডুবে যান।

কিন্তু এইভাবে চুপচাপ আর ক-দিন কাটানো যায়! একটা হিত-বিহিত এখুনি না করলে – ইংরেজদের কাণ্ডকারখানা ক্রমশ বিপরীত ঘটাবে। শায়েস্তা খাঁ প্রচুর অশ্বারোহী, অসংখ্য পদাতিক সেনা নিয়ে ইংরেজদের খেদিয়ে সাগর-পার করার আদেশ দিয়ে যুদ্ধযাত্রায় পাঠালেন মালেক কাশেম খাঁকে।

এদিকে মার্চ এপ্রিল মাস থেকে হিজলীতে লেগেছে মড়ক। শয়ে শয়ে লোক মরছে দু-বেলা। ঘরের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে পচা, পেট-ফোলা গরু। পচা মাছ ছাড়া খাবার পাওয়া যায় না। ইংরেজদের যে সব কুলি, মজুর, সিপাই সান্ত্রী ছিল, আপন প্রাণ বাঁচাতে হিজলী ছেড়ে তারা চোঁচা দৌড় দিলে।

তবুও যুদ্ধ বন্ধ রইল না। চার্নক আক্রমণ করলেন মোগল সেনাদলকে। প্রথম চটকাতেই তিনি দখল করলেন নবাবী ফৌজের ১৫০০ মণ চাল। দ্বিতীয় দফায় নবাবের তোপখানা ভাঙলেন। বড় বড় কামান নষ্ট হল। ছোটগুলো নিজেদের দখলে এল।

কিন্তু এর পরেই যুদ্ধের চাকা ঘুরে দাঁড়াল উল্টোমুখো। মোগলদের নিদারুণ

আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে ইংরেজদের জাহাজ সমুদ্রের দিকে পালাতে লাগল। অবিশ্রাম গোলা পতনের শব্দে মাটির নরম বুক ফেটে চৌচির।

ইংরেজদের তখন কাহিল অবস্থা। জ্বরে, ম্যালেরিয়ায় অসংখ্য মরেছে। বাকী প্রায় শ-তিনেক শুসছে। জ্বরে ভুগে ভুগে শুকিয়ে প্যাকাটি। ঢাল, তরোয়াল ধরতে না পারলে, শুধু শুধু নিধিরাম সর্দার সেজে আর ক-দিন যুদ্ধ চালানো যায়।

মোগলরা ইংরেজদের এই অসহায় অবস্থার সংবাদ পেয়ে নগরে লুঠপাট, আগুন লাগানো শুরু করে দিলে। মোগলদের উন্মত্ত অত্যাচার-উৎপীড়নে ইংরেজদের 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক।

চার্নক ঠিক করলেন– 'মরেছি না মরতে আছি।' এবার হিজলী থেকে পাত্-তাড়ি তুলে সেই সুতানুটিতেই যাওয়া যাক্। সেখানকার বনে জঙ্গলে একটা মাথা গুঁজবার মত আস্তানা গেড়ে তবু কিছুদিন কাটানো যাবে।

চার্নক আবার নৌকোয় চাপলেন সুতানুটির উদ্দেশে। পথে পড়ল উলুবেড়িয়া। তিনি সেখানে নেমে ডক তৈরি করে জাহাজ মেরামতের কাজে লেগে পড়লেন। কিন্তু জায়গাটা খুব আরামদায়ক বলে মনে হল না তাঁর। চারদিক ফাঁকা। বাণিজ্য জমানো কঠিন। জংলী পেঁচার লক্ষ্মীছাড়া ডাক শোনা যায় কেবল।

চার্নক শেষ পর্যন্ত সুতানুটিতেই এসে পৌছলেন। একটা ঘর-দোর বেঁধে কিছুদিন মাথা ঠাণ্ডা করে কাটানো যাক্ এখানে। তারপর ভাবা যাবে– কি করে ব্যবসাকে আবার পুরনো বা হারানো দিনের মত জমিয়ে তুলতে পারা যায়!

এদিকে তাঁর দূত ছুটল নবাব-দরবারে। ব্যবসার কিছু গতি করবার চেষ্টায়। কিন্তু কিছুই হল না। এমন সময় হীথ সাহেব এসে তড়িঘড়ি জুড়ে দিলেন। চলো, ওঠো। আর এখানে বসে স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখতে হবে না, ঢের হয়েছে। আরাকান রাজের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করে দেখা যাক্– কতটা কি হয়। আরাকান রাজার সঙ্গে সন্ধি হবার আগেই হীথ সাহেব সবাইকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলেন মাদ্রাজে।

মাদ্রাজ তখন খুব জমজমাট। ইংরেজদের বসবাস এখানে কম নয়। ব্যবসা চলেছে জোর। জব চার্নক মাদ্রাজের কুঠিতে বসে বসেই তখন স্বপ্ন দেখছেন– বাংলাদেশে কি করে ব্যবসা জমানো যায় আবার।

এমন সময় আওরঙ্গজেব নিজের ভুল কিছুটা বুঝতে পারলেন।

ইংরেজরা ছিল, বেশ ছিল। কেন তাদের তাড়ালাম? রাজকোষে বছর-বছর তিন হাজার টাকা জমা পড়ত, সেটা গেল। এখন ব্যবসা-বাণিজ্যও অচল। আজ মারাঠা, কাল রাজপুত, পরশু বিজাপুর, গোলকুণ্ডার নবাব, এদের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করতে গিয়ে বাদশাহী দৌলতখানা ফৌত হবার যোগাড়।

এ তো গেল অর্থনীতির দিক। রাজনৈতিক দিক থেকেও ইংরেজদের বেশ একটু প্রয়োজন পড়ল সম্রাটজাদার।

পর্তুগীজ জলদস্যুরা খুব উদ্ধত হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। মক্কা যাওয়ার পথে হজযাত্রীদের ওপর হানা দিয়ে নানাভাবে নির্যাতন করে। জলপথে তাদের শায়েস্তা করার মত নৌ-বল বা রণ-কৌশল মোগলদের আয়ত্তের বাইরে। আর ওরা হচ্ছে জলের জীব। হাঙর কুমীরের চেয়েও ভয়ংকর। এখন ইংরেজদের আবার ডাকাই উচিত। নইলে হার্মাদদের ফাঁদে ফেলা যাবে না।

ভিন্ন ইতিহাসে ভিন্ন বিবরণ। ভুলটা নাকি বুঝতে পেরেছিল ইংরেজরাই। আওরঙ্গজেব নয়। তাই অনুরোধ এবং উপঢৌকন দুই-ই ইংরেজদের কাছ থেকে নিয়মিত এসে পৌঁছচ্ছিল সম্রাটের কাছে! "পরিশেষে আত্মভ্রম বুঝিতে পারিয়া, প্রস্তর মস্তক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন হইতে পারে ইহা অনুধাবন করিয়া, সুরাটবাসী ইংরেজদল প্রবলপ্রতাপ বাদশাহ আরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হইলেন (১৬৯০)। প্রবীন বাদশাহ্ আরঙ্গজেব ইউরোপীয় বাণিজ্যে দেশের প্রভূত উপকার স্মরণ করিয়া, দেড় লক্ষ টাকার পূজোপকরণে বশীভূত হইয়া, সম্ভবত মক্কাযাত্রী মুসলমানদিগের প্রতি ইংরেজের ভবিষ্যৎ উপদ্রবের আশঙ্কা করিয়া আবার পূর্বমত বাণিজ্য চালাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। বাঙ্গলায় ইংরাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরোয়ানা আসিল।" (বাঙ্গলার ইতিহাস)।

বাংলার নতুন নবাব হয়েছেন ইব্রাহিম খাঁ। তাঁর স্বভাবটা একটু গো-বেচারা গোছের। 'সুতর-দিলি' মেজাজ। অর্থাৎ উটের মত নম্র। তিনি দেখলেন 'নরম সমসের বুদ' – তরবারির ধার নরম। 'সেল্ সেলে ফেৎনা দরাজ্' – বিবাদের শৃঙ্খল বড়ই লম্বা। 'ও দস্তে খোদ্ কোতা দিদা' – নিজের সাধ্যও সংকীর্ণ। সুতরাং 'বা হজরৎ শাহিনশাহী আরজদাস্ত নমুদ' – বাদশাহের কাছে আর্জি জানানো ভালো।

বাদশাহের মনোভাব নরম জেনে ইব্রাহিম খাঁ মাদ্রাজ থেকে বাংলায় ফিরে আসার জন্যে অনুরোধ জানালেন চার্নককে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধে

সবই দেওয়া হবে। কেউ কারো ওপর হামলা করবে না আর। আগের মত তিন হাজার টাকা বছরে-বছরে খাজনা দিলেই, সব ঠিক-ঠাক।

১৬৯০। ২৪ আগষ্ট। স্থতান্থটির ঘাটে এসে নামলেন চার্নক। সেই বুনো, জংলী, জলাকীর্ণ স্থতান্থটি।

আগের বারে এসে যেখানটায় ছিলেন ঘর বেঁধে, এসে দেখেন সেটা ভেঙে-চুরে একশেষ। লালমুখো সাহেবদের দেখতে আশপাশের গ্রামের লোক ভেঙে পড়ছে। কিন্তু তাদেরই বা কি জিজ্ঞেস করবেন। মাথা গোঁজার মত ঠাঁই চাই আপাতত। আবার সন্ধে হতে না হতেই এল বৃষ্টি। অঝোর। অবিশ্রান্ত। চার্নক বোটের ভেতরেই রাত কাটালেন।

পরের দিন কাউন্সিলের মিটিংয়ে প্রস্তাব পাশ হল যে, এই মুহূর্তে একটা গুদাম, একটা রান্নাঘর, থাকবার ঘর, প্রহরীর ঘর আর এলিস্ সাহেবের বাসস্থানের প্রয়োজন সবচেয়ে জরুরী। এজেন্ট মিঃ পিচির ঘরটা যা আছে, তাকেই একটু মেরামত করে নিলে চলে যাবে।

শেষ পর্যন্ত স্থতান্থটিতেই চার্নকের মন বসল। এবং অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলেন, জায়গাটা বেশ নিরাপদ, নিরালা। যদিও চারপাশের পরিবেশের মধ্যে কোথাও সৌন্দর্যের নামগন্ধটুকুও নেই। তা হোক। কে আর আমাদের জন্যে স্বর্গ-রাজ্য বিছিয়ে রেখেছে না রাখবে ?

ইংরেজরা প্রথম দিকে হাটখোলাতেই আস্তানা পেতে বসল। পাশের গাঁয়েই স্থতান্থটির হাট। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থবিধে।

বৌবাজারের রাস্তাটা শেয়ালদার গা ছোঁবে ছোঁবে করছে যে জায়গাটায়—সেখানে একটা বিরাটকায় বট গাছ। তারই তলায়, অনেকখানি ঘন কালো শীতল ছায়ার নীচে বসে চার্নক গড়গড়া টানতেন রোজ। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত হাট-বাজারের ব্যাপারীরা। চলত দর-দস্তর। কেনা-বেচা। আধুনিক মতে, পালটে গেছে সেই বট গাছের ঠিকানা। ওটা বৌ-বাজারে বা বৈঠকখানায় নয়। নিমতলার কাছাকাছি কোনও একটা জায়গায়। চার্নক তামাক খেতেন আর স্বপ্ন দেখতেন, এইখানেই ইংরেজদের একটা সবচেয়ে সেরা কুঠি, সেরা বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা যায় কোন্ মন্ত্রবলে। স্থরাটের চেয়ে বড়। মাদ্রাজ দেখলে লজ্জা পাবে। কোম্পানী বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাবে, এত বড় একটা বাণিজ্য-কেন্দ্র !

কিন্তু বেশী দিন এ স্বপ্ন তাঁকে দেখতে হয়নি। মাত্র তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে, অধ্যবসায়ে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের মোটামুটি একটা

পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করেই তিনি মারা গেলেন। তারিখ ১০ জানুয়ারি। সাল ১৬৯২।

চার্নক বিয়ে করেছিলেন পাটনায়। সে এক ঘটনা।

সতীদাহে প্রাণ বিসর্জন দিতে এসেছে এক মেয়ে। পরমা সুন্দরী। মানবী নয় যেন দেবী। হিন্দুর মেয়েরা স্বামীকে এত ভালবাসে? এমন অতুল জীবন, অপরূপ যৌবন পুড়িয়ে ছাই করে দেয় তারা স্বামীর চিতায়?

হিন্দু নারীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠলেন চার্নক। পাটনা কুঠির সিপাই সান্ত্রীদের ডাকিয়ে বন্ধ করলেন ঐ সতীদাহ। মেয়েটির সঙ্গের লোকজন আত্মীয়-পরিজনকে কড়া ধমকানি দিয়ে তাড়ালেন। হিন্দু রমণী যত্নের আশ্রয় পেল ইংরেজ কুঠির কামরায়। পরে এই রমণীকেই দীর্ঘ প্রেম-আরাধনা করার পর শেষে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিতা করে বিয়ে করলেন ক্রিশ্চানী মতে। নতুন নাম দিলেন মারিয়া। কত দিনের বিবাহিত জীবন তাঁদের? কেউ বলেন কুড়ি। কেউ চোদ্দ। মারিয়ার কবরও এই কলকাতাতেই। প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে চার্নক মুর্গি জবাই দিতেন কবরে।

চার্নকের তিন মেয়ে। কেউ বলেন চার। তিন মেয়েরই কলকাতার সবচেয়ে নামজাদা নামজাদা ইংরেজদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বড় মেয়ে মেরি। চার্লস আয়ারের স্ত্রী। মেজো এলিজাবেথ। স্বামী উইলিয়ম বাউচার। ছোট ক্যাথ্রিন। স্বামী জোনাথন ওয়াইট।

চার্নকের মৃত্যুর পর চার্লস আয়ারই ব্যবস্থা করেন তাঁর সমাধির। যে প্রাচীন গীর্জার ভিতরে সেই সমাধি আজও অক্ষত, সে সম্বন্ধে 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়ে' রয়েছে বিস্তৃত সংবাদ।

"সেন্ট জন চার্চ। প্রোটেস্টান্ট খৃষ্টানদের এই প্রধান গির্জাটি পুরাতন বারুদখানা ও পুরাতন গোরস্থানের জমির উপর নির্মিত হইয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন রেভারেণ্ড মিঃ জনসনের দ্বারা উৎসৃষ্ট হয় এবং লর্ড কর্নওয়ালিসের দ্বারা উদ্বোধিত হয়। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির প্রথম মিটিংয়ে প্রধান পৃষ্টপোষক হেষ্টিংস ও তাঁহার পরিষদবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সেই দিনই সাধারণের প্রদত্ত চাঁদা ৩৫,৯৫০ টাকা পাওয়া যায়। লটারির দ্বারা ২৫,৫৯২ টাকা সংগৃহীত হয় এবং অবশিষ্ট টাকা চাঁদা পাওয়া যায়। মোট ব্যয় হইয়াছিল এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। মহারাজা নবকৃষ্ণ ৩০,০০০ মূল্যের একখণ্ড সংলগ্ন জমি গির্জা-সমিতিকে দান করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল মিঃ হোয়েলার দ্বারা ইহার ভিত্তি স্থাপন হয়। সেদিন গভর্নর

সাহেব এই উপলক্ষে একটি সাধারণ ভোজ দিয়াছিলেন। এবং প্রধান কর্মচারীদের একটি মিছিল করিয়া ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। এই গির্জার নক্শা করিয়াছিলেন জেমস্ আস্। এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ইহা নির্মিত হয়। চুনার ও গৌড়ের ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রস্তর আনাইয়া ইহাতে লাগানো হইয়াছিল। এবং সেই কারণে দেশীয় লোকেরা ইহাকে পাথুরীয়া গির্জা বলিত।

"কোম্পানী ইহার জন্য কোন কোন আসবাব, মখমল, ও ঘণ্টার জন্য ১২,০০০ টাকার দান করিয়াছিলেন। তদানীন্তন খ্যাতনামা চিত্রকর জোফানি (Zoffany) এখানকার বেদীর জন্য alterpiece বিনামূল্যে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার নাম 'Last supper'। এই চিত্রে খৃষ্ট-প্রেরিত শিষ্য সকলের যে প্রতিকৃতি আছে, চিত্রকর তাহাদের মুখাকৃতি তৎকালে কতিপয় খ্যাতনামা স্থানীয় লোকের অনুরূপ করিয়াছিলেন। এই গির্জাটি ১৮১৪ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি চার্চ নামে খ্যাত ছিল। তৎপরে ইহা ক্যাথিড্রেল নাম প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাতে বার শত লোকের একত্র ভজনা করিবার স্থান ছিল। এই গির্জা সংলগ্ন গোরস্থানেই কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক, ডাক্তার হ্যামিণ্টন ও অন্যান্য বহু প্রসিদ্ধ লোকের সমাধি আছে।"

মরবার আগে চার্নক যে উইল রেখে গিয়েছিলেন—সেটা খুবই বিচিত্র। কন্যারা সম্পত্তি পাবেই, এ জানা কথা। কিন্তু কেউ ভাবতে পারেনি যে উইলে তাঁর সরকার মশাই বদলী দাস আর দুজন প্রিয় চাকর ঘনশ্যাম আর দুর্লভ—এদেরও নাম থাকবে। বদলী এককালীন একশো। চাকররা কুড়ি টাকা করে।

আরেকজনও পেয়েছিল। এক বাঙালী ডাক্তার। নাম চন্দ্রশেখর। তাকে আর উইল মারফৎ কিছু দেননি। মরবার আগে নিজের হাতেই যা দেবার দিয়ে যান।

চার্নক কি সত্যিই সম্মান পেয়েছেন যথার্থ নায়কের? আমরা তাঁকে নায়ক বলে মেনে নিয়েছি। কিন্তু তাঁর নিজের দেশের মানুষ? 'রেইনড মোর এ্যাব-সলিউট দ্যান এ রাজা, অনলি হি ওয়ানটেড মাচ অব দেয়ার হিউম্যানিটিজ'—এই কঠোর উক্তি ক্যাপ্টেন হ্যামিলটনের! 'Block of rough-hewn British manhood', এ হল হাণ্টারের গঞ্জনা। একালের ঐতিহাসিক ফিলিপ উডরফের তিক্ত সমালোচনা—"He was the rougher kind of company's servant; he was not a man of good birth and education like Streynsham Master or Gerald Aungier, nor can he be credited with any great foresight or imagination. But he catches the fancy, he sticks in the memory....perhaps more truely because of the silent staborn obstinancy that seems to have been his strength."

ঐতিহাসিক অর্মির ভাষা তবু অনেক নরম। 'A man of courage, without military experience, but impatient to take revenge' ইত্যাদির বাইরে খুব একটা কড়া নালিশ নেই। সমালোচকরা যাই বলুক, সরকারী কাগজে তিনি কিন্তু আজীবন থেকে গেছেন, 'good old servant'.

কখনো কখনো মনে হয় যেন চার্নককে তাঁর কৃতিত্বের বেদী থেকে মাটিতে আছড়ে ফেলার জন্যেই কিপলিঙের কবিতায় "chance-directed, chane-erected." ইত্যাদি পদাবলী। শুনতে যতই মধুর লাগুক কানে, তথ্য হিসেবে সত্য নয়। কারণ সুতানুটির সঙ্গে তাঁর হঠাৎ দেখা প্রেম নয়। পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের আগে আরো কয়েকবার শুভদৃষ্টি ঘটেছে দুজনের। পালিয়ে গেছেন। আবার ফিরে এসেছেন অদৃশ্য টানে।

"August 24th, 1690. This day at Sankrail, I ordered Captain Brooke to come up with his vessel to Chuttanuttee, where we arrived at noon, but found the place in a diplorable condition, nothing being left for our present accomodetion, the rain falling day and night...., নিজের কলমে একথা যখন লগ্‌বুকে লিখছেন, তখন তাঁর দেহ-মন সমর্পণ করা হয়ে গেছে সুতানুটির পায়ে। আর ফেরার পথ নেই। আনুপূর্বিক এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত ঘটনাই তাঁকে বাধ্য করেছে এই সিদ্ধান্তে। আগের বারে এসে যে কুঠি কিংবা কুঁড়ে ঘর বানিয়েছিলেন সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যিনি পুড়িয়েছিলেন তাঁর নামও অজানা নেই আজ। বৃকোদর মল্লিক। তখনও, ইংরেজদের আর কিছু না থাক, সুতানুটির মাটিতে কবরখানা ছিল একাধিক। এখনকার সেন্ট এ্যান গীর্জার কাছাকাছি অঞ্চলে ছিল সেই গোরস্থান। জাহাজ চলেছে হুগলী বা বালেশ্বর। পথে মারা পড়ল কেউ। তখন ঐখানেই মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হত কাঁধে করে। মৃতদেহ দেখে ইংরেজ মহিলারা পাছে মূর্ছা যান আতংকে-উদ্বেগে, সেইজন্যেই বেছে নেওয়া হত দুটো জিনিষ। এক রাত্রির অন্ধকার, দুই নির্জন জনমানবহীন পরিবেশ।

Thus from the midday halt of Charnock
Grew a City.
As the fungus sprouts chaotic from its bed.
So it spread.

বিদ্রূপের এমন কড়া চাবুক খাওয়ার পরেও চার্নকের প্রতি আমাদের মন একটু নরম হয় নাকি, যখন লং-এর বর্ণনায় চোখে পড়ে—"St.

Petersburg was founded by Petter the Great at the same time that Calcutta was by Job Charnock, both were erected in swamps, amid an unhealthy climate, both became the Capitals of mighty empires."

কলকাতা তাহলে একা নয়। মহানগরীরাই ভূমিষ্ঠ হয় অস্বাস্থ্যকর আঁতুড় ঘরে। এবং দৈবাৎ।

পুনরায় ফিরে আসি চার্নক প্রসঙ্গে। চার্নক গোঁয়ার গোবিন্দ। প্রমাণ? যখন হুগলীর কুঠিতে, এর-ওর-তার সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই আছে। কিছুতেই লিখবেন না হিসেবের খাতা। কারন পদাধিকারে তিনি দ্বিতীয়। সুতরাং এটা তাঁর কাজ নয়।

চার্নক অপরিণত রাজকর্মচারী। প্রমাণ? পরিণাম না ভেবে হুগলীকে লণ্ডভণ্ড করার দুঃসাহস। তাঁর জাহাজে ছিল আতস কাঁচ। সেই কাঁচে সূর্যের আলো প্রতিবিম্বিত করে চন্দননগরের শহর-বাজার পুড়িয়ে ছাই করেছিলেন তিনি।

চার্নক অমানুষিক। কারণ? সামান্য অপরাধে কর্মচারীদের উপর ক্ষেপে আগুন হয়ে ওঠা ছিল স্বভাব। স্থানীয় অপরাধীরা যখন শাস্তির বেদনায় আর্ত চীৎকারে আকাশ ফাটাচ্ছে, চার্নক নাকি তখন ডাইনিং রুমে, খাবার টেবিলে। নেটিভদের কান্নায় তিনি নাকি শুনতে পেতেন মিষ্টি কোনো গানের সুর।

কিন্তু তাঁর ছবিতে তিনি অন্য মানুষ। যেন উপকথার নায়ক। কবির মত চোখ। রমণীর মত মুখের আদল। মাথায় পরচুলা। গায়ে লেসওয়ালা কোট। ঠোঁটের কোণে ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার দৃঢ়তা। চোখের কোণে স্বপ্ন। দৃষ্টি ছড়ানো দূরে।

দূরদর্শিতা ছিল বৈকি কিছু। নইলে হাঁটু গেড়ে বসার জায়গা মেলার সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দেবেন কেন, যে যেখানে আছ, চলে এসো সুতানুটিতে! সুযোগ সুবিধে যতটা চাও পাবে।

ইতিহাস বলে, চার্নকের অনেক আগে থেকেই আর্মেনীয়ানরা বাস করত কলকাতায়। পর্তুগীজদেরও আনাগোনা ছিল অনেক দিন থেকে। চার্নকের ডাকে সাড়া দিয়েছিল নাকি সকলেই। চার্নকও নিজের ব্যবসা বাড়ানোর স্বার্থেই সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে চলতেন। যেহেতু তাদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের পরিচয়টা পুরনো, তাই তাদের মাধ্যমেই চালাতেন বেচাকেনার পালা। অনেক দিনের সম্পর্ক বলেই তখন পর্তুগীজদের ভাষাটাই ছিল

বেশীলোকের জানা। সেই ভাষাতেই তাই কথাবার্তা, বেচাকেনার কাজ। পর্তুগীজ ভাষার শিরোদেশে 'Lingua Franca' উপাধির মুকুট পরানো হয়েছিল সেকালে, ঐ জনপ্রিয়তার কারণেই।

চার্নক নেই। এলিস্ সাহেব হলেন সুতানুটির কুঠি-সর্দার। তিনি 'কাজে কুঁড়ে আর ভোজনে দেঁড়ে' গোছের মানুষ। গোটা মগজ খুঁজলেও তিল পরিমাণ বুদ্ধি বেরুবে কিনা সন্দেহ।

এমনি সময় মাদ্রাজ থেকে সুতানুটির হালচাল পরীক্ষা করতে এলেন স্যার জন গোল্ডস্‌বরা। এসে দেখেন এ যে ফাঁকা মাঠ! ঘর কই? বাড়ি কই? কোম্পানীর হিসেবের নথিপত্র, খাতা কাগজ রাখবার কাছারী কই? মালপত্র এরকম স্যাতসেঁতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে কেন?

গোল্ডস্‌বরা এলিসের কাজের দৌড় টের পেলেন। ১৬৯৬ সালে তিনি চার্নকের বড় জামাই চার্লস আয়ারকে মাদ্রাজ থেকে ডেকে এনে কলকাতার সর্বময় কর্তা করে দিলেন।

সেই সঙ্গে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে তাঁদের কাছারীটা ভাড়া নিলেন মালপত্তর রাখার, দপ্তর বসাবার সুবিধের জন্যে। তারপরে ভাবলেন কেল্লার কথা। প্ল্যান্‌ট্যান তৈরি। কাজ আরম্ভ করে দিলেই হয়।

সুতানুটির দক্ষিণ দিকে কলকাতায় একটা উঁচু ঢিপি, ঠিক গঙ্গার গায়েই। গোল্ডস্‌বরা সেইখানেই কাজ আরম্ভ করলেন। একটা বুরুজ শেষ হয়েছে। মাটির দেয়াল গাঁথা হচ্ছে। এমন সময় গোল্ডস্‌বরার ডাক এল মৃত্যুর দেশ থেকে। কলকাতা যেন অভিভাবকহীন, নির্জীব হয়ে রইল কিছুদিন। চার্লস আয়ার নিলেন সেই অসমাপ্ত কাজের ভার নিজের হাতে। দুর্গের কাজ এগোচ্ছে। কিন্তু মনটা ক্রমশঃ ভয়ে পিছোচ্ছে। যদি নবাবের কানে গিয়ে পৌঁছয়—তাহলেই সর্বনাশ! নবাবের অনুমতি ছাড়া যেখানে একটা ইট গাঁথা বারণ, সেখানে ঘর নয়, বাড়ি নয়, একেবারে একটা কেল্লা!

চার্লস আয়ার ভয়ে ভয়ে নিজের বুকের ঢিপঢিপোনি নিজেই শুনতে-শুনতে চোখ-কান বুজিয়ে কেল্লার কাজটা সেরে নিচ্ছিলেন। এমন সময় এল এক মহাসুযোগ। যে খায় চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামণি। ইংরেজরা বড় হবে—ইতিহাস তার দিকে। তাই রাজ্যে ঘটনা-দুর্ঘটনা যাই ঘটুক ইংরেজদের কাছে সেইটেই হয়ে দাঁড়ায় স্বর্ণ সুযোগ।

শোভাসিংহ চেতুয়ার জমিদার। প্রবলপ্রতাপান্বিত ব্যক্তি। থেকে থেকে আজ এর কাল ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেন।

ওদিকে উড়িষ্যার আফগান দলপতি ছিলেন নাককাটা রহিম খাঁ। শোভা সিংহ তাঁকে দলে টেনে নিয়ে মেতে উঠলেন বর্ধমান-রাজকে আক্রমণ করতে। বর্ধমান-রাজ রাজা কৃষ্ণরাম রায় তখন সারা পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে ধনশালী। ঐশ্বর্যের স্বর্গে তিনি সিংহাসন পেতে বসেছেন। কিন্তু তলোয়ারের জোরে শোভাসিংহের কাছে পারলেন না। মারা পড়লেন শত্রুর দুর্ধর্ষ আক্রমণে। যুবরাজ জগৎ রায় ঢাকায় পালিয়ে বাঁচল।

শোভাসিংহ বর্ধমান জয় করে নিজেই নিজের ঢাক-ঢোল পেটাতে লাগলেন। আমি রাজা। আমি রাজা।

আর ওদিকে রাজ-সেনারা এদিক-ওদিক যখন যেদিকে পারল দু-হাতে লুঠ-পাট জুড়ে দিলে। এগোতে এগোতে হুগলীর দরজায় এসে পৌঁছল সেই লুঠপাট বাহিনী। ইংরেজদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে আমসী হবার যোগাড়।

ইব্রাহিম খাঁ বৃদ্ধ। সত্তর বছর বয়স। মাথার চুল বেল ফুলের চেয়ে সাদা। দিনরাত ফার্সী পুঁথি পড়েন। সাদীর গুলিস্থান আওড়ান। ইংরেজদের কাছেও তিনি সবচেয়ে 'ভালোমানুষ নবাব'। মোগল ঐতিহাসিকদের মতে, তাঁর আমলে একটু ক্ষুদে পিঁপড়েও নির্যাতিত হয়নি।

ইংরেজ, ডাচ, ফরাসী – এই তিন বিদেশী বণিক একটা সম্মিলিত যুক্ত ফ্রন্ট তৈরি করে করজোড়ে নবাবের দরবারে গিয়ে দাঁড়াল।

হুজুর, ধর্মাবতার, খোদাবন্দ, বিদ্রোহীদের উৎপাতে আমাদের ব্যবসা যায়-যায়। আমাদের এমন কোন শক্তি নেই যা দিয়ে কেউ আক্রমণ করলে আত্মরক্ষা করি। বঙ্গেশ্বর, অনুমতি করুন, আমরা যাতে নিজের নিজের এলাকা-এক্তিয়ারের মধ্যে কেল্লা বানাতে পারি।

নবাবের মন তখন সাদীর গুলিস্থানের রসে মাতাল। কোনরকমে একবার মুখটা তুলে শুধু বললেন – 'যে যে ভাবে পারো, নিজেদের রক্ষা করো।' কেল্লার সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বললেন না।

সকলেই শুনলে – নবাব মত দিলেন কেল্লা বানাতে। ঢাকা থেকে দূত ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কেল্লার কাজে পুরোদমে হাত পড়ল।

কেল্লা শুধু কলকাতাতেই শুরু হল না। চন্দননগরে বানাতে লাগল ফরাসীরা। চুঁচড়ায় ডাচ।

কেল্লা তো হল। কিন্তু কি নাম দেওয়া যায়? তখন ইংলণ্ডের রাজা হচ্ছেন উইলিয়ম দি থার্ড। সুতরাং তাঁরই নামানুসারে কেল্লার নাম হল – ফোর্ট উইলিয়ম। অবশ্য ফোর্ট বলতে আমরা যা বুঝি – তা নয়। বা ক্লাইভের আমলে

গোবিন্দপুরে যা তৈরি হয়েছিল তার সঙ্গেও এর কোন মিল নেই। মাটির দেওয়াল চারপাশে। ভেতরে কতকগুলো গুদামঘর, কাঁচা-পাকা, ইট আর মাটি মিলিয়ে তৈরি। তারই উত্তরে, দক্ষিণে, পুবে পশ্চিমে চারটে বুরুজ। সেই বুরুজের ওপরে সিংহের মত কালো কুচকুচে চারটে থাবা উঁচোনো কামান।

ইতিমধ্যে শোভাসিংহ মরলেন বর্ধমান রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীর হাতে। শোভা-সিংহ যে রাত্রে তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্যে আলিঙ্গনের ব্যগ্র বাহু বাড়ালেন, সেই রাত্রেই এবং তখুনি রাজকুমারী নিজের আঁচলের আড়াল থেকে লুকানো ছুরি বার করে চুকিয়ে ফেললেন শত্রু-নিধন পর্বটা। ওদিকে চন্দ্রকোনায় রহিম খাঁর মাথা কাটা গেল আজিম ওসমানের এক আরবী সেনাপতির হাতে।

আওরঙ্গজেব ইব্রাহিম খাঁর অতিরিক্ত পুঁথি-প্রিয়তা দেখে এবং তাঁর রাজ-নৈতিক ভুল-ভ্রান্তির পরিমাণ লক্ষ্য করে তাঁকে নবাবগিরি থেকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় বসিয়েছেন নাতি আজিম ওসমানকে।

এই যুদ্ধ হাঙ্গামাগুলো একটু থিতোবার পর ইংরেজরা বললে – কেল্লা তো হয়েছে। এইবার কলকাতার এই জমি জায়গাগুলোকে নিজেদের হাতে আনার একটা চেষ্টা করা যাক্। দূত গেল নবাব দরবারে। খোজা সরহাদ। একজন আরমানি সওদাগর। অনেক দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক। তিনি বাদশাহী বা নবাবী শাসনব্যবস্থার অনেক ঘাঁতঘোঁত জানতেন। তাই ঢাকায় পদার্পণ করার আগেই খোজা সাহেব উপহার সামগ্রী কিনে নিলেন ১৬ হাজার টাকার। বলাই বাহুল্য, তাঁর এই মহৌষধ কাজে লাগল। আজিম ওসমান রাজী হলেন। ইংরেজরা অনুমতি পেল, ঐ ১৬ হাজার টাকার বিনিময়ে, তিনটে গ্রাম কেনার। সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা।

সাবর্ণ চৌধুরীদের আর সেই পুরনো খানদানী অবস্থা নেই। শরিকে-শরিকে ভাগাভাগি হয়ে বিষয় সম্পত্তি তছনছ। টাকার দরকার সকলেরই। তাই রাজী হতে খুব একটা সময় লাগল না তাদের। দর কষাকষির পর চৌধুরীরা তাদের জমিদারী তেরশ টাকায়, ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিলেন। তারিখটা ছিল ১০ নভেম্বর। ১৬৯৮। বিলেতের ডিরেকটররা খবর পেয়ে আগুন। জমিদারী কিনতে গিয়ে ফতুর হব নাকি আমরা ? কলকাতার ইংরেজরা জবাব পাঠালেন, কোম্পানীর টাকাকে কলকাতা কেনার মত আর কোন লাভজনক কাজে আমরা এ পর্যন্ত লাগাতে পারিনি।

কলকাতা আর গ্রাম নয়। আবার তখনও শহর হয়নি। কোম্পানীর নির্দেশমত

এটা হল একটা প্রেসিডেন্সী। এবার থেকে একজন করে প্রেসিডেন্ট থাকবেন এর সর্বময় কর্তা হিসেবে। আর তাঁর সঙ্গে থাকবে কাউন্সিল। আর এই কাউন্সিলই তামাম বাংলাদেশে যাবতীয় কুঠির নিয়ন্ত্রণকর্তা।

আয়ার সাহেব অসুস্থ হয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন। বহু অনুনয়-বিনয় করে তাঁকে সেখান থেকে বাংলায় নিয়ে আসা হল। আবার তাঁকেই দেওয়া হল কলকাতার প্রথম প্রেসিডেন্টের বা গভর্নরের গৌরবাধিকার।

কলকাতার প্রথম গভর্নর গৌরব যেমন আয়ারের, তেমনি বাংলায় ইংরেজ কুঠির প্রথম গভর্নর হবার গৌরব উইলিয়াম হেজেসের। ইংরেজ রাজত্বের একেবারে শৈশবের দিনগুলিকে জানতে গেলে হেজেসের ডায়েরী না পড়ে উপায় নেই। তুলি দিয়ে ছবির পর ছবি সাজিয়ে গেছেন তিনি। হেজেসের সঙ্গে চার্নকের জীবন, তখনকার বাংলা কুঠির জীবনযাত্রা, ইন্টারলোপার্সদের চুরি-জোচ্চুরি সব ফুটে আছে অক্ষরে অক্ষরে।

১৬৮২। ২৮ জানুয়ারি। ঠিক হয়েছে বাংলার কুঠি আর মাদ্রাজের অধীন থাকবে না। নিজস্ব গভর্নর থাকবে তার। কে গভর্নর? উইলিয়াম হেজেস। 'ডিফেন্স' জাহাজে চেপে হেজেস সাহেব ঐ তারিখে বাংলায় এসে পৌঁছলেন।

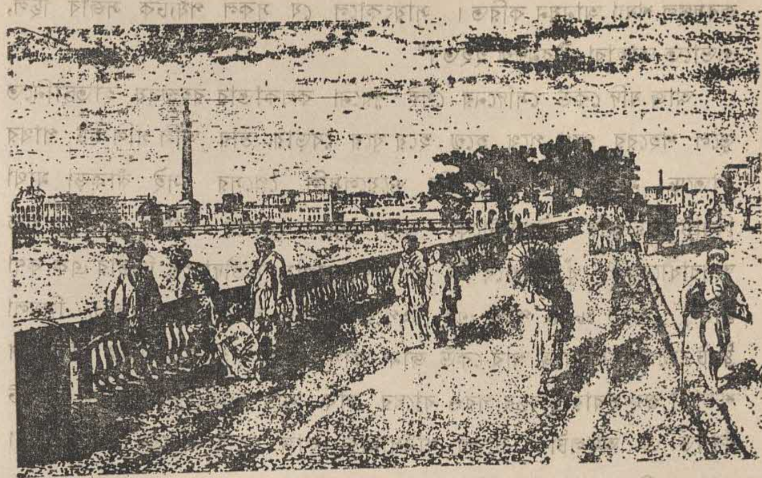
বাংলায় তখন একদল উচ্ছৃঙ্খল ইংরেজদের উৎপাত চলেছে। রাজসনদ নেই। নিশান নেই। ছাড়পত্র নেই। এসব ছাড়াই কোম্পানীর কর্মচারীদের উৎকোচে কব্জা করে, অবাধে ব্যবসা চালিয়ে লাভ করে যাচ্ছে। এদের বলা হত 'ইন্টারলোপার্স।' "An interloper was an independent violator of the company's monopoly", এই হল সংজ্ঞা। বিলেতের কর্তারা এদের উপদ্রবে দারুণ শঙ্কিত। মাদ্রাজ থেকে হেজেস সাহেবকে পাঠানো হল এই আদেশ দিয়ে, যে তুমি কুঠির ভেতরের শাসন-শৃঙ্খলার সুবন্দোবস্ত করে এই সব 'ইন্টারলোপার'দের একদম সমূলে উজাড় করে ছাড়বে। হেজেস তা পারেননি। তার কারণ কোম্পানীর কর্মচারীদের সর্ষের ভিতরেই ভূত।

গভর্নর হেজেসের অধীনে তখন মন্ত্রীসভা। সাতজন সদস্য। জব চার্নক, জন বেয়ার্ড, জন রিচার্ড, ফ্রান্সিস এলিস্, জোসেফ উড ও উইলিয়াম জনসন। যে কোন কারণেই হোক কনিষ্ঠ জনসনের ওপরে হেজেসের দারুণ অনুরাগ। আর জ্যেষ্ঠ চার্নকের ওপরে হাড়ে হাড়ে চটা। জনসন হেজেসের গুপ্তচর। কে কোথায় কোন ষড়যন্ত্রের কি কোন অপরাধের চেষ্টা করছে, খোঁজো। তখন কেঁচো খুঁজতে সাপ বেরোয়।

কোথায় ধরা পড়বে চার্নক। কিন্তু ধরা পড়ল জন বেয়ার্ড। হেজেসের বিরুদ্ধে একশ কুৎসা গেয়ে বিলেতে চিঠি পাঠাচ্ছিল। ধরা পড়ল এলিস্। চার হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে কোম্পানীর মাল সরিয়েছে। চার্নকের নামেও অভিযোগ নানা। অনন্তরাম নামে এক বদমাইশকে কর্মচারী করে তিনি কোম্পানীর ক্ষতি করেছেন। বিরক্ত, বিব্রত চার্নক একদিন খোলাখুলি ঘোষণা করলেন—হেজেসের দিন ফুরিয়েছে।

মুখের কথা না গলার ফাঁস। সত্যি সত্যিই ১৬৮৪ সালের ১৭ জুলাই মাদ্রাজ থেকে হো সাহেব তাঁর পদচ্যুতির খবর নিয়ে এলেন। 'পুনর্মূষিকভবঃ' হয়ে বাংলার কুঠির শাসনভার আবার চলে গেল মাদ্রাজের হাতে।

এসব অনেক আগের কথা। আমরা ফিরে আসি কলকাতায়, যে এতক্ষণে শৈশব কাটিয়ে পা দিয়েছে বালক-বয়সে।



॥ কলকাতার বাল্যলীলা ॥

বনের গায়ে বন। জঙ্গলের ঘাড়ে জঙ্গল। পচা পাতার গন্ধ। বুনো পাখির কলকলানি। দিনে শুয়োরের হানা। ঝোপে-ঝাড়ে সাপ-খোপের শিষ। রাতে বাঘের গর্জন। ডাকাতের উল্লাস। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বাঁচা।

এদিকে ওদিকে ধান ক্ষেত। ক্ষেতে খড়ির বন আর হোগলার ঝাড়। বন পেরুলে এঁদো ডোবা। ডোবা ছাড়িয়ে মস্ত মস্ত খানা খন্দ। তাতে যত জল, তত বিষ।

একটু বনের পথ ধরে হাঁটলে পায়ে ঠেকে মরা মানুষের হাড়। একটু বেশী রাতে বাড়ি ফিরলে প্রাণ যায় ডাকাতের হাতে। রাত আরও গভীর হলে নরবলির উন্মত্ত চীৎকার ওঠে দূরের কোন মন্দিরে।

ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর আর জঙ্গলে ডাকাত। এই নিয়ে আদ্যিকালের কলকাতা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ইংরেজ লেখক এ্যাটকিনসনের কবিতা। "হে কলিকাতে! তোমার অবস্থা তখন কি ছিল? তোমাকে তখন উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অতি কষ্টে সৃষ্টে জীবনধারণ করিতে হইত। তখন তোমার অঙ্গ নিবিড় জঙ্গলে ও অনিষ্টকর জলায় সমাচ্ছন্ন ছিল। তাহাতে অনেক সাহসী ও উচ্চাভিলাষী লোককেও প্রাণ দিতে হইয়াছে। চতুর্দিকে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষসমূহ আলোকরুদ্ধ করিয়া ইউপাস তরুর ন্যায় বিষাক্ত বাষ্প উদ্গীর্ণ করিত। দিনমান প্রগাঢ় উত্তাপে জ্বলিতে থাকিত এবং তমসাচ্ছন্ন রজনী অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও

জরসঙ্কুল শয্যা আনয়ন করিত। সায়ংকালে যে সকল পর্য্যটক সজীব ছিল, প্রভাতে তাহারা জীবনশূন্য হইত।”

আজ যদি কেউ সেদিনের সেই পুরনো কলকাতার রহস্যময় হাতছানিতে ভুলে শহরের পথে পথে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার অলি গলি ইট পাথর হাতড়ে মরে, খুঁজে পাবে কি ওয়েলেসলি প্লেসের সেই ঝাঁকড়া মাথা বিরাট বহু-ঝুরি বটগাছটাকে, যার ডালে ঝুলিয়ে শাস্তি দেওয়া হত অপরাধীদের? খুঁজে পাবে কি চিৎপুরের ধুলোয় সতীদাহের চিতার এক কণা ছাই? অথচ ১৮২৮ পর্যন্ত এই চিৎপুরে জ্বলেছে সতীদাহের চিতা। সিমলা ষ্ট্রীটে যেতে হলে আজ আর কেউ জামা কাপড় খুলে যাই না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী স্থরু হবার ছ'বছর পরও বাঘের ডাক আর ডাকাতের লাঠির দাপটে কাঁপত ঐ অঞ্চলটা। চাকর খানসামারা কাজ সেরে মনিবের কাছে জামা কাপড় গচ্ছিত রেখে বেরোত পথে।

আজকের এই বিংশ শতাব্দীর কলকাতার সে সব দিনের স্মৃতি হারিয়ে গেছে চিরকালের জন্যে। রূপকথা বা রহস্য কাহিনীর মত তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কেবল ইতিহাসের পাতায়, অধ্যায়ে-অধ্যায়ে। অধ্যয়নের আড়ালে এখন তার আত্মগোপন।

মোটামুটি ১৭০০ সাল থেকে একটু-একটু করে বাড়তে লাগল শিশু কলকাতা। শুরু হল তার বাল্যলীলা।

১৭০০ সালেই আরেক নতুন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে এসে হাজির। হাতে ইংলণ্ডেশ্বর উইলিয়ম দি থার্ডের দেওয়া সনদ। কোম্পানীর নাম 'English Company Trading to the East Indies'. গ্রেট ব্রিটেনের রাজনীতিতে তখন 'হুইগ'দের প্রাধান্য। পার্লামেন্টে সমালোচনা হল, 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' টোরী দলেরই একটা প্রতিষ্ঠান, এই অপবাদ এনে। ১৬৯৪-এ প্রস্তাব পাশ করা হল, প্রত্যেককেই বাণিজ্য করার স্বাধীন অধিকার দেওয়া হবে। তারই পরিণাম এই নতুন কোম্পানী।

"This culminated in the floating of a new Company called the English Company of Marchants. ....It sent an ambassador to Aurangzeb, and its agents caused much trouble to the East India Company. or the Old Company. John. Pitt, who was the New Company's agent at Masulipatam, quarrelled with his relative Thomas Pitt, the Old Company's Governor at Madrass." – *Powell Price.*

নতুন কোম্পানী যে রাজদূত পাঠিয়েছিল, তাঁর নাম স্যার উইলিয়ম নরিস। ১৬৯৯-এর শেষ দিকে তিনি পৌঁচেছিলেন ভারতবর্ষে। মসলিপট্টনে এক বছর কাটিয়ে ১৭০০-র ডিসেম্বরে রওনা দিলেন সুরাটে। আওরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের আগুন নিয়ে মেতে। নরিস নানা চেষ্টা করেও সম্রাটের কাছে পৌঁছবার কোন পথ খুঁজে পান না। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় উজীর অমাত্যদের উৎকোচে কব্জা করে অনুমতি যোগাড় করলেন সম্রাটের সামনে গিয়ে সেলাম ঠোকার। সেজে গুজে ফিটফাট বাবুটি হয়ে নরিস সম্রাটের সামনে হাজির একদিন। সঙ্গে ৩০ জন ইংরেজ। ৩০০ জন দেশীয় দেহরক্ষী। আর ছিল উপহার সামগ্রী। নানার জাতের বনাত, বিলেতী লেবু আর কাচের বাসনকোসন।

আওরঙ্গজেব বেশ খাতির জানালেন নরিস সাহেবকে। নরিস তখন বিগলিত। সম্রাটকে জানালেন মনের সংগোপন অভিপ্রায়। হুজুর, আমাদের এই নতুন কোম্পানীও আপনার মহানুভবতার কাছে একটি আর্জি পেশ করতে চায়। আমরাও ব্যবসা করতে চাই। আমাদেরও সনন্দ দিন। ছাড়পত্র দিন। আওরঙ্গজেব হুকুম দিলেন, এদের সনন্দ দিয়ে দাও। কাগজপত্র তৈরী শুরু হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ বাদ সাধল সেই সব উজীর-ওমরাহরাই, যারা পকেটে পুরেছিল নরিস সাহেবের ঘুষের টাকা। সম্ভবতঃ উৎকোচ দিয়ে তাদের বশ করেছে তখন পুরনো কোম্পানীর কর্মচারীরা। পুরনো কোম্পানীর প্রতিনিধিরা, নতুন কোম্পানী যাতে বাদশাহী-অনুগ্রহ না পায়, তার জন্যে যা করবার করে চলেছিল। নরিস সাহেবও শিখে গিয়েছিলেন, কাজ-বাগানোর মূলমন্ত্রটা। তিনিও চালালেন ঘুষের বদলে ঘুষ। শেষ পর্যন্ত ঘুষ জোগাতে জোগাতে ট্যাকের অবস্থা গড়ের মাঠ। ভাঙা মন নিয়ে ফিরে এলেন সুরাটে। সেখানেও দুর্ভোগ। দিন কয়েকের জন্যে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হল। তারপর পা বাড়ালেন স্বদেশের দিকে। কিন্তু স্বদেশের ধুলোয় পুনরায় পা ফেলার সুযোগ বা সৌভাগ্য জুটল না কপালে। তার আগেই মারা গেলেন সেন্ট হেলেনায়। অসুখটা ছিল আমাশয়।

নরিস নেই। নতুন কোম্পানীর হর্তা-কর্তা হলেন স্যার এডওয়ার্ড লিটনটন। ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৬৭২-য়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরে। চাকরী গেল 'দশ বছর বাদে, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে। নতুন কোম্পানীর চাকরী নিয়ে সেই লিটনটনই আবার ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। আস্তানা প্রথমে বালেশ্বর। তারপর হুগলীতে। কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নামলেন তিনি পুরনো কোম্পানীর সঙ্গে। কে কার কতটা ব্যবসা কাড়তে পারে। পয়লা নম্বর ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তো দেখে-শুনে চোখ উঠল কপালে। এদিকে সম্রাট আওরঙ্গজেবও পড়লেন মহা ধাঁধায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বলতে দু-দুটো। এখন মাশুল আদায় করব কার কাছ থেকে? এ দেখাবে ওকে। ও দেখাবে একে। একটা কথাবার্তা কইবার দরকার হলেই বা ডাকবো কোন্ দলের কাকে? সম্রাটের এমন ধারণা করাটাও অমূলক নয়। সুরাটের কাছে হজযাত্রীদের ওপর ইংরেজরা হামলা চালাচ্ছে। কাউকে ধরতে গেলে এ বলে, আমরা নয়। ও বলে, আমরা নয়।

আওরঙ্গজেব শেষ পর্যন্ত যখন কোন মীমাংসাতেই আসতে পারলেন না—তখন ঢালাও হুকুম দিলেন যেখানে যত ইংরেজ দেখবে, সবাইকে এনে পোরো কারাগারে। তাদের মালপত্র যেখানে যা কিছু আছে আটক করো সব। আজ থেকে ভারতবর্ষে সমস্ত ইওরোপীয় বণিকেরই ব্যবসা বন্ধ।

তাঁর হুকুমনামায় অনুচ্ছেদ ছিল আরো একটি। "তাহাদের দ্রব্যসমূহ বাজেয়াপ্ত হইবে। প্রত্যেক শাসনকর্তা, আটকী দ্রব্যের একটা ফর্দ আমার কাছে পাঠাইবেন। এতদ্ব্যতীত আরও হুকুম করা হইতেছে, ইউরোপীয় বণিক-কর্মচারীদের দেখিলেই যেন অবরুদ্ধ করিয়া নজরবন্দী রাখা হয়।"

যেমন হুকুম, তেমনি কাজ। মাদ্রাজ, পাটনা, রাজমহল, কাশিমবাজার, যেখানে যত ইংরেজদের কুঠী, সব আটক করা শুরু হয়ে গেল। বিপদে পড়ল নতুন কোম্পানীই সবচেয়ে বেশী। পুরনো কোম্পানী অনেক দিনের। অনেক রকম ঘাঁত-ঘোঁত জানে। ঘুষ জুগিয়ে হাসিল করতে পারে অনেক কাজ। সামলাতে পারে বিপদ-আপদের ঝড়-ঝাপটা। লিটনটন নতুন। ধূর্তামীতে তাই কিছুটা আনাড়ী। তাঁর কোম্পানীর ক্ষতি হয়ে গেল প্রায় ৬০ হাজার টাকা।

একূল ওকূল, অর্থাৎ মালপত্র আর বাণিজ্যের অধিকার দুই-ই হারিয়ে দুই কোম্পানীই চোখে সর্ষে ফুলের বাগান দেখতে লাগল। শেষে দুটো কোম্পানীই এক হওয়ার একটা প্রস্তাব নিলে। কিন্তু তাতেও সম্রাটের মন ভেজে না। ভাবলেন—এরা টাকা অর্থাৎ মাশুল ফাঁকি দেবার জন্যে একটা চাল চালছে বুঝি। চাপে পড়ে দুটো কোম্পানী এক হল বটে। তবে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে, রোটেশন পদ্ধতিতে। মোগল শাসনকর্তারা দেখল, এতো বেশ মজার ব্যাপার। দুটো কোম্পানীই টিকে রইল। দুজনের কাছ থেকেই লোটা যাবে ঘুষের টাকা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধারণাও একই। এক সঙ্গে কাজ করলেও কোম্পানী তো দুটো। এখন থেকে প্রত্যেক কোম্পানীকে আলাদা আলাদা করে, তিন যুক্ত তিন, মোট ছ' হাজার টাকা করে খাজনা দিতে

হবে। দুই কোম্পানীই ভেঙে পড়ল অনুনয়-বিনয়ে। কিন্তু পাথর গলল না। পুরনো কোম্পানীর মাদ্রাজের গভর্নর তখন পিট সাহেব। বিলেতের কর্তাদের কাছে এই সময় তিনি যে চিঠি লিখলেন, তার মধ্যে ফুটে উঠল মনের জ্বালা যন্ত্রণার টগবগানি।

"You will see that they (Mogal) have a great mind to qurrel with us again and it is certain, that Moors will never let your trade run on quietly as formarly till they are well-beaten."

১৭০০ সালের ২৭ মার্চ পর্যন্ত কলকাতা থেকে বিলেতের ডিরেকটরদের কাছে যে সমস্ত চিঠিপত্র গেছে, তাতে কলকাতার নামোল্লেখ নেই। তার বদলে সুতানুটি। এর পর থেকে কখনো কলকাতা। কখনো ফোর্ট উইলিয়ম।

চার্লস আয়ার চলে গেছেন বিলেতে। নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন জন বিয়ার্ড। বাংলাদেশের জলহাওয়ায় মানুষ। এদেশের রাজনীতির ঘাঁত-ঘোঁত জানা হয়ে গেছে হাতে-কলমে। ঘুষ জুগিয়ে আর দূত পাঠিয়ে নবাব, বাদশা আর দেওয়ানদের তোষামুদি করার চেয়ে কেল্লার দেওয়ালকে শক্ত করাটাই যে বুদ্ধিমানের কাজ এটা বুঝতে দেরী হয়নি তাঁর। কাউন্সিলের সদস্যদের কাছে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বচন ছিল, দূতের চেয়ে দূর্গ ভাল। "Force and a strong fortification were better than an ambassador."

বাংলার সিংহাসনে নবাব আজিম ওসমান। মুর্শিদকুলী খাঁ দেওয়ান। দেওয়ান হলেও তাঁর ক্ষমতার দাপট নবাবের সিংহাসন ছাড়িয়ে আরও অনেকখানি লম্বা। দেওয়ানির দায়িত্ব হাতে পেয়েই তিনি মন দিলেন জমিদারদের লোভের মুঠো থেকে রাজস্বের টাকা ছিনিয়ে আনায়। তরতর করে বেড়ে চলল রাজস্বের পরিমাণ। দিল্লীর সম্রাট মহা খুশী। কিন্তু খুশী নন নবাব আজিম ওসমান। নবাবের চেয়ে দেওয়ানের আধিপত্য কারই বা ভাল লাগে। তিনি মুখে বজায় রাখলেন সমাদর-সদ্ভাব। মনে-মনে আঁটতে লাগলেন চক্রান্ত। আবদুল ওয়াহেব ছিল এক নগদী সৈন্যদলের নেতা। নগদী সৈন্য মানে, এরা রাজকোষ থেকে মাইনে পেত। কিন্তু জায়গীর পেত না। ওয়াহেবের দলবল ছিল একটু বেপরোয়া ধরনের। রাজপথের মাঝখানেই তারা বলে বেড়াত, আমরা কাউকে গ্রাহ্য করি না। আমাদের মত তলোয়ারবাজ ভূ-ভারতে নেই। নবাব হাত করলেন ওয়াহেবকে। পরামর্শ দিলেন, দেওয়ান যখন রাজসভায় আসবেন, রাস্তার মাঝখানে আটকে তোমরা মাইনে না-পাওয়ার অজুহাতে হট্টগোল বাধাবে। আর সেই ফাঁকে দেওয়ান বধ।

মুর্শিদকুলী খাঁও যথেষ্ট বিচক্ষণ। আগেই আঁচ পেয়েছিলেন, নবাব ফেলতে পারেন বিপদে। ওয়াহেবের দলবল যখন তাঁকে সত্যিই পাকড়াও করল রাস্তায়, মুর্শিদকুলী অবিচলিত। বললেন, তাই নাকি? মাইনে পাচ্ছ না তোমরা? খুব দুঃখের কথা। চল আমার সঙ্গে রাজসভায়। মাইনের ব্যবস্থা করছি।

রাজসভায় পৌঁছেই মুর্শিদকুলী খাঁর অন্য চেহারা। শক্ত মুঠোয় কৃপাণটা তুলে ধরে সোজাসুজি নবাবের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, এ চক্রান্ত আপনারই তৈরী। আপনি যদি আমাকে হত্যার চেষ্টা করেন, আপনাকে হত্যা করতেও আমার হাত কাঁপবে না। এবং বাদশাহ-ও আমার প্রাণনাশের প্রতিশোধ নেবেন।

ঘটনাটা যে এমন চেহারা নেবে আজিম ওসমান স্বপ্নেও ভাবেননি। বাদশাহের ভয়ে হাড়ে মাসে কাঁপুনি লাগল তাঁর। তিনি জানালেন, এসব ঘটনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাঁর। তিনি দেওয়ানের সঙ্গে আজীবন জড়িয়ে থাকতে চান প্রীতির বন্ধনে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহেবের দলকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে রাজসভা থেকে দূর করে দিলেন। মুর্শিদকুলী মুখের কথায় ভোলার লোক নন। তিনি সেইদিনই দেওয়ানখানায় গিয়ে সরকারী কর্মচারীদের হুকুম দিলেন, বিদ্রোহী সেনাদলের আচরণ সরকারী কাগজে লিখে ফেলতে। তারপর কয়েকজন জমিদারের উপর দায়িত্ব দিলেন বিদ্রোহী সেনাদের মাইনে মিটিয়ে দেবার। আর মাইনে মিটে গেলেই যেন তাদের নাম কেটে দেওয়া হয় সরকারী খাতা থেকে।

মুর্শিদকুলী এইখানেই থামলেন না। ঢাকায় থাকা মানেই নবাবের বিষ-নজরে থাকা। সুতরাং দেওয়ান-খানা তুলে নিয়ে যেতে হবে অন্যত্র। পাত্র-মিত্র-জমিদার-কানুনগোদের সঙ্গে পরামর্শ করে জায়গা স্থির হল একটা। মুখসুসাবাদ। বাংলাদেশের ঠিক মাঝখানেই জায়গাটা। তবে চল সেইখানে। আওরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত এবং বিপন্ন। তিনি সেখানে বসেই সংবাদ পেলেন আজিম ওসমানের আচার-আচরণের। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এল তাঁর ক্রুদ্ধ চিঠি। আর বাংলার নবাবী নয়। চলে যাও পাটনায়। আজিম ওসমানের জায়গায় এল তাঁর ছেলে ফর্‌খশিয়র। নবাব নয়। নায়েব সুবেদার।

মুখসুসাবাদে এক বছর কাটিয়েই মুর্শিদকুলী বাংলাদেশ থেকে পাওয়া রাজস্বের টাকাকড়ির হিসেব-নিকেশ নিয়ে হাজির হলেন আওরঙ্গজেবের কাছে। টাকার পরিমাণ দেখে আওরঙ্গজেব অভিভূত। আগে কোনদিন এত টাকা

রাজস্ব পাননি। সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদকুলীকে উপহার দিলেন উপাধি, উৎকৃষ্ট খেলাৎ, বাদশাহী ঝণ্ডা, নকড়া আর মন্‌সবী অর্থাৎ সেনানায়কত্ব। উপাধি দিলেন 'মোতোমন্ উল্ মুল্‌ক আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নসিরী নাসিরজঙ্গ মুর্শিদকুলী খাঁ।' সেই থেকে তিনি মুর্শিদকুলী খাঁ।

মুর্শীদকুলী আসলে কিন্তু বামুনের ঘরের ছেলে। দুঃখ-দারিদ্রের বোঝা বইতে না পেরে খুব ছেলেবেলায় বাবা ছেলেকে বেচে দেন ক্রীতদাস হিসেবে হাজী সফি নামের একজন পারসিক ব্যবসাদারের কাজে। সফী তাঁকে নিয়ে যান ইস্পাহানে। লেখাপড়া শেখান। সেই সঙ্গে দীক্ষা দেন মুসলমান ধর্মে। নামকরণও হয় নতুন। মহম্মদ হাদী। হাজী সফি একদিন মারা গেলেন। তাঁর বংশধরেরা হাদীকে মুক্তি দিয়ে দিল ক্রীতদাসত্বের বন্ধন থেকে। হাদী চলে গেলেন দাক্ষিণাত্যে। বেরারের দেওয়ান হাজী আবদুল্লা। চাকরী দিলেন হাদীকে। হিসেব-নিকেশ রাখার চাকরী। বেশী দিন গেল না। তরুণ হাদীর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। আওরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যে। এই খ্যাতির খবর কানে এল তাঁরও। ডেকে পাঠালেন হাদীকে। চাকরী দিলেন হায়দ্রাবাদে। অনেক দিন খালি পড়েছিল দেওয়ানের পদ। হাদীকে বসালেন সেই গদীতে। সেখানেও অল্প দিনে সুনাম সম্মান। আওরঙ্গজেব ভাবলেন, এমন একটা যোগ্য লোককে এখানে ফেলে না-রেখে, ভারতবর্ষের সবচেয়ে সেরা জায়গা, বাংলা-দেশেই পাঠানো যাক। ১৭০১। বাংলার দেওয়ান করে পাঠালেন হাদীকে। সেই সঙ্গে উপহার দিলেন নতুন উপাধি। কারতলব খাঁ।

'রিয়াজ উস-সালাতীন' আর 'তারিখ বাংলা' র মতে বাংলার দেওয়ান হওয়ার আগে তিনি নাকি বেশ কিছুদিন দেওয়ানিগিরি করেছেন উড়িষ্যায়। ঐতিহাসিক স্টুয়ার্টের মতে, তিনি যখন হায়দ্রাবাদের দেওয়ান, তখনই নাকি সম্রাট তাঁকে দিয়েছিলেন ঐ কারতলব খাঁ উপাধি। বাংলার দেওয়ানী লাভের সময় মুর্শীদকুলী খাঁ। রিয়াজ আর তারিখ বাঙ্গলা মত ভিন্ন। বাংলার দেওয়ানী লাভের সময় কারতলব খাঁ। পরে মুর্শীদকুলী খাঁ।

মুর্শীদকুলী নিতান্তই ঝোঁকের বশে বা নবাবের কাছ থেকে পালাবার জন্যেই মুখ্‌সুসাবাদে চলে আসেন নি। বিচক্ষণ শাসক ছিলেন তিনি। বুঝেছিলেন রাজ্যশাসনের পক্ষে জায়গাটা নানা দিক থেকে কাজের।

"কয়েকটি কারণে মুখসুসাবাদ দেওয়ানী কার্যের উপযুক্ত স্থান বিবেচিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ স্থানটি অতি মনোহর। মন্থর গামিনী ভাগিরথী ধীরে ইহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। উগ্রচণ্ডা পদ্মার ন্যায় তিনি কখনও

সংহার মূর্তি ধারণ করেন নাই। দ্বিতীয় স্থানটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। তৃতীয়ত মুখসুসাবাদ বাঙ্গলা প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত।···চতুর্থত বাঙ্গলার বাণিজ্যকার্য পরিদর্শনের পক্ষে মুখসুসাবাদই উপযুক্ত স্থান ছিল। কারণ ভাগিরথী বাঙ্গলার বাণিজ্য প্রসারণের সর্বপ্রধান পথ। এবং গঙ্গা, পদ্মা, ও জলঙ্গী প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদীর সহিত তাহার সংযোগ।···সে সময়ে মগ বা ফিরিঙ্গীদিগের কোনরূপ অত্যাচার না থাকায় পূর্ববঙ্গে অবস্থান করার বিশেষ কোনরূপ প্রয়োজন ছিল না। এই সমুদয় কারণ বিবেচনা করিয়া কারতলব খাঁ কাননগো ও খালসা বা রাজস্ব বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীদের সহিত ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুখসুসাবাদে উপস্থিত হইলেন। এবং তাহার ফুলুড়িয়া নামক পতিত মৌজায় দেওয়ানখানা ও মহলসরা প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া দক্ষতা সহকারে দেওয়ানী কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে জগৎশেঠের আদি পুরুষ মাণিকচাঁদও দেওয়ানের সঙ্গে মুখসুসাবাদে চলিয়া আসেন।” মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।

প্রাচীন ইতিহাস বলে মুখ্‌সুসাবাদ নামটা হয়েছে, মুখসুস খাঁ নামের একজন নামকরা ব্যবসায়ীর থেকে। আবার আকবরনামা-য় একজন শাসনকর্তার নাম পাওয়া যায় সারদ খাঁ। তাঁর ভায়ের নাম মুখসুস খাঁ। মুখ্‌সুসাবাদে দেওয়ানী তুলে এনে মুর্শীদকুলী খাঁ এর নাম পাল্টে নতুন নামকরণ করলেন নিজের নামে। সেই থেকে মুখ্‌সুসাবাদ মুর্শিদাবাদ।

ওদিকে কলকাতা একটু-একটু করে বাড়ছে। খানিকটা ইংরেজদের চেষ্টায়। বাকীটা মুর্শিদকুলী খাঁর দাপ-দাপটে। পুরনো জমিদারদের উচ্ছেদ করে নতুন-নতুন লোককে জমিদার বানাচ্ছিলেন তিনি। সেই সব পরিবারের লোকেরা একে একে চলে আসতে লাগল কলকাতায়, নতুন জীবিকার খোঁজে। শোভা সিংহের আক্রমণের সময় থেকেই মোগল নায়েব-বাদশাদের সম্বন্ধে দেশী লোকজনের মনে সর্বদাই একটা আতঙ্ক উদ্বেগ। এই বুঝি ধন যায়, এই বুঝি প্রাণ, এমনি অবস্থা। তাদের মনে ধারণা জন্মাতে লাগল ইংরেজরা বিদেশী হলেও মারকাট্টা মোগলদের চেয়ে ঢের ভদ্র। তার উপর কানে আসতে লাগল কলকাতা শহরের ক্রমশ বদলে যাওয়ার খবর। সেটা সত্যিই। শহরটাকে খানিকটা ভদ্র গোছের চেহারা দেবার জন্যে ইংরেজরা বেশ মন দিয়েই লেগেছিল। সব চেয়ে বেশী মনোযোগ ছিল কেল্লার দিকে। মুর্শিদকুলীর যা রগচটা মেজাজ আর সম্রাট আওরঙ্গজেবের যে রকম নড়বড়ে অবস্থা, দুর্গটাকে না সামলালেই নয় তাদের। নতুন করে বুরুজ বসানো হল আরো কয়েকটা। চারদিকে দেয়াল তোলা হল চার ফিট পুরু। চোদ্দ ফিট

উঁচু। মাল ওঠানোর নামানোর জন্যে জেটি। ঘাট তৈরী হল দু-দুটো। ঘাটের কাছে আবার মন্দির। নাম নোঙ্গরেশ্বর শিব। মহাজনেরা মাল-পত্র নামিয়ে পূজো দেয় ধুমধাম করে।

কেল্লার ভিতরে সারে-সারে সাজানো ঘরে থাকে কর্মচারীরা। সেগুলোর মেঝে একটু উঁচু। একে বলা হয় Long Row. কেল্লার ভিতরে অস্ত্রাগার। বারুদখানা। তার গায়ে মাল গুদাম। ডাক্তারখানা। কারখানা। দক্ষিণ দিকে ফটক। দুটো ফটকের দুটো রাস্তা। একটা গেছে নদীর ধারে। আরেকটা লালদিঘির ধার ধরে, লালবাজারের পাশ দিয়ে বৌবাজারের দিকে। কেল্লার ভিতরে দক্ষিণ দিকে প্রেসিডেন্টের ঘর। ঘর তো নয়, যেন প্রাসাদ। দাঁড়িয়ে দেখার মত। চৌরঙ্গীর গায়ে এখন যেখানে মিডলটন ষ্ট্রীট, সেখানে বন জঙ্গল সাফ করে খানিকটা জায়গায় প্রেসিডেন্টের জন্যে শাকসব্‌জীর বাগান। পুকুরে মাছ। প্রেসিডেন্টের জন্যে ঝালর্‌দার পালকী।

এরপর নজর পড়ল লালদিঘির দিকে। ৫৪ হাজার টাকা খরচ করে সারানো কিংবা সাজানো হল লালদিঘি। ইংরেজরা আদর করে নাম দিলে Green before the Fort. মাঝে লালদিঘির জলটা খুব নোংরা হয়ে গিয়েছিল। মুখে দেওয়া যায় না। অথচ পানীয় জল বলতে ঐটেই একমাত্র সম্বল। ২০ হাজার টাকা খরচ করে পাঁক তোলা আর পানা সরানো হল। বাকী ৩৪ হাজার টাকায় চারধারের বাগান, কাঁকরের রাস্তা, আর জলে মাছের চাষ। সাহেব এবং বিবিরা পেয়ে গেলেন মনের সুখে হাওয়া খাওয়ার, হাত-পা ছড়িয়ে ঘুরে বেড়াবার জায়গা। তখন এই জায়গাটার নাম ছিল ট্যাঙ্ক স্কোয়ার। আবার কারো-কারো লেখায় দি গ্রেট ট্যাঙ্ক। এখন ডালহৌসী স্কোয়ার।

ধীরে ধীরে বাড়ি উঠতে লাগল এই স্কোয়ারের চার পাশে। বিঘে প্রতি তিন টাকা খাজনা। আবার একটু নিরিবিলিতে থাকার জন্যে কেউ কেউ চলে গেলেন সুতানুটি কিংবা গোবিন্দপুরের দিকে। তখনকার কলকাতায় দুটো ছিল বিখ্যাত বাগান বাড়ি। একটা হল পেরিন সাহেবের বাগান। উত্তর দিকে, বাগবাজারে। আরেকটা হল সুরম্যান সাহেবের বাগান। দক্ষিণ দিকে, হেষ্টিংসে।

এমন কলকাতা ছেড়ে অন্য জায়গায় মন বসে কারো? জনসংখ্যা বাড়ছে। বাড়ি ঘর বাড়ছে। কোম্পানীর দপ্তর বাড়ছে। নতুন কর্মচারীর দরকার হচ্ছে রোজ। সুতরাং কলকাতায় এলেই চাকরী। মুঠো মুঠো টাকা। শুধু দুহাতে কুড়োবার জন্যে যেটুকু সময়।

১৭০০ সালে তৈরী হল জমিদারের পদ। অর্থাৎ কোম্পানীর কালেক্‌টর।

প্রথম এই পদমর্যাদা পেলেন র‍্যাল্‌ফ শেলডন। লোক বাড়ছে বলে কাজও বাড়ছে এত যে একা জমিদারে কাজ সামলানো কঠিন। দরকার হল দেশী লোকের। কাকে দেওয়া যায় চাকরীটা? ডাক পড়ল নন্দরাম সেনের। ইংরেজের চাকরীতে বড় রকম পদে নন্দরাম সেনই প্রথম বাঙালী। প্রথম ব্ল্যাক জমিদার। হাটখোলা অঞ্চলে বাড়ি। মৌলিক কায়স্থ। কোম্পানীর চাকরীতে ঢুকে রাতারাতি খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং অর্থ তিনটেই জুটে গিয়েছিল বরাতে, এবং প্রচুর পরিমাণে। যতদিন মাথার উপরে প্রভু শেলডন, ততদিন বেশ কাটছিল সুখে-স্বচ্ছন্দে। প্রমোশন পেয়ে বছর চারেক বাদে শেলডন যেদিন আরও উঁচু জায়গায় চলে গেলেন, এবং নতুন জমিদার হলেন বেঞ্জামিন বাউচার, তখন থেকেই নন্দরামের কপাল ফাটার শুরু। বাউচার গদীয়ান হয়েই কড়া নজর ছড়ালেন অধস্তন কর্মচারীদের কাজকর্মের দিকে। কিছুদিনের মধ্যে চোখে পড়ল তাদের অকর্মন্যতা। আর সেই সঙ্গে জাল-জুয়াচুরী করে যে-যার-নিজের ট্যাঁক ভারী করার চেষ্টা। বাউচার একদিন রেগেমেগে ছ'-ছ'জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করে বসলেন। কাউন্সিল তলব করলে, কেন এই ছাঁটাই? এতে কি বাউচারেরই অকর্মন্যতা প্রমাণ হচ্ছে না? তিনি যদি নিজের কাজে মন না দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোন, তাঁর কর্মচারীরা তো সেই সুযোগে চুরি-চামারি করবেই। বাউচার কাউন্সিলকে জানালেন, কোম্পানী যে-রকম বলছেন, সে-রকম চুরি-চামারি কেউ করেনি। শেলডন তখন কাউন্সিলের সভ্য। তিনি বললেন, করেছে বৈকি! এই যে নন্দরাম সেন, ও তো আমার কাছেই গচ্ছিত রেখেছে নগদ দুশো টাকার থলি। কোথা থেকে এল এই টাকা? কোম্পানীর টাকা না সরিয়ে?

কাউন্সিল যাই বলুক, ছ'জন কর্মচারীর চাকরী ঠিকই খেয়ে বসলেন বাউচার। তার মধ্যে নন্দরাম একজন। নন্দরামের জায়গায় নতুন করে আনা হল জগৎ দাসকে। জগৎ দাসও বেশী দিন টিকলেন না। তহবিল তছরূপের দায়ে তাঁরও চাকরী গেল একদিন। তখন আবার নন্দরামকেই ডাকাডাকি। নিশ্চয়ই যোগ্যতার জন্যে।

বছর গড়িয়ে এল ১৭০৯। শেলডন সাহেব পরলোক গমন করলেন এপ্রিলের ২৬ তারিখে। ইতিমধ্যে নিজের দেশে অর্থাৎ কোম্পানীর কানে পৌঁছে গিয়েছিল তাঁর কৃতিত্বের খবর। কোম্পানী ভালবেসে তাঁকে প্রেসিডেন্টের পদ উপহার দিলে। কিন্তু সে খবর কলকাতায় এসে পৌঁছল ১৭১০। হতভাগ্য শেলডন তখন কবরে।

শেলডনের মৃত্যুর পর নন্দরামকে নিয়ে পড়ল কাউন্সিল। নন্দরাম আসন্ন ঝড়-ঝাপটার গন্ধ পেয়ে পালিয়ে গেলেন হুগলীতে। শেলডনের মৃত্যুর পর এক সপ্তাহ গেল না, কোম্পানীর পেয়াদা ছুটল হুগলীতে। সেখানকার সুবেদারকে জানাল, কোম্পানীর টাকা তছরূপ করে পালিয়ে এসেছে এই নন্দরাম। একে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। 'হি বিয়িং আওয়ার সারভেন্ট, উই মে হ্যাভ স্যাটিসফ্যাকশন ফর দি অ্যাবিউজ টু দি কোম্পানী।'

যে-জেলখানার একদিন নিজেই ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক, ভাগ্যের ফেরে সেই জেলখানাতেই হাজত বাস ঘটল নন্দরামের। দু'বছরের জেল। তারপর একদিন সারা শহর জুড়ে ঢোল সহরৎ। নন্দরামের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যদি কারো কাছে থাকে, কোম্পানীকে না জানিয়ে কেউ যেন তাঁকে বা তাঁর পরিবার-বর্গকে দিয়ে না বসেন। জানা যায় পরে তিন হাজার টাকা জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন নন্দরাম। হুগলী থেকে তাঁকে ধরতে কোম্পানীর খরচ পড়েছিল দুশো সাতচল্লিশ টাকা আট আনা। কোম্পানী সব টাকাই উসুল করে নিয়েছিল তাঁর জমি-জমা ঘরদোর-আসবাব-পত্র ক্রোক করে।

সম্প্রতি শ'খানেক বছরের পুরনো একটা কাব্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। মঙ্গল-কাব্যের ছন্দে নন্দরাম সেনের জীবনী সেটি। খানিকটা সত্যি। খানিকটা শোনা কথায় ভেজাল। এখানে তারই যৎসামান্য অংশ–

প্রসিদ্ধ সকলে জ্ঞাত কলিকাতা ধাম
শোভাবাজারের কুল সেন বংশ নাম।
দীর্ঘ গঙ্গা নামে স্থান সেন কুলোদ্ভব
তদপূর্বের বার্তা জানা নাহিক সম্ভব।

* * * *

এলেন পুরুষ মহা দীর্ঘ গঙ্গা হৈতে
জঙ্গল কাটিয়া বাস এখানে করিতে।
মুর্শিদাবাদে কাজ করিতেন তিনি
শুনিয়াছি লোকমুখে স্থির নাহি জানি।

* * * *

দেওয়ান বলিয়া খ্যাত সেন নন্দরাম
আদি পুরুষের মন জান এই নাম।

রচয়িতা জয়ন্তীচন্দ্র সেন। নন্দরাম সেনেরই পরবর্তী বংশধর। সম্পূর্ণ

কাব্যগ্রন্থটি যদি কেউ পড়তে ইচ্ছুক হন, মিলবে গবেষক নারায়ণ দত্তের 'জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী' নামের বইটিতে।

নন্দরামের স্মৃতি বলতে আজকের কলকাতায় আছে কেবল শোভাবাজার বা হাটখোলা অঞ্চলে একটা সরু গলি। একটা ঘাট গড়ে দিয়েছিলেন গঙ্গার ধারে। নাম ছিল রথতলার ঘাট। আঠারোশো শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত নাকি সেটা টিকে ছিল। তারপর ভেসে গেছে গঙ্গার জলে।

আবার ফিরে যাই পিছন দিকে। ১৭০৭। ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় বছর। ঐ বছরের ২০ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেব ৯০ বছর বয়সে সজ্ঞানে মারা গেলেন। ইতিহাসের পাতায় মৃত্যুর তারিখ এবং মৃত্যুকালীন বয়স নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কারো মতে বয়সটা তখন ৯২। তারিখটা ২০ ফেব্রুয়ারী। অন্য মতে বয়স ৮৯। তারিখ ৩ মার্চ। এক বিষয়ে সকলের মিল। সেটা হল বার। সম্রাট নিজের মৃত্যুকামনা করেছিলেন শুক্রবারে। তাই-ই ঘটেছিল। প্রাতঃকালীন প্রার্থনা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ দিনে মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করেছিল তাঁকে। মৃত্যুর পায়ের শব্দ কানে এসেছিল অনেক আগেই। জানতেন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকুমারেরা এই সময়ে কাছে থাকলে শাজাহানের মত অবস্থা হতে পারে তাঁরও। তাই তাদের পাঠিয়েছিলেন যার যার কাজের জায়গায়। মৃত্যুর কিছু আগে তাদের উদ্দেশে লিখে রেখে গেলেন এক চিঠি।

"যখন সংসারের প্রথম আলোক দর্শন করিয়াছিলাম, তখন অনেকেই আমার পার্শ্বে ছিল। কিন্তু এখন আমি একাই চলিলাম। আমি কে, কেন পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না। রাজ্য, রাজকার্য, যুদ্ধ লইয়াই জীবন কাটাইয়াছি। স্বার্থের চিন্তাতে বিভোর হইয়া, জীবনের পথে অন্ধের মত চলিয়া আসিতেছি। আত্মচিন্তায় সর্বস্ব অর্পণ করিয়া, খোদাকে ভুলিয়াছি। এ জীবনে আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। যে-দেশ আমার শাসনাধীনে ছিল, যে-প্রজা আমার আশ্রয়াধীনে ছিল, তাহাদেরই বা কি করিয়াছি? ঈশ্বর তো আমার প্রাণের মধ্যেই বিরাজিত ছিলেন, কিন্তু আমার অন্ধ চক্ষু তাহা তো দেখে নাই। দেখিবার চেষ্টাও করে নাই। সংসারে কিছুই সঙ্গে করিয়া আনি নাই। যাইবার সময় পাপের বোঝা লইয়া যাইতেছি। ঈশ্বরের উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তবুও নিজের কৃতকার্য্যের জন্যে মন অনুতাপে ভরা। যাহা হইবার হইবে। অকূল সাগরে জীবনতরী ভাসাইলাম।"

মৃত্যুর আগে নিজের উইলে তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন কয়েকটা জরুরী নির্দেশ। আমার সমাধি হবে সাধারণ। খোলামেলা জায়গায়। কোন

চন্দ্রাতপ থাকবে না তার উপর। আমার টুপি বেচে পাওয়া গেছে সাড়ে চার টাকা। কবর দেওয়ায় খরচ হবে ঐ টাকাটা। আমার কোরান বেচে পাওয়া গেছে তিনশো পাঁচ টাকা। মৃত্যুর দিন ঐ টাকা যেন বিতরণ করা হয় সাধু-সজ্জনদের মধ্যে। তাই করা হয়েছিল। এখানে জানান দরকার, যে-টুপি আর কোরান বেচে সমাধি-ক্রিয়ার টাকা জোগাড় করেছিলেন তিনি, সেই দুটোই তাঁর নিজের হাতের রচনা। কোরান কপি করা আর টুপি বানানো দুটোই ছিল তাঁর 'humble and therefore holy Pastime.'

ইতালীয়ান পর্য্যটক মানুচি তখন ভারতবর্ষে। দীর্ঘদিন রয়েছেন। চিকিৎসক হিসেবেই সর্বত্র সমাদর। মোগল সাম্রাজ্যের চলা-হাঁটা, চাল-চলন তাঁর জানা জিনিষ। তাই অতি সহজেই তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন, আওরঙ্গজেবের পরই মোগল সাম্রাজ্যের পতন। তাঁর খেদ –

"What an event to behold will be the tragedy following the death of this old man."

আওরঙ্গজেব নিজেও জানতেন, মোগল সাম্রাজ্যের ভিতের তলায় ঢুকে পড়েছে কতখানি ধ্বংসের চোরাবালি। নেই কোন সুযোগ্য সেনাপতি। যোগ্য মন্ত্রণাদাতা। যথার্থ বীর। তৃতীয় পুত্র আজম। সম্রাটের সবচেয়ে প্রিয়। একদা তার কাছে লিখেছিলেন এক চিঠি। হাহাকারে ভরা। প্রত্যেকটি রাজকর্মচারীর নাম ধরে ধরে তাদের অকর্মন্যতার বিবরণ। আর একেবারে শেষ লাইনে – "I myself am forlorn and destitute and misery is my ultimate lot." অবশ্য এই সর্বাঙ্গীন অধঃপতনের মূলে তিনি নিজেই। কখনো বিশ্বাস করেন নি কাউকে। কাউকে দেননি কাজ করার স্বাধীনতা। যোগ্য জনকে দেননি সম্মান।

ফরাসী পর্য্যটক বার্নিয়ের তাঁকে দেখেছেন কাছ থেকে। অনেক প্রশংসা আছে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে। কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক সত্যভাষণও।

"ওরঙ্গজীব ভিন্ন প্রকৃতির। জ্যেষ্ঠ দারাশিকোর মতন তাঁর বাইরের চরিত্রে কোন মাজাঘষা চাকচিক্য ছিল না। কিন্তু তাঁর বিচার বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। বন্ধু-বান্ধব আমলা অমাত্য নির্বাচনে তিনি অত্যন্ত হুঁশিয়ার ছিলেন। এবং এমন কাউকে কোনদিন আমল দিতেন না, যার দ্বারা তাঁর নিজের কার্যসিদ্ধি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সেই ভাবেই তিনি পদমর্য্যাদা ও পুরস্কারাদি বিতরণ করতেন। কতবার যে তিনি রাজদরবারে এবং ভাইদের কাছে ধনদৌলত, রাজৈশ্বর্যের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত বীতরাগ ও বৈরাগ্যের ভান এবং গোপনে

সিংহাসন অধিকার করার ষড়যন্ত্র করেছেন, তার ঠিক নেই। ছলাকলা ও কূটবুদ্ধিতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিলেন না।" বাদশাহী আমল।

তাঁর মৃত্যুর পর বেশীদিন গেল না। লাগল ক্ষমতা দখলের লড়াই ভায়ে-ভায়ে। আওরঙ্গজেবের তিন ছেলে জীবিত তখন। মোয়াজ্জেম, আজম ও কামবক্স। দুই ভাইকে যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত করে মোয়াজ্জেমই এক বছরের মধ্যে দখল করে নিলেন সিংহাসন। তখন তাঁর নতুন নাম বাহাদুর শাহ্, অথবা প্রথম শাহ্ আলম। সেটা ১৭০৮।

দিল্লীর উত্থান-পতন ছেড়ে আমরা ফিরে আসি কলকাতায়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ যথারীতি এবং যথাসময়ে পৌঁছে গেল কলকাতায়। উদ্বেগ, আতঙ্ক, দুর্ভাবনা গ্রাস করে বসল ইংরেজদের। কাউন্সিলের সদস্যরা বসে পড়লেন মন্ত্রণায়। ৩ এপ্রিলের কনশালটেশন বুকে তার বিবরণ –

"মোগল বাদশাহের মৃত্যু-সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিবা মাত্র সমগ্র নগরী অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রবিভাগের চারিদিকেই একটা গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়া সম্ভব বিবেচনায় সকলেই আতঙ্কিত। নানাস্থান হইতে এ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই সকলে ইহা বিশ্বাস করিতেছে। এবং সেইজন্য কলিকাতার দুর্গেও এক মহা হুলুস্থূল উপস্থিত। এই হেতু শীঘ্রই একটি মন্ত্রণাসভা আহূত হইল। সভায় এই স্থির হইল – সম্রাটের মৃত্যুতে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে। এজন্য মহাজন ও পাওনাদারগণকে যাহাতে আর টাকা কড়ি না দেওয়া হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। আমাদের যে সমস্ত কর্মচারী নিকটবর্তী স্থানে কার্যোপলক্ষে গিয়াছেন তাহাদের কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। মিঃ ডাবেল ও স্পেনসারের নিকট কোম্পানীর টাকাকড়ি ও সনন্দ প্রভৃতি আছে। তাঁহাদিগকে নিরাপদে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য কুড়িজন গোরা সৈন্য পাঠান হউক। মিঃ বগডেন ও ফিক কাশিমবাজারে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগের উপর আদেশ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা কোম্পানীর মালপত্র লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হউন।"

এর চার দিন বাদে আবার এক অধিবেশন। এবং প্রস্তাব –

"সম্রাটের মৃত্যুতে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহার উপর এখনই শস্যাদি দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। যদি কোন বিপ্লব উপস্থিত হয়, দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধে, তাহা হইলে খাদ্যের অভাবে আমাদের বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে। আমরা শুনিয়াছি, মাদ্রাজের ইংরাজ উপনিবেশেও এইরূপ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গমধ্যস্থ সেনাগণ ও কোম্পানীর কর্মচারীগণের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনমতে পাঁচ হাজার মণ চাউল ও এক হাজার মণ গম সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডারজাত করা হউক। এ বিষয়ে আর্থার কিং সাহেবকে আদেশ দেওয়া হইল। যদি মাদ্রাজের কুঠীতে শস্যের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাদেরও সাহায্য পাঠাইতে হইবে। এই রাষ্ট্রবিপ্লবে নিকটবর্তী জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে কোম্পানীর উপর উৎপাত করিতে পারেন। কলিকাতা লুটপাট করিতে পারেন। তাহার প্রতিকার উদ্দেশে এই সমস্ত সম্ভাবিত বিপদের প্রতিকার জন্য আদেশ হইল, ৬০ জন অতিরিক্ত দেশীয় সৈন্য কোম্পানীর দলভুক্ত করা হউক। তাহারা কলিকাতা নগরীর চতুর্দিকে পাহারা দিয়া নগর রক্ষা করিবে।"

সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর ডিহি কলকাতা এই তিন নিয়ে যে কলকাতা, তার চতুঃসীমা তখন এই রকম। পশ্চিমে ভাগীরথী। উত্তরে সুতানুটি। পূবে নোনা জলাভূমি, খাল। দক্ষিণে গোবিন্দপুর।

বাগবাজারের খাল থেকে বড়বাজারের টঁ্যাকশাল পর্যন্ত সুতানুটি। কাস্টমস্ হাউস পর্যন্ত কলকাতা আর কলকাতার দক্ষিণে এখনকার ভবানীপুর পর্যন্ত গোবিন্দপুর।

"১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহা যখন জমিদারীরূপে ক্রীত হয় তৎকালে ইহার পরিমাণ ফল দেড় বর্গমাইল মাত্র ছিল। কলিকাতা সে সময়ে একটি বাণিজ্যিক উপনিবেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। নগরের যে অংশের মধ্য দিয়া চিৎপুর রোড বিস্তৃত তাই-ই পূর্বকালের সুতানুটি। যে-ঘাট এক্ষণে হাটখোলা ঘাট নামে পরিচিত, তাহাই প্রায় এক শতাব্দীকাল সুতানুটি ঘাট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এবং তাহারই অতি নিকটে সুতানুটি বাজার নামে একটি প্রকাণ্ড বাজার ছিল। ১৮৫০ সালের ২৩ আইন অনুসারে সমস্ত কলিকাতা যখন জরিপ করা হয়, তখন সুতানুটির চতুঃসীমা এইরূপ নির্দিষ্ট করা হয়। বাগবাজার খালের (মাহাট্টা খাতের) দক্ষিণ, আপার সার্কুলার রোডের পশ্চিম, রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট নামক রাস্তার উত্তর, ভাগীরথী নদীর পূর্ব। গোবিন্দপুর একটা শৃঙ্খলাপূর্ণ অদ্ভুত-দৃশ্য গ্রাম ছিল, স্থানে স্থানে কতকগুলি করিয়া কুটিরের সমাবেশ, আর সেই কুটির সমষ্টির মধ্যে মধ্যে বন জঙ্গল। বর্তমানে ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গ ও তৎসন্নিহিত ময়দান গোবিন্দপুরের স্থান অধিকার করিয়াছে।" কলিকাতার ইতিহাস।

১৭০৭-এ কলকাতার কাউন্সিল যে জরিপ করেছিল, তার বিবরণ ১২ জুনের 'ডায়েরি ও কনসালটেশন বুকে।' তখন বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম অঞ্চল

জুড়ে গোবিন্দপুর গ্রাম। উত্তরে বৌবাজার পর্যন্ত টাউন কলকাতা। তারও উত্তরে বড়বাজার পর্যন্ত বাজার কলকাতা। আরও উত্তরে শোভাবাজার শ্যামবাজার পর্যন্ত সুতানুটি।

গোবিন্দপুরের মোট জমির পরিমাণ ১১৭৭ বিঘে ৭ কাঠা। তার মধ্যে ৫৭ বিঘে ৯ কাঠায় লোকজনের বাস। বাকীটার মধ্যে আছে ধান ক্ষেত, বনজঙ্গল, পতিত জমি, বাঁশবন, কলাবাগান, সবজীর ক্ষেত।

টাউন কলকাতায় মোট জমি ১৭১৭ বিঘে ১৪ কাঠা। ২৪৮ বিঘে ৬ কাঠায় মানুষজনের বাস, ঘরবাড়ি। বাকীটা ঐ ধানক্ষেত, কলাবাগান, বাঁশবন, তুলো, তামাক, জঙ্গল আর পতিত জমি।

বাজার কলকাতার মোট জমি ৪৮৮ বিঘে ১২ কাঠা। তার মধ্যে বেশীটা জুড়েই বসত। তার পরিমাণ ৪০১ বিঘে ১১ কাঠা। ব্রহ্মোত্তর আছে ২৬ বিঘে ৮ কাঠা। বাকি জমিতে বাগান, ধানক্ষেত, আর কলার চাষ।

সুতানুটির জমি ১৬৯২ বিঘে ১৬ কাঠা। ১৩৪ বিঘে ৪ কাঠায় লোকজন। বাকি জমিতে কলাবাগান, ধানক্ষেত, তুলো, তামাকের চাষ, সবজীর বাগান ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হল ৪ বিঘে ১৭ কাঠা জুড়ে ফুলবাগান। তখন গঙ্গার গা থেকে সোজা একটা খাল চলে গেছে পূব দিকে সল্ট লেক পর্যন্ত। নৌকো যাতায়াত করে সেই খাল দিয়ে। মাঝখানে পড়ে ক্রীক রো, ডিঙে ভাঙা, জেলে পাড়া।

চীনে বাজার থেকে আজকালকার হেষ্টিংস পর্যন্ত ছড়ান ছিল তখনকার সাহেব পাড়া। জমজমাট হচ্ছে দিনকে দিন। বাড়ছে বড়বাজারও। যত ব্যবসায়ীর বাস সেখানে। আর এই দুই অঞ্চলের মাঝখানে পর্তুগীজ আর আরমানিদের ঘর-সংসার, দোকান-পাট। বড়বাজারে শুধু বাঙালী নয়, যে ব্যবসায়ী, তারই ঠাঁই। আরবি, পারসি, কাফ্রী, মালাই, মোগল, হাবসি সকলেরই। শেঠ-রা আগে থাকতো গোবিন্দপুরে। ক্লাইভ যখন জায়গাটা বাছলেন নতুন কেল্লার জন্যে, তখন তারা সপরিবারে কিংবা সদলবলে চলে আসে বড়বাজারে। তখন বলা হত বড়বাজারের শেঠ। কলকাতায় পুরনো ইতিহাসে দুজন শেঠের নাম পাই আমরা। লক্ষ্মীকান্ত শেঠ। ১৭৫৮। ২ জানুয়ারি অথবা ১১৬৫-র ২১ পৌষ। দেখা যাচ্ছে এক পাট্টায় তাঁকে কলকাতার জমিদার ম্যাথিউ কলেট সাহেব বড়বাজারে বিলি করছে সাড়ে ছ' কাঠা জমি। খাজনা কত? বছরে সিক্কা সাত আনা সাত পাই।

তারও আগে আছেন আর এক শেঠ। জনার্দন শেঠ। ইংরেজরা ব্যবসা

করতে এসে এক সময় হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল, দিশি লোকের সাহায্য ছাড়া ব্যবসা চালানো কিংবা ব্যবসা বাড়ানো একেবারেই অসম্ভব। কাকে ডাকা যায়? উমিচাঁদেরা কলকাতার পুরনো বাসিন্দে। উমিচাঁদের ভাই দীপচাঁদ। কোথাও তাঁর পদবী বেরা। কোথাও বেলা। কেউ বলেন, ভাল্লা। সাহেবরা পাকড়াও করল তাঁকে। ১৭০৪ সালের মে মাস। দীপচাঁদ বহাল হয়ে গেলেন কোম্পানীর দালালগিরির কাজে। কিন্তু যে-কারণেই হোক, দীপচাঁদে মন ভরল না তাদের। পুরনো রেকর্ড বলে, না, মন ভরাভরি নয়। দীপচাঁদ মারা গেলেন। সেটা ১৭০৬-এর অক্টোবর। তখনই ডাক পড়ল জনার্দন শেঠের। তাঁকে সাজানো হল বড় দালাল। হেড বেনিয়ান। শিরোপা, আতর, গোলাপ, পান, স্থপুরি দিয়ে জানানো হল সম্মান। গায়ে মোগলাই কাবা জোব্বা। বগলে নথিপত্র। তিনি যেতেন সাহেবদের হয়ে ওকালতি করতে, হুগলীর ফৌজদারের কাছে।

কনসালটেশন বুকে এঁদের দুজনকে নিয়ে যে-দুটি প্রস্তাব, তা এই রকম। প্রথমে—

"দীপচাঁদ বেলা (বেরা?) কোম্পানীর দালাল পদে নিযুক্ত হইল। দেশীয় ব্যবসায়ীদের নিকট যত টাকার মাল খরিদ হইবে, দীপচাঁদ তাহার প্রতি টাকায় আধ পয়সা হিসাবে কমিশন পাইবেন।"

এর কিছুকাল পরেই—

"দীপচাঁদ বেরা বলিয়া যে-ব্যক্তি এতদিন কোম্পানীর দালালী করিয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই জন্য এই ফৌত দীপচাঁদের স্থানে কোম্পানী জনার্দন শেঠকে তাঁহাদের ক্রয় বিক্রয়ের দালালরূপে নিযুক্ত করিল।"

'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' থেকে, আমরা জানতে পারি, জনার্দন শেঠ কোম্পানীর প্রথম যুগের দালাল। এঁদের আদি পুরুষ মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাস করতেন সপ্তগ্রামে। তারপর সপ্তগ্রাম ছেড়ে গোবিন্দপুরে। এঁদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীউর নাম থেকেই গোবিন্দপুর।

মুকুন্দরামের পর আরও আট পুরুষ কেটে গেছে যখন, তখন শেঠ বংশের খ্যাতনামা পুরুষ কেনারাম। তাঁর তিন ছেলে। জনার্দন, বারানসী আর নন্দরাম। নগেন্দ্রনাথ শেঠের 'কলিকাতাস্থ তন্তু বণিক জাতির ইতিহাস'-এ অন্য কথা। সেখানে জনার্দনের বাবার নাম কিরণচন্দ্র। ছেলের সংখ্যাও সেখানে ভিন্ন। একেবারে দ্বিগুণ। অর্থাৎ ছ'জন। জনার্দনের স্ত্রীর নাম সেখানে দ্রৌপদী। উইলসন সাহেবের মতে, টুনুমণি।

জনার্দন শেঠ-এর কাজ ছিল দালালি। কিন্তু পাকে-চক্রে পড়ে দূতের কাজও করতে হয়েছে বার কয়েক। শেরবুলন্দ খাঁ হয়েছেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার নতুন শাসনকর্তা। ইংরেজদের পক্ষ থেকে কে যাবে দেখা করতে? সকলের মুখে এক নাম। জনার্দন শেঠ।

জিয়াউদ্দীন খাঁ হয়েছেন হুগলীর নতুন ফৌজদার। তাঁর কাছে দরবার করতে যাবে, একজন দূত চাই। কাউন্সিলের মিটিং বসে গেল ফোর্ট উইলিয়মে। সভার সব সদস্যই একমত। যাবে, জনার্দন শেঠ। জনার্দন শেঠ গিয়েছিলেন। এবং কাজটাও হাসিল করেছিলেন ভাল মত। মন গলেছিল জিয়াউদ্দীনের। কথা দিয়েছিলেন, কোনও একদিন পায়ের ধুলো দেবেন কলকাতায়। তবে সর্ত আছে একটা। যেচে যাবেন না। ইংরেজদের কেউ, অর্থাৎ কাউন্সিলের হর্তা-কর্তাদের কেউকেটা গোছের কাউকে প্রথমে হুগলীতে এসে করজোড়ে তাঁকে জানাতে হবে আমন্ত্রণ। ইংরেজরা তাই করল। জিয়াউদ্দীন এলেন কলকাতায়। সেটা ১৭১০।

"ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় হুগলীর ফৌজদারকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক উৎসব হইয়াছিল। কোম্পানীর দালাল জনার্দন শেঠের উদ্যোগে ও কৌশলে উহার আয়োজনাদি হইয়াছিল। বর্তমানে কলুটোলা ষ্ট্রীট ও চীৎপুর রোডের মোড়ের বাড়িতে হুগলীর ফৌজদারের বালাখানা বাড়ি ছিল, এখনও ঐ স্থান ঐ নামে পরিচিত। সেকালে হুগলীর ফৌজদার যখনই কলিকাতায় আসিতেন, তখনই তিনি ঐখানে থাকিতেন। উভয়পক্ষের প্রীতি প্রদর্শন ও পূজা উপহারাদিসহ শিষ্টাচারের বিনিময়, যেমন ফৌজদারের কলিকাতায় হইয়াছিল, তেমনি নভেম্বর মাসে যুক্ত কোম্পানীর গভর্ণরের হুগলীতে হইয়াছিল। গভর্ণরকে ফৌজদার পোষাক, ঘোড়া ও সম্রাটের সম্মানলিপি আদি পরস্পর আদানপ্রদান করিয়াছিলেন।" কলিকাতার কথা।

জনার্দন মারা যান ১৭১২-র ৯ ফেব্রুয়ারী। তখন শেঠ পরিবারে চলেছে অশৌচ। জনার্দনের মৃত্যুর পর দুটো দিন কাটতে-না-কাটতেই, কোম্পানীর পাল্কী ছুটলো শেঠ-বাড়ির দিকে। ১১ ফেব্রুয়ারীতেই জনার্দনের জায়গায় তাঁর ভাই বারানসীকে বসিয়ে দেওয়া হল কোম্পানীর প্রধান দালালের শূন্য পদে। এত দ্রুত বারানসীকে চাকরীতে বহাল করার পিছনে কারণ ছিল একটাই। 'অল দি মার্চেন্টস এ্যাকাউন্টস বিইং ইন হিজ ব্রাদার।' জনার্দনের রেখে যাওয়া হিসেব-নিকেশের কাগজপত্র সবই যেহেতু বারানসীর হেফাজতে, সুতরাং

অন্ততপক্ষে সেই সালটার জন্যেই বারানসীকে কোম্পানীর তখন জরুরী প্রয়োজন। গোড়ায় এ্যাপয়েন্টমেন্টটা ছিল টেম্পোরারী।

সম্ভবত দাদার চেয়ে বেশ কিছুটা শৌখিন ছিল তাঁর মেজাজ। কোনো একজন ঐতিহাসিকের রচনা থেকে আমরা জানতে পারি, নিত্য ব্যবহারের জন্যে বিলেতী জিনিষপত্র কেনার দিকে তাঁর নজরটা ছিল বেশ উঁচু। এবং তিনিই নাকি প্রথম পথপ্রদর্শক, বিদেশী আসবাবপত্র কিনে বাবুগিরী ফলানোর ব্যাপারে। একবার চারখানা বিলেতী কম্বল কিনেছিলেন নিলামে। অবশ্য তার দাম শুনলে এখনকার কলকাতার চোখ উঠবে কপালে। চার আনায় এক একটা কম্বল। আর কিনতেন বিলেতী ছবি।

উইলিয়ম হেজেসের ভাইপো রবার্ট হেজেস যেদিন কাউন্সিলে গভর্ণরের চেয়ারে বসলেন, চাকরী চলে গেল বারানসীর। কারণ বিলেত থেকে চিঠি এসেছে, এই দালাল কোম্পানীকে ঠকাচ্ছে। কি ভাবে? নিজের আত্মীয় স্বজন, আপন পরিবারের লোকজনের মালপত্র বেচে কোম্পানীর কাছ থেকে মোটা টাকার দালালি কামাচ্ছে। তার চেয়েও বড় কথা, তারা যে দরে বেচছে, সেটা তাদের নিজেদেরই বেঁধে দেওয়া। অথচ তার চেয়ে সস্তায় অন্য কারো কাছ থেকেও কোম্পানী যে মাল কিনবে, সে পথটাও বন্ধ। নতুন কোন দাদনী-বণিককে তারা ইংরেজদের কাছে ঘেঁসতে দেয় না।

রবার্ট হেজেস, কোম্পানীর বশংবদ। ডিরেকটরদের চিঠি তাঁর কাছে বেদবাক্য। অতএব ছাঁটাই হলেন বারানসী। তার বদলে নতুন দালাল এলেন, রামকৃষ্ণ খাঁ। কিন্তু বেশীদিন দালালগিরীর চন্দনের টিপ সইলো না তাঁর ফাটা কপালে। মাস কয়েক পরেই পাড়ি দিলেন পরলোকে। তাঁর জায়গায় এলেন হরিনাথ।

ইংরেজরা একদিন যাঁকে তাড়ায়, পরে দেখা যায়, আবার তারই পায়ে ধরে সাধাসাধি। বারানসীর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৭১৯-এর ১৪ এপ্রিলে ডাক পড়েছিল আবার। ঐ পুরনো চাকরীতেই। তারও আগে, যখনই কোন বিপদ, তখনই বারানসীর ডাক। এমন কি চাকুরী খেয়েছিলেন যিনি, সেই হেজেসকেও ডাকাডাকি করতে হয়নি কম। হেজেস মারা গিয়েছিলেন ১৭২৭-এর ডিসেম্বরে। ৯ দিনের জ্বরে ভুগে। মারা যাওয়ার ক'দিন আগে শেঠজীকে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে বসেছিলেন ব্যক্তিগত জমি-জমা টাকা পয়সার হিসেব করতে।

জনার্দন শেঠের বড় ছেলে বৈষ্ণবচরণ। তিনিও পুরনোকালের কলকাতার

একজন বিখ্যাত পুরুষ। অন্যান্য ব্যবসার মধ্যে একটা ছিল গঙ্গাজল বেচা। 'richest and most honest merchants of his time.' লং সাহেবের সংগ্রহ করা তথ্য থেকে খবর পাই, তেলেঙ্গানা রাজ্যের যুবরাজ রামরাজা তাঁর নিত্যদিনের দেবপূজায় একমাত্র সেই গঙ্গাজলই ব্যবহার করতেন যাতে বৈষ্ণবচরণের শীলমোহরের ছাপ।

"কলিকাতায় তখন গঙ্গার জল বিক্রি করার ব্যবসা ছিল। ৺বৈষ্ণবচরণ শেঠের পিতার শিলমোহর করা গঙ্গাজল দেশ-বিদেশে যাইত ও ত্রৈলঙ্গ্য দেশে শ্রীশ্রী৺রামচন্দ্রের পূজায় ঐ জল ভিন্ন অন্য কোন জল ব্যবহার হইত না। উক্ত তাঁতি শেঠেরাও কোম্পানীর দালাল ছিল।···কলিকাতার দুর্গের পাশের সদর রাস্তা মেরামত ও পরিষ্কার রাখিবার জন্য কলিকাতার জনার্দন, গোপাল, যদু, বারানসী ও জয়কৃষ্ণ শেঠেরা শেঠের বাগান পাইয়াছিল। তখন কোম্পানীর সনন্দে প্রতি বিঘা তিন টাকার অধিক জমি বিলির হার করিবার ক্ষমতা ছিল না। কলিকাতায় তখন ধান জমির পরিমাণই সর্বাপেক্ষা অধিক, উহার পর তামাক ও পানের বোরোজ ছিল। কোম্পানীর কর্মচারীরা তখন রূপোর বাসনে খাবার খাইত, ও ডাক্তার বা উচ্চ কর্মচারীরা রূপোর ঝালর দেওয়া পাল্কী ও ছাতা ব্যবহার করিত। সেকালে কোম্পানীর দালাল নিয়োগাদির সময় নতুন দালালকে এক বোতল গোলাপজল, পান ও শিরোপা দান করা রীতি ছিল। দালালেরা প্রতি টাকায় আধ পয়সা কমিশন ও সামান্য বেতন পাইত বটে, কিন্তু তদপেক্ষা তাহারা খরিদ বিক্রীর কমিশন ও দরে বেশ পোষাইয়া লইত ও উহাতেই ধনবান হইত।" কলিকাতার কথা।

বেনিয়াগিরিতে তখনকার কলকাতায় শেঠেদেরই দাপট। তারপর বসাক। ব্যবসার জন্যে কোম্পানী যদি অন্য কাউকে দাদন দিত, চটে লাল হয়ে উঠত তারা। ভিন্ন জাতের লোককে দাদন দিলে তারা কোম্পানীর কারবারে নেই, এ-রকম হুমকী দেবার মতও সাহস ছিল তাদের। একবার কাউন্সিলের এক প্রস্তাবে শেঠেদের খাজনা কমিয়ে করা হয় বিঘে প্রতি আট আনা। নিজের এলাকার রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়টা যেহেতু তাদের উপরেই।

মল্লিকরাও প্রাচীন বাসিন্দে কলকাতার। এই বংশের সবচেয়ে পুরনো নাম, রাজারাম মল্লিক।

"সে সময় কলিকাতায় মল্লিকেরা থাকিতেন না; তাঁহারা তখন ব্যবসার জন্য যাতায়াত করিতেন মাত্র। জব চার্নক সেই মল্লিকদের পূর্বপুরুষের পরামর্শে সুতানুটি ও কলিকাতায় আসিয়াছিল ও শেষে তাহারা সেইখানেই

কুঠি করে। সেই মল্লিক বংশের পূর্বপুরুষ রাজারামের সহিত ইংরাজদের ব্যবসার সম্বন্ধ ছিল। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ইংরাজগণের নিকট হইতে সম্রাটের পুরাতন সনন্দ তলব করেন। ইংরাজেরা তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা নতুন বন্দোবস্ত করিবার জন্য নবাবের সেরেস্তায় সেই রাজারাম মল্লিককে পাঠান। তিনি পারশী ও উর্দু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও অবস্থাভিজ্ঞ ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। এদেশে ব্যবসার সুবিধার বিষয় বিজ্ঞ ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্যে তাহা করিতে পারিবে না বলিয়াই রাজারামকে চারি শত টাকা পাথেয় ও দেওয়ানের খাস কর্মচারীর জন্য কতকগুলি উপঢৌকনাদি দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। ইংরাজেরা রাজারামকে এই গুরুতর কর্মের ভার দিয়া ভালই করিয়াছিল। নবাবের অর্থলোলুপ কর্মচারীরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবার পাত্র ছিলেন না। সেইজন্য রাজারাম তাহাদের দাবীর টাকা দেওয়া সম্বন্ধে ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। শেষে যখন হঠাৎ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল, তখন আর কিছুই দিতে হইল না। চারদিকে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

"রাজারামের দেহান্ত হইল, কিন্তু নবাবের কর্মচারীরা রাজারামের চতুরতায় অসন্তুষ্ট হয়। শেষে তাহার বংশধর দর্পনারায়ণের উপর উক্ত কর্মচারীরা কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে সেইজন্য তখন কলিকাতায় দর্পনারায়ণ সগোষ্ঠী বড় বাজারে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে।" কলিকাতার কথা।

এই রাজারামের ছড়িয়ালিতেই ঝগড়া মিটেছিল দুই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর। রাজারাম থাকতেন ত্রিবেণীতে। সেখান থেকে মোগল আমলাদের তাড়া খেয়ে যখন পালিয়ে এলেন কলকাতায়, ইংরেজরা নিজেদের জায়গা তাঁকে ছেড়ে দিলে বিনা খাজনায়। জমি-জমা, ঘর-বাড়ি, দোকান-বাজার সব হল একে একে। পরে দিতে আরম্ভ করেন অল্প খাজনা। রাজারামের দুই ছেলে দর্পনারায়ণ আর সন্তোষ। পুরনো কলকাতার সন্তোষ বাজার নামে জড়িয়ে ছিল তাঁর স্মৃতি। 'কলকাতার আদি বাসিন্দে' নামের অধ্যায়ে এঁদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা।

কলকাতার পুরনো বাসিন্দেদের চালচলন সম্বন্ধে 'কলিকাতার কথা' থেকে আরও কিছু তথ্য।

"তখন লোকে যে যেখানে বাস করিত, তাহার চারিদিক বাঁশ বা কাঠের বেড়া দিয়া হিংস্র জন্তুদিগের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপায় করিতে হইত। সেই বেড়ার মধ্যে গৃহাদি নির্মিত হইত ও উহার পরিচয় অমুকের বেড়া বলিয়া হইত। কোম্পানী যেখানে আসিয়া মালপত্রাদি রাখিত ও তাহাদের

জাহাজের সারেঙ আদি থাকিত, উহাকে সারেঙ বের বলিত। উহা কলিকাতার বড়বাজারে ছিল। সেইখানেই কলিকাতার রাজারাম মল্লিকেরা প্রথম বাস করেন। উহাদের নিকট এক পাঞ্জাবী বাস করিত। তিনি একজন সেকালের কলিকাতার ব্যবসাদার ও পুরাতন বাসিন্দা। তাহার বংশধর কলিকাতার ইতিহাসে একজন প্রধান অভিনেতা বলিলেও বলা যায়। তিনি লাহোর নিবাসী মুলুকচাঁদ টণ্ডন, ব্যবসা করিবার জন্য বাঙলাদেশে বাস করেন। তিনি সুন্দরবনের বিনায়াসলব্ধজাত দ্রব্যাদি লইয়া ব্যবসা করিতেন। তখন সুন্দরবনের বাঁশ, গোলপাতা, উলুখড়, ঘাস, হেঁতাল, বেত, কুচিলা, গালা, হরিতকি, মধু, ও মোম অতি উত্তম ব্যবসার জিনিষ ছিল। মুলুকচাঁদের পুত্র দেওয়ান কাশীনাথ কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে শিব প্রতিষ্ঠা ও জুম্মা পীরের দরগাদি করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আত্মীয় হুজুরীমল কলিকাতার আর একজন নামজাদা বাসিন্দা ছিলেন।"

পুরনো বাসিন্দেদের মধ্যে শেঠ বসাক মল্লিক ছাড়া আর ছিলেন কুশারীরা। পঞ্চানন কুশারীর বাস গোবিন্দপুরে। গঙ্গায় এসে পৌছয় সাহেবদের নৌকো। পঞ্চানন করতেন এই সব জাহাজে মাল তোলা, নামানো, এবং খাদ্য-পানীয় সরবরাহের কাজ। তাঁর অধীনে কাজ করতো একাধিক কুলি মজুর। কুশারীরা ব্রাহ্মণ। পীরালি বামুন। ব্রাহ্মণকে তো নাম ধরে ডাকা যায় না। তাই তারা বলতো 'ঠাকুর মশাই।' সেই শুনে জাহাজের কাপ্তেনদের কাছে তিনি হয়ে গেলেন পঞ্চানন ঠাকুর। নথিপত্রে তাঁর নামের চেহারা দাঁড়াল কখনো Tagore, কখনো Tagoure.

পঞ্চাননের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরাও কাজ নেয় কোম্পানীতে। ১৭৪২-এ কলকাতায় যে জরিপের কাজ হয়, তাতে পঞ্চাননের দুই ছেলে জয়রাম ও রামসন্তোষ ছিলেন আমিনের পদে। ধনসায়রে বাড়ি ঘর। অর্থাৎ ধর্মতলা আর গড়ের মাঠের কাছে। গঙ্গার ধারে বাগান বাড়ি। এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়ম সেইখানে। সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করলেন, তখন তিনি জীবিত। যা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি, সোনা দানা, গয়না গাটি সব নিয়ে ছুটে এসেছিলেন ফোর্ট উইলিয়মে। ১৭৫৬ তাঁর মৃত্যু। এই বংশ থেকেই একদিকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি, আরেকদিকে পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ির জন্ম।

দিশি বাসিন্দেদের কথা ছেড়ে এবার আসি সাহেব-সুবোদের কথায়। তখন কোম্পানীর কাজ-কর্ম হত দু-দফায়। প্রথম, সকাল ন'টা থেকে বারোটা। মধ্যাহ্নভোজের পর আবার বিকেল চারটে পর্যন্ত। এরপর

খানা-পিনা, আড্ডা। বড় হলঘরে নিজের নিজের পদমর্যাদা অনুসারে পর পর খেতে বসত সবাই।

১৭০৬-এ কলকাতায় লোক চলাচলের রাস্তা দুটো। গলি বলতেও নাকি দুটো। পুকুর ১৭টা। পাকা বাড়ি ৮টা। মেটে বাড়ি ৮ হাজার। সিরাজউদ্দৌলার আক্রমণের সময় পাকা বাড়ির সংখ্যা পৌঁচেছিল ৪৯৮-এ। মেটে ঘর ১৪,৫০০। ২৭টা রাস্তা। ৫২টা গলি। ১৩টা পুকুর।

বড়বাজারের বাসিন্দেদের কথা আগেই বলেছি। খাস বাঙালীদের বসবাস সুতানুটিতে। মুখুজ্যে, বাড়ুজ্যে, চাটুজ্যে, পাঠক, ঘোষাল, ঠাকুর, মিত্তির, বোস, ঘোষ, দত্ত, দে, কর, ধর, সোম, সরকার, কুণ্ডু, বসাক, কোঠনা, মল্লিক, রায়, সবাই। সবাই ছিল বটে। কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে যত মান সম্মান পিরালী বামুন, কায়স্থ, তাঁতী আর সোনার বেনের। নিশ্চয়ই তাই ছিল। নইলে ছড়া তৈরী হবে কেন—

পিরালী, কায়েত, তাঁতী আর সোনার বেনে
করলে আবাদ তারা দেশ বয়ে ধন এনে।

সাহেব পাড়ায় বাড়ি ঘর ইঁটের। বড়বাজারের মাঝামাঝি। ইঁটও আছে। মাটিও আছে। সুতানুটির সবটাই মাটির। ছাউনি কোনটা খড়ের। কোনটা গোলপাতার।

কলকাতা বাড়ছে। জমিদারের কাজ কর্মও বাড়ছে সেই সঙ্গে। জমিদারের কাজ বলতে প্রজাবিলি, খাজনা আদায়, ন্যায় অন্যায়ের বিচার, জঙ্গল কাটানো, ডোবা বোজানো, বাজার বসানো, ড্রেন কাটানো, ব্রীজ বানানো, এই সব। তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন পদ। কোতোয়াল, চৌকীদার, পাইক, বরকন্দাজ, শিকদার, ঢাকি, ঢুলি আরও কত কি। এরা দিশি লোকজন। জমিদারীর দপ্তরে খাতা লেখার জন্যে তৈরী হচ্ছে কেরাণীর পদ। গোড়ার দিকে এ কাজটা একচেটিয়া ছিল পর্তুগীজদের। পরে পরে কব্জা করে কায়স্থরা।

কেরাণী পর্তুগীজদের সম্পর্কে লং সাহেবের যে মন্তব্য পাই, সত্যিই মর্মান্তিক। একদিন যাদের দাপটে ভারতবর্ষ থরহরি কম্পমান, তারাই একদিন এদেশে সবচেয়ে নিরুপদ্রব কেরাণী অথবা নির্বিরোধী রাঁধুনী। একে কি বলবো? ইতিহাসের পরিহাস? লং যা লিখেছেন—"The name Portuguese, in the last century, was a bye-ward of reproch, the name Portuguese ayah was synonimous with 'femme de Plaisir' while the men who boasted to be countrymen of Auquerque and the De-casts, became petty keranis or cooks—what fall

for, Persons, whose ancestors, as early as 1563, used to send thirty ships annually from Bengal to Malabar Coasts, laden with Pepper, sugar, cloth and oil." অবশ্য একটা বিষয়ে লং প্রশংসা জানিয়েছেন তাদের। সেটা তাদের ভারতবর্ষ প্রীতির জন্যে। ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে পরের বাড়ির উঠোন ছিল না। হয়ে উঠেছিল নিজের বাস্তুভিটে। 'They made India their home.' ইংরেজদের কাছে যখন ভারতবর্ষ মানেই 'The Eviles,' পর্তুগীজদের কাছে তখন এইটেই স্বদেশ। এমন কি কলকাতা যখন ইংরেজদের কাছে 'a settlement', পর্তুগীজদের কাছে সেটা তখন 'a city.'

এবার তখনকার কোম্পানীর গড়ন-গঠনটার দিকেও একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। খাস বিলেতে থাকেন যাঁরা, তাঁদের মাথায় 'The chairs'. চেয়ারম্যান আর ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদকে একসঙ্গে মিলিয়ে বলা হত 'দি চেয়ার্স'। তারপরেই 'কোর্ট অব ডাইরেকটর্স'। ২৪ জন ডাইরেকটর নির্বাচিত হতেন প্রতি বছর। একনাগাড়ে কারোর চার বছর কাজ হয়ে গেলে তাঁকে বিশ্রাম নিতে হত এক বছরের জন্যে। একে বলা হত 'retirement by rotation,' তারপরের ধাপে একদিকে 'Committees', অন্য দিকে 'Court of Proprietors', কোম্পানীর বিভিন্ন কাজ বা দপ্তর ভাগ বাটোয়ারা করা থাকতো বিভিন্ন কমিটির উপর। যেমন 'Committee of Secrecy-র' কাজ ছিল রাজনৈতিক বিষয় দেখাশোনা। এ ছাড়া ছিল 'Committee of Correspondence', 'Treasury Committee', ইত্যাদি।

কোম্পানী বিভিন্ন দেশে, ভারতবর্ষে, চীনে, পাঠাতো নিজেদের প্রতিনিধি। কোর্ট অব প্রোপ্রাইটরস নির্বাচিত বা মনোনয়ন করতেন শেয়ার হোল্ডার্সরা।

কলকাতা আর মাদ্রাজে ব্যবসা বাণিজ্যের সর্বময় কর্তা কাউন্সিল আর তার প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্টেরই অন্য নাম গভর্ণর। কাউন্সিলে গভর্ণরের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা বা Overriding Power বলে কিছুই থাকতো না। থাকতো কেবল নিজের সাধারণ ভোট আর একটা কাষ্টিং ভোট।

কাউন্সিলের অধীনে একদিকে 'সিনিয়র মার্চেন্ট'। অন্য দিকে 'সাবর্ডিনেট ফ্যাক্টরিজ'। সিনিয়র মার্চেন্টদের প্রমোশন হত সিনিয়রিটি অনুযায়ী। তার নীচে 'জুনিয়র মার্চেন্ট'। তার পরের ধাপে 'Factors'. সবার শেষে 'রাইটার'। রাইটাররা আসতো বিলেত থেকে। তাদের হাতে-পায়ে নানান রকম বিধি নিষেধের শিকল পরানো। পালকী চড়তে পারবে না। সন্ধে হলেই ফিরে

আসতে হবে যার যার ডেরায়। আমোদ-ফুর্তি, বাবুগিরি বারণ। হোটেল-বাজি কিম্বা সভা-সমিতি, ক্লাব কফি হাউসে হুল্লোড় নিষিদ্ধ। গোড়ায় গোড়ায়, নতুন দেশে এসে, সকলেই খানিকটা সুবোধ বালকের মত চালচলন দেখাতো। তারপর এখানকার জল-হাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাবার পর সকলেই শিখে যেত আইন-না-মানার ফন্দি-ফিকিরগুলো। রাইটারদের তখন একমাত্র লক্ষ্য মাইনে ছাড়া আরও অতিরিক্ত টাকা। আরও বিলাসিতা, আরও সুখ, আরো আরাম, আরো বাবুগিরির জন্যে তারা চালাতো গোপন ব্যবসা। ক্লাইভের যুগে একজন রাইটারের বেতন ছিল বছরে পাঁচ পাউণ্ড। একজন সিনিয়র মার্চেন্টের চল্লিশ পাউণ্ড। পরে অবশ্য বেতন আর ভাতা আরো বেড়েছিল। পাঁচ পাউণ্ডে কার চলে? কতটুকু নবাবি হয় এই ধুলো পরিমাণ টাকায়? অতএব ঘুষ।

Muttrasaw অর্থাৎ মথুর সাহা। Ramnarrain অর্থাৎ রামনারায়ণ। Rupsuliman অর্থাৎ রূপ সুলেমান। Rogonaut অর্থাৎ রঘুনাথ। Ramchund Pramanik অর্থাৎ রামচাঁদ প্রামানিক। Muddcaun অর্থাৎ মধু খাঁ। Rogoodee অর্থাৎ রঘু দে। Horkissin cotma অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ কোটমা। Giachund Saw. অর্থাৎ গুইচাঁদ বা গয়াচাঁদ সাহা। সংখ্যায় এরা ন'জন। বণিক। হুগলীর কুঠিতে মাল জোগানো এদের ব্যবসা। গুদাম-সাহেব হলেন এলিস। তাঁর হাড়ে-মাসে লোভ। বিলাসী নবাব সাজার ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষায় তিনি টই-টম্বুর। তাই ঘুষের জন্যে হাত পাতা সর্বদাই। অবশ্য তখনো ইংরেজদের সত্যিকারের নবাবী যুগ শুরু হয়নি। সেটার শুরু পলাশী যুদ্ধের পর থেকে।

উপরে বিচিত্র ইংরেজী বানানে যে ন'জন ব্যক্তি, তাঁরা একটি আবেদনপত্রের সাক্ষরকারী। তখন হুগলীর এজেন্ট হেজেস সাহেব, তাঁর কাছে। হুঁজুর, দফায় দফায় আমাদের রোজ বাধ্য করা হচ্ছে উৎকোচ দিতে। কখনো টাকা। কখনো মলমল। কখনো রেশম। কখনো অন্যান্য জিনিষ। আপনি এর প্রতিকার করুন।

যে-কোন কুঠির এজেন্ট-ই তখন সর্বেসর্বা। তাঁর মাইনে বছরে একশো পাউণ্ড। ১৬৮২-র পর থেকে দুশো পাউণ্ড। কুঠিয়াল এজেন্টের অনুমতি ছাড়া বাইরে যাওয়ার অধিকার নেই কারোর। কুঠির ভিতরেই খাওয়া-দাওয়া, মদ্যপান। রবিবার ছুটির দিন। সেইদিন শিকার। শিকার থেকে ফিরে এসে গলা ডুবিয়ে পান ভোজন। বিলেতী মদ দামে চড়া। তার দিশির সঙ্গে গলায়

গলায় ভাব। নেশা যখন মাথা পর্যন্ত চড়ে বসল, তখন শুরু কোঁদলের। 'The Enlish in Bengal were equally notorious for their quarrels." ঝগড়া থেকে মারামারি, হাতাহাতি। এই সব ব্যাধি ছাড়াও আরও যা ছিল তা হচ্ছে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ।

জমিদারী বাড়ছে। তার সঙ্গে নিয়ম-কানুনও বদলাচ্ছে। কোম্পানীর এলাকার মধ্যে কোনও ইংরেজ হয়তো মারা গেল উইল করে। কিন্তু নিয়ম হল, সে-উইল কাউন্সিলে পেশ না না করলে বৈধ হবে না। কোনও ইংরেজের বিয়ে করতে হলেও লাগবে কোম্পানীর লাইসেন্স। দিতে হবে ট্যাক্স। কোম্পানীর কোনো নতুন আদেশ বা বিজ্ঞাপন জানানো হত ঢেঁড়া পিটিয়ে। নোটীশ ঝুলিয়ে দেওয়া হত ফোর্ট উইলিয়মের দরজায়। তিনটে ভাষায় একসঙ্গে। ইংরেজী, উর্দু, বাংলা।

কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারীরা অপরাধ করলে, শাস্তি ব্যবস্থা ছিল ছ' রকমের।

১। কেউ যদি রাত্রে না ফেরে কিংবা ফেরে রাত্রি ৯টায় ফটক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, তাহলে ১০ টাকা জরিমানা।

২। শপথ না করলে জরিমানার পরিমাণ ১ শিলিং। অথবা তিন ঘণ্টার কয়েদ-খাটা।

৩। মিথ্যে কথা বললে প্রত্যেক মিথ্যে কথার জন্যে ১ শিলিং।

৪। মাতলামি করলে ৪ শিলিং।

৫। উপাসনার সময় যদি কেউ গরহাজির থাকে, জরিমানা ১ শিলিং।

৬। যদি কেউ আসক্ত হয় পরস্ত্রীর উপর, কুমারী মেয়ের সঙ্গে নষ্টামি করে যদি কেউ, পাপ কাজে যায়, শান্তি ভাঙে কুঠির নিয়ম-নীতি না মেনে, সব সময়েই কলহ-বিবাদে গলা ফাটায়, আর প্রথম পাঁচটা আদেশ বা নির্দেশ বারংবার অমান্য করে, তাহলে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হত মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ ফোর্টে। সেইখানেই চূড়ান্ত বিচার। চরম শাস্তি।

১৭০৫। কাউন্সিলের আদেশ, দেশীয় অধিবাসীদের জরিমানা থেকে যে টাকা উঠবে, তা দিয়ে বোজানো হবে খানা, ডোবা। তৈরী হবে নালা-নর্দমা, জলনিকাশের। কলকাতায় মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার শুরু এই সময় থেকেই।

সেই সঙ্গে সাবধান বাণী। এলোমেলোভাবে বাড়ি করা চলবে না। ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে কেউ যদি পাঁচিল তোলে, দেয়াল গাঁথে,

কি পুকুর কাটায়, জরিমানার শাস্তি পেতে হবে। এ নির্দেশ বিশেষ কেউ মেনেছিল তেমন প্রমাণ নেই।

প্রত্যেক সপ্তাহের গোড়ায় কেল্লার ভিতরে কাউন্সিলের সব সদস্যরা মিলে আলোচনায় বসতেন। বিষয়, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি। ১৭০৪ থেকে নিয়ম, এক একজন সভাপতিত্ব করবেন, এক এক সপ্তাহে। কাউন্সিলের মিটিং বসেছে। সেক্রেটারীর তখন প্রথম এবং প্রধান কাজ টেবিলের উপরে একটা পাত্রে জল আর আরেকটা পাত্রে 'আরক' নামের মদ রেখে দেওয়া। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে যে-সদস্যের যেমন দরকার, সেই রকম পাত্রের দিকেই ঘন ঘন হাত বাড়াবেন তিনি।

কাউন্সিল-সদস্যের খাতির শুধু কনসালটেশন-টেবিলেই নয়। ঘরে যতখানি, ঘরের বাইরে তার চেয়ে ঢের বেশী। লণ্ডন থেকে কাউন্সিল সদস্য বা জজেরা যে মুহূর্তে পা ফেলতেন এদেশের মাটিতে, অমনি ফোর্ট উইলিয়ম থেকে তোপ ধ্বনি।

তখন গভর্নর বা পদস্থ রাজকর্মচারীদের বায়ু-পরিবর্তনের জায়গা ছিল নদীয়া। কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারীদের নিয়মিত আড্ডাখানা ছিল শ্রীমতী ডেমিঙ্গো অ্যাশ্-এর বৈঠকখানায়। ঐখানে বসেই 'আরক' মদের ফোয়ারা। গল্প-গুজব। নতুন জাহাজে কারা এল স্বদেশ থেকে, এল নতুন কি খবরাখবর, তাই নিয়ে মত্ত মজলিশ।

কলকাতায় তখন মদও ছিল, গাঁজাও ছিল। প্রত্যেক মদওয়ালা লাইসেন্স পেত দিনে সাড়ে বারো গ্যালন মদ বেচার। লাইসেন্স ফি পাঁচ টাকা। এর চেয়ে বেশী করতে যায় যদি কেউ, পাবে। তখন লাইসেন্স ফি-এর অংকটা চড়া। গাঁজাওয়ালাদের ফি ছিল দিনে ৮ আনা।

"১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে খাস কলিকাতা শহর ভিন্ন অন্যত্র মদের দোকান ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিক রাত্রি পর্যন্ত মদের দোকান খুলিয়া রাখিবার নিয়ম ছিল না। তখন সেন্ট জন গির্জার নিকট ইউনিয়ান ও রাইটার্স্ নিউ ট্যাভার্ণ এবং এক্সচেঞ্জ ক্রাউন ও এংকর নামে চারিখানি আর প্রসিদ্ধ হারমনিক্ ট্যাভার্ণ এইগুলি বিলিতি মদের দোকান ছিল। আরক, পাঞ্চ এবং সিরাজ মদটাই খুব বেশী প্রচলিত ছিল। বিলাতি মদ ও বিয়ার খুব বিলাসের সামগ্রী ছিল।" প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়।

একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে শপথ করার প্রসঙ্গ। শপথ না করলে জরিমানার কথা। এই শপথ জিনিষটা হল, কোম্পানীর কাজ ছেড়ে কেউ যখন

দেশে ফিরে যেত, তাদের শপথ করে বলতে হত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণটা কতখানি। এবং তা এত টাকার বেশী নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দিয়েছিল কোম্পানী। তার চেয়ে বেশী হওয়া চলবে না। সিনিয়র মার্চেন্টদের বেলায় সর্বোচ্চ আয়ের পরিমাণ ২৮ হাজার টাকা। জুনিয়রদের ২৪ হাজার। সাধারণ কেরাণীর ১৯ হাজার ২০০ টাকা।

সাধারণ ইংরেজ কর্মচারীদের তখন পালকী চড়ার অধিকার ছিল না। প্রধান-প্রধান কর্মচারী আর তাদের সহকারীরাই পেত সে-সুযোগ। অন্যান্য কর্মচারী বা রাইটাররা ছাতা মাথায় দিয়ে চলতো। পয়সা ফেললেই পথের ধারে যে-কোন জায়গায় মিলতো ছাতাবরদার।

বিচারের আসর বসতো প্রত্যেক শনিবারে। সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত।

উন্নতি হচ্ছে শহরের। নতুন নতুন বাজার হচ্ছে। খাল কাটানো হচ্ছে। সাঁকো হচ্ছে। তার প্রমাণ জোড়াসাঁকো। রাস্তা ঘাট হচ্ছে। ইংরেজদের সব আছে। বাড়ি। বাড়ির সামনে বাগান। বেড়াবার জায়গা। তাহলে কি নেই? নেই গীর্জা। একটা সময় ছিল যখন কলকাতায় ছিল মোটে দুখানা পাকা বাড়ি। সে উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। তার মধ্যে একটা হল সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের কাছারী বাড়ি। আরেকটা পর্তুগীজদের প্রার্থনা গৃহ। অর্থাৎ Mass House. চার্নকের সুতানুটিতে পা দেওয়ার অনেক আগে থেকেই এর অস্তিত্ব। ইংরেজদের গীর্জাও নেই। পাদরীও নেই। ফোর্ট উইলিয়মের একটা স্যাতসেঁতে অন্ধকার ঘরে বসেই কোনমতে উপাসনাটা সেরে নিতো। কাউন্সিলেররই কোন বয়স্ক কিংবা মাতব্বর সদস্যকে সাজিয়ে নেওয়া হত সাময়িক পাদরী। নিজের সাধারণ সাজ-পোষাকের উপর একটা কালো কোট চাপিয়ে তিনি পড়ে যেতেন সারমন।

১৭০৯। ৫ জুন। রবিবার। চাঁদা তুলে ইংরেজরা গড়ল নিজেদের গীর্জা। নাম হ'ল, সেন্ট অ্যান্স গীর্জা। ইংলণ্ডের রাণী কুইন এ্যানকে মনে রেখে। কাউন্সিল দিয়েছিল জমি। বিলেত থেকে এল গীর্জায় ঝোলাবার ঘন্টা। সেই সঙ্গে একজন পাদরী। নাম উইলিয়াম আণ্ডারসন। কলকাতায় ছিলেন মাত্র দুবছর। ১৭১১। ভাঙা শরীর জোড়া লাগাতে যাচ্ছিলেন মাদ্রাজে। পথেই মারা গেলেন জাহাজে।

সে-গীর্জা আজ আর কোথাও নেই। ছিল তখনকার পুরনো ফোর্ট উইলিয়মের

গায়ে। এখনকার রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পশ্চিম দিকে। বাজ পড়ে জখম হয়েছিল একবার। ১৭৩৭-এর ভয়াবহ ঝড়ে ধ্বংস হয়েছিল খানিকটা। মেরামতি করে যদিবা খাড়া করা হয়েছিল, সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা জয় করে ফিরে যাওয়ার সময় ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে যান ধুলোয়।

"Funerals were a daily occarance despite the small numbers of the British Colony." এই ছিল আদি কলকাতায় রোগ-শোকের চেহারা। এই প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন হ্যামিলটনের এক ভয়াবহ হিসেব। ১৭০০-এ ১২০০ ইংরেজ ছিল কলকাতায়। পরের বছরের জানুয়ারীতে সে সংখ্যা নীচে নেমে দাঁড়াল ৪৬০। "The Company has a pretty to good hospital at Calcutta, where many go in to undergo the penance of physic, but few come out to give an ,account of its operation." এই সকরুণ মন্তব্যও তাঁর। অসুখের মধ্যে প্রধান হল, ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর। তা ছাড়াও ছিল কলেরা, আমাশয়। তৈরী হল হাসপাতাল। এখনকার সেন্ট জন চার্চের পুব দিকে। পাশেই গোরস্থান।

ক্রমওয়েলের আমলে লণ্ডনে দুটো দল। একদল কোম্পানীর স্বাধীনতার পক্ষে। আরেকদল সেটাকে সরকারী আওতায় আনার দিকে। যারা কোম্পানীর সরকারীকরণের বিপক্ষে তাঁদের মুখে মুখে তখন ঘুরতো-ফিরতো একটা ছড়া।

I was well.
I would be better.
I took physic.
And here I die.

এই ছড়া কোম্পানীর সরকারীকরণের ব্যাপারে যতটা সত্যি, তার চেয়ে ঢের বেশি সত্যি তখনকার কলকাতার চিকিৎসা বিভ্রাট প্রসঙ্গে।

মারী মড়ক আছে। বন জঙ্গল আছে। জঙ্গলে বাঘ-ভালুক আছে। জলে বিষ আছে। ডাঙায় লোভ-লালসার ছোবল। তবু কলকাতা থেমে নেই। বেড়ে চলেছে তরতরিয়ে।

পশ্চিমী সিপাইরা পেটের জ্বালায় কলকাতায় ছুটে আসতো চাকরীর লোভে। গোড়ায় গোড়ায় মন টিকতো না হয়তো। তাই হাতে খৈনি টিপতে টিপতে গাইতো এই গান—

দাদ হোয়, খাজ হোয়

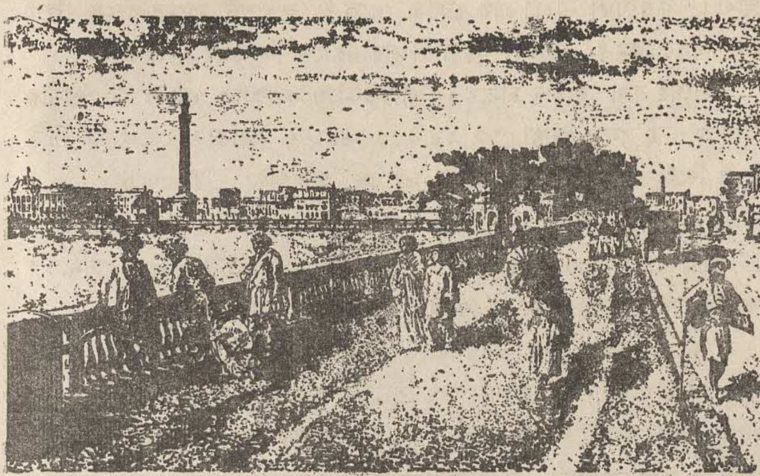
আর হয় হৌ হোহা

কলকাত্তা নাই যাও

খাও মৌহা।

পশ্চিমী সিপাইরা যতই বারণ করুক, কলকাতায় লোক আসার বিরাম নেই। এমন কি হুগলীর ফৌজদাররাও ছুটে আসেন বেড়াতে। দেখে অবাক। একি কাণ্ড! ছিল এঁদো জমি। একি রাজ্যপাট গড়ে উঠছে দিনকে দিন!

একবার পারস্যের রাজদূত কলকাতায় হাজির। যাচ্ছিলেন হুগলী থেকে দিল্লীতে। নেমে পড়লেন মাঝপথে। কলকাতার চেহারা, চাল-চলন দেখে মুগ্ধ। যাবার সময় বলে গেলেন, দিল্লীর বাদশার কাছে কোম্পানীর হয়ে দু-চার কথা বলবো নিশ্চয়ই। তার কিছুদিন পরে ঘুরে গেলেন পেগু-রাজ্যের রাজদূত। তিনিও দেখেশুনে স্তম্ভিত। স্তম্ভিত সকলেই। সেই যে ছড়ায় আছে, বন থেকে বেরোল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে, এ যেন সেই রকমই এক কাণ্ড। কলকাতার মাথায় সত্যিই তখন সৌভাগ্যের টোপর।



॥ কলকাতার নাম ধাম ॥

ঐতিহাসিকের নাম উইলসন। তাঁরই একটা বিচক্ষণ মন্তব্য—

"The fact remains that Charnock, and Charnock alone, founded Calcutta". উইলসনের সমর্থনে আর এক ঐতিহাসিকের সওয়াল—

"In selecting Sutanuti as the place for the chief settlement in Bengal, Job Charnock made his choise delibarately and well."

এঁর নাম ডবলিউ. কে. ফার্মিঙ্গার। একদা ছিলেন বিখ্যাত বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেসেন্টের সম্পাদক। আর ক্যালকাটা হিষ্টোরিক্যাল সোসাইটির সভাপতি।

পত্রিকার নাম, সমাচার চন্দ্রিকা। তারিখ ২৩ ডিসেম্বর। সাল ১৮২৬। মন্তব্য -- "মেং চার্নক সাহেব ১৬৯২ সালের ১০ জানুয়ারীতে পরলোকগত হন। কিন্তু যদ্যপি পরমেশ্বর মৃত ব্যক্তিদিগের জীবিতদের ন্যায় দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা দিতেন তবে এই মেং চারণক সাহেব আপন স্থাপিত এই দেশ (কলিকাতা) এতাদৃশ সুশোভিত দেখিয়া কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন তা বক্তব্য নহে ; যাহা হউক ঐ সাহেবের নাম কীর্তি দ্বারা অদ্যাপি সুপ্রকাশিত আছে এবং সকলের প্রার্থনা এই যে এই মহানগর কলিকাতার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক।"

বর্তমান পরিচ্ছেদের উপলক্ষ্য অবশ্য চার্নক নন। তাঁর তৈরী কলকাতাও নয়। দিনে দিনে অথবা উত্তরোত্তর যে-শহরটা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে বলে সংবাদপত্রে এত আনন্দ উল্লাস, আমাদের উদ্দেশ্য, তার নামকরণের ইতিহাসটা

জানা। কলকাতা নামটা এল কোথা থেকে? সুতানুটি নামের উৎস কি? গোবিন্দপুর কেন? চৌরঙ্গী অথবা চীৎপুর জন্মালো কি ভাবে? ইত্যাদি।

আগেই বলা হয়েছে চার্নকের জীবিতকালে কলকাতা নামটা কোম্পানীর কাগজে-পত্রে লেখা-জোখা শুরু হয়নি। ১৬৯১-এ কলকাতা থেকে যে চিঠি গেছে বিলেতের ডিরেকটরদের কাছে, তাতেও সুতানুটি। "They lived in a wild and unsettled condition at Chutanutee, neithcr forfified houses, nor godowns, only tents, huts and boats." চার্নকের জামাই চার্লস আয়ারের আমল থেকে সুতানুটির বদলে কলকাতা।

মৃত ব্যক্তিকে ঈশ্বর চোখ দিলে চার্নক কলকাতা দেখে কতটা খুশী হতেন তার পরিমাপ করা অবশ্যই আমাদের সাধ্যের বাইরে। তবে সুতানুটির নাম বদলে কেন কলকাতা হল, সন্দেহ নেই, সে বিষয়ে আমাদের মতই কৌতূহল ছড়াতো তাঁর দুচোখে। সুতানুটি দিয়ে দিয়েই শুরু করা যাক।

চার্নক আগমনের বহু আগে থেকেই এখানে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ আর আর্মেনিয়ানদের আনাগোনা। তাদের সঙ্গে ব্যবসার খাতিরে সপ্তগ্রাম ছেড়ে চলে আসে চার ঘর বসাক আর এক ঘর শেঠ। বসাল হাট। সেই সঙ্গে ঘাট। সুতানুটির নামেই। পর্তুগীজদের জাহাজ এসে থামে সেই ঘাটে। চলে বেচাকেনা। শেঠ বসাকরা তন্তুবায় হলেও, নিজে হাতে সুতো কাটে না বা তাঁত চালায় না। নিজেরা সুতো কিনে বুঝতে দেয় স্থানীয় তাঁতিদের। এই ফাঁকে বসাকদের সম্বন্ধে বলে নিতে হয় কিছু কথা। বসাকরা আগে ছিল বস্থক।

"বসাক বা বস্থকদিগের আদি বাসস্থান সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের একটি পুষ্করিণী তাঁদের নামানুসারে 'বসকা-দীঘি' বলিয়া খ্যাত। সপ্তগ্রামে, বাসকালে, বসাকদিগের 'বসক' উপাধি ছিল। কলিকাতায় আসিবার পর তাহা 'বসাকে' পরিবর্তিত হয়।

"সপ্তগ্রামের পতন দেখিয়া তথাকার শেঠ ও বস্থকেরা বেতোড়ের (বর্তমান ব্যাটরা) বাণিজ্যে লাভবান হইতে প্রয়াসী হন। কলত্রীশ গোত্রীয়, যাদবেন্দ্র বসাক মহাশয় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতার সন্নিকটবর্তী গোবিন্দপুরে বাস করিতে আসেন। এই সময়ে শেঠ বংশীয় মুকুন্দরাম শেঠও গোবিন্দপুরে গ্রামবাসী হন। ইহার প্রপৌত্র গোপীমোহন ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'দাদ্‌নী-বণিক' ছিলেন।" কলিকাতা সেকালের ও একালের।

লাগল দিনকে দিন। নজর পড়ল ডাকাতদের। তারপর সত্যি-সত্যিই ডাকাত পড়ল একদিন বাড়িতে। ডাকাতের হাতে মারা গেলেন তিনি। বয়স তখন ৭০। ছেলে বলরাম ঘোষ বিধবা মাকে নিয়ে পালিয়ে এলেন চন্দননগরে। সেইখানে ব্যবসা-বাণিজ্য। নাম ডাক। অগাধ সম্পত্তি। ১৭৫৬। ৯৫ বছর বয়সে মারা গেলেন বলরাম ঘোষ। দুই ছেলে। রামহরি আর শ্রীহরি। ইংরেজরা যখন চন্দননগর দখল করল, দুই ভাই চলে এলেন কলকাতায়। এই শ্রীহরি ঘোষের নামেই প্রসিদ্ধ প্রবাদ, 'হরি ঘোষের গোয়াল।'

'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়ে' চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরের বিবরণ—

"বাগবাজারের গঙ্গার ধারের এই চিত্রেশ্বরী দেবী অতি প্রাচীন। শুনা যায়, চিত্তে নামক এক দস্যুদলপতির দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই দেবীর নাম হইতেই চিৎপুর নাম হইয়াছে। এখানে বহুসংখ্যক নরবলি হইত বলিয়া জনপ্রবাদ আছে। এই জঙ্গলময় পথ ধরিয়া চৌরঙ্গীর জঙ্গল মধ্যস্থ পথাবলম্বনে কাপালিক ও সন্ন্যাসীরা কালীঘাট যাইত।"

ঐ একই বইয়ে অন্যত্র কিন্তু চিত্রেশ্বরীর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে মনোহর ঘোষ-এর নাম। 'কলিকাতার কথা'তেও রয়েছে মনোহর ঘোষ-এর পক্ষে সমর্থন।

কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন পথ এই চীৎপুর। ইংরেজরা বলত 'Road to Kalighat'. মোগল-আমল থেকেই এই রাস্তার চল্। মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় ঢোকার সে সময়ে ঐ একটিই রাস্তা। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে শুরু। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে শেষ। পলাশীর আগে সিরাজ কলকাতায় এসেছিলেন এই পথেই। সেনাপতি তখন মীরজাফর। চীৎপুরেই তাঁবু পড়েছিল সৈন্য-সামন্তের।

চীৎপুরের গায়ে ছিল পেরিন সাহেবের (Captain Perrin) বাগান। 'রমণীয় এবং সুবিস্তীর্ণ। সকাল-সন্ধে সাহেব-মেমরা হাত ধরাধরি করে মেটাতো ভ্রমণ সুখ।'

"এই বাগান হইতে বাগবাজার নাম হইয়াছে। এই স্থান তখন কোম্পানীর সৌখিন চাকরদের একটি আনন্দ নিবাস ছিল। আনুমানিক ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে যাওয়া কমিতে থাকে; ১৭৫২ হইতে যাওয়া বন্ধ হয়। পরে বে-মেরামতে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। এবং পরিশেষে ক্যাপ্টেন পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যে স্কট (Colonel Scott) সাহেবের নিকট বিক্রয় করেন।" প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়।

এ সম্বন্ধে আরও অতিরিক্ত তথ্য পূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভট সাগর-এর একটি রচনায়।

"জব চার্নক আসিবার কয়েক বৎসর পরেই (১৭০৫ খৃষ্টাব্দে) পেরিন সাহেব (Captain Charles Perrin) বাগবাজারে বাগান ও বাজার বসাইয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার-ঘাটে তাঁহার তিনখানি জাহাজ বাঁধা থাকিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মালপত্র লইয়া যাইবার ও আনিবার জন্যই জাহাজের প্রয়োজন ছিল। পেরিন সাহেব তাঁহার বাগান ও বাজার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিক্রয় করেন। জোফানিয়া হলওয়েল (Zophania Halwel) সাহেব ইহা প্রকাশ্য নিলামে (১৭৫২ খৃষ্টাব্দে) ২৫০০ (মতান্তরে ২৫০০০) টাকায় খরিদ করিয়াছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে স্কট সাহেব (Colonel Barolene Frederik Scott) ইহা হলওয়েল সাহেবের নিকট হইতে ক্রয় করেন। এই স্কট-কন্যা মেরী ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর প্রথমা সহধর্মিণী ছিলেন। সুতরাং হেষ্টিংস বাগবাজারের জামাইবাবু। স্কটের মৃত্যুর পরে তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ বুচানন (Captain Jon Buchanan) সাহেব এই বাগান ও বাজার ক্রয় করিয়া পরিশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ৪০০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন।"

এই প্রাবন্ধিকের রচনা থেকে বাগবাজার সম্বন্ধে আরও বহু নতুন তথ্য জানতে পারি আমরা। যেমন বাগবাজার ষ্ট্রীটের আগের নাম। Old Powder Mill Bazar Factory Road. পরে আপজন যখন মানচিত্র বানালেন কলকাতার, তখন নাম হল, Old Powder Mill Bazar Road. সেটা ১৭৯৪-এ। ১৮০০-য় ইংরেজ কোম্পানী আদেশ জারী করে নাম পালটেছিল কলকাতার অনেক রাস্তাঘাটের। সেই থেকে বাগবাজার। এখানে 'বাঘ' বিক্রী হত বলে বাগবাজার নাম হয়েছে, তা নয়। পেরিন সাহেবের বাগান আর বাজার এই দুয়ে মিলে বাগবাজার। তবে এর একটা দ্বিতীয় নামেরও সন্ধান পাই তাঁর রচনায়। সেটা হল 'বারুদখানা।'

"ওয়ারেন হেষ্টিংসের পূর্বপক্ষের শ্বশুর স্কট সাহেব এই স্থানে একটি বারুদের কারখানা করিয়াছিলেন। এই হেতু বাগবাজারের অন্য একটি নাম 'বারুদখানা'। কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী, মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, নন্দলাল মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সরকার, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাচীন অধিবাসীগণ 'বাগবাজার' না বলিয়া 'বারুদখানাই' বলিতেন।"

তখন ঐখানে ছিল একটা আটকোণা কেল্লা। নাম দুটো। Bagbazar Redoubt, অথবা Perrin's Redoubt. কোম্পানী সেটা তৈরি করার ভার দিয়েছিলেন দুজন সাহেবের কাঁধে। একজনের নাম O' Hara, সিভিলিয়ান। আর একজন Simpson, সাধারণ কর্মচারী। তৈরী হয়েছিল ১৭৫৫-য়। এই

বারুদখানা সম্বন্ধে দ্বিতীয় মত হল মারাট্টা খাতের দক্ষিণে ইংরেজ সেনাপতি হলওয়েল-এর সঙ্গে ঐখানে যুদ্ধ হয়েছিল সিরাজের সৈন্যের। সেই থেকে বারুদখানা।

প্রাচীনকালে চীৎপুর রোডের আর এক বড় আকর্ষণ ছিল মদনমোহন আর সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির। চীৎপুর রোডের উপরেই মদনমোহনতলা। বিরাট দোতলা বাড়ি। ভিতরে বিরাট নাটমন্দির। মহাসমারোহে উৎসব হয় দোল, ঝুলন আর রাসে। এই দেবতা সম্বন্ধে রয়েছে এক কিম্বদন্তী। বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহ। একবার টাকার টানাটানি পড়ল। তখন বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে নিজের গৃহদেবতা সোনার মদনমোহনকে বন্ধক রেখে কর্জ করলেন এক লক্ষ টাকা। তারপর যথাসময়ে রাজা দামোদর যখন এলেন কর্জের টাকা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে নিজের গৃহ-বিগ্রহকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, তখন গোকুল মিত্র যেটা ফিরিয়ে দিলেন সেটা আসল নয়, নকল। এই আসল এবং নকল মদনমোহনকে কেন্দ্র করে সেকালে ছড়া এবং গান রচনা হয়েছিল একাধিক। লোকের মুখে মুখে ফিরতো সে সব।

১। স্বুবুদ্ধি রাজার কুবুদ্ধি ঘটিল
সোনার মদনমোহন বাঁধা দিয়ে গেল।

২। কারুর কিছু হারিয়েছে
বাগবাজারের মদনমোহন পালিয়েছে।

৩। বাগবাজারে এসে ঠাকুর রহিলেন বোসে
বিষ্ণুপুরের শ্রীমন্দিরে পাথর পড়ে খসে।
রাজা কাঁদেন, রাণী কাঁদেন, কাঁদেন প্রজাগণ
পূজারী ব্রাহ্মণ কাঁদেন হয়ে অচেতন।
হাতী শালে হাতী কাঁদে, ঘোড়ায় না খায় পানি
বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন গোপাল সিংহের রাণী।
রাজা ডাকে গোকুল মিত্র শুনহে বচন
টাকা লয়ে দেও আমার মদনমোহন
মিত্র বলে মহারাজা কোয়ালা দেখ আছে
বন্ধক নয়, মদনমোহন বিক্রী করে গেছে।

গোকুল মিত্রদের আদি নিবাস বালি। বাবা সীতারাম মিত্র। কোম্পানীর নিমক মহলে কাজ ছিল গোকুল মিত্রের। অর্থাৎ নুনের ব্যবসা। তার থেকেই অগাধ বিষয়-আশয়। সঙ্গে-সঙ্গে দেবভক্তি। তারপর ঐ দেবতার মূর্তি ও

মন্দির। ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণে ছিল বিরাট দীঘি। উৎসবের দিনে চারখানা নৌকোয় কবিগান হত মেয়েদের। সং এবং তামাসার আসর বসত ডাঙায়। মন্দিরের কাছাকাছি জায়গায় সাজানো হত রাধাকৃষ্ণের বিষয়ে ছবি টাঙিয়ে। এক সময় কবি রামপ্রসাদ সেন ছিলেন গোকুল মিত্রের সরকার। অনেকের ধারণা উপরের তিন নম্বর গানটি তাঁরই রচনা।

এরপর সিদ্ধেশ্বরী দেবীর কথা। মন্দিরের নাম নবরত্নমন্দির। হলওয়েলের আমলে গোবিন্দরাম মিত্র ডাকসাইটে লোক। কুমোরটুলির মিত্র বংশের আদি পুরুষ। কলকাতার ব্ল্যাক ডেপুটি। এটি তাঁরই তৈরী। সময়টা আনুমানিক ১৭৩০। শোনা যায় এখনকার অক্‌টরলোনী মনুমেণ্টের চেয়ে উঁচু ছিল সেই মন্দিরের চূড়ো। ১৮৪০-এর ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ে। সাহেবরা একে বলতো ব্ল্যাক-প্যাগোডা। কেউ কেউ আরো একটু আদর করে 'মিত্রের প্যাগোডা'।

এই সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে নিয়ে এক সময় 'সমাচার দর্পণে' যে সংবাদ বেরিয়েছিল সেটা উল্লেখযোগ্য। তারিখ ১২২৬-এর ২৭ অগ্রহায়ণ।

"মোং কলিকাতা বাগবাজারের রাস্তায় এক সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা আছেন। তাঁহার নিকটে অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পূজা দেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রতিদিন বিশ ত্রিশজন চণ্ডীপাঠ ও স্তব কবচাদি পাঠ করেন এবং ধনবান লোকেরা স্বর্ণ রৌপ্যাদি গঠিত অনেক অলঙ্কার তাঁহাকে দিয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে অনেক লোক মানত পূজা বলিদানাদি অনেক করেন।

"সম্প্রতি গত সপ্তাহে জ্যোৎস্না রাত্রিতে অনুমান হয় ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে এক চোর তাঁহার ঘরের জানালা ভাঙিয়া অনুমান পাঁচ সাত হাজার টাকার স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়াছে। পরে থানায় খবর লইলে বরকন্দাজেরা অনুসন্ধান করিতে করিতে এক বেশ্যার ঘরে সেই অলঙ্কার কতক পাইল এবং সে বেশ্যাকে তখনি কয়েদ করিল। ঐ বেশ্যার প্রমুখাৎ শুনা গেল যে এক ব্যক্তি কর্মকার জাতি চুরি করিয়াছে ; ঐ বেশ্যালয়ে তাহার গমনাগমন আছে কিন্তু সে কামার পলাইয়াছে, সে ধরা পড়ে নাই।"

সমাচার দর্পণে চীৎপুর সম্পর্কেও একাধিক সংবাদ। ১২২৮। ২৮ শ্রাবণ।

"দক্ষিণে চাঁদপাল ঘাট অবধি উত্তরে চিৎপুর পর্যন্ত গঙ্গার তীরে যে রাস্তা হইতেছে এই রাস্তা প্রশস্ত হইলে শহরের শোভা অধিক হইবে এবং মহাজন লোকেদের নামানোর ও জিনিশপত্র উঠানোর ভাল হইবে ও সাহেব লোকেদের বায়ু সেবনার্থে উত্তম হইবে। এবং ধর্মতলা হইতে যে রাস্তা বহুবাজার পর্য্যন্ত

আসিয়াছে তাহার একদিকে যে নতুন পুষ্করিণী কাটান গিয়াছে, সে মৃত্তিকা দ্বারা যে ছোট ছোট পুষ্করিণী পুরান গিয়াছে, তাহাতে শহরের অনেক ভাল হইয়াছে। আরও শুনা যাইতেছে যে ঐ বহুবাজার হইতে চিৎপুরের পূর্ব আর এক রাস্তা হইবেক তাহা হইলে শহরের আরও ভাল হইবেক।"

১২৩৫। ১১ ফাল্গুন।

"অনেক কালাবধি কলিকাতায় যে খাল কাটানোর কল্পনা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সেই খাল চিৎপুরের উত্তর ভাগ হইতে বেলিয়াঘাটার খাল পর্য্যন্ত যাইবে তাহা আঠার হাত গভীর ও আশীহাত চওড়া এবং তাহার উভয় দিকে চল্লিশ হাত চওড়া রাস্তা হইবে। রাজা রামলোচনের রাস্তার নিকটে দুই তিন হাজার লোক খাল কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং অনুমান হয় যে এ বৎসরে তাহার অর্দ্ধেক কাটা যাইবে এবং তাহার উপরে দুই অথবা তিন লৌহের সাঁকো বসান যাইবে; ইহাতে সেই অঞ্চলের অতিশয় উপকার হইবে। তাহাতে মৃত্যুজনক যে ক্ষুদ্র বন ও বৃক্ষ আছে তাহা একেবারে পরিষ্কৃত হইবে ও ঐ স্থান হইতে মাল একেবারে নদীতে পৌছাইতে পারিবে। এই খাল কাটানোর কল্পনা পূর্বে তেরিটি সাহেব কর্তৃক হইয়াছিল। তিনি সেই কর্মের পরামর্শ শ্রীযুত লর্ড ওয়েলেসলি সাহেবকে দিয়াছিলেন কিন্তু সে সময়ে তাহা সিদ্ধ হইল না। তাহার পর মেজর সক সাহেব ঐ খালের নক্সা করেন; কিন্তু তিনি সেই কর্ম সিদ্ধ না করাতে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে এক গোলার দ্বারা মারা পড়িলেন।"

চীৎপুর-কথন শেষ। এবার চৌরঙ্গী-পালা।

কেন চৌরঙ্গী নাম, তা নিয়ে বাক-বিতণ্ডা অন্তহীন। যতটা না পথ, তার চেয়ে মতের দৌড় অনেক লম্বা। পয়লা নম্বর মতটা হল, এই অঞ্চলের বনে নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু সাধক চৌরঙ্গীনাথ বসবাস করতেন সেই প্রাচীন-কালে। 'চৌরঙ্গী' তাঁরই স্মৃতি। দ্বিতীয় হল, চৌরঙ্গী গিরি থেকে। ধূপ ধুনো বুনো কাঠের হোম জ্বালিয়ে, বছরের পর বছর ধরে তিনি নাকি সাধন-ভজন করতেন ঐ জঙ্গলে। তার থেকেই চৌরঙ্গী নাম। হয়তো চৌরঙ্গী নাথ এবং চৌরঙ্গী গিরি একই ব্যক্তি। লোকের মুখে দুটো আলাদা নাম। দুটো কেন, তিনটে। আরও একটা হল, জঙ্গল গিরি চৌরঙ্গী। জঙ্গলের ভিতরে ইনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এমন কথাও বলেছেন কেউ কেউ।

জনৈক বাঙালী ইতিহাস-রচয়িতা আবার সাধুকে ছেড়ে জড়িয়েছেন ইংরেজদের। চৌরঙ্গী তখন ভয়াবহ জঙ্গল, দিনের আলোতেই ঐ পথ মাড়াতে

ভয় পেত মানুষজন, কালিঘাটের পথে পা বাড়ানো তীর্থ যাত্রীরা। বনের মধ্যে হরদম চলে ডাকাতি। সহায়-সম্পদ, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হারানো একদল ফিরিঙ্গীর ডাকাতিই ছিল পেশা। তাদের সঙ্গে গোলেমালে জুটে গিয়েছিল কিছু ইংরেজ। সাধারণ মানুষের মুখে ইংরেজরা ছিল ইঙ্গ-রাজ। সেই চোর ইঙ্গরা যেখানে থাকে, সেটাই চৌরঙ্গী। খুবই কষ্ট-কল্পিত সিদ্ধান্ত। তাহলে আসল উৎসটা কি ?

উইলসন সাহেব পেশ করেছেন প্রাচীন দলিল।

"The original name of 'Chowringhee' is 'Chirangi' in all the early records."

ঐতিহাসিক এ. কে. রায় একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছেন সাধু-সন্ন্যাসীদের ব্যাপারটা।

"There is no tangible evidence that Chowrangi Swami ever came to Calcutta and lived in its jungle as an asetic and gave his name to the village as some writers have stated." তিনিও সমর্থক 'চিরাঙ্গী'-র।

"It is to the Goddess Kali herself, called 'Cherangi' from the legend of her origin by being cut up with Vishnu's dise, that they trace the name of Chowringhee."

বিষ্ণু অথবা নারায়ণের চক্রে খণ্ড খণ্ড হয়েছিল সতীর দেহ। বাহান্নটি টুকরো। তার থেকে বাহান্ন পীঠ। প্রত্যেকটিই তীর্থস্থান। কালীঘাটে পড়েছিল সতী দেহের পায়ের একটি আঙুল। তার থেকেই এসেছে চিরাঙ্গী বা চেরাঙ্গী।

কিন্তু ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ এই মতের সমর্থক নন। তিনি জানান—

"গ্রাম দেবতা চৌরঙ্গীনাথের (শিব) নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে। প্রাচীন নাথ যোগীদের মুখ থেকে শুনেছি, তাঁরাই চৌরঙ্গীনাথের পূজারী ছিলেন এবং গ্রামাঞ্চলে দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করতেন।"

চৌরঙ্গী ছাড়াও এ অঞ্চলের আর একটা নাম ছিল। 'ডিহি বিজরী'। আপজনের মানচিত্রে চৌরঙ্গীর বদলে ঐ নাম।

১৭৮২-তে মিঃ উড বানিয়েছিলেন কলকাতার একটা মানচিত্র। পুরো নাম লেফ্‌ট্যান্ট কর্নেল মার্ক উড। এই মানচিত্র বানাতে খরচ পড়েছিল আঠাশ হাজার টাকা। সেই মানচিত্রে ধর্মতলা থেকে পার্ক ষ্ট্রীট পর্যন্ত রাস্তাটার নাম

'Road'. চৌরঙ্গীর সীমানা তখন এই রকম। পূর্বে সার্কুলার রোড। পশ্চিমে এখনকার চৌরঙ্গী। উত্তরে কলিঙ্গা। দক্ষিণে পার্ক ষ্ট্রীট।

চৌরঙ্গীর জঙ্গলকাটা শুরু হয় ১৭৫৭-য়। গড়ের মাঠে নতুন কেল্লা বানানোর সময়।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখনো 'ধর্মতলা' জন্মায়নি। তবে ধর্মতলার জন্মকাহিনী নিয়েও গবেষকে-গবেষকে যে মতবিরোধ সেটাও এই প্রসঙ্গে বলে নি।

"Dharmatala is so called a great mosque, since pulled down, which was on the site of Cook's stables, the ground belonged with all the neighbouring land to Jaffir, the Jamadar of Warren Hestings, a zealous Mussalman.

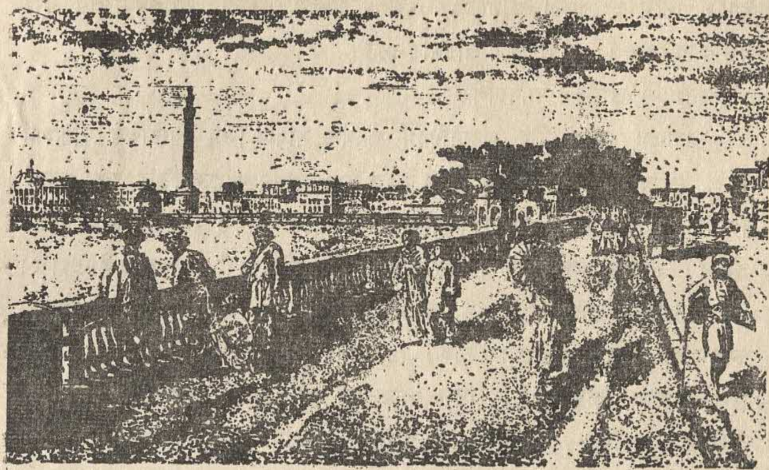
"The Karbala, a famous Mussalman assemblage of tens of thousands of People, which now meets in the Circular Road, used then the congregate there, and by its local sanctity, gave the name to the street of Dharmatala or Holy street."

লং-এর এই মন্তব্যে কুকের আস্তাবলের যে উল্লেখ, সেটা ছিল ধর্মতলার এখনকার মসজিদের পাশে। সেই আস্তাবলের সংলগ্ন জমিতেই ছিল প্রাচীন মসজিদটি। লং-এর সিদ্ধান্ত, ঐ মসজিদ, মসজিদ-প্রাঙ্গণে কারবালার উৎসব আর জনসমাবেশ থেকেই জায়গাটার নাম হয়েছে ধর্মতলা। এখন যে মসজিদটা আমরা দেখি, সেটা তৈরি হয়েছে পুরনো মসজিদ ভেঙে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর। জন্ম সাল, ১৮৪২। জন্মদাতা, টিপু স্থলতানের বংশধর প্রিন্স গোলাম মহম্মদ। তখন লর্ড অকল্যাণ্ডের আমল।

পাদরী লং যা বলেছেন, পাদরী কেরী সাহেবেরও তাই মত। কিন্তু বাঙালী ঐতিহাসিকদের মতামত ভিন্ন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এক রচনায় জান-বাজারের ধর্মঠাকুরের উল্লেখ রয়েছে। বেঙ্গল ও আগ্রা অ্যানুয়াল গেজেটিয়ারেও ঐ ঠাকুরের উল্লেখ। দুটোই ১৮৪১ সালের কথা। এ ছাড়াও আরও অনেক ধর্মঠাকুরের সংবাদ দিয়েছেন অন্যেরা। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পিছনে বাঁকা রায়ের মন্দির। বাঁকা রায় ধর্মঠাকুরের অন্য নাম। বিনয় ঘোষের রচনা থেকে জানতে পারি, ঘাটাল আরামবাগ এ সব অঞ্চল থেকে জেলেরা এসে বাস করতো ধর্মতলা অঞ্চলে। তারাই প্রচলন করে ধর্মঠাকুরের পুজো। পিছনে উৎসাহদাত্রী ছিলেন রাণী রাসমণি। ধর্মঠাকুরের পুজো হত ডোমটুলিতে, ধর্মতলার উত্তরে। হত হাড়িপাড়ায়, অর্থাৎ তালতলা অঞ্চলে।

"ধর্মঠাকুরের প্রাধান্যের জন্যেই ধর্মতলার নাম হয়েছে ধর্মতলা, মসজিদের জন্য নয়। মসজিদ বা পীঠস্থানের জন্যে কোন স্থানের নাম ধর্মতলা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।...পশ্চিমবঙ্গের (রাঢ়ের) ধর্মঠাকুরের সেবক বা পণ্ডিত ডোম ও হাড়িজাতির বেশ প্রাধান্য ছিল ধর্মতলা অঞ্চলে একশ বছর আগেও। যেখানে হাড়ি ও ডোমের এরকম প্রাধান্য ছিল সেখানে ধর্মঠাকুর ছিল না, একথা মনে হয় না। সারা কলকাতায় এক সময় ধর্মঠাকুরের বেশ প্রতিপত্তি ছিল এবং গাজনও হত। পরে ধর্মের গাজন শিবের গাজনে রূপান্তরিত ও লুপ্ত হয়েছে।" বিনয় ঘোষ

কলকাতার পথঘাটের নাম-ধামের আরও বহু ইতিহাস বাকি রয়ে গেল। যথাসময়ে সে সমাচার পরিবেশিত হবে। এখন আমরা ফিরে যাব কলকাতার ক্রমবিকাশের দিকে। মোগলদের হাত থেকে কি ভাবে একটু-একটু করে জমি-জমা এবং ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা জমিদার হয়ে উঠছে সেই ঘনঘটাময় ঘটনাবলীর মুখোমুখি হব এবার।



॥ ইংরেজরা হল জমিদার ॥

দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেছে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর। ১৭১০। মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন দাক্ষিণাত্যে। ছেলে আজিম ওসমানের প্ররোচনায় বাহাদুর শাহ তাঁকে বাংলা থেকে হটিয়ে দিয়েছিলেন দূর দেশে। ১৭১০-এ তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনা হল বাংলায়। তাঁর কাঁধেই আবার দেওয়ানীর ভার।

মুর্শিদকুলী বাংলায় ফিরে দেখতে পেলেন, ইংরেজরা বেশ শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেছে কলকাতায়। বাংলাদেশের যেখানে যত ধনী-মানী, ব্যবসায়ী লোকজন, কলকাতার দিকে তাদেরও বেশ আঁতের টান। ব্যবসা করতে এসে বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে তো ইংরেজরা। দাঁড়াও, ঝাড়ে-বংশে শেষ করছি তোমাদের।

ইংরেজরাও প্রমাদ গুনল মনে মনে। এ লোকটা মহা ঝুঁদে। এতদিন ছিল না, বেশ ছিলাম। আবার এসেছে যখন, জ্বালাবে পোড়াবে বিস্তর। হেজেস সাহেব কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ। ছুটলেন মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদ-কুলিকে সেলাম ঠুকতে। তাতে কিছুই লাভ হল না। ইংরেজের উপরে তাঁর বিষদৃষ্টি যেমন ছিল, রয়ে গেল তেমনিই। ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর চারদিক থেকে শুরু হল নানান রকম বাধা-বিঘ্ন। পাটনার কুঠি থেকে আসে সোরার চালান। পথে পড়ে মুর্শিদাবাদ। রোজই আটক করা হয় সেই সব সোরার নৌকো। অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে ছাড়াতে হয় সেগুলো। ইংরেজরা তিতি বিরক্ত। ১৭১১। জুলাই। সোজাসুজি মুর্শিদকুলীর

কাছে গিয়ে ইংরেজরা জানালে, এরকম চললে তারা কাশিমবাজার কুঠি বন্ধ করে দেবে। তুলে দেবে পাটনার কুঠি।

কূলি খাঁ তাতেও অবিচলিত।

"অগত্যা কোম্পানীর কর্মচারিবর্গ পূর্বমত সাধনা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিলেন না। শেষে মীমাংসা হইল, ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলে তিনি স্বয়ং 'ছাড়' লিখিয়া দিবেন এবং বাদশাহী সনন্দ দেওয়াইলে আরও ২৩৫০০ টাকা দিতে হইবে। ইংরেজ পক্ষ ইহাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

এতেই যে সমস্যা মিটে গেল, তা নয়। কলকাতা বেড়ে চলেছে। জমিদারী চালাতে গেলে আরও লোক চাই। লোক রাখতে গেলে টাকা চাই। টাকা তুলতে হলে ট্যাক্স চাই। কিন্তু ট্যাক্স-এর ব্যাপারে বিলেতের ডিরেকটরদের আপত্তি। ওহে! ওরকম ট্যাক্স বসিয়ে জমিদারী চালানো যায় না। দিশী লোকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর। তারা যত আসবে, তত আয় হবে খাজনা। খাজনা থেকেই জমিদারী চলবে জমিয়ে। এটা হল ডিরেকটরদের যুক্তি। কিন্তু কলকাতার কাউন্সিল দেখছে, লোক যে আসবে জায়গা কই? জায়গা বাড়াতে হলে আশপাশের আরও দুচারটে গ্রাম কিনতে হয়। কিন্তু জমি যাদের হাতে, তারা সবাই মুর্শিদকুলীর হাতের লোক। তারা ইংরেজদের জমি বেচতে রাজী নয় এক ছটাকও। সর্বনাশ! জমি বেচে কি মাথা খোয়াব নাকি মুর্শিদকুলীর কাছে?

কিছুদিন বাদে বাধল আর এক বিভ্রাট। 'মুদ্রা বিভ্রাট।'

মাদ্রাজের কাছে আর্কট। সেখানে ছিল ইংরেজদের ট্যাঁকশাল। রূপোর চাঙ আসত নিজেদের দেশ বা চীন দেশ থেকে। তৈরি হত রূপোর টাকা। বাদশাহের নামেই ছাপা হত। তার নাম ছিল আর্কট টাকা। বাংলাদেশের রাজকোষে রূপোর টাকা যা কিছু জমা পড়ত, মুর্শিদকুলী সব পাঠিয়ে দিতেন দাক্ষিণাত্যে। আওরঙ্গজেব সেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত। টাকার দরকার রোজই। বাংলাদেশে তখনও কড়ি দিয়ে কাজ চলে। আর আছে সিক্কা টাকা। তারপর হঠাৎ একদিন মারা গেলেন আওরঙ্গজেব। অমনি ইংরেজদের আর্কট টাকার চল্ বন্ধ হতে লাগল এদেশে। ইংরেজরা আর্কটের বদলে সিক্কা টাকা নিতে গিয়ে দেখলে বাট্টায় বাদ যায় অনেক। প্রচুর লোকসান। বিলেতের ডিরেকটররা এই দুঃসংবাদ পেয়ে রেগে লাল। হতেই পারে না। এ নিশ্চয়ই কিছু মতলববাজ কর্মচারীর কীর্তি। কোম্পানীর লোকসান দেখিয়ে নিজের পকেটে টাকা পুরবার মতলবে খাড়া করেছে এই মিথ্যে অজুহাত।

হেজেস সাহেবের দূত মুর্শিদকুলীর কাছে গিয়ে মিনতি জানালে, হুঁজুর! কলকাতায় আমাদের একটা ট্যাকশাল গড়তে দিন। মুর্শিদকুলী খাঁ তো প্রস্তাব শুনেই হতবাক্। সাহেব বাচ্চারা বলে কি? আজ চাইছে ট্যাঁকশাল। কাল এসে বলবে, খোদাবন্দ! আপনার সিংহাসনটা আমাদের জন্যে ছেড়ে দিন! খেদিয়ে বিদায় করে দিলেন ইংরেজ-দূতকে।

ইংরেজরা অতঃপর ঠিক করলে, স্বয়ং সম্রাটের কাছে একবার দরবার করে দেখা যাক। মন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। কে কে যাবে দূত হিসেবে। কি কি উপহার সামগ্রী যাবে সঙ্গে। মাদ্রাজ কুঠির অধ্যক্ষ তখন পিট সাহেব। তিনি সেখান থেকে বাংলায় পাঠালেন কিনে-কেটে যোগাড় করা জিনিষপত্র। দূত কে যাবে তখনও ঠিক না হলেও, উপহার সামগ্রী বোঝাই হচ্ছে নৌকায়। এমন সময় খবর এল কলকাতায়, সম্রাট বাহাদুর শাহ গমন করেছেন পরলোকে। ১৭১২-র মার্চ মাস সেটা।

সিংহাসন নিয়ে আবার বুঝি লড়াই লাগে। চারদিকেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। মুর্শীদকুলী খাঁ সৈন্য-সামন্ত কামান ইত্যাদি সাজিয়ে তৈরি। অবস্থা কোন দিকে ঘোরে কে জানে। ইংরেজরাও কলকাতায় ব্যস্ত নিজেদের আত্মরক্ষায়।

দিল্লীতে রক্তপাত চলল সিংহাসনের ভাগ নিয়ে। বাহাদুর শাহ-র চার ছেলে। জাহাঙ্গীর শাহ, আজিম ওশমান, জাহান শাহ, রফি-উসমান। জুলফিকার খাঁয়ের সাহায্য নিয়ে জাহাঙ্গীর শাহ তিন ভাইকে হত্যা করে সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু বরাতে বেশীদিন সিংহাসনের সুখ জুটল না। পরের বছরই আজিম ওশমানের ছেলে ফারুকশিয়র পিতৃব্য জাহাঙ্গীর শাহ আর প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার খাঁকে হত্যা করে দখল করে নিলেন সিংহাসন। ১৭১৩।

ঐ বছরের শেষ দিকে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ হলেন হেজেস সাহেব। মার্চ-এ চিঠি পাঠালেন দিল্লীতে। আমরা সম্রাটকে পাঠাতে চাই উপঢৌকন। আপনি যেন দঁয়া করে প্রাদেশিক সরকারদের জানিয়ে দেন, আমাদের যাওয়ার পথে পাহারার বন্দোবস্ত রাখার জন্যে। আর মুর্শিদকুলি খাঁকে একটু অনুরোধ জানাবেন, নিশ্চিন্তে আগের মত আমাদের ব্যবসা করার সুযোগ-সুবিধেগুলো বজায় রাখতে। চিঠিপত্রে যোগাযোগটা চলছিল খোজা সরহাদ নামের একজন আর্মেনিয়ান বণিকের মাধ্যমে। যথাসময়ে সম্রাট ফারুকশিয়রের কাছে অথবা কানে পৌছল উপহারের সমাচার। কি আছে? আছে কাপড়, সিল্ক, ব্রোকেড, ফায়ার আর্মস, স্পিরিট, সুগন্ধী তেল, কাঁচের বাসন, ঘড়ি, এবং আরও নানাবিধ জিনিষ। সম্রাট শিশুর মত বিভোর হয়ে উঠলেন উপহারের

লোভে। ১৭১৩-র অক্টোবর। বাংলা, বিহার, এলাহাবাদ, আকবরবাদ-এর শাসনকর্তাদের কাছে পৌঁছে গেল সম্রাটের হুকুম। ইংরেজরা উপহার নিয়ে দিল্লীতে আসবে। ওদের আসার পথ পাহারা দেবার জন্যে যেন সৈন্যসামন্ত মজুত থাকে। পরের বছরের ৪ জানুয়ারী দিল্লী থেকে 'হজবল্ হুকুম' এসে পৌঁছল মুর্শীদকুলীর নামে। ইংরেজদের অবাধে ব্যবসা করতে দাও।

আনন্দে আত্মহারা অবস্থা ইংরেজদের। দুর্গ থেকে তোপের পর তোপ। ১৪ জানুয়ারী। 'ডায়েরী এ্যাণ্ড কনসালটেশন বুক'-এ তার বিবরণ।

"কাল রাত্রে এসে পৌঁচেছে হজবল হুকুম। গায়ে প্রধান উজীরের শীল-মোহর। তাতে দেওয়ান মুর্শীদকুলী খাঁকে হুকুম, আমাদের আগের মত বিনা বাধায় বাণিজ্য করার স্বাধীনতা দেওয়া হোক। যেমন স্বাধীনতা ভোগ করে গেছেন আমার পূর্বসূরীরা। সম্রাটের এই অনুগ্রহ দানকে উপলক্ষ্য করে আমরা একটা প্রকাশ্য উৎসব বা আনন্দ প্রকাশের ব্যবস্থা করলাম। সৈন্যদের তিন রাউণ্ড বন্দুকের আওয়াজের পর আমাদের দেশের রাণী আর এদেশের সম্রাট ফারুকশিয়রের জন্যে স্বাস্থ্যকামনা। তার জন্যে ৫১টা তোপ। তারপর কোম্পানীর স্বাস্থ্যকামনা করে পানভোজন এবং ৩১টা তোপ। আরও ২১টা তোপ কোম্পানীর ব্যবসার উন্নতি কামনায়। তোপধ্বনি প্রত্যেকটা জাহাজ থেকেও। তারপর রাত্রিতে সৈন্যদের হুকুম দেওয়া হল একটা বড় রকমের 'বন-ফায়ার' করতে। সেই সঙ্গে দেওয়া হল পিপে বোঝাই পাঞ্চ, তাদের মেজাজকে মশগুল রাখতে। আমাদের মার্চেন্টদের হুকুম দেওয়া হল, হজবল হুকুমের খবরটা যেন ছড়িয়ে দেওয়া হয় সর্বত্র। সেই সঙ্গে এই অনুগ্রহলাভ উপলক্ষে আমাদের আনন্দ উৎসবের কর্মসূচীও।"

উৎসবের পালা চুকলে, কাউন্সিল স্থির করলে, এবার সম্রাটের কাছে প্রতিনিধিদল পাঠানোর একটা ব্যবস্থা করা হোক। প্রতিনিধি পাঠানোর পরিকল্পনাটা বহুদিনের পুরনো। মাদ্রাজের গভর্ণর টমাস পিট এর খসড়া তৈরি করেছিলেন ছ' বছর আগে। কিন্তু কাজে লাগান যায়নি। কারণ দিল্লীর সিংহাসনে ঘন ঘন সম্রাট বদল। এবার কাউন্সিল কোমর বেঁধে লাগল, নতুন উৎসাহে, নতুন স্বপ্নে ডগোমগো হয়ে।

১৭১৪। ৫ জানুয়ারী। কলকাতার কাউন্সিলের মিটিং। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দুটি। কে কে যাবে দিল্লীতে? আর মুখপাত্র হবে কে? যিনি হবেন পারসী ভাষাটা কণ্ঠস্থ থাকা চাই তাঁর। কোম্পানীর লোকের মধ্যে সে রকম তো কেউ নেই। তাহলে? এক যদি মাদ্রাজ থেকে শুরু হত এই দৌতাভিযান,

তাহলে ইতালীয়ান পরিব্রাজক মানুচিকে দেওয়া হত এই পদ। তবে সেটাও সম্ভব নয়। মানুচি এখন বৃদ্ধ। ঐ রকম যোগ্যতাম্পন্ন একজন য়ুরোপীর কি আর পাওয়া যাবে কোনোখানে? না। তাহলে?

তাহলে খোজা ফানুস কলান্তর এর ভাইপো, ঐ খোজা সরহাদকেই ডাকা হোক। লোকটা এক সময় কাকার সঙ্গে অনেকদিন ছিল লণ্ডনে। যদিও লিখতে বা পড়তে পারে না, তবু ইংরেজীটা বলতে-কইতে পারে মোটামুটি। তা ছাড়াও আছে আরও একটা ব্যাপার। ১৬৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন আজীম ওশমানের কাছ থেকে নেওয়া হয় তিনটে গ্রামের অধিকার, তখন দৌত্যগিরি করেছিল এই খোজা সরহাদই। ফারুকশিয়র তখন বালক। সরহাদের সঙ্গে তখন বালক ফারুকশিয়রের বেশ ভাবসাব হয়ে যায়।

সাত-পাঁচ ভেবে সরহাদকে নেওয়া হল দলে। তবে কড়া নজর রইল তার গতিবিধির উপর। তা ছাড়া সরকারী কাগজে রেকর্ড করা হল তার সঙ্গে যাবতীয় সর্ত।

"It was agreed that he would require careful watching and that the English members of the misson would have to keep one eye on the Mughal and other on the Armenian."

সর্ত হল, ৫০ হাজার টাকার। যদি সব কিছু মনের মত করে পাইয়ে দিতে পারে। যেমন এক নম্বর, নতুন ফরমান। দু নম্বর, জমিদারীর সীমারেখা। সেটা হবে উত্তরে বরানগর। পূর্বে সল্ট লেক। দক্ষিণে খিদিরপুর। পশ্চিমে গঙ্গার ওপারের কিছু জমি জায়গা। তিন নম্বর, মুসলিপত্তনের কাছে দিভি আইল্যাণ্ডের অধিকার।

এ ছাড়া আরও ৫০ হাজার টাকা পাবে যদি আদায় করে দিতে পারে সুরাটে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার সুবিধেটা।

প্রতিনিধিদলের প্রথম অর্থাৎ প্রধান সদস্য নির্বাচিত হলেন জন সুরম্যান। দ্বিতীয় সদস্য, জন প্রাট। তৃতীয়, এডওয়ার্ড ষ্টিফেনসন। কিছুদিন পরে, ২৭ জানুয়ারীতে, কাউন্সিল মত পালটালে। খোজা সরহাদ হলেন দ্বিতীয়। জন প্রাট তৃতীয়। ষ্টিফেনসন হলেন সেক্রেটারী এবং হিসেব রক্ষক। আবার কিছু অদল বদল ৪ মার্চে। প্রাট যাবেন না। তখন ষ্টিফেনসন হলেন তৃতীয়। হুগ বেকার হলেন সেক্রেটারী। জন সুরম্যান, সত্যিই যোগ্য লোক। নিজের স্বার্থের চেয়ে কোম্পানীর স্বার্থ তার কাছে চিরদিনই বড়। কি করে ইংরেজ জাতটার ব্যবসা বাড়ে, সেদিকেই তাঁর কড়া নজর। ১৭০৬-এর ২০ ডিসেম্বর

তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন কোম্পানীর একজন রাইটার। কোচ-মেকার জন স্থরম্যানের ছেলে। ১৭০৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারী 'ডাচেস' জাহাজে চেপে পাড়ি। ১৭০৭-এর ১৯ আগষ্ট বাংলায়। ১৭১৭-এর ৩০ জানুয়ারী পাটনায়। ১৭১২-র ১৯ এপ্রিল পাটনায় কাউন্সিলের সদস্য। কারণ স্থরম্যান সম্বন্ধে কোম্পানীর সকলেই তখন একমত। "A man of great ability, and of great integrity, of strong passion, and a strong will, a man, as the Indian say, of great heart."

আগে যে ক'জনের নাম করা হয়েছে, তাঁরা ছাড়াও প্রতিনিধিদলে ছিলেন আরও একজন। তিনি ডাক্তার উইলিয়াম হ্যামিলটন। ১৭০৯ 'শেরবোর্ণ' জাহাজে চেপে পাড়ি দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের দিকে। উদ্দেশ্য রাতারাতি ধনী হওয়া। এবং ধনী হয়ে স্বদেশে বিয়ে করবেন প্রণয়ী এ্যানাকে। সম্পর্কে 'কাজিন'। কলকাতার তিনি দু-নম্বর ডাক্তার। মাস মাইনে তিন পাউণ্ড। তখনকার হিসেবে চব্বিশ টাকা।

সঙ্গে রইল যাবতীয় দলিল দস্তাবেজ, কাগজপত্র। মোগল বাদশাদের সঙ্গে যতবার যতকিছু লেখা জোখা হয়েছে, তার সব নথিপত্র। আর দেওয়া হল একটা নির্দেশ। যদি কোনো আকস্মিক কারণে মৃত্যু ঘটে স্থরম্যানের, নেতৃত্ব নেবে ষ্টিফেনসন। এ ছাড়া প্রতিনিধিদলের সঙ্গে রইল চার দফা জিনিষের ফর্দ। প্রথম দফা, সম্রাটের জন্যে। তাতে যে সব উপহার সামগ্রী তার দাম ১,০২, ৪৭২, ১১.৪ পয়সা। রাজদরবারের অন্যান্য আমীর ওমরাহদের জন্যে যে সব জিনিষ, তার দাম ১, ০৪, ২৪৮, ১১.৩ পয়সা। অবশ্য এর থেকে যদি কোনো জিনিষ সম্রাটকে দিতে হয়, দেওয়া চলবে। তৃতীয় দফায়, প্রতিনিধি দলের নিজস্ব ব্যবহারের জিনিষপত্র। তার দাম, ২৯, ৯৫৮, ৪.০ পয়সা। শেষ দফায়, দিল্লীতে বেচার জিনিষপত্র।

কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু হল পাটনার দিকে। পাটনা থেকে যাত্রা শুরু হল, বাদশাহ-র নির্দেশমত রক্ষীবাহিনী পৌঁছবার পর। ইতিমধ্যে পাটনায় কেটে গেছে বেশ কয়েকমাস, নানাবিধ গণ্ডগোলে। ১৭১৫-র এপ্রিলে দিল্লীর দিকে পা। জুলাইয়ে দিল্লী।

দুহাজার মনসবদারী একজন সৈন্যাধ্যক্ষ, সঙ্গে দুটো হাতী, দুশো ঘোড়া, সেই সঙ্গে যথেষ্ট বাজনাবাদ্যি বাজিয়ে প্রতিনিধি দলকে নিয়ে চলল রাজদরবারের দিকে। তোরণের বাইরে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন সৈয়দ সলাবৎ খান। প্রতিনিধিদল তাঁরই অতিথি। যাবার পথে, প্রতিনিধিদল রাস্তায় ছড়াতে ছড়াতে

চললেন টাকা-পয়সা। কেন? 'In order to create a favourable impression.' রাজপ্রাসাদে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল খান দৌরাণের। তিনি ইংরেজ পক্ষের বন্ধুস্থানীয়। দ্বিপ্রহরে, দরবার কক্ষে দেখা দিলেন সম্রাট স্বয়ং।

দিল্লী থেকে পাঠানো ডেসপ্যাচে রয়েছে উপহার বিতরণের ধারা বিবরণী।

"আমরা প্রথমবারে প্রয়োজনীয় উপহারগুলি লইয়া সম্রাট সাক্ষাতে গেলাম। এই উপহারের মধ্যে ১০০১টি মোহর, টেবিলে রাখিবার উপযুক্ত মণিমুক্তা খচিত একটি বহুমূল্য ঘড়ি, সমগ্র ভূখণ্ডের একটি মানচিত্র ও আরও অনেক দ্রব্যাদি ছিল। এইরূপ ধরনের জিনিষপত্র আমরা লইলাম, যাহা দেখিলেই বাদশাহ্ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা এই সমগ্র নির্বাচিত উপহার দ্রব্যের এক একটি হাতে করিয়া সম্রাট দরবারে উপস্থিত হইলাম। উপহারের দ্রব্য দৃষ্টে মহাসন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট সুর্মান সাহেবকে এক প্রস্থ বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও মণিখচিত একটি কলগা উপহার দিলেন। খোজা সরহাদের অদৃষ্টেও এইরূপ উপহার লাভ ঘটিল। সম্রাট আমাদের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। দরবারান্তে আমরা ডেরায় ফিরিয়া আসিলাম। সে দিন উজীর সলাবৎ খাঁর বাটীতেই আমাদের সকলের ভোজের নিমন্ত্রণ হইল।"

উপহার সামগ্রী তালিকায় যে মানচিত্রের কথা, তার কিছু ইতিহাস আছে। কোম্পানীর কাউন্সিল যখন ঠিক করলে সম্রাটকে উপহার দেওয়া হবে একটা মানচিত্র, তখন সমস্যা ছিল, মানচিত্রের লেখাগুলো হবে কি ভাষায়। ইংরেজীতে হতে পারে না। তাহলে লিখতে হয় পারসীতে। কে লিখবে? খোঁজ খোঁজ, পারসী জানে আবার হাতের লেখাটা বেশ ছবির মত, কে আছে কোথায়। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল মির্জা ইব্রাহীমকে। মির্জা ইব্রাহীম এক মাস ধরে নিখুঁত তুলির টানে শেষ করলেন অক্ষর রচনা। তাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হল নগদ টাকা একশ। আর একশ টাকা দামের বনাত।

মানচিত্রের অক্ষর-শিল্পটুকুই মির্জা ইব্রাহীমের। বাকী সব আঁকা-জোকা, সাজানো-গোছানো যাঁর হাতে, তাঁর নাম জন বরনেল। সোনা এবং আরও একাধিক রঙে সে মানচিত্র বানানো। জায়গার নামগুলো কোনটা সোনার, কোনটা রূপোর। তাঁর পারিশ্রমিক ছিল নগদ দুশো টাকা। এ ছাড়া 'কিং উইলিয়ম' জাহাজে বিনা খরচে দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ।

ওদিকে মুর্শীদকুলী খাঁ অপমানে ফুলছেন। থামো ব্যাটা ইংরেজ, তোমাদের ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া শেখাচ্ছি। তিনি উজীর আবদুল্লা খাঁকে পেছনে

লাগালেন এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা পণ্ড করতে। উজির আবদুল্লা খাঁ-র সাহায্যেই বাদশা পেয়েছেন সিংহাসন। সুতরাং তাঁর কথা কানে তুলবেনই, উড়িয়ে দিতে পারবেন না।

কিন্তু এতে কারোরই কিছু সুবিধে হল না। কোনো দিক থেকেই নয়। না পারলেন উজীর আবদুল্লা খাঁ সম্রাটের মনে ইংরেজ বিদ্বেষ জাগাতে। না পারলেন ইংরেজরা লক্ষ টাকার মুদ্রাঞ্জলী দিয়ে তাঁকে তুষ্ট করতে। তিনি উপহার নেন। অর্থও গ্রহণ করেন। সবই ঠিক। কিন্তু ইংরেজরা এমন সুযোগ পায় না যে তাঁকে তাদের মনোবাঞ্ছা জানায়। আজ শিকার। কাল তীর্থযাত্রা। তারপর শরীর খারাপ। মন ভালো নয়। সাত দিনে সতেরো ব্যাধি। তাহলে হবে কি? এতগুলো টাকা জলে চলে যাবে মিথ্যে মিথ্যে? তা কি কখনো যায়? তিষ্ঠ, তিষ্ঠ।

বেশী দিন নয়। কিছু দিনের মধ্যেই এল দৈবযোগ।

রাজা অজিত সিংহের মেয়ের সঙ্গে সম্রাটের বিবাহের পাকাপাকি। বিয়ের আগে যথা-বিহিত আড়ম্বরে রাজকুমারী রাজধানী পৌঁছে গেছেন। এমন সময়ে সম্রাটের দুরারোগ্য পীড়া। প্রাণ যায় যায়। সর্বনাশ। দিল্লীর চৌহদ্দিতে যেখানে যত ডাক্তার কবিরাজ বদ্যি হাকিম, কেউ সারাতে পারে না। রাজ্য জুড়ে উৎকণ্ঠা। কথাটা কানে গেল হ্যামিলটনের। তিনি জানালেন, আমাকে একটা সুযোগ দেওয়া হোক। এলেন হ্যামিলটন। রাজবদ্যি হাকিম কবরেজরা যা করতে গিয়ে হিমশিম, নেয়ে-ঘেমে অস্থির, হ্যামিলটন সাহেব কি সব এটা-ওটা অস্ত্রশস্ত্র চালিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই বেমালুম সুস্থ, সুস্থির করে তুললেন সম্রাটকে।

অবশ্য ঘটনাটা যত সহজে বলে ফেলা হল, এত সহজে ঘটেনি। অনেক বাধা বিপত্তি সামলাতে হয়েছে হ্যামিলটন সাহেবকে। ১৭১৫। ৩ অক্টোবর। অসুস্থ হয়ে পড়লেন সম্রাট। এটা দ্বিতীয়বারের পীড়া। এর আগের অসুখটা হ্যামিলটনই সারিয়ে ছিলেন বলে এবারেও ডাক পড়ল তাঁর। ডেকে পাঠালেন সম্রাট জননী। অন্দরমহলে। হ্যামিলটনের সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজনে। সঙ্গে খোজা সরহাদ, দোভাষী। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চলল দুপক্ষে।

"This time the king was suffering from a violent pain which he feared turn to fistula The disease, whatever it was, taxed all Hamiltons skill for nearly two months, during which he was doubtless exposed to much misrepresentation and

jealousy. The introduction of a new physician could not have been pleasing to the King's French doctor Monsieur Martin or to the Hindu and Muhammadan Practitioners at the court, and it seems to have excited the suspicious of the populace." Surman Embassy.

একদিন রাত্রে ছুর্গ থেকে ফিরছেন হ্যামিলটন। কারা যেন আঘাত করল মাথায়। অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন তিনি। খবর পৌঁছল সম্রাটের কানে। তখুনি হুকুম দিলেন, পাকড়াও অপরাধীদের। আরেকবার শহরে রটে গেল, সাহেবের হাতে পড়ে মারা গেছেন সম্রাট। ইংরেজ প্রতিনিধিদলের বাসস্থানে ঝাঁকে-ঝাঁকে জড়ো হতে লাগল লোক। লোক নয়, ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ জনতা। ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেবে এমন অবস্থা। শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বাঁচালেন স্বয়ং সম্রাট। তিনি এসে দাঁড়ালেন রাজপ্রাসাদের অলিন্দে।

প্রাণ ফিরে পাবার আনন্দে সম্রাট ডাক্তারকে উপহারে উপঢৌকনে ঢেকে ফেললেন। দামী দামী পোষাক পরিচ্ছদ। মণিমুক্তো খচিত কলগা। ছুটি হীরের আংটি। একটা হাতী, একটা ঘোড়া, নগদ পাঁচহাজার টাকা। যে যন্ত্রপাতি বা অস্ত্র দিয়ে সম্রাটের ফোঁড়া কেটেছিলেন হ্যামিলটন, সেগুলো বাঁধিয়ে দিলেন সোনায়। আর দিলেন কামিজে পরার জন্যে সোনা আর মণি বসানো বোতাম। সম্ভবত হ্যামিলটনের মাথায় টাঁক ছিল না। থাকলে কি আর চিরুনি অথবা বুরুশের কথা মনে পড়ত সম্রাটের? হ্যাঁ, বুরুশও দিয়েছিলেন একটা। সেও সোনা-বাঁধানো। মণিমাণিক্যও বাদ নেই তাতে। এর পরেও জিজ্ঞেস করলেন—পারিশ্রমিক হিসেবে আপনি কী চান বলুন। আমি তাই দেব।

যে ব্রাউটন, সেই হ্যামিলটন। এক দেশের মানুষ। একই ক্ষমতা-তৃষ্ণা তাঁদের সাগর পারে ছুটিয়ে এনেছে। হ্যামিলটন বললেন--ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকারের স্বাধীনতা আর ফরমান। সম্রাট খুশি মনেই বললেন—ক'টা দিন বোসো। বিয়ের হাঙ্গামা চুকলে সব হবে।

১৭১৬ সালের জানুআরি মাসে আবেদন পত্র দাখিল হল সম্রাটের কাছে। তাতে ৪টি প্রার্থনা।

১। কলকাতার কুঠির অধ্যক্ষের সই করা ছাড় বা দস্তক দেখালে কোন সরকারী কর্মচারী কোন অজুহাতেই কোম্পানীর মালপত্র আটকাতে পারবে না।

২। মুর্শিদাবাদ ট্যাঁকশালের কর্মচারীগণ প্রয়োজন হলে সপ্তাহে তিন দিন কোম্পানীর মুদ্রা প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা করবেন।

৩। ইংরেজ কোম্পানীর কাছে ঋণগ্রস্ত এমন লোক, দেশী বা বিদেশী যেই হোক, কোম্পানীর প্রয়োজনে কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

৪। সুলতান আজিম ওসমান আগে যেমন ইংরেজদের কলকাতা ইত্যাদি জায়গায় জমিদারী কিনতে অনুমতি দিয়েছিলেন, এখন ঠিক সেই ভাবেই কলকাতার চারপাশের আটত্রিশখানি গ্রামের জমিদারী কেনার অনুমতি ইংরেজ কোম্পানীকে দিতে হবে।

"এক্ষণে দরবারে উজীর আবদুল্লা খাঁ ইংরেজ কোম্পানীর এই সমস্ত প্রার্থনার বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক আরম্ভ করিলেন। শেষে বাদশাহের নিকট আবার দুইখানি প্রার্থনা-পত্র ক্রমশঃ দাখিল করা হইলে, উজীর এক আদেশপত্র বাহির করিলেন। কিন্তু ইহাতে বাদশাহের মোহর থাকিল না, কেবল উজীরের মোহর দেওয়া হইল। ইংরেজপক্ষ বিলক্ষণ বুঝিলেন, এরূপ ফর্মান প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ গ্রাহ্যই করিবেন না; তাঁহারা মহাগোলযোগে পড়িলেন। এ সময়ে সাধারণতঃ যেরূপ ঘটনা হয়, এখানেও তদ্রূপ গৃহবিচ্ছেদ দেখা দিল। খোজা সর্হদকে ঘোরতর অবিশ্বাস হইল। তিনি মন্ত্রভেদ ও অন্যান্য নানা প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন দেখা গেল। ইংরেজ দূতদ্বয় সাহসে ভর করিয়া উজীরের অনুজ্ঞাপত্র প্রত্যার্পণ করিলেন এবং যতদিন বাদশাহী ফর্মান না পান, তত দিন অপেক্ষা করিবেন স্থির করিলেন। এদিকে বাঙ্গালার নবাবের উকীলগণও বাধা দিবার জন্য বিধিমতে উদ্যোগ করিতেছিলেন। যে কারণেই হোক, আরো চোদ্দ মাস ইংরেজপক্ষের কার্যের কোন সারোদ্ধার হইল না। অবশেষে ইংরেজ দূতগণ অন্দরমহলের জনৈক প্রিয়তম খোজাকে উৎকোচ প্রদানের পরামর্শ পাইলেন। এ উপায়ে আশানুরূপ ফললাভের তাঁহাদের কোনও ভরসা ছিল না। তথাপি ঐরূপ ব্যবস্থা করিলেন। বাদশাহের মোহরযুক্ত ফর্মান বাহির হইল।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার সঠিক তারিখ জানা নেই। সালটা ১৭১৭। মাসটা নিশ্চয়ই ঐ বছরের মার্চ মাসের আগে। কারণ ইতিহাসে পাই, বাদশাহী ফর্মান পাওয়ার খবরটা কলকাতায় পৌঁছে গেছে মার্চ মাসে।

কিন্তু অন্যত্র অন্য তারিখ। সেখানে মে মাস। মাস তারিখ যাই হোক, ইংরেজদের তখন হাতে স্বর্গ পাওয়ার অবস্থা। সঙ্গে-সঙ্গে বসে গেল কাউন্সিলের মিটিং। তাতে প্রস্তাব –

"If being necessary to make some Publick Rejoycing upon the advice We have received from Mr. Surman.···We make a Publick dinner for all the Companys Servants and a loud Noise with Our Cannon and conclude the day with Bonfires and other demonstrations of Joy. ···"

আকাশ কাঁপিয়ে বাতাস ফাটিয়ে ঘন ঘন তোপধ্বনি। গেলাসে-গেলাসে মদ। সারা রাত জুড়ে হৈ-চৈ, হুল্লোড়। আতসবাজীর আলোয় কলকাতা সেদিন রাঙা।

ঐতিহাসিক অর্মের ভাষায়, ফারুকশিয়রের এই ফর্মান হল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানার ম্যাগ্‌না কার্টা।

১৭১৭-র জুন মাস। বাদশাহী ফর্মান পকেটে নিয়ে স্থরম্যান সাহেব সদলবলে যাত্রা করলেন দিল্লী থেকে। ফর্মানের একটা কপি পাঠিয়ে দিলেন মাদ্রাজে আর একটা মুর্শিদাবাদে।

সবাই যখন দিল্লী থেকে ফিরতে চলেছে দৌত্যগিরির পাট চুকিয়ে, ফারুকশিয়র তলব করলেন ডাক্তার হ্যামিলটনকে। তোমার বাবু যাওনা হবে না। তুমি দিল্লীতেই রয়ে যাও, আমার নিজস্ব চিকিৎসক হয়ে। যা চাইবে, যত স্থখ, সব পাবে। প্রতিদিনই সম্রাটের এক অনুরোধ। হ্যামিলটন দেখলেন, মহাবিপদ। মাথা খারাপ নাকি সম্রাটের? আমি আমার জাতভাইদের ছেড়ে এখানে পড়ে থাকবো? কিন্তু মুখের রেখায় প্রকাশ করলেন না মনের সে-অনিচ্ছে। বললেন, ঠিক আছে। তবে এখনকার মত একবার কলকাতায় যেতে দিন। সেখান থেকে যাব নিজের দেশে। স্ত্রী-পুত্রদের অনেকদিন দেখিনি। তা ছাড়া বেশ কিছু দরকারী ওষুধ-পত্র জোগাড় করতে হবে। হয়ে গেলেই ফিরে আসবো। অগত্যা সম্রাট অনুমতি দিলেন যাওয়ার।

কলকাতায় পা দিয়ে মাত্র কয়েকটা মাস। তারপরেই এসে গেল পরপারের ডাক। ১৭১৭-র ৪ ডিসেম্বর। মৃত্যুর আগে নিজের অর্জিত যাবতীয় ধন-সম্পত্তি সবই তিনি উইল লিখে দান করে গিয়েছিলেন চেনা-পরিচিতদের মধ্যে।

হ্যামিলটনের মৃত্যুসংবাদ দিল্লীতে গিয়ে পৌছল এক সময়ে। সংবাদ শুনে সম্রাট ভাবলেন, দিল্লীতে এসে বসবাস করার ইচ্ছে নেই বলে, ফন্দী করে এই মিথ্যে রটনা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে কলকাতায় পাঠালেন খোঁজ নিতে। কর্মচারী এসে দেখতে পেল, ডাক্তার সাহেবের কবর। পাথরের ফলকের গায়ে ইংরেজী ইন্‌স্ক্রিপসন—

"Under this lyes intered the body of William Hamilton, Surgeon, who departed this life the 4th December, 1717. His memory ought to be dear to his nation for the credit he gained the English in curing Farrkscer, the Present King of Indostan, of a malignant distemper, by which he made his own name famous at the court of the great Monarch and without doubt will perpetuate his memory as well in Great Britain as all other nations in Europe."

দিল্লী থেকে রাজকর্মচারী সেই ফলকের নীচে পারসীতেও আরও একটা ইনস্‌ক্রিপসন লিখিয়ে দিলেন।

কম করে ৬০ বছর পার হয়ে গেছে হ্যামিলটন সাহেবের মৃত্যুর পর। তিনি তখন বিস্মৃতপ্রায় এক নাম। সেই সময় সেণ্ট জন্‌স গীর্জার গোড়াপত্তনের মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল এক কবর। কবরের গায়ে ফলক। তখন হেষ্টিংসের রাজত্বকালের শেষ দিক। এদেশে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্‌ গাঁথার পিছনে হ্যামিলটন সাহেবের কি অবদান, হেষ্টিংস তা জানতেন। শ্রদ্ধায় বিগলিত মন। তিনি জানালেন, ফলকের গায়ের অক্ষরগুলোকে রাঙিয়ে দেবেন সোনা দিয়ে। এবং নতুন গীর্জার পূর্বদিকের প্রবেশ দ্বারে সবচেয়ে দর্শনীয় স্থানে ঐ ফলক স্থাপন করা হবে, দিলেন পরামর্শ। কিন্তু গীর্জাটা সম্পূর্ণ তৈরী হওয়ার আগেই তাঁকে চলে যেতে হল এদেশ ছেড়ে স্বদেশে। জব চার্নকের সমাধিমন্দিরের তলায় এখন চাপা পড়ে আছে সেই পাথর।

স্বরম্যান সাহেব বেঁচে ছিলেন আরো বেশ কয়েক বছর। তাঁর মৃত্যুর বছরটা ছিল ১৭২৪। খিদিরপুরের কুলী-বাজারের কাছে ছিল তাঁর প্রমোদ উদ্যান।

ষ্টিফেনসনের জীবনে উন্নতি ঘটেছে ধাপে-ধাপে। হয়েছিলেন কলকাতা কাউন্সিলের মেম্বার। পরে একবার মাত্র একদিনের জন্যে ফোর্ট উইলিয়মের একটিনি প্রেসিডেন্ট।

এরপর খোজা সরহাদের কথা। ১৭১৭-র সেই দৌত্যগিরির পর থেকে খোজা সরহাদের সংগে ইংরেজদের মন কষাকষির শুরু। কোম্পানী হিসেব চায়। দিল্লী অভিযানের জন্যে যা খরচ হয়েছে, তার টাকা আনা পাই-এর হিসেব বুঝিয়ে দাও। সরহাদ হিসেব দিতে না পেরে পালিয়ে গেলেন চুঁচড়ায়। হয়তো আবার ফিরে এসেছিলেন, কেননা ইংরেজরা যখন তাঁর বাড়িতে পাহারা বসাল, তখন তিনি কলকাতায়। কোম্পানীর কনসাল্‌টেশন-বুকের তথ্য—

"খোজা সরহাদ কোম্পানীর কাছে অনেক টাকা ধার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা শোধ করিতে পারিতেছেন না। পাছে মালপত্র সরাইয়া তিনি কোম্পানীকে ফাঁকি দেন, এইজন্য দুইজন বরকন্দাজকে তাঁহার বাটি চৌকী দিবার জন্য পাঠান হউক। তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি অনেক। ঐগুলি ক্রোক হইলে, কোম্পানীর পাওনা অনেক টাকা আদায় হইতে পারে।"

কনসাল্‌টেশনের পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যায় খোজা সরহাদ কোম্পানীর নামে অভিযোগ জানাচ্ছে এই বলে যে, তিনি কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা হিসেব-নিকেশ করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত। তা সত্ত্বেও কোম্পানী তাঁর বাড়ির দরজায় দুজন দারোয়ান বসিয়ে তাঁকে হেনস্থা করছেন। এরও পরবর্তী বিবরণ থেকে জানা যায় খোজা সাহেবের বাড়ি বেচে কোম্পানী আদায় করেছিল ৫৫৬৪ টাকা।

১৭১৭-র পর থেকে কলকাতার সেই আদি তিনটে গ্রাম ছাড়া আরও ৩৮টা গ্রামের জমিদারী এসে গেল ইংরেজদের হাতে। ১। সালকিয়া। ২। হাবড়া (HOWRAH)। ৩। কাসুন্দিয়া। ৪। রামকৃষ্ণপুর। ৫। ব্যাঁটরা। ৬। দক্ষিণ পাড়া। ৭। বেলগাছিয়া। ৮। দক্ষিণদ্বারী। ৯। হোগলাকুড়িয়া। ১০। উল্টাডিঙ্গি। ১১। সিমলে। ১২। মাকন্দা। ১৩। কামারপাড়া। ১৪। কাঁকুড়গাছি। ১৫। বাঘমারি। ১৬। আর্কুলী। ১৭। মির্জাপুর। ১৮। শিয়ালদহ। ১৯। কুলিয়া। ২০। ট্যাংরা। ২১। শুঁড়া। ২২। বাহির শুঁড়া। ২৩। শেখপাড়া। ২৪। ধলন্দা। ২৫। বির্জি। ২৬। তিলজলা। ২৭। তোপসিয়া। ২৮। শাপগাছি। ২৯। চৌবাঘা। ৩০। চৌরঙ্গী। ৩১। কলিঙ্গা। ৩২। গোবরা। ৩৩। বাহির দক্ষিণদ্বারী। ৩৪। শ্রীরামপুর (ইটিলি)। ৩৫। জলা-কলিঙ্গা। ৩৬। গোঁদলপাড়া। ৩৭। ইটিলি। ৩৮। চিৎপুর।

১৭১৭-য় ইংরেজরা হল জমিদার। আর ঐ বছরেরই অক্টোবরে মুর্শিদকুলী খাঁ বাদশা ফারুকশিয়রকে এক লক্ষ টাকা নজরানা দিয়ে আনিয়ে নিলেন বাংলার সুবেদার-এর পদমর্যাদা। তখন থেকে তাঁর নতুন নাম জাফর খাঁ। আবার বাংলাদেশে শুরু হল তাঁর দাপট। বাদশার চেয়ে নবাবকেই তখন বেশী ভয় প্রজাদের।

নতুন নবাব হয়ে প্রথমেই নোটিশ জারি করলেন, কোনো জমিদার যেন এক ছটাক জমিও ইংরেজদের না বেচে। ইংরেজদের ডেকে বললেন, ওহে কলকাতার খাজনা আমি এখন থেকে তিনগুণ করে দিলাম। এইবার নতুন হিসেবে

বারো বছরের খাজনার টাকাটা মিটিয়ে দাও। আর ঐ যে বাদশার কাছ থেকে কী ফর্মান আনিয়েছ, ও আমি মানি না।

ইংরেজরা সর্ষেফুল দেখল চোখে। নবাবজাদা বলেন কি? বাদশা দিয়েছেন ৩৮টা গ্রাম কেনার অনুমতি। আগের মত বছরে তিন হাজার টাকা খাজনা দিয়ে বাণিজ্য করার অধিকার। আর দিয়েছেন বাংলাদেশেও ইংরেজদের আর্কট টাকা চালানোর হুকুম। ভাঙাতে গেলে বাট্টা দিতে হবে না। আরও আছে। ইংরেজরা ইচ্ছে করলে নিজেদের একটা টঁ্যাকশাল বসাতে পারে।

মুর্শিদকুলীর সবেতেই না। তার উপরে টাকার খাই। ইংরেজরা বুঝলে নবাবকে বেশী চটিয়ে লাভ হবে না। ঘুষ-ঘাষ দিয়ে কাজটা হাসিল করতে হবে। যেমন দেবতা তার তেমন নৈবিদ্যি। তাতে কাজও হল। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট একেবারে মিটল না। তবু তারই মধ্যে ইংরেজদের বাণিজ্য এবং কলকাতার শ্রী দুটোই বাড়তে লাগল ধীরে ধীরে।

ইংরেজদের নতুন চার্চ সেন্ট অ্যান্স গীর্জার কথা আগেই বলা হয়েছে। তাই দেখে কলকাতার পর্তুগীজ আর আরমেনিয়ানরা মিলে তাদের নিজেদের একটা গীর্জা বানাতে লেগে গেল নতুন করে। পুরনো গীর্জাটা ছিল কাঠের। দরজা দিয়ে চারপাশটা ঘেরা। নতুনটা শুরু হল ইট চুণ বালির। ইংরেজরাও ভালবেসে উপহার দিলে একটুকরো জমি। ১৭২০। নতুন গীর্জা তৈরী। নাম 'চার্চ অব দি ভারজিন মেরী অব দি রোজারী।' এই গীর্জা সম্পর্কে আরো কিছু বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করছি প্রাচীন রচনা থেকে।

"যখন জব চার্নক ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তাঁহার সহিত কতিপয় পোর্তুগীজ আসিয়াছিলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বর্তমান মুর্গীহাটায় তাঁহাদের একখণ্ড জমি দান করেন। সেন্ট আগষ্টিন্ সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীস্টানগণ তথায় অস্থায়ীভাবে একটি উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে উহাকে একটি ইস্টক নিমিত গীর্জায় পরিণত করা হয় এবং ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে উহার আয়তন বর্দ্ধিত করা হয়। পরে এই গীর্জাটি পুরাতন হইয়া যাওয়ায় ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে উহাকে ধ্বংস করিয়া একটি বড় এবং তখনকার কালোপযোগী নতুন ধর্ম-মন্দির নির্মাণের সংকল্প করিয়া ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মার্চ উহার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করা হয়। ইহাতে মোট ব্যয় হয় ৯০০০০ হাজার টাকা। তন্মধ্যে গীর্জার আয় হইতে ৩০০০০ হাজার টাকা এবং অবশিষ্ট সাধারণের চাঁদা ও তদানীন্তন পোর্তুগীজ সম্প্রদায়ের প্রধান বোরোটা ভ্রাতৃদ্বয়ের আনুকূল্যে সংগৃহীত হয়। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর ইহা মেরীর (Virgin

Mary of the Rossary) উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়। তখন বিশপের আবাস উহার সংলগ্ন ছিল এবং বিশেষ বিশেষ উৎসবাদিতে উহা ব্যবহৃত হইত।" প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়।

১৭২৭। দেখতে দেখতে আমরা পার হয়ে এসেছি অষ্টাদশ শতকের এক চতুর্থাংশ। এই বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল দুটো। প্রথম, পরলোক গমন করলেন বাংলার প্রসিদ্ধ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। দ্বিতীয় কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করা হল বিচারালয়। আগে বিচারালয়ের ইতিহাসটা বলে নিই।

প্রস্তাবটা প্রথম এসেছিল লণ্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টরদের কাছ থেকে। সেটা ১৬৯৩। কলকাতার ইংরেজ অধিবাসী যারা, তাদের যাবতীয় বিবাদ-বিসম্বাদ মেটানোর জন্যেই ডিরেকটররা এদিকে মন দিয়েছিলেন। "In 1693, when the company in London were devising large schemes for their young settlement at Calcutta, they proposed the establishment of a Court of Judicature which would take cognisance of disputes between British subjects residing at that place." Firminger.

কলকাতার কাউন্সিলকে ডিরেকটররা জানিয়েছিলেন, মাদ্রাজের সেণ্ট জর্জ ফোর্টের অনুকরণে কলকাতাতেও একটা বিচারালয় বা বিচার-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। এই বিচারালয়ের কাজ হবে, যে দোষী তার শাস্তিবিধান। কিন্তু সেটা করতে হবে 'with exact justice and moderation'. এ ছাড়া 'if you find any refractory you may reduce them to obidience by denying them the priviledge of our passes and dusticks (dastaks) etc.'

কলকাতা কাউন্সিল তার জবাব পাঠাল ১৬৯৪-এর ১৪ ডিসেম্বর। চার্নক মারা গেছেন। এ রকম অবস্থায় আপনাদের ইচ্ছা-আকাজ্ক্ষা কোনোটাকেই পূরণ করা আমাদের সাধ্য নয়। তার কারণ আমাদের মাথার উপর সব সময়েই উঁচিয়ে আছে খাড়ার ঘা। যতদিন নবাব আর দেওয়ান আছেন, কিছু করা যাবে বলে মনেও হয় না। 'We have no hopes of a grant for it so long as this Duan continues.'

লণ্ডনের চিঠি এল ১৬৯৬-এর ১৪ মার্চ। তাতে লেখা, ঠিকই বলেছ। এখন কোর্ট-কাছারী নিয়ে মাথা না-ঘামানোই বুদ্ধির কাজ। তবে যারা কোম্পানীর ক্ষতি করবে, নিয়ম-কানুন মানবে না, কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে

নিজের আখের গোছাবার ধান্দায় ঘুরে বেড়াবে, তাদের সরাসরি পাঠিয়ে দেবে মাদ্রাজের ফোর্টে। তাদের নামে ওয়ারেন্টও বের করতে পার।

তারপর এসে গেল ১৭২৬। ঐ বছরের গোড়ার দিকে, ১৭ ফেব্রুয়ারী, লণ্ডনের এক বিরাট চিঠি এসে পৌঁছল কলকাতায়। তাতে ২১ দফা প্রস্তাব। চিঠির শুভারম্ভে রয়েছে–

"Upon application made to His Majesty' We have obtain'd His Majestys Royal Charter for our settlements at Madraspatam, at Calcutta at Fort William in Bengal and at Bombay in the East Indies to enable us by Vertue thereof to have our Affairs in those places ..."

কলকাতায় তৈরী হয়ে গেল আদালত। প্রথমেই মেয়র্স কোর্ট। কোর্ট তো খাড়া হল, কিন্তু তার কাজকর্ম হবে কোথায়? বাড়ি কই? বেশ একটু হাত-পা-ছড়ানোর মতন বাড়ি। খোঁজ, খোঁজ। কিন্তু বড় মাপের বাড়ি খালি নেই কোথাও। শেষ পর্যন্ত চোখ পড়ল একটা বাড়ির দিকে। পারস্যের রাজদূত যখন এসেছিলেন কলকাতায়, এই বাড়িতেই ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁর থাকার। সেকালের কলকাতার 'এ্যামবাসাডরস্ হাউস'। রাইটার্স বিল্ডিং-এর পুব দিকে সেন্ট এণ্ড্রুস চার্চ। তারই কাছে বাড়িটা। বাড়িটা বড় সড়ই। তবে কি, এখন একেবারে হাড়কঙ্কালসার। তা হোক্। মেরামত করে নিলেই চলবে। ১৭২৯। সাড়ে ছ' হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয়ে গেল বাড়ি। টাকাটা এল কোথা থেকে? কলকাতার বাসিন্দেদের কাছ থেকে ট্যাক্স নিয়ে। কোম্পানী নাকি একটা পয়সাও খরচ করেনি নিজেদের ট্যাক থেকে।

একজন মেয়র আর ন'জন অলডারম্যান নিয়ে মেয়র্স কোর্ট-এর গঠন। কলকাতার যাঁরা ইউরোপীয়ান বাসিন্দে, এখানে বিচার হত শুধু তাদেরই। দেওয়ানি মামলা। ন'জন অলডারম্যানের মধ্যে সাতজনকে হতে হবে খাস ইংরেজ। 'ব্রিটেন-জাত ব্রিটিশ প্রজা'। বাকা দুজন বিদেশী হলেও, এমন দেশের প্রজা হতে হবে তাঁকে, গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যে-রাজ্যের মিত্রতার সম্পর্ক। মেয়র নির্বাচিত হত প্রতি বছর অলডারম্যানদের ভোটে। অলডারম্যানদের অদল-বদল নেই। আজীবন সদস্য। তবে কাউন্সিল বা কাউন্সিলের গভর্ণরের হাতে ক্ষমতা ছিল, যুক্তিসঙ্গত কারণে অলডারম্যানকে ছাঁটাই করার। এঁদের মাস মাইনে ২০।২২ টাকার মত। মেয়র বসতেন মখমলের গদিতে। অলডারম্যানদের গায়ে থাকতো লাল তাফতা।

মেয়র্স কোর্টের খরচ-খরচার এটা প্রাচীন চিত্র।

বাড়ি ভাড়া মাসিক ৩০৲ (আর্কট টাকা)

অলডারম্যানদের বিচার পরিচ্ছদের জন্য তফতা কাপড় ২২৮৶/১৫

সমস্ত সেরেস্তার নকল রাখার জন্য মুহুরির মজুরি ৬৪৸০

মোমজানা কাপড় খরিদ ১৲

বিচারাসনের জন্য মখমল খরিদ ৩৭।৫

ইন্টারপ্রেটারের এক মাসের বেতন ২০৲

পাহারার জন্য দুইজন দেশীয় জমাদার ২।০ হিসাবে ৪॥০

দুইজন কোর্ট সারজেন্ট ১০৲ হিসাবে ২০৲

আলোকের জন্য মোমবাতি খরিদ (৬ মাসের) ১০৲

একজন মেথর ১৲

পাদরী লং-এর 'সিলেকশন ফ্রম দি আন পাবলিশড্ রেকর্ডস অব গভর্ণমেণ্ট'-এর মধ্যেও রয়েছে এই হিসেব।

মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ছাড়া আরও কিছু কাজ ছিল মেয়র্স কোর্টের। কেউ মারা গেছে। অর্থাৎ কোনো ইংরেজ। কোর্টের কাজ, তাঁর সম্পত্তির হিসেব-পত্র তলব করা। উইল থাকলে, প্রবেট দেওয়া। উইল না থাকলে, লেটার্স অব এ্যাডমিনিসট্রেশন-এর ব্যবস্থা করা। আরও আছে। কেউ হয়তো নাবালক। কিংবা কেউ হয়তো দেউলে। অথবা পাগল। এদের গার্জেন ঠিক করে দেওয়া, কার হেফাজতে থাকবে তারা, রক্ষণাবেক্ষণ করবে কে, এসব ব্যবস্থা বাতলে দেওয়াও মেয়র্স কোর্টের কাজ।

গোড়ার দিকে ঝামেলা হত, ইংরেজ বা ইউরোপীয়দের বিচারে সাক্ষী যখন দেশীয় প্রজা। সাক্ষী দেওয়ায় আগে পাঠ করতে হয় হলফ্‌নামা। দেশী লোকরা ক্রীশ্চানী ঢংয়ে 'যাহা বলিব সত্য বলিব' বলতে রাজী নয়। দেশী রীতি ছিল তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করা। ইংরেজরা অনেক মাথা ঘামিয়ে ঠিক করলে, ঐ তামা-তুলসী-গঙ্গাজলই ভাল। নইলে জাত যাওয়ার ভয়ে সাক্ষী দিতে আসবে না কেউ।

মেয়র্স কোর্টের উপরে ছিল আরেক কোর্ট। আপিল কোর্ট। সেখানে হর্তাকর্তা হলেন কাউন্সিল আর তার প্রেসিডেন্ট। ফৌজদারী মামলা-টামলা সব এখানেই। কেবল একটা জিনিষ বাদ। সেটা হল রাজদ্রোহের বিচার। তাদের বিচার হত খাস ইংল্যাণ্ডে। অপরাধীকে ধরে বেঁধে জাহাজে চাপিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়াই ছিল আপিল কোর্টের কাজ।

কোর্ট অব রিকোয়েস্ট, আরেকটা কোর্ট। এখানে সেই সব মামলা, যেগুলো সাধারণ, খুদে সাইজের। বিচারক অবশ্য সংখ্যায় ২৪ জন। তাঁরা সবাই কমিশনার। ২০ টাকার মধ্যে পাওনা-গণ্ডা বা দাবী-দাওয়া হলে হলে তবেই সে মামলা মাথা গলাতে পারতো এখানে। বেশী হলে নৈব চ।

মেয়র্স কোর্ট তৈরী হওয়ার আগে দেশী লোকদের দেওয়ানি আর ফৌজদারী দুটো মামলারই বিচার করতো কলকাতার জমিদার। শুনানি হত জমিদারের কাছারী বাড়িতে। জমিদারের কাজের এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল অনেক কিছুই।

"The Zemindar acts in a double capacity, distinct and independent of each other (with a very few exceptions) the one as superintendent and collector of your revenues, the other as Judge of the court of Cutcherry, a tribunal constituied for the hearing, trying and determining all matters and things, both civil and criminal, wherein the natives only, subjects of the Mogal, are concernod." Holwell.

এই জমিদার বা তাঁর অধস্তন ব্ল্যাক জমিদারের হাতে শাস্তিদানের ক্ষমতা ছিল প্রচুর। চাবুক মারা। জরিমানা অথবা জেল খাটানো। কেবল কোনো অপরাধীকে যদি চাবুক মারতে মারতে প্রাণে মেরে ফেলার শাস্তি দেওয়া হত, সেখানে প্রয়োজন ঘটত কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের সম্মতি। প্রেসিডেণ্টও তখন তলব করতেন সমস্ত ঘটনার বিবরণী আর নথিপত্র।

শাস্তির তালিকায় আরও যেসব বিধি-বিধান, তার মধ্যে ছিল হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে রাস্তার কাজ করানো, চোর-জোচ্চোর খুনে ডাকাতদের কখনো হাত-পা, কখনো নাক-কান কেটে গঙ্গার ওপারে ছেড়ে দিয়ে আসা। আরও একটা শাস্তি, দাগা মারা। অর্থাৎ গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দেওয়া।

"১৭২০ অব্দে বা তৎসমকালে শাসন সম্পর্কীয় কতকগুলি বিষয়ের ভার কলিকাতার 'জমিদার' নামক কর্মচারীর হস্তে অর্পণ করা হয়। কাউন্সিলের সদস্য যদি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হইতেন, সাধারণতঃ তিনিই এই পদে অধিষ্ঠিত হইতেন। এই বিচারালয়ের নাম 'ফৌজদারী কাছারী' ছিল। ১৭২০ অব্দে ইহার প্রথম স্থাপনকাল হইতে ১৭৫৬ অব্দ পর্যন্ত গোবিন্দরাম মিত্র জমিদারের দেওয়ান অর্থাৎ প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন। ষ্টার্নডেল সাহেবের মতে গ্রীক নামক একজন সাহেব প্রথম জমিদার হন। জমিদারের প্রধান বা সদর কাছারী কলিকাতায় অবস্থিত ছিল। তথায় তিনি প্রজাবিলি করিতেন এবং কোনও প্রজা যথাসময়ে খাজনা দিতে না পারিলে তিনি তৎকাল প্রচলিত

অন্য কোন বিচারালয়ে বিচার প্রার্থী না হইয়া স্বয়ং তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া বেত্রাঘাত করিয়া দণ্ডপ্রদান করিতেন।" কলিকাতার ইতিহাস।

নিজের এলাকা-এক্তিয়ারে বিচারের ব্যাপারে কলকাতার জমিদার সর্বেসর্বা হলেও একটা জায়গায় নবাব বা ফৌজদারের নির্দেশ মানতেই হত তাঁকে। সেটা ফাঁসী কাঠে ঝুলিয়ে হত্যাদণ্ডের ব্যাপারে। ফৌজদার চাইতেন না তাঁর প্রজাদের, বিশেষ করে মুসলমান প্রজাদের, ঐভাবে মারা হোক। মুসলমান প্রজাদের পক্ষে ঐ রকম মৃত্যু অপমানজনকও বটে। ফাঁসীর বদলে হত্যা করা হত চাবুক মেরে। আর ঐ চাবুক মারার ব্যাপারে অপরিসীম দক্ষতা ছিল চাবুক সওয়ারের।

"The officers of the court called Chawbuck-swars or lashbearers, are some times so dexterous as to be able to kill a man with two or three strokes of the Indian Chawbuck." Bolts.

গোড়ার দিকে হুগলীর ফৌজদার নিজেই চলে আসতেন সোজা কলকাতায়। ফৌজদারি মামলার বিচার করতে। তাঁর রাজত্বে, তাঁকে বাদ দিয়ে কোথাকার কে ইংরেজ তাঁর প্রজাদের বিচার করবে, এ কখনো বরদাস্ত করা যায়! গোটা কয়েক গ্রামের জমিদারী পেয়েছে বলে, ইংরেজরা কি নিজেদের লাট-বাদশা ভেবেছে নাকি? ইংরেজরাও ছাড়বার পাত্র নয়। তারা বলতো, আমাদের জমিদারী। অতএব আমরাই হর্তাকর্তা বিধাতা। শেষ পর্যন্ত নাকি ফৌজদারকে তাঁরা বশ অথবা তাঁর ক্ষমতার দাপটকে অবশ করেছিলেন বছরে বছরে মোটা টাকার দক্ষিণা দিয়ে।

ইংরেজরা যখন কলকাতার জমিদার সেই সময়ে বাংলার নবাবী আমলের বিচার বিভাগ ছিল নানা স্তরে, নানান কর্মচারীর হাতে ছড়ানো।

১। নাজিম। প্রাণদণ্ডের বিচারে প্রধান।

২। দেওয়ান। ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচারক।

৩। দারোগা-আদালত-আল-আলিকা। ফৌজদারী আদালতে নাজিমের প্রতিনিধি।

৪। দারোগা-ই-আদালত-দেওয়ানী। দেওয়ানী আদালতে দেওয়ানের প্রতিনিধি।

৫। ফৌজদার। প্রাণদণ্ড ছাড়া আর সব রকম মোকদ্দমার বিচারক।

৬। কাজি। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচারক।

৭। মুক্তবসিব। নেশাখোর, মাতাল বা নেশার জিনিষ কেনাবেচা সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচারক। আর ছিল কৃত্রিম বাটখারা ইত্যাদির পরিমাপ যন্ত্রের তদন্তের ভার।

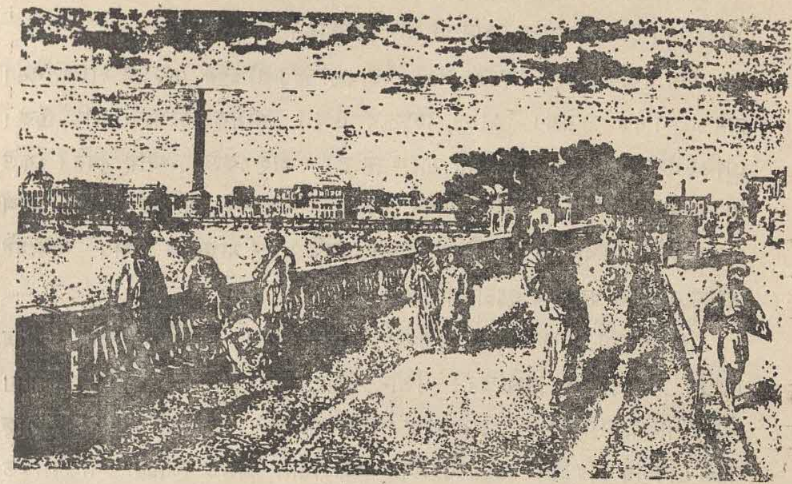
৮। মুফ্‌তি। কাজিকে শোনাতো আইনের ব্যাখ্যা।

৯। কানুনগো। জমি-জমার রেজিষ্ট্রার। ঐ সংক্রান্ত মামলার বিচারক।

১০। কোতয়াল। রাত্রির শান্তিরক্ষক।

আবার ফিরে আসি মেয়র্স কোর্ট প্রসঙ্গে। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজরা উঠিয়ে দিলে জমিদারের পদ। তখন থেকে দেশী-বিলেতি সব রকম মামলাই আসতে লাগল মেয়র্স কোর্টে। অবশ্য দেশীয়রা সব সময় কোর্টের ছায়া মাড়াত না। কোর্টের কাছে দরখাস্ত করে দেশী সালিসি দিয়ে মিটিয়ে নিত নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা। এই সালিসির কাজে তখন দুজন লোক ছিলেন নামজাদা। এক হলেন রাজা নবকৃষ্ণ দেব। দুই হলেন দেওয়ান কাশীনাথবাবু।

১৭৫৬। কলকাতা দখল করে সিরাজউদ্দৌলা যখন ফিরে যাচ্ছেন মুর্শিদাবাদে, সেই সময় অন্যান্য অনেক বাড়ির মত মেয়র্স কোর্টের আদি বাড়িটাকেও ভেঙে দিয়ে যান। কাউন্সিল তখন জায়গাটা বিক্রী করে দিল। কিনল কলকাতার চ্যারিটি স্কুলের কর্তারা, নিজেদের ফাণ্ডের টাকায়। কিছুকাল পরে ঐ ভাঙা বাড়ির জমিতেই তুললো নতুন একটা বাড়ি। দোতলা। মেয়র্স কোর্ট চলে এল ঐ বাড়ির একতলায়। দোতলায় চ্যারিটি স্কুল। পরে যখন চ্যারিটি স্কুল উঠে গেল সদর ষ্ট্রীটের পুব দিকের রাস্তায়, দোতলা দখল করল কলকাতার টাউন হল। তখনো আসল টাউন হল তৈরী হয়নি। কলকাতার ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীট বয়ে বেড়াচ্ছে ঐ চ্যারিটি স্কুলেরই স্মৃতি। আর ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট ঐ মেয়র্স কোর্টের। মেয়র্স কোর্টের পরমায়ু শেষ ১৭৭৪-এ। তার বদলে সুপ্রীম কোর্টের জন্ম। জন্মের মুহূর্তে সুপ্রীম কোর্টের নিজের কোনো আশ্রয় ছিল না। তাই মেয়র্স কোর্টের বাড়িতে বসেই চলত কাজকর্ম। আর সেশন। নন্দকুমারের ফাঁসী ঘোষণা করা হয় সেই বাড়ি থেকেই। সেটা ১৭৭৫। জুন মাস।



॥ মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের একটা ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম, সীতারাম। কাহিনীর কাল, মুর্শিদকুলীর আমল। ঐ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে মুর্শিদকুলী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—

"আবার এই সময়ে, মহাপাপিষ্ঠ, মনুষ্যাধম মুর্শিদ কুলি খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদে আরূঢ় থাকায়, সুবে বাঙ্গলার আর সকল প্রদেশে হিন্দুর উপর অতিশয় অত্যাচার হইতে লাগিল-বোধ হয়, ইতিহাসে তেমন অত্যাচার আর কোথাও লিখে না।"

এই পরিচ্ছেদেরই পাদদেশে রয়েছে একটি টীকা।

"ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাগণের পক্ষপাত এবং কতকটা অজ্ঞাত নিবন্ধন সেরাজউদ্দৌলা ঘৃণিত এবং মুর্শিদ কুলি খাঁ প্রশংসিত। মুর্শিদের তুলনায় সেরাজউদ্দৌলা দেবতাবিশেষ ছিলেন।"

মুর্শিদকুলী বাংলার ইতিহাসে সত্যিই এক বিতর্কিত চরিত্র। নানা কারণে, তাঁর রাজত্বকাল, এবং শাসন পদ্ধতির প্রভাব পড়েছে অনেক দূর পর্যন্ত। বাংলার সমাজ-কাঠামো অনেকখানি বদলে গিয়েছিল তাঁর আমলে। তা ছাড়া মুর্শিদকুলীর চেয়ে এত দীর্ঘকাল বাংলা দেশকে কেউ শাসন বা গঠন করার সুযোগও পাননি। বছরের হিসেবে আলীবর্দীর নবাবী ১৬ বছরের। সে জায়গায় মুর্শিদকুলীর মাত্র দশ। ১৭১৭ থেকে ১৭২৭। কিন্তু নামে বা উপাধিতে নবাব

হওয়ার অনেক আগে থেকেই তিনি বাংলার একচ্ছত্র অধিপতি। যার শুরু ১৭১০-এ। যখন থেকে তিনি বাংলার দেওয়ান।

তাঁর সম্বন্ধে পড়তে-পড়তে মনে হয়, মুর্শিদকুলী যেন একজন মানুষ নন। যেন একাধিক চরিত্র। মানুষ হিসেবে এক। শাসক হিসেবে আর এক। ঐতিহাসিকদের তাই এত দ্বিধা, তাঁকে নিয়ে। তাই কেউ নিন্দায় মুখর। কেউ বা পঞ্চমুখ প্রশংসায়। আমরা এখন এই দুটো দিককেই চোখের সামনে মেলে ধরতে চাই। অর্থাৎ মুর্শিদকুলী খাঁ নামক একটি সম্পূর্ণ মানুষকে দেখা। প্রথমেই তাকানো যাক ব্যক্তি মানুষটার দিকে।

"মুর্শিদকুলী খাঁ কর্মনিষ্ঠ ও আলস্যবিরহিত ছিলেন। রজনীতে অল্পকাল মাত্র নিদ্রায় অতিবাহিত করিতেন। তিনি ধর্মনিষ্ঠ আনুষ্ঠানিক মুসলমান ছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা ও ব্রতনিয়মাদি পালন করিতেন।…প্রাতরাশের পর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বিচার বিতরণ ও কোরাণের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া অতিবাহিত করিতেন।…অতিথি সৎকারে মুর্শিদকুলী মুক্তহস্ত ছিলেন। প্রতিদিন বহু সংখ্যক অনাথ ফকিরকে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। পরন্তু প্রান্তরের পশু ও গগনচারী পক্ষিগণও তাঁহার আহার দান হইতে বঞ্চিত ছিল না। তাহাদের জন্য স্থানে স্থানে প্রচুর খাদ্য রক্ষা করা হইত। তাঁহার নিয়োজিত লোকগণ ক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া হলবাহী বলীবর্দগণকে পানভোজনাদি দিয়া আসিত। মৃগয়ায় প্রাণিবধে তাঁহার কোন আমোদ ছিল না। বলাই বাহুল্য, বিলাসিতা তাঁহার আদৌ ছিল না। পানাহার পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে তিনি পূর্ণমাত্রায় মিতচারী ছিলেন। অতিরিক্ত মশলা দেওয়া খাদ্য ব্যবহার করিতেন না। বরফযুক্ত সরবৎ বা মালাই কুল্পীও গ্রহণ করিতেন না। সাদা বরফমাত্র তাঁহার ব্যবহার্য ছিল। শীতকালে রাজমহলের পাহাড় হইতে বর্ষ-ভোগ্য বরফ সংগৃহীত হইত। সুরা বা অন্য কোন প্রকার মাদকদ্রব্য তিনি কোন কালেই ব্যবহার করেন নাই। নর্তকীর নৃত্যগীত শ্রবণ করিতেন না। স্বীয় একমাত্র পত্নীতে চিরদিন অনুরক্ত ছিলেন। স্ত্রীজাতির সহিত ব্যবহারে তাঁহার এতই শীলতা ছিল যে, কোন অপরিচিতা স্ত্রী বা খোজা হাবসীদিগকে তিনি অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে দিতেন না। মুর্শিদকুলী স্বয়ং যেমন সুধী ও সুপণ্ডিত ছিলেন, যাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও ধর্মজ্ঞানের সুখ্যাতি ছিল, তাঁহাদের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও লিখন ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল। অঙ্কশাস্ত্রে সম্পূর্ণ দক্ষতা থাকায় সর্বপ্রকার হিসাব নিকাশ শীঘ্র প্রণিধান করিতেন। হিসাবে তাঁহাকে প্রতারিত করে, কাহারও এরূপ সাধ্য ছিল না। সমস্ত নিকাশী কাগজ ও হুকুম স্বয়ং লাল কালীতে

করিতেন। মাসের শেষ দিবসে সকল সেরেস্তার মাসকাবারের কাগজপত্র স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিতেন।...মুর্শিদকুলী যুদ্ধে বীর, পরোপকারে মুক্তহস্ত, দানে হাতেম ও বিচারে নসেরুয়াঁর সাদৃশ্য ছিলো।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

আবার শাসক হিসেবে এই মানুষটিই ছিলেন বজ্রাদপি কঠোর।

"যে সকল জমিদার নিয়মিত রাজস্ব দিতেন মুর্শিদকুলী খান তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। এবং কোন উপরি পাওনার দাবী করিতেন না। কিন্তু নির্ধারিত তারিখে রাজস্ব জমা দিতে না পারিলে তিনি রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী ও জমিদারদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন। তাঁহাদিগকে কাছারীতে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। খাদ্য বা পানীয় কিছুই দেওয়া হইত না। ঐ রুদ্ধ কক্ষেই মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইত। অনেক সময় মাথা নীচু ও পা উপরের দিকে করিয়া তাঁহাদিগকে ঝুলাইয়া বেত্রাঘাত করা হইত। বিষ্ঠাপূর্ণ গর্তে তাহাদিগকে ডুবাইয়া রাখা হইত। এই গর্তের নাম দেওয়া হইয়াছিল বৈকুণ্ঠ! অনেক সময় খাজনা দিতে না পারার অপরাধে হিন্দু আমিন, জমিদার প্রভৃতিকে স্ত্রী পুত্রসহ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইত।" বাংলা দেশের ইতিহাস।

এখানে বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মানুষের মাপে গর্ত করা একটা খাদ। খাদের ভেতরটা অকথ্য পুঁতিগন্ধময় পদার্থে বোঝাই। আগে নানাবিধ অত্যাচারের পর অপরাধীদের এই খাদে ফেলে টেনে আনা হত। যেহেতু এই জাতীয় অত্যাচার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বরাদ্দ ছিল হিন্দু জমিদার বা বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের বরাতে, তাই হিন্দুদের বৈকুণ্ঠ-প্রীতিকে উপহাস করার ছলে এই নাম দেওয়া।

কিন্তু বৈকুণ্ঠ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকরা দ্বিমত। কারো-কারো মতে এটা নিতান্তই প্রবাদ। এখনও পর্যন্ত এর কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলেনি। তা ছাড়া দেওয়ান সৈয়দ রজী অথবা রেজা খাঁর অনেক কুকীর্তি, জোর-জুলুম, অত্যাচার-অবিচার, প্রবাদের হাওয়ায় উড়তে-উড়তে চেপে বসেছে মুর্শীদকুলীর ঘাড়ে।

হিন্দু জমীদারদের জোর করে মুসলমান করার ব্যাপারেও সব ঐতিহাসিক একমত নন।

"বাকী খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারগণকে কারারুদ্ধ করা অথবা রাজধানীতে নজরবন্দী রাখা নবাবী আমলের আইনের ব্যবস্থা। নম্রস্বভাব সুজাউদ্দীন বা সুবিখ্যাত প্রজারঞ্জক আলিবর্দী খাঁর সময়েই এই জন্য জমিদারগণের কারাবাস ঘটিয়াছে। পূর্ববর্তী মুসলমান শাসনকর্তৃগণের সময়েই এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং চিরাগত মুসলমানী প্রথামত অবাধ্য বা রাজস্ব আদায়দানে অশক্ত

জমিদারবর্গকে বন্দীভাবে রাখিয়া, মুর্শিদকুলী খাঁ যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। অজ্ঞাতনামা ইতিহাস লেখক অন্যত্র নির্দেশ করিয়াছেন – 'রাজস্বদানে অশক্ত জমিদারগণকে সপরিবারে মুসলমান করা হইত।' অথচ এইরূপ একজন জমিদারেরও উল্লেখ দেখা যায় না। প্রকৃত হইলে. অন্ততঃ সীতারাম ও উদয় নারায়ণের পরিবারবর্গের দৃষ্টান্ত মিলিত।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

মুর্শিদকুলীর আমলে জমিদার শ্রেণীর হিন্দুরা কতখানি নিগৃহীত হয়েছে, সে আলোচনা থেকে বিরত হয়ে আমরা চোখ ফেরাই অন্য এক প্রসঙ্গে। তাঁর আমলে আর এক শ্রেণীর হিন্দু জমিদার কি ভাবে বড় হয়েছে প্রভাবে প্রতিপত্তিতে। মনে রাখা দরকার পরবর্তীকালের এই জমিদারেরা মুর্শিদকুলীরই শাসন ব্যবস্থার পরিণাম। এ সম্বন্ধে দুজন ঐতিহাসিকের স্বাক্ষ্য।

"তিনি দিওয়ান হইয়া যখন বাংলায় আসিলেন, তখন আর সমস্ত খাস জমিই কর্মচারীদের জায়গীরে পরিণত হইয়াছে। জমিদারদের মধ্যেই অনেকেই অলস, অকর্মণ্য ও বিলাসী হওয়ায় নিয়মিত রাজস্ব দিত না। তিনি এই উভয় প্রকার জমির রাজস্ব আদায়ের জন্যই নতুন ইজারাদার নিযুক্ত করিলেন। জমিদার নামে মাত্র রহিলেন, কিন্তু ইজারদের হাতেই তাঁহার রাজার আদায়ের ভার পড়িল।...পূর্বেকার মুসলমান ইজারাদারেরা রাজস্ব আদায় করিয়াও ন্যায্য টাকা জমা দিতো না – অধিকাংশই আত্মসাৎ করিতেন। এইজন্য মুর্শিদকুলী খান বেশীর ভাগ হিন্দুদের মধ্য হইতেই নতুন ইজারাদার নিযুক্ত করিতেন। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে প্রাচীন জমিদারেরা প্রায় লুপ্ত হইল। এবং নতুন ইজারাদারেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া দুই তিন পুরুষের মধ্যেই রাজা মহারাজা প্রভৃতি উপাধি পাইলেন। এইরূপে বাংলা দেশে নতুন এক হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। ইংরেজ যুগে লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সব ইজারাদারের বংশধরেরাই উত্তরাধিকারী সূত্রে জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন।" বাংলা দেশের ইতিহাস।

"হিন্দু ও পাঠান রাজত্বকাল থেকে যাঁদের প্রতিষ্ঠা, সেই বাংলাদেশের বনেদী জমিদারদের মুর্শিদের সময়ে যথেষ্ট অধঃপতন হয়েছিল। তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত রাজস্ব আদায় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠার ফলে মুর্শিদ রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার নিয়োগ করেন তাঁর এই ব্যবস্থাকে 'মাল জামিনি' ব্যবস্থা বলা হয়। বনেদী জমিদাররা রইলেন, কিন্তু ইজারাদারের আওতায়।... মুর্শিদ হিন্দুদের ভিতর থেকে ইজারাদার নিয়োগ করতেন বেশি, তার কারণ সেই সময় মুসলমান ইজারাদাররা রাজস্বের টাকা তছরূপ করে পরে আর তা পরিশোধ

করাতে পারতেন না। হিন্দু ইজারাদাররা এ ব্যাপারে একটু বেশী রাজভক্তি দেখাতেন। বোধ হয়, দেওয়ান ও নবাবের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায়। সেই অনুগ্রহ হল জমিদারী ও তার সনদ।" বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা।

এই জাতীয় ঐতিহাসিক উপাদানগুলো সহজেই প্রমাণ করে, মুর্শিদকুলী যতই কঠোর প্রকৃতির শাসক হোন না কেন, হিন্দু মাত্রের প্রতিই উদ্যত ছিল না তাঁর অত্যাচার অথবা শাসন। অক্ষম, অপদার্থ, বিলাসীদের প্রতিই, হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে, তিনি ছিলেন নির্মম। সক্ষম, রাজভক্ত, এবং যোগ্যতা-সম্পন্নের প্রতি ন্যায়পরায়ণ।

মুর্শিদকুলীর বিষয়ে এতখানি আলোচনার প্রয়োজন এই কারণে যে, বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে সেটা একটা সন্ধিক্ষণ। আগামীকালের সামাজিক কাঠামোর বীজ বোনার সময় এটি।

"The land revenue system taken over by the English was in its main features the creation of Murshid Quli Khan, and it was continued in a more refined but more rigid form under Cornwallis's Permanent Settlement."

অন্য দিকে—

"Indeed, under Murshid Quli and the Permanent Settlement of Cornwallis, our hereditary landed families of historical origin (except a few small fry) were extinguished and their places were taken by new men of the official and Capitalist classes."

দুটি মূল্যবান উক্তিই ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যে ধ্বংসের ছায়া। দিল্লীর সিংহাসনে এখন আর দিল্লীশ্বর থাকেন না! থাকেন কাঠের পুতুল। তাঁকে যেমন নাচানো হয়, তেমনি নাচেন। কেউ রাজস্ব দেয়, কেউ দেয় না। প্রদেশে প্রদেশে সুবেদার বা নবাবরা যে-যার নিজের মাথায়, নিজের আত্মীয়-কুটুমের মাথায় রাজছত্র তুলে ধরতেই মহোৎসাহী। চোখের সামনে এমন কেউ নেই, যাকে দেখে মনে হবে, ইনি প্রতিপালক, যথার্থ রক্ষাকর্তা।

মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর বাংলাদেশ জুড়ে সেই রকমই অরাজকতার ছায়া। রাজ্য শাসনের চেয়ে ব্যক্তিগত সুখ-সাধ, লোভ-লালসাই মুখ্য। প্রজার মঙ্গলের চেয়ে রাজার কাছে অনেক বেশী প্রিয় ব্যক্তিগত প্রমোদ। মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদ নিয়ে শুরু হয়ে গেল পিতা পুত্রে সংঘাত। একদিকে তাঁর

জামাই। সুজাউদ্দীন। অন্যদিকে পৌত্র সরফরাজ। মুর্শীদকুলীর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। সন্তান বলতে একটিই, কন্যা। জিন্নেতুন্নেসা বেগম। সরফরাজের দিকে ছিল উত্তরাধিকার। সুজার দিকে ছিল চক্রান্ত ও লোভ। অতিরিক্ত কামপ্রবণতার জন্যে মুর্শিদকুলি খাঁর মনে অসন্তোষ জমা ছিল জামাই-এর প্রতি। তিনি ছিলেন সরফরাজের প্রতি সদয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হল লোভেরই। জয়ী হলেন সুজাউদ্দীন। স্ত্রী ও শাশুড়ির উদারতায়। সরফরাজ মাথা নোয়ালেন। সেটা তাঁর মাতৃভক্তির পরিণাম।

সিংহাসন নিয়ে বিদ্বেষ রয়েছে ঠিকই। তবুও একটা কথা সত্যি যে, মুর্শিদকুলীর পর দুজন অযোগ্য নবাবের আমলেও বাংলাদেশের আর্থিক কাঠামো, সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েনি। এবং এই ভেঙে না পড়ার মূল কারণ একটাই। মুর্শিদকুলীর গড়ে যাওয়া শাসন পদ্ধতি। একালের ঐতিহাসিকদের চোখে মুর্শিদকুলী সেই কারণে একটি স্মরণীয় চরিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের চূড়ান্ত বিক্ষোভকে কানাকড়ি দাম না দিয়েই।

"Mughal civilization in the eighteenth century has been described as a spent bullet. The court was decadent and the aristocracy presented a picture of complete degenaration. But it would be a mistake to think of Bengal in the Mughal administrative setting on the first half of the eighteenth century,…a remarkable change took place in the begining of the eighteenth century with the coming of Murshid Quli Khan to Bengal,…Bengal got the full benefit of his remarkable administrative ability,…Murshid Quli Khan evoled an efficient system of Civil Administration. …No wonder Mughal Administration did not collapse in Bengal as it did in the rest of India for it had been cast into a new mould here. No doubt the powerful were oppresive and the weak fraudulent. But the Zaminder as the subordinate instrument of a larger system was answerable for peace and good order in the country.…"
Economic History of Bengal,

বাংলার সিংহাসন নিয়ে লোভ-লালসার সূত্রপাত মুর্শিদকুলী যখন বেঁচে, তখন থেকেই। অবশ্য গোপনে। এবং সুজার পক্ষে। যাঁরা মন্ত্রণাদাতা তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম প্রধান।

মির্জা মহম্মদ আলী আর হাজী আহম্মদ। দুই ভাই। হাজী বড়। মির্জা

ছোট। এঁরা তুর্কবংশীয়। পিতামহ ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের 'দুধ ভাই'! মির্জার বাবা আর বড় ভাই হাজী ছিলেন যুবরাজ আজিমশার কর্মচারী। আজিমশার মৃত্যুর পর এঁদের দিন কাটতে থাকে দারুণ দুঃখে। কোনও কোনও ইতিহাস লেখক বলেছেন, মির্জার বাবা ছিলেন আজিমশার রান্নাশালের দারোগা। আজিমশার মৃত্যুর পর অনেক ধনরত্ন হাত সাফাই করে সরে পড়েছিলেন এঁরা। কেউ কেউ সেটা স্বীকার করতে নারাজ। তা যদি হত, তাহলে দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে পথের আশ্রয়ে দিন কাটাবেন কেন? মুর্শিদকুলীর জামাই সুজাউদ্দীন এঁদের মায়ের দিক থেকে আত্মীয়। এঁরা চলে এলেন কটকে, সুজার কাছে। তার আগে অবশ্য মির্জা মহম্মদ একবার ঘুরে গেছেন মুর্শিদাবাদ। চাকরী চাই। কিন্তু কোন রকম পাত্তা দিলেন না মুর্শিদকুলী। তার কারণ দুটো। এঁরা জামাই-এর পক্ষের লোক। জামাই-এর চরিত্রহীনতা সম্বন্ধে তাঁর হাড়ে-মাসে রাগ। তাছাড়া যে কারণ, সেটা হল স্বজাতি বাৎসল্যের ব্যাধিটাকে কোনদিন প্রশ্রয় দেননি তিনি। অজ্ঞাতকুলশীল ভাগ্যান্বেষী মুসলমানদের প্রতি কোনদিনও সহানুভূতি দেখাতে পারেননি তিনি। মির্জা ফিরে গেলেন সুজার কাছে। মির্জার বুদ্ধি সুদ্ধি চালাক চতুর চরিত্রটা সুজাকে মুগ্ধ করল। একশ টাকার চাকুরী দিয়ে দিলেন তাঁকে। সেই সংগে পরিবারের অন্যদের জন্যে বৃত্তি। সামান্য চাকরী থেকে, বুদ্ধির জোর আর যুদ্ধের সাহস দেখিয়ে মির্জা হয়ে গেলেন একটা বিভাগের ফৌজদার। কিছু দিন পরে নিজের তিন ছেলেকে নিয়ে হাজী আহম্মদও কটকে হাজির। এই দুই ভায়ের পরামর্শ ছাড়া তখন আর সুজার দিন কাটে না। কোনও কোনও সমসাময়িক লেখকের ধারণা, দুই ভাই তাঁদের বেগমকে সুজার সেবায় লাগিয়েই সিদ্ধ করেছিলেন নিজেদের মনস্কামনা। এই মির্জা মহম্মদ আলিই বাংলার পরবর্তী ইতিহাসের আরেক বিখ্যাত নায়ক, আলিবর্দী খাঁ।

"মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পূর্বেই আলিবর্দী খাঁ প্রভৃতির মন্ত্রণায়, তাঁহাদের পরিচিত লোক দ্বারা দিল্লী দরবারে মন্ত্রী আমির-উল্-উম্‌রা-খান দৌরাণের সাহায্যে সুজা খাঁর নবাবীপদে নিয়োগের সনন্দ প্রাপ্তির উদ্যোগ হইতেছিল। তৎপরে কুলী খাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিল। একবার পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযান অকর্তব্য মনে হইল, কিন্তু রাজ্যভোগ লালসা হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধ করিতে লাগিল। শেষে মন্ত্রীবর্গের উত্তেজনায় অন্যতম পুত্র তকী খাঁকে প্রতিনিধি রাখিয়া সুজা সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন! পথিমধ্যে মেদিনীপুরে বাদশাহী সনন্দ পাইলেন। এদিকে সরফরাজ খাঁ পিতার আগমনবার্তা পাইয়া, একদল সৈন্য

পাঠাইয়া বাধা-প্রদানের পরামর্শ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্মশীলা বুদ্ধিমতী মাতা ও মাতামহী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। পিতার সহিত বিরোধ ধর্মবিগর্হিত ও অযশস্কর; পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, কতকালই বা রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিবেন, সরফরাজের নিজস্ব সম্পত্তিও প্রচুর রহিয়াছে, ইত্যাদি কথায় সরফরাজ নিরস্ত হইলেন। স্নেহময়ী জননীও মাতামহীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, অনুচর সঙ্গে প্রত্যুদ্গমন ও পিতাকে অভিবাদন করিলেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

সুজাউদ্দীন পারস্যের খোরসান প্রদেশের লোক। আফ্‌সর নামের বিখ্যাত তুর্ক বংশের ছেলে। দক্ষিণাপথের বুরহানপুরে জন্ম। মুর্শিদকুলী খাঁর মেয়েকে বিয়ে করে তাঁরই আশ্রয়ে মানুষ। কুলী খাঁ যখন বাংলার দেওয়ান, জামাইকে প্রথম বসালেন উড়িষ্যায় নায়েব দেওয়ান করে। পরে নায়েব-নাজিম। সুজার চরিত্র এমনিতে বেশ নম্র, ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু সব ঢাকা পড়ে যায় এক কলঙ্কের কালো মেঘে। সেটা হল অতিরিক্ত কামাসক্তি। এবং সেটা এতই তীব্র যে, স্ত্রী জিন্নেত স্বামীকে ছেড়ে মুর্শিদাবাদে থাকেন।

সিংহাসনে বসে সুজা চেষ্টা করলেন নিজেকে ভালমানুষ সাজাতে। পুত্র এবং স্ত্রীর মনে যেন কোন ক্ষোভ বা খেদ না জন্মায় মনোযোগ দিলেন সেদিকে।

দেওয়ান হলেন আলমচাঁদ। বাদশাহী দরবার থেকে তাঁকে আনিয়ে দেওয়া হল রায়-রায়ান উপাধি। সেই সঙ্গে এক হাজারী মন্‌সবীর সনন্দ। দেওয়ান হয়ে আলমচাঁদ দেখলেন, নবাবের বিলাসিতার খরচপত্র তো সাংঘাতিক। অঢেল টাকার দরকার, রাজকীয় আড়ম্বর নামক হাতির খোরাক যোগাতে। খরচটা কমানোর দিকে নজর না দিয়ে, দেওয়ান সাহেব মন দিলেন নতুন নতুন আবওয়াব তৈরীর কাজে। যাতে প্রজার কাছ থেকে আরও টাকা শোষণ করে ফাঁপিয়ে তোলা যায় রাজকোষ। সুজার রাজ্যশাসন চলেছে ভালভাবেই। শ্বশুরের আমলে যে-সব জমিদারকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, তিনি একে একে খুলে দিলেন তাঁদের হাতের শিকল। মুক্তি পেয়ে মনের আনন্দে তাঁরা রাজী হয়ে গেলেন, নবাবকে রাজস্ব ছাড়াও অতিরিক্ত নজরানা দিতে। কুলী খাঁ যে-সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, হিসেব কষে দেখা গেল তার পরিমাণ ৬১ লক্ষ টাকার মত। সেই টাকা, কয়েকটা হাতি আর কিছু উপঢৌকন পাঠিয়ে দেওয়া হল দিল্লীর দরবারে। সম্রাটের মনোরঞ্জন চাই। মনোনয়নও। কাজ হল এই উপহারে। উপহার ছাড়া রাজকর তো ছিলই, বছরের শেষে। অচিরাৎ তিনি উপাধি পেলেন, মোতামেন-উল্‌-মুলুক-সুজাউদ্দীন-বাহাদুর-আসদজঙ্গ। সঙ্গে সাত হাজারী মন্‌সবী আর ঝালরদার পাল্কী।

রাজা হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই পাটনার শাসনকর্তা ফকরুদ্দৌলা হলেন পদচ্যুত। সুজা ডাক দিলেন পুত্র সরফরাজকে। আজ থেকে পাটনার শাসক তুমিই। কিন্তু বাদ সাধলেন জননী জিন্নেত। প্রিয় সন্তানকে বিদেশে, নয়নের আড়ালে পাঠাতে রাজী নন তিনি। তাহলে কে যাবে ?

সুজার মন্ত্রীসভায় তখন উপদেষ্টা চারজন। হাজী মহম্মদ, আলমচাঁদ, ফতেচাঁদ, আর জগৎশেঠ। আলিবর্দী খাঁ রাজমহলের ফৌজদার। সুজা আলিবর্দীর দিকেই চোখ ফেরালেন। পাঁচশ' সৈন্য দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বিহারে, পাটনার শাসনকর্তারূপে। মাত্র কয়েকদিন আগে কনিষ্ঠা কন্যা আমিনার গর্ভে জন্ম নিয়েছে নাতি সিরাজউদ্দৌলা। আলিবর্দী ভাবলেন, নাতিটি বড় পয়মন্ত। সেই থেকে নাতির প্রতি তিনি দুর্বল। পাটনায় কয়েক বছর বেশ দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য চালানোর কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে সুজাউদ্দীন তাঁকে দিল্লী থেকে পাইয়ে দিলেন নতুন উপাধি। মহব্বৎ-জঙ্গ ! সেই সঙ্গে পাঁচহাজারী মন্‌সবী। রাজকার্য বেশ ভাল ভাবে চলেছে দেখে সুজাউদ্দীন এবার মনোযোগ ফেরালেন অন্যদিকে। ঐশ্বর্য, আড়ম্বর, অট্টালিকা এবং প্রমোদ-কানন।

মুর্শিদকুলী খাঁর প্রাসাদটা ছিল বহরে ছোট। সেটাকে তিনি নতুন করে গড়লেন বিরাট প্রাসাদের চেহারায়। মুর্শিদকুলীর সময়ে নাজির আহম্মদ ছিলেন ক্রোক সাঁজোয়াল। তাঁর দাপ-দাপটে সবাই থরহরি কম্পমান। জমিদারদের উপর অত্যাচারে তাঁর হাত ছিল খুবই পাকা। নবাবী কেল্লার উল্টোদিকে, ভাগিরথীর পশ্চিমপারে তিনি বানিয়ে ছিলেন একটা বাগানঝাড়ি আর একটা মসজিদ। সুজা সিংহাসনে বসেই তলব করলেন নাজির আহম্মদকে। তল্লাস করলেন, লোকটা সত্যিই কতটা অত্যাচার করেছে জমিদারদের উপর। প্রমাণ পেলেন হাতে নাতে। সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করলেন নাজিরের সম্পত্তি। নাজিরের আরম্ভ করা বাগানবাড়ি দখল করে সুজা বানালেন নিজের প্রমোদ উদ্যান। সুন্দর মসজিদ, বিরাট দীঘি, কেলিকুঞ্জ। প্রত্যেক বছর বসন্তকালে সুজা আসেন আমোদ-আহ্লাদে দিনগুলো কাটাতে। সঙ্গে থাকে 'স্ত্রীগণ'। জায়গাটার নতুন নামকরণ হল, ফর্‌রাবাগ বা আনন্দকুঞ্জ।

"প্রতি বর্ষে সুজা খাঁর জন্মদিবসে তুলট হইয়া দরিদ্রগণকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বিতরণ করা হইত। কর্মচারী ও অনুরক্তদের প্রতি দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। ...পান ভোজনের পারিপাট্য, বন্ধুবর্গের প্রীতিভোজন এবং গীতবাদ্যের ব্যবস্থায় যথেষ্ট ব্যয় হইত। উৎসবাদি মহাসমারোহে নির্বাহ হইত। পণ্ডিত ও ফকীর-গণের প্রতি তাঁহার সমধিক শ্রদ্ধা ছিল। গজদন্ত-নির্মিত স্মারক লিপিতে শয়নের

পূর্বে তিনি পরদিন পুরস্কার প্রদানের উপযুক্ত পাত্রগণের নাম লিখিয়া রাখিতেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

সুজার আমলে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ বাধাবিঘ্ন ঘটল না। ইংরেজরা সেটাকে কাজে লাগাল নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে। কোম্পানী রইল মাথায়। আর মাথার ভিতরে সব সময় যে-যার নিজের গোপন ব্যবসা চালিয়ে মুনাফা লোটার ফন্দি-ফিকির। সেটা যে কত বৃহৎ আকার নিয়েছিল, কোম্পানীর ডিরেকটররা বিলেতে বসেও টের পেলেন, লাভের অঙ্ক দেখে। আগে যেখানে শতকরা ৮ টাকা লাভ হত, এখন সেটা সাত। অথচ ওলন্দাজরা করছে শতকরা ২৫। কড়া চিঠি এল বিলেত থেকে। ব্যাপার কি? একে তো পাঠাচ্ছো নিকৃষ্ট মাল। তাতে ক্রেতা চটছে। ভয়-ভীতি দেখা দিচ্ছে কোম্পানীর অংশীদারদের মনে। তার উপরে কোম্পানীর উন্নতির চেয়ে এখন তোমাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে নিজের নিজের গোপন ব্যবসা। সর্বনাশ হচ্ছে আমাদের। পৌষ মাস তোমাদের।

শুধু চিঠিই এল না। এল ছ' জন মেম্বারের বরখাস্তের নোটীশ। কোম্পানীর শাসন-পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটানো হল কিছু কিছু। কলকাতার ইংরেজরা সংযত হল খানিকটা।

ইতিমধ্যে ঘটে গেছে আরো দুটো গণ্ডগোল। একটা ঘরে। একটা বাইরে। ঘরেরটা হল, বিলেতের একদল বণিক কোম্পানীর বিরুদ্ধে এবং স্বাধীন বাণিজ্যের পক্ষে আবেদন জানাল হাউস অব কমন্স-এ। সেটা ১৭৩০। শেষ পর্যন্ত কুড়ি লক্ষ টাকা উৎকোচ আর দেনার সুদ কমিয়ে ১৭৬৬ পর্যন্ত যেমন ব্যবসা চলছে তেমনি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেল কোম্পানী।

বাইরের গণ্ডগোলটা হল অন্য এক বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে। ইউরোপের অনেক দেশ ভারতবর্ষে ব্যবসা চালিয়ে মোটা টাকা লুটছে দেখে জার্মান সম্রাটের অধীন বেলজিয়মের কয়েকজন বণিক সম্রাটের সনদ নিয়ে হুগলীর কাছে বাঁকীপুরে এসে হাজির। সে ঘটনা ১৭২৩-এর। কোম্পানীর নাম অষ্টেণ্ড কোম্পানী। মুর্শিদকুলী তখনো বেঁচে। তিনি জানতেন বিদেশী বণিকদের মধ্যে যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, তত তাঁরই লাভ। তাই এই নতুন কোম্পানীকে কুঠি গড়বার অনুমতি দিয়েছিলেন সহজেই। মুর্শিদকুলীর কাছে আবেদন জানিয়ে ফল হবে না জেনেই, অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা একজোটে আবেদন জানালেন জার্মান সম্রাটের কাছে। তাতে কাজ হল। আদেশ এল, সাত বছর অষ্টেণ্ড কোম্পানী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে পারবে না।

ওদিকে তখন বাঁকীপুরে চলেছে তাদের কুঠির চারপাশে পাঁচিল তোলা। আর বুরুজ গড়া। ইংরেজ আর ওলন্দাজরা একসঙ্গে আক্রমণ করল সেই কুঠি। ছোট্ট একটা জার্মান জাহাজ অধিকার করে নিল গোড়াতেই। হুগলীর ফৌজদার পীর খাঁ কালোয়াৎকে উৎকোচে বশীভূত করে অষ্টেণ্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধে নানান রকম অতিরঞ্জিত অভিযোগ পেশ করল নবাবের কাছে। নবাব হুকুম দিলেন, দুর্গ ভাঙো। লাগল ফৌজদারের সঙ্গে অষ্টেণ্ড কোম্পানীর লড়াই। লড়াইয়ে হেরে এই নতুন কোম্পানীর সকলেই পালাল বাংলাদেশ ছেড়ে।

অষ্টেণ্ড কোম্পানী গেল বটে, কিন্তু ইংরেজদের জন্যে রেখে গেল এক অভিশাপ। সেটা হল ফৌজদারের অর্থ লালসা। রোজই তাঁর নানান রকম দাবী। নজরানার উৎপাত। না পেলেই ইংরেজদের মাল বোঝাই নৌকো আটক। নবাবের কানে তাদের সম্পর্কে নানাবিধ অভিযোগ পৌঁছে দেওয়া। এ সব শুনে নবাব একবার হুকুম দিলেন কলকাতা, কাশিমবাজার প্রভৃতি জায়গায় ইংরেজ কুঠিতে কোন খাবার-দাবারের জিনিষ যেন না পৌঁছয়। ইংরেজদের চোখে তখন সর্ষে ফুল। কি উপায় আছে বাঁচার। উপায় দুটো। এক হল, অনুনয়-বিনয় ক্ষমা ভিক্ষা। দুই হল, উৎকোচ। শেষ পর্যন্ত রফা হল তিন লক্ষ টাকায়। বিলেতে বসে কোম্পানীর কর্ণধাররা বুঝলেন, কিছুটা কঠোর না হলে বাংলাদেশের ব্যবসা ডুবে যাবে একদিন। নতুন নিয়ম ঘোষণা করল কোম্পানী। এখন থেকে কোম্পানীর কর্মচারীদের শপথ করে জানাতে হবে যে, তাদের সংগে দেশীয় লোকের ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন রকম সম্পর্ক নেই। এই ঘটনা ১৭৩৭-এর।

১৭৩৭ আরও একটা ভয়ংকর কারণে স্মরণীয়। এই বছরের ১১ অক্টোবর ঝড় উঠেছিল গঙ্গাসাগর থেকে। ঝড়ের সঙ্গে ভূমিকম্প। সেই ঝড়ে ভেঙে চুরমার হয়েছিল কলকাতা। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিবরণ।

"১৭৩৭-এ ভীষণ ঝটিকা ও ভূমিকম্পে কলিকাতার সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। ১৭৩৮-৩৯ সালের Gentleman's Magazine পত্রিকায় ইহার যে বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে জানা যায় কলিকাতায় তখন দুইখানি বাটী ভূমিসাৎ হয়। প্রথম চূড়াওয়ালা গীর্জা সেন্ট জনের চূড়াটি ভূপতিত হয়। নয়খানি ইংরাজ কোম্পানীর জাহাজের মধ্যে আটখানি এবং চারখানির মধ্যে তিনখানি ডাচ্ জাহাজ লোকজন ও মালপাত্রসহ জলমগ্ন হয়। ঝটিকা এত প্রবল হইয়াছিল যে, অনেক বড় বড় নৌকাও গাছের উপর উঠিয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, এই দৈবদুর্বিপাকে সর্ব সমেৎ গঙ্গাতে ২০.০০০ জাহাজ, নৌকা,

স্লুপ প্রভৃতি জলমগ্ন হয় এবং তিন লক্ষ প্রাণী বিনষ্ট হয়।" প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়।

"১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর রাত্রে ঐ ঝড় ও ভূমিকম্পে নদীর জল চল্লিশ ফিট উচ্চ ও নৌকা জাহাজ লোকজনাদি নষ্ট হয়। স্থলে গির্জা ঘর বাড়ি গাছপালা, জীবজন্তরও মৃত্যু হয়। উহাতে পর বৎসর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। চতুর ইংরাজ কোম্পানী সেই সময়ে সকলের দুঃখ দূর করিবার বিধিমত চেষ্টা করিয়া সকলকে বাধ্য করিয়াছিল।

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মন্ত্রণা সভার সভ্য স্যার ফান্সিস রসেলের বর্ণিত ঝড়ের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া গেল – আমি কখনও সেই ঝড়ের বিষম সন্ সন্ শব্দের সহিত মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত আদি ভুলিতে পারিব না। প্রতি মুহূর্তেই বোধ হইতে লাগিল যে, যেন সকলে বাড়ী চাপা পড়িয়া সমাধিস্থ হইবে। সকলে সেই ভয়, উদ্বেগ ও মৃত্যুর আশঙ্কায় সমগ্র রাত্রি বসিয়া কাটাইলাম। প্রভাতের দৃশ্য অতীব ভয়ঙ্কর। পূর্ব দিনের রাত্রের ঝড়ে ডিউক অব ডর্সেট নামক জাহাজ ভিন্ন ছোট বড় ঊনত্রিশ জাহাজাদি, কতকগুলি নদীতে ডুবিয়াছে, তীরে ভাঙিয়া আড় হইয়া পড়িয়াছে, ও কতকগুলি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া চূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। বৃক্ষ সমুদায় রাস্তার দুই ধারে জুড়িয়া পড়িয়া আছে। সেণ্ট জন গির্জার চূড়া ভাঙিয়া পড়িয়া আছে। আর আর সমস্ত মাটিতে সমভূমি, ইংরাজ ও বাঙালীর বাড়ী মধ্যে দশ বার খানি একেবারে ধুলিশায়ী হইয়াছে। নদী স্রোতে বাঘ, গণ্ডার ও গৃহপালিত পশুপক্ষী মৃতাবস্থায় ভাসিতেছে, ও কতক পথিমধ্যে পড়িয়া আছে। ঝড় আসিবার পর জলমগ্ন জাহাজের মধ্য হইতে মাল উদ্ধার করিবার চেষ্টা হয়। একে একে তিন জন লোক নামিয়া গেল, কিন্তু তাহারা আর ফিরিল না। শেষে দেখা যায় যে, এক প্রকাণ্ড কুম্ভীর সেই ডেকের মধ্যে উহাদিগকে জলপান করিয়াছে। পরে উহাকে বধ করিলে উহার উদর মধ্য হইতে তাহাদের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঁচ ঘণ্টায় নদীতে জল ১৫ ইঞ্চি বাড়িয়াছিল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প। ঝড়টি বঙ্গোপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ষাট লিগ পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী স্থানে ব্যাপৃত হয়। উহাতে অনেক ছোট জাহাজ, নৌকা দুই শত ফিট দূরবর্ত্তী গ্রামের মধ্যে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।" কলিকাতার কথা।

"১৭৩৭ খ্রীঃ। ১১ই অক্টোবর রাত্রে গঙ্গাসাগরে এক প্রবল ঝটিকা উঠিয়া উত্তর দিকে প্রায় একশত ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থান ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ানক ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল। কলিকাতার যে-পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল

তাহা বর্ণনাতীত। দুই শত ইষ্টক নির্মিত গৃহ একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কোম্পানীর গীর্জার প্রকাণ্ড চূড়া পতিত হইয়া মৃত্তিকামধ্যে বসিয়া যায়। কিন্তু ভাঙ্গে নাই।…গঙ্গার জল ৪০ ফিট উচ্চ হইয়া উঠে। এই বিপদের উপর পরবর্ষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কলিকাতার ইংরেজ অধ্যক্ষ এ সময়ে দরিদ্র দেশীয়গণকে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন, খাজনা রেহাই দিয়া, চাউলের মাশুল উঠাইয়া দিয়া, যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিয়া ও টাকা কর্জ দিয়া, তিনি এসময়ে কলিকাতাবাসিগণের আশীর্বাদভাজন হন। কোম্পানীর বিলেতের কর্তৃপক্ষগণও এই কার্যে অধ্যক্ষের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন!" বাঙ্গলার ইতিহাস।

"The year 1737 broought with a great calamity. The Gentleman's Gazzette of that year says, 'In the night of the 11th October 1737, there happened a furious hurricane at the mouth of ganges, which reached sixty leagues up the river, There was at the same time a violent earthquake, which threw down a great many houses along the river side; in Golgota (i. e. Calcutta) alone, a port belonging to the English, two hundred houses were thrown down and the high and magnificent steeple of the English church sunk into the ground without breaking. It is computed that 20,000 ships, bargues, sloops, boats, canos &c. have been cast away; of nine English ships then in the Ganges, eight were lost, and most of the crew drowned. Bargues of sixty tons were blown two leagues up into land over the top of the high tree; of four Dutch ships in the river, three were lost, with their men and cargoes; 300,000 souls are said to have perished. The water rose forty feet higher than usual in the Ganges.' Good old days of Honarable John Company.

উপরের একাধিক বিবরণ থেকে বাদ পড়েছে আর একটি ক্ষতির উল্লেখ। সেটি গোবিন্দরাম মিত্রের বিখ্যাত মন্দির। ঐ সময়ের ঝড়েই চূড়া ভেঙে ছিল সেই আকাশ-ছোঁয়া নবরত্ন মন্দিরের।

এই বিবরণগুলো আমাদের মনে যে সব প্রশ্ন জাগায় তার মধ্যে প্রধানটি হল কলকাতার তখনকার লোকসংখ্যা। ১৭৫২-র কলকাতায় লোকসংখ্যা চার লক্ষ, এটা হলওয়েলের হিসেব। জমিদারী সংক্রান্ত একটা রিপোর্ট দাখিল করতে গিয়ে দাখিল করেছিলেন এই হিসেবটা। তার কুড়ি বছর পরে সেনসাস্

অফিসার বেভারলি সাহেব যখন চারদিকের হিসেব-নিকেশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে গেলেন, তখন চোখে পড়ল, হলওয়েলের হিসেব গোঁজামিল। তিনি জানালেন, ১৭৫২-য় এক লাখের বেশী জনসংখ্যা হতেই পারে না। বাড়িয়ে বলা হলওয়েলের একটা মুদ্রাদোষ। বেভারলি ছাড়াও আরও একজনের মন্তব্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হ্যামিলটন সাহেব। তাঁর মতে ১৭১০-এ কলকাতার লোক সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হলে হবে বারো হাজার। এই দুটো মন্তব্যকে নেড়ে-চেড়ে দেখলে সহজেই অনুমান করা যায় ১৭৩৭-এর ঝড়ে কলকাতার মৃত্যের সংখ্যা তিন লাখ, এটা অতিরঞ্জিত মিথ্যা।

প্রশ্ন জাগে আরও একটা। ১৭৩৭-এর কাছাকাছি সময়েও জেন্টলম্যান গেজেটে কলকাতার বদলে গলগাথা কেন? ঐ বিখ্যাত পত্রিকায় গলগাথা-র উল্লেখ কি তাহলে তখনকার প্রচলিত ধারণা বা নিয়মেরই প্রতিফলন?

কলকাতার কথা ছেড়ে আবার আমাদের ফিরে তাকাতে হবে বাংলা-দেশের রাজনীতির দিকে। সুজাউদ্দীন এখনো সিংহাসনে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুলগ্ন প্রায় আসন্ন। সম্ভবত এটা টের পেয়েছিলেন নিজেও। তাই শ্বশুরমশায়ের অনুকরণে ভাগিরথীর তীরে নবাবী কেল্লার সামনে গড়লেন নিজের সমাধি আর তারই পাশে মসজিদ। সমস্ত রাজকর্মচারীকে ডেকে পুরস্কার দিলেন দুমাসের মাইনে। ক্ষমাপ্রার্থনা করে নিলেন কৃতকর্মের। তারপর ১৭৩৯। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে। বিনা বাধায় সিংহাসনে বসলেন পুত্র সরফরাজ।

দোষে গুণে মিলিয়ে সুজা ছিলেন বেশ ভালই। অন্তত প্রজাদের দিক দিয়ে বিচার করলে, তার রাজত্বকালটাকে বেশ সুখেরই বলা যায়। দেওয়ান তখন যশোবন্ত রায়। তিনি মুর্শিদকুলীর হাতে গড়া মানুষ! তাই চরিত্রে সাধু। কর্তব্যে দৃঢ়। সুখ বাড়ুক প্রজাদের। তা বলে সরকারের যেন ক্ষতি না হয়, এক সঙ্গে এই দুটো দিকে তাকিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতেন তিনি।

শায়েস্তা খাঁর সেই তোরণ দ্বার, যার গায়ে লেখা ছিল 'যে রাজার সময়ে শস্য এমন সুলভ না হবে, তিনি যেন এই তোরণ দ্বার উন্মুক্ত না করেন', যশোবন্তের আদেশে সেই তোরণ দ্বারের উন্মোচন হল মহাসমারোহে।

"In the midst of Maharatta invasious and the convulsions which followed men looked back to his time as a golden age when Bengal realley merited the title of 'Paradise of Provinces' which it had received in former time." The House of Jagatseth.

সরফরাজ মানুষটা কেমন ? ইতিহাসে নানান মতবিরোধ।

"সরফ্‌রাজ একজন আদর্শ ধার্মিক। যৌবন, ধনসম্পদ প্রভৃতি চরিত্র কলুষিত হইবার প্ররোচক উপকরণ সমস্ত বর্তমান থাকিলেও, তাঁহার কোন দোষ লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার সামান্য রাজ্যকাল মধ্যে আমি সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতাম, কখনও তাঁহাকে দুষ্ক্রিয়াসক্ত দেখি নাই, কিন্তু হায়, রাজকার্যের নীতি কৌশল তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।" ইউসুফ আলি খাঁ।

"ধর্মের বাহ্যাড়ম্বর থাকিলেও, সরফ্‌রাজ পিতার ন্যায় লম্পট ছিলেন। নান প্রকারের ১৫ শত রমণী ছিল। ইহাদের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ-বাটিকায় আমোদে-প্রমোদে কালকর্তন করিতেন। উপপত্নীর পীড়া হইলে রোজা রাখিয়া, মাথায় কোরাণ লইয়া, রৌদ্রে দণ্ডায়মান থাকিতেন। সপক্ষে এইমাত্র বলা যায় যে, মাতাল ছিলেন না। অধার্মিক শিয়াগণের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ছিল। ধর্ম বিগর্হিত ও রাজ্যের ক্ষতিকর অনেক কার্য্য তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল।" তারিখ-বাঙ্গলা।

"A man of mean abilities and governed only by his vices." Orme.

"Indulged in excessive debauchery even to that degree as to disorder his faculties, soon rendered himself odious to his own people, and lost affection of those who migbt have sopported him." Scrafton.

"His excesses in spirituous liquoss and women, were beyond control and example ; his insolence and impetuosity of temper beeame intolarable to all about him." Holwell.

সিংহাসনে বসে সরফরাজ, বাবার নির্দেশ মত, সমস্ত প্রাচীন রাজকর্মচারীকে বহাল রাখলেন যার-যার পদে। কেবলমাত্র অবসর নিতে বাধ্য করালেন একজনকে। তিনি হাজী আহম্মদ। এর পিছনে উস্‌কানি অথবা পরামর্শ ছিল নিজের প্রিয় অনুচরবর্গের। হাজী মুখে ভান করলেন, যেন আঘাত পাননি এতটুকুও। মুখে বললেন, বুড়ো হয়েছি, এখন আবার রাজকার্য কেন ? বেশ করেছ। তবে তোমার বাবার খেয়ে মানুষ। বিপদে আপদে যখনি ডাকবে, আছি। উত্তর শুনে সরফরাজ বিগলিত। ভাবলেন, এমন সাচ্চা মানুষ আর হয় না। আগের চেয়ে গোপনে অনেক আস্থা বেড়ে গেল হাজীর উপর। গোপনে নেন হাজীর পরামর্শ। অন্যেরা তাঁর দোষ-ত্রুটি, বিশ্বাসঘাতকতার নালিশ জানালেও কান পাতেন না সেদিকে। হাজী বলেছে, ব্যয় সংক্ষেপের জন্যে সৈন্য

সংখ্যা কমান। তাই করলেন সরফরাজ। এটা যে চক্রান্ত, ভাই আবলীর্দীকে সিংহাসনে বসানোর, সেটা অনুমান করার মত বুদ্ধি ছিল না সরফরাজের ঘটে। চক্রান্তের অংশাদার একা হাজীই নন। আছেন ফতেচাঁদ জগৎশেঠও সঙ্গে। জগৎশেঠকে বলা যায় তখনকার 'কিং মেকার'। সিংহাসন থেকে দূরে থাকেন। কিন্তু সিংহাসন চলে তাঁর আঙুলের নড়াচড়ায়। জগৎশেঠ হুণ্ডী দিলে তবে দিল্লীতে যায় রাজকর। বাংলাদেশের 'আন-ক্রাউণ্ড' রাজার মতই প্রতাপ। সেই জগৎশেঠ একদিন চটলেন সরফরাজের ব্যবহারে। ইতিহাসে এ নিয়ে দুটো কাহিনী। প্রথমটা হল—

জগৎশেঠের পৌত্র মহাতাপ রায়। তাঁর সঙ্গে বিয়ে ঘটল এগারো বছরের এক পরমাসুন্দরীর। সরফরাজের কানে গিয়ে পৌছল সে খবর। রূপসীর নামে রোমাঞ্চিত নবাব শেঠ পরিবারে সমাচার পাঠালেন, আমি একবার কন্যাটিকে দেখতে চাই। মুসলমান নবাব দেখবেন তাঁদের কুলের বৌকে, এই লজ্জায় ছিঃ ছিঃ পড়ে গেল শেঠ পরিবারে। কর্তা-ব্যক্তিরা এসে অনুনয়-বিনয় জানাল নবাবের কাছে। নবাব অবিচলিত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়ে ঘেরাও করলেন শেঠ-বাড়ি। হুকুম গেল, শেঠ বাড়ির বধূটিকে যেন নবাবের প্রাসাদে পাঠান হয়। তিনি কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করছেন, বধূটিকে মাত্র এক পলক দেখেই ছেড়ে দেবেন। নবাবের উৎপীড়নের ভয়ে বাধ্য হতে হল শেঠ পরিবারকে। তবে ঘটনাটা ঘটল, দিনমানে নয়। রাত্রির অন্ধকারে। এ ছাড়া দ্বিতীয় ঘটনাটা হল—

সরফরাজের ধারণা জন্মেছিল, মুর্শিদকুলীর সাত কোটি টাকা গচ্ছিত আছে শেঠ-বাড়িতে। সরফরাজ হঠাৎ একদিন চেয়ে বসলেন সেই টাকা। জগৎশেঠ বললেন, কোথায় পাব টাকা ? কে বলেছে ঐ টাকা আমার কাছে ? সরফরাজ এজন্যে প্রচুর তিরস্কার এবং অপমান করলেন জগৎশেঠকে।

জগৎশেঠ বিপক্ষে। জগৎশেঠের মতই আমিনচাঁদও বিপক্ষে। তিনিও নাকি তিরস্কৃত ও অপমানিত হয়েছিলেন কোনও এক সময়। আর হাজী তো আছেই। শুরু হয়ে গেল চক্রান্ত। আলিবর্দীর কাছে খবর গেল, সসৈন্যে চলে এস মুর্শিদাবাদে। আক্রমণের জমি তৈরী।

আলিবর্দী ছুটে এলেন পাটনা থেকে, রণসাজে। কিন্তু মুখে মৃদু হাসি, উদারতার ভাষা। আমি আক্রমণ করতে আসিনি। এসেছি আমার পরিবারবর্গের অবমাননার সংবাদ পেয়ে।

কি সংবাদ সেটা। হাজীকে হাত করার জন্যে সরফরাজ পেশ করেছিলেন

এক প্রস্তাব। বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন নিজের ছেলের সঙ্গে হাজীর দৌহিত্রীর। হাজী তাতে অসম্মত। কারণ আগে থেকেই মির্জা মহম্মদ অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা। তাই নিয়ে আন্দোলন। হাজীর ছেলেরা রেগে লাল।

আলিবর্দীর মুখে এক। মনে এক। সরফরাজকে যখন সেটা বোঝালেন তাঁর প্রিয় অনুচরবর্গ, তখন তিনিও পরলেন রণসাজ। গিরিয়ার প্রান্তরে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। যুদ্ধে নিহত হলেন সরফরাজ, মাথায় গোলার ঘা খেয়ে। ৯ এপ্রিল। ১৭৩০।

"নবাবের তাম্বু পড়িল ব্রাহ্মণের স্থলে,
আলীবর্দীর তাম্বু তখন পড়িল রাজমহলে ॥
নবাবের তাম্বু যখন পড়িল দেয়ান সরাই,
আলীবর্দীর তাম্বু তখন আইল ফরক্কায় ॥
নবাবের তাম্বু আইল খাসরা সরাইতে,
আলীবর্দীর তাম্বু তখন সূতীর দরগাতে ॥
নবাবের তাম্বু পড়িল গিরিয়ার মাঠেতে,
আলীবর্দীর তাম্বু তখন পড়িল পিপিলাতে ॥"

সরফরাজের রাজত্ব এক বছর আঠাশ দিনের। তারপরই চির বিদায়।

"শুজা খাঁ নবাব সুত সরফরাজ খাঁ।
দেওয়ান আলমচন্দ্র রায় রায় রাঁয়া ॥
ছিল আলীবর্দী খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বাধিলেক তায় ॥
তদবধি আলীবর্দী হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা পাওসা খেতাব ॥"

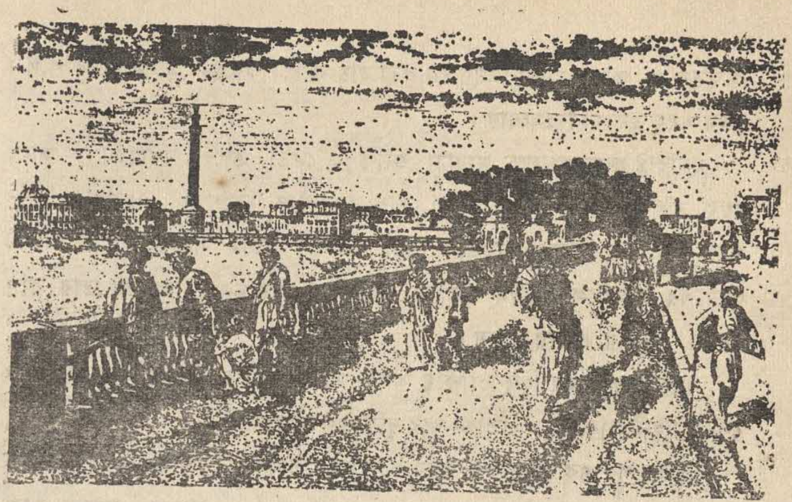
"যুদ্ধকাণ্ডের দুইদিন পরে আলীবর্দী খাঁ নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইতঃপুর্বেই হাজিকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিয়া নাগরিকগণকে নিশ্চিন্ত থাকিবার ভরসা দেওয়া হইয়াছিল। সরফরাজের মৃতদেহ যুদ্ধের দিন রাত্রেই আনীত হইয়াছিল, সরফরাজ-পুত্র মির্জা আমানী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ রাত্রিযোগে নাকটা-খালির বাটীতে উহা সমাহিত করিয়া, নগররক্ষায় বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আলীবর্দী খাঁ নগরে প্রবেশ করিয়া, প্রথমে সরফরাজ-জননী জিন্নেতুন্নেসা বেগমের প্রাসাদের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া, বিনয় নম্রবচনে তাঁহার নিকট কৃত-অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, ভবিষ্যতে তাঁহাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন ইত্যাদিও জ্ঞাপন করা হইল। সেখানে কোনও উত্তর না পাইয়া,

দরবার গৃহে প্রবেশ করিয়া, সর্বসমক্ষে সিংহাসন গ্রহণ করিলেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

আলিবর্দী সিংহাসনে বসলেন বটে, কিন্তু ইংরেজদের মনে তখনও সন্দেহ। যেহেতু বাদশার পরোয়ানা অর্থাৎ হুকুমৎনামা এসে পৌছয়নি তাঁর নামে। ২৯ মে। দিল্লী থেকে ইংরেজদের এক দূত ছুটে এল পাটনায়। হ্যাঁ, আলিবর্দীই নবাব হচ্ছেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার। ১০ জুন। ইংরেজরা খবর পেল, হ্যাঁ, ফরমান পৌঁছে গেছে মুর্শিদাবাদে। ১৯ অক্টোবর। কাশিমবাজারের ইংরেজরা দেখতে পেল ফরমানের কপি।

দিল্লীর সম্রাট তখন মহম্মদ শা। ফরমান আনতে আলীবর্দী পাঠিয়েছিলেন প্রচুর টাকা, মূল্যবান উপহার সামগ্রী। কারো মতে তার পরিমাণ এক লাখ। কারো মতে চুয়ান্ন লক্ষ সম্রাটের জন্যে। চার লক্ষ উজীরদের। উপাধি এল তার বিনিময়ে। স্নুজাউল মুল্‌ক হেসাম উদ্দৌলা। আর সাত হাজরী মনসবী। উপাধি জুটল আত্মীয়-স্বজনদেরও। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ঢাকায়, কনিষ্ঠ পাটনায় পেয়ে গেল নায়েব-নাজিমের পদ। ভূতপূর্ব দেওয়ান জানকী রায় পেলেন প্রথমে দেওয়ান পরে রাজা উপাধিসহ সামরিক বিভাগের প্রধান। রাজার বিভাগের সচিব হলেন চিন্ময় রায়। উপাধি পেলেন রায়-রায়ান। ভগ্নিপতী মীর মহম্মদ জাফর খাঁ হলেন সেনাপতি।

আর বুকের কাছে এঁটে রইল একজন। সে কে? সে দৌহিত্র সিরাজ। মাতামহের স্নেহপুত্তলী।



॥ বর্গি এল দেশে ॥

আলিবর্দী খাঁ রাজকার্যে নিপুণ। সংযত, স্থির, ধীর, ব্যক্তি। চরিত্রবান। সারা জীবন একটির বেশী দুটি নারীর সংসর্গে দিন কাটাননি কখনো। দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদের মত মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর তালিকায় এ এক আশ্চর্য ব্যতি-ক্রম। দোষের মধ্যে শুধু একটি। খেতে ভালবাসেন বিস্তর।

সিংহাসনে বসলেন বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের ডাক। ছুটতে হল কটকে। সুজাউদ্দীনের জামাই মুর্শীদকুলীকে শায়েস্তা করতে। যুদ্ধে জিতলেন। বীরত্ব দেখালেন সিপাহ শালার মীরজাফর। দ্বিতীয় জামাই সইদ্ আহম্মদকে মুর্শিদকুলীর জায়গায় বসিয়ে, স্থানীয় জমিদারদের কানে অভয়বাণী শুনিয়ে ফিরে এলেন মুর্শিদাবাদে। কিছু দিন যেতে না যেতেই আবার ছুটতে হল সৈন্যসামন্ত নিয়ে কটকে। আবার যুদ্ধ। কার সঙ্গে ? বাখর খাঁ-এর সঙ্গে। কে তিনি ? সইদ্ আহম্মদের লাম্পট্য, অত্যাচার, সৈন্যদের বেতন হ্রাস ইত্যাদি নানান রকমের বিশৃঙ্খল আচরণে উত্ত্যক্ত হয়ে রাজ্যের একদল লোক বাখর খাঁকে বসিয়ে দিয়েছিল সইদের জায়গায়। সইদ্ বন্দী। আলিবর্দী এসে শিকল খুলে দিলেন সইদের হাতের। উড়িষ্যার নতুন শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন মাসুম খাঁকে।

আলিবর্দী দেশে ফিরছেন। ধীর তাঁর প্রত্যাবর্তনের গতি। শরীর ক্লান্ত। সৈন্যদের দিয়েছেন ছুটি। ফিরে যাও মুর্শিদাবাদে। নিজের সঙ্গে রেখেছেন মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য। পথে পড়ল ময়ুরভঞ্জ। ময়ুরভঞ্জের রাজা বাখর খাঁকে সাহায্য

করেছিল। তাকে যতটা নির্য্যাতন করা যায় করে, ফিরছেন মেদিনীপুরের পথে। এমন সময় এল মহাদুঃসংবাদ।

মহারাষ্ট্র জুড়ে জেগেছে মারাঠা জাতি। নেতা তাদের শিবাজী। অসি, ধনুক, মল্লবিদ্যা আর অশ্বারোহণে তাঁর অসাধারণ নিপুণতা। একরাজ্য ধর্ম-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে বেঁধে তোলার মহান সংকল্পে, তিনি পার্বত্য প্রদেশের অন্তরালে দীর্ঘদিন সুকঠিন রণ-সাধনা করেছেন। অসংখ্য তার বর্গি সৈন্য। অসীম তাদের সাহস।

সমস্ত হিন্দুস্থানের হিন্দু তাকিয়ে আছে তাঁর সুগঠিত সংকল্প আর সংগঠিত সেনাবাহিনীর দিকে। এতদিন পরে বুঝি এল ত্রাণকর্তা।

একের পর এক রাজ্য জয় করে চলেছেন শিবাজী। আজ কঙ্কন। কাল বিজাপুর। পরশু সুরাট লুণ্ঠন। তারপর গোলকুণ্ডা। দেখতে দেখতে সারা দাক্ষিণাত্যে উড়ল মারাঠা জাতির বিজয় নিশান।

কিন্তু শিবাজীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আকস্মিক ভাবে থেমে গেল সব অগ্রগতি। বড় বড় সর্দার সেনাপতিরা মেতে উঠলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার, স্বার্থসিদ্ধির পারস্পরিক কলহে। দেশপ্রেম নিল লুণ্ঠনের, অরাজকতা-সৃষ্টির ভূমিকা।

মারাঠা নায়ক তখন রঘুজী ভোঁসলে। মন্ত্রী পণ্ডিত ভাস্কররাম কোলহৎকর। কূটবুদ্ধিতে অতুলনীয়। তারা দুজনে ঠিক করলেন বাংলাদেশকে এইবার জয় করে জুড়ে দিতে হবে নাগপুরের সঙ্গে। কি করে সম্ভব হবে সেটা? কেন লুঠ-পাট, জোর-জুলুম, হত্যা আর অত্যাচারে। নাগপুরের এক পাহাড়ী অঞ্চলের অন্ধকার অরণ্য বার বার শিউরে উঠল এই দুই মারাঠা বীরের গোপন ষড়যন্ত্রে।

শিবাজীর জীবিত কালেই দিল্লীর বাদশা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে রাজস্বের এক চতুর্থাংশ অথবা চৌথ মারাঠাকে দেওয়া হবে। ভাস্কর পণ্ডিত আলিবর্দীর কাছে চেয়ে পাঠালেন সেটা। আলিবর্দী অস্বীকার করলেন অতীতের অঙ্গীকার। না চৌথ, না সরদেশ মুখ।

"সংবাদদাতা নিবেদন করিল যে, প্রবল প্লাবনের মত মহারাষ্ট্রবাহিনী বিংশতি ক্রোশ মাত্র দূরে রহিয়াছে; পরদিবস সন্ধ্যাসমাগমের মধ্যে নবাব শিবিরের নিকটস্থ হইতে পারে। শুনিয়া কূটবুদ্ধি নবাব বুঝিলেন যে, এই আসন্ন বিপদে তিনি ভীতির চিহ্নমাত্র দেখাইলে সেনাদলে অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার হইবে। সপ্রতিভ নবাব চাঞ্চল্যের বা ভীতির চিহ্নমাত্র প্রদর্শন না করিয়া উত্তর করিলেন—'সেই কাফেরগণ কোথায়? পৃথিবীতে এমন কোন্ স্থান আছে,

যেখানে আমি তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিতে অসমর্থ?' সংবাদদাতা ও উপস্থিত সদস্যবর্গ এই বিপদের সংবাদেও নবাবের এবম্প্রকার স্থির নিশ্চল নির্ভীক ভাব লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইলেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

সেটা ১৭৪২ সাল। ঘোড়ার খুরে পাথর ফাটিয়ে, নাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চল কাঁপিয়ে, বীরভূম-বিষ্ণুপুরের শালবন ডিঙিয়ে, উড়িষ্যার গিরিনদী পার হয়ে, বিশ হাজার বর্গী সেনা নেমে এল বাংলার বুকে। সঙ্গে ২৩ জন সর্দার। তাদের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব এদের ঠাট্টা করে বলতেন—'পার্বত্য মূষিক'। সেই মূষিকের আক্রমণেই বাংলার গ্রাম, নগর, জনপদ, ফেটে পড়ল এক আকস্মিক চিৎকারে। গ্রাম পুড়ছে। ঘর জ্বলছে। মাঠের ধান, দোকান-বাজারের খাদ্য শস্য, সংসারের আসবাব, ঐশ্বর্য, ধনরত্ন হচ্ছে লুঠপাট। মানুষ পালাচ্ছে জন্মভূমির মাটির মায়া কাটিয়ে। দ্বিপ্রহরের চড়চড়ে রোদ। তারই মাঝে উন্মাদিনীর মত প্রাণ ভয়ে ছুটছে গর্ভবতী রমণী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পালাচ্ছে। গলায় দুলছে শালগ্রাম শিলা। বগলে শাস্ত্র-গ্রন্থ। গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' এই পলায়নের দ্রুত, খর পদধ্বনি ফুটে উঠেছে প্রতি ছন্দে।

"তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলাএ কত নিক্তি হড়পি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিত্তল লইয়া কাঁসারী পলাএ কত॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি।
জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ি॥
সঙ্ক বণিক পলাএ করাত লইয়া জত।
চতুর্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম শুইনা সব পলাইল॥
ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত হাটে নাই পথে।
বরগির পলানে পেটারি লইয়া মাথে॥
ক্ষেত্রি রাজপুত জত তলোয়ারের ধনি।
তলোয়ার ফেলাইঞা তারা পলাএ অমনি॥

গোসাঞি মোহন্ত জত চোপালি-এ চড়িয়া।
বোচকা বুচকি লয় জত বাহুকে করিয়া॥
চাষা কৈবর্ত জত জা-এ পলাইঞা।
বিচন বলদের পিঠে লাঙ্গল লইয়া॥
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম স্থইনা সব পলাইল॥
গর্ভবতী নারী জত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে॥
সিকদার পাটোআরী জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম স্থইনা সব পলাইল॥"

কিন্তু পালিয়ে বেশী দূর যেতে হল না। পথের মাঝখানেই এসে পড়ল বর্গিরা।

"এই মত সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুঠে নএ আর সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধ-এ পরাণ॥
ভাল ২ স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জন ধরে।
রমণের ডরে ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মতে বরগি যত পাপ কর্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগি গ্রামে সাধা-এ।
বড় ২ ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণু মোণ্ডপ।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দিকে বরগি বেড়াএ লুটিয়া॥
কাহুকে বাঁধে বরগি দিআ পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পা-এ জুত চড়া॥

রূপি দেহ রূপি দেহ বলে বারে বার।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জলে ভার ॥
কাহুকে ডুবায়ে বরগি পথইয়ে ডুবা-এ।
কাফর হইঞা তবে কারু প্রাণ জা-এ ॥"

বর্গীদের হাতে-পিঠে হাল্কা ঢাল। কোমরে তলোয়ার। রক্তে টগবগ করছে পাশব জিঘাংসা। আর তার চেয়েও কঠিন, অস্ত্রের চেয়ে শানিত, নির্দেশ রয়েছে মাথার ওপর। সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের হুকুমৎনামা।

"স্ত্রী পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলোয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা ॥"

মহারাষ্ট্র পুরাণ ১১৫৮ সালে রচনা। ময়মনসিংহ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল এই পুঁথি। সম্পূর্ণ পুঁথিটি প্রথম ছাপা হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়। সমসাময়িক কালের অত্যাচার, লুণ্ঠন, উৎপীড়ণের সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিকার আমাদের জানাতে ভোলেন নি আরও কিছু উপভোগ্য সমাচার। যেমন ভাস্কর পণ্ডিতের দুর্গোৎসব। সেটা করেছিলেন, দাঁইহাটে পৌঁছে।

"এথা ভাস্কর লইয়া কিছু শুন বিবরণ।
জেরূপে ডাঞিহাটে কৈলা পূজা আরম্ভন ॥
তবে গ্রামে গ্রামে যত জমিদার ছিল।
তা সভারে ডাক দিয়া নিকটে আনিল ॥
কহিতে লাগিল তবে তা সভার ঠাঞি।
জগত জননি মায়ের পূজা করিতে চাই ॥
এই কথা ভাস্কর কহিলা তা সভারে।
শ্রদ্ধা পাইয়া তারা সবে উর্জোগ করে ॥
ঘট কপূর আনে কেহ করিয়া সম্মান।
আসিঞা প্রতিমা তারা করেন নির্মান ॥
এইরূপে কুমার প্রতিমা বানাইয়া।
ভাস্করের ঠাঁই তারা গেল বিদায় হইয়া ॥
তারপর উপাদেয় সামগ্রী আইল জত।
ভার বাহাঙ্গিতে বোঝা এ কত শত ॥
ভাস্কর করিবে পূজা বলি দিবার তরে।
ছাগ মহিষ আইসে কত হাজারে হাজারে ॥"

কবেকার সেই বর্গী-আক্রমণের নৃশংসতা আজও আমাদের দেশে ছেলে-ভুলোনো বা ঘুম-পাড়ানো ছড়ার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। আমাদের দেশের মা-মাসিরা শিশুদের কানে প্রথম যে গানের কলিটি গেয়ে শোনান, সে ঐ ধ্বংসের গান।

ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

বালেশ্বর থেকে রাজমহল পর্যন্ত বর্গী-আক্রমণে অস্থির। আজ মেদিনীপুর ডুকরে কাঁদছে। কাল বর্ধমান। ওদিকে হুগলীর আর্তনাদ ভাগীরথীর ঢেউ-এ আছড়ে আছড়ে ছুটে আসছে কলকাতার কিনারে। তখন বর্গীরা শিবপুর থানা-দুর্গ দখল করেছে।

আর বৃদ্ধ আলিবর্দী বছরের পর বছর হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই হানাদারী শত্রুর পেছনে পেছনে। কিছুতেই বাগে আনতে পারেন না বর্গীদের। শেষ পর্যন্ত ১৭৪২ সালে যার শুরু হয়েছিল তার একটা সাময়িক নিষ্পত্তি হল ১৭৫১ সালে। সন্ধির শর্তে। বাংলাদেশ থেকে উড়িষ্যা প্রদেশটাকে প্রাপ্য চৌথ হিসেবে মারাঠাদের শাসনাধীনে ছেড়ে দিলেন। শুধু মেদিনীপুরকে ছেঁটে জুড়ে দিলেন বাংলার সঙ্গে।

"বর্গীর হাঙ্গামার কথা এখন ইতিহাসের জীর্ণস্তরে মিশিয়া গিয়াছে। লোকে আর তাহার কথা আলোচনা করিবার সময় বিষাদের দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে না। কিন্তু সেকালে বর্গীর হাঙ্গামাই বাঙ্গালীর সর্বনাশের সূত্রপাত করিয়াছিল। চতুর মহারাষ্ট্রীয়গণ জানিত যে, বাঙ্গালীর অন্নগত প্রাণ; বাঙ্গলার সমতলক্ষেত্রে একবার পদার্পণ করিতে পারিলে, অন্নজীবী বাঙ্গালী সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারিবে না। দেশে দুর্গ নাই। রাজধানী হইতে গণ্ডগ্রাম পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অরক্ষিত; সুতরাং বাঙ্গলাদেশে পদার্পণ করিয়া তাঁহারা একেবারে কাটোয়া পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে ভাগিরথীর পশ্চিমতীরস্থ সম্পন্ন জনপদগুলি জনশূন্য হইয়া গেল। লুণ্ঠন-পরায়ণ মহারাষ্ট্র-সেনা গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিয়া চালে চালে আগুন ধরাইয়া দিল; অশ্বপদ তাড়নায় শস্যক্ষেত্র পদদলিত হইয়া গেল; লোকে স্ত্রী পুত্রের হাত ধরিয়া হাহাকার করিতে করিতে ভাগিরথী পার হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে মহাবিপ্লব। আলিবর্দ্দী একাকী অসিহস্তে ছুটাছুটি করিয়া ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে একাকী আর পারিয়া উঠিলেন না। আপন আপন ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য সকলকেই যথাযোগ্য ক্ষমতা দিতে বাধ্য হইলেন। সেই ক্ষমতায় জমিদারগণ

সৈন্য-বল বৃদ্ধি করিলেন ; ইংরাজগণ কাশিমবাজারে একটি ছোট-খাট রকমের দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন ; কলিকাতা রক্ষার জন্য মহারাষ্ট্রখাত খনন করিয়া কলিকাতা ও অন্যান্য বাণিজ্য-স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাষ্ট্র বিপ্লবে নবাবের রাজকোষ শূন্য হইতে লাগিল। বিদেশী বণিকদিগের পদোন্নতির সূত্রপাত হইল, দেশের লোকের সহিত তাঁহাদের আত্মীয়তা ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ফলে উহা হইতেই যে মুসলমান শক্তি পদদলিত হইতে পারে, আলিবর্দী তাহা অস্বীকার করিতেন না ; কিন্তু কি করিবেন ?" সিরাজউদ্দৌলা।

ইতিমধ্যে ভাস্কর পণ্ডিতের মাথা কাটা গেছে। আলিবর্দীর ছলনাজালের ফাঁদটাকে তিনি ভেবেছিলেন সত্যিই বুঝি সন্ধি-আলোচনার তাঁবু। যাই হোক্ বাংলাদেশ থেকে মৃত্যু আর রক্তপাত আর হত্যার আতঙ্ক একটু একটু করে ধূসর হতে-হতে মুছে যেতে লাগল এইবার।

এতবড় ঘটনার সময়ে কলকাতার গায়ে কিন্তু আচড়টিও লাগেনি। বরং হিসেব খতিয়ে দেখা দেখলে বোঝা যাবে, খরচের চেয়ে জমার ঘরটাই জমজমাট।

বর্গীরা যখন হুগলী আক্রমণ করেছে—তখন সবাই চারদিক থেকে পালাই পালাই চিৎকারে ছুটে এল কলকাতার দিকে। কলকাতায় ইংরেজ আছে। ইংরেজদের কামান-বন্দুক আছে। গোলা-বারুদ আছে। সৈন্য-সামন্ত আছে। কেল্লা-দুর্গ আছে। চলো কলকাতায়। আরো সুবিধে কলকাতার এদিকে চারপাশে নিবিড় বন জঙ্গল। ওদিকে নদী। মারাঠারা সহজে কলকাতা আক্রমণ করতে এগোবে না।

মারাঠা আক্রমণের ফলে কলকাতায় ভিড়ই বাড়ল শুধু। চিড়া খেল না কিছু। ইংরেজরা তবু নিঃশঙ্ক হতে পারেনি। কেননা এই তো মাত্র ক-বছর আগে ১৭৩৭ সালে প্রবল ঝড়ে, বজ্রাঘাতে, ঘূর্ণীর ঘায়ে কী নিদারুণ ক্ষয় ক্ষতি হয়ে গেল।

আবার যদি ধ্বংস হয় এই মারাঠা আক্রমণে – তাহলে কোম্পানীর ব্যবসা গুটোতে বেশী দিন লাগবে না।

তাড়াতাড়ি একটা উপায় ঠাওরাও। কিসে শহর বাঁচে মারাঠার মারের হাত থেকে।

উপায় বেরুলো। পয়লা নম্বর উপায় হচ্ছে শহরের চারপাশে একটা গভীর খাদ খোঁড়া হোক। শত্রুরা সহজে ঢুঁ মারতে পারবে না। সবাই বললে, বহুৎ আচ্ছা।

দ্বিতীয় নম্বর প্ল্যান হল, শহরের ভেতরে শত্রুরা যে যে পথ দিয়ে মাথা গলাবে, সেই সেই জায়গায় কামান-ঘাঁটি বানানো যাক্। একদিকে রইল ঝোপ। আর এই জলপথ বা নদীপথের দিকে থাক তোপ্। সবাই বললে, সাবাস্ কিয়া। প্ল্যানটা দিয়েছিলেন, কলকাতা ফৌজের তখনকার ক্যাপটেন উইলিয়ম হোলকম্প সাহেব।

তৃতীয় নম্বর বুদ্ধি বাতলালেন একজন, গোটা সাহেব পাড়াটাকে শক্ত কাঠের রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া যাক্। দেশী লোকদের কি দশা হবে সেকথা ভেবে আমাদের কি লাভ? আমরা বাঁচলেই কলকাতা বাঁচবে।

এইবার একে একে প্ল্যান-মাফিক কাজ শুরু হয়ে গেল। সেই সঙ্গে নবাব আলিবর্দীর কাছে আর্জিও পাঠান হল একটা। তাতে ইংরেজদের পুরনো কেল্লাটাকে যাতে আরেকটু মজবুত করা যায় তার জন্যে বিনীত প্রার্থনা।

আলিবর্দী খাদ খুঁড়তে অনুমতি দিলেন। কিন্তু দুর্গের ব্যাপারে চোখ রাঙালেন। দিনরাত তোমাদের এত দুর্গ দুর্গ করে চেঁচানো কিসের হে? আমার দেশ। আমার রাজত্ব। আমি থাকতে তোমাদের খুব বেশী না ভাবলেও চলবে। ইংরেজরাও চুপ করে গেল।

খাদ খোঁড়ার কাজ শুরু হয়ে গেল। মোট পরিধি হবে সাত মাইল। চওড়ায় একুশ হাত। টাকা লাগবে কম পক্ষে পঁচিশ হাজার। টাকা আসবে কোথা থেকে? কেন দেশী লোকদের ট্যাঁক থেকে। আপাতত কাউন্সিল টাকা দেবে কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্যে। দেশীয় লোকদের তিন মাস পরে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে টাকাটা।

খাদ খোঁড়ার কাজ বেশী দূর এগোয়নি। অর্ধেকটা হয়েছে। এমন সময় মারাঠাদের দাপাদাপিটা আলিবর্দীর দাপটে যেন খানিকটা নিভে এল। উত্তর দিকের বাগবাজার থেকে দক্ষিণ দিকের হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, তখনকার কুলিবাজার, পর্যন্ত খাদের বিস্তৃতির পরিকল্পনা ছিল। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিন মাইল খোঁড়া হবার পর এণ্টালির কাছ বরাবর গিয়ে কাজ বন্ধ হয়ে গেল। প্রথম দিকে ঠিক ছিল যে এই খাদ একেবারে নাকের সিধে এগোবে। কিন্তু হালসী বাগানের উমিচাঁদ আর ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের বাগান-বাড়ির সামনে পর্যন্ত এসে খাদটা পেট-বাঁক নিল। এঁরা দুজন তখন দেশীয়দের মধ্যে সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তি। ইংরেজদের দরদী-মরমী। যাকে বলে আঁতের লোক। ওঁদের বাগানবাড়িকে বাঁচাতে হবে তো? এখনকার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বাড়ি তাঁদেরই বাগানবাড়ির খানিকটা অংশে।

এই খাদকেই সেকালে বলা হত 'মারাঠা ডিচ'। এই ডিচকে কেন্দ্র করেই সেকালের কলকাতার সীমানা ছিল, পূর্বদিকে মফস্বল। পশ্চিমে শহর।

"কলকাতা হাইকোর্টের ওরিজিনাল সাইডে যদি কখনো কারো মামলা করার সৌভাগ্য ঘটে থাকে, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই জানেন মারাঠা-ডিচের ওপারে হাইকোর্টের সমন পৌঁছয় না, ওয়ারেন্টও যেতে পারে না। এপারের মধ্যেই তার যা-কিছু দৌড়।

"১৭৯৪ সালে একবার কথা উঠেছিল, কলকাতা শহরের সীমানাটা ঠিক কি; সেই সময় এক প্রক্লামেশন করে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই মারাঠা ডিচের উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ লাইন টেনে নিয়ে গেলে তার পশ্চিম দিকে যে অংশটা পড়ে, সেইটেই হল শহর কলকাতা।...এখনো ভবানীপুরের কোনো লোক সার্কুলার রোড পেরিয়ে এদিকে কোথাও এসে, বাড়ি ফিরে গেলে কোথায় যাওয়া হয়েছিল কেউ জিজ্ঞেস করলে বলেন, কলকাতা গিয়েছিলুম।" পলাশীর যুদ্ধ।

মারাঠা ডিচ প্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভট সাগরের স্মৃতি—

"গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী ও কলিকাতার অধিবাসীগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎকালীন গভর্ণর Thomas Braddyll কে বলিল, 'আপনারা কলিকাতার চতুর্দিকে একটি গড়খাত কাটাইয়া দিন। নচেৎ আমরা মারা যাই।' গভর্ণর সাহেব আলিবর্দী খাঁর অনুমতি লইয়া গড়খাত করিতে আদেশ দিলেন। বহু সংখ্যক মজুর কাজ করিতে লাগিল। তৎকালে প্রত্যেক মজুর উদয়অস্ত পরিশ্রম করিয়া একটিমাত্র পয়সা পাইত। প্রত্যেক গৃহস্থ একটি করিয়া মজুর দিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম মিত্র ৫০০ মজুর দিয়াছিলেন। কোম্পানী বাহাদুর ২৫.০০০ হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় বাঙালীরা এই টাকা পরিশোধ করিয়াছিলেন।"

লং-এর বিবরণ—

"The ditch was dug in 1742 to protect English territories, then seven miles in circumference, the inhabitants being terrified at the invasions of these modern Vandalis, the mahrattas, who, the year previous, invaded Bengal to demand the Chauth or the forth part of the revenues. ...Like the French national guard, they were soldiers and peasants, and noted for the Keen sword blades wielded ; they used to say English sword only fit for cutting butter. ...The country on the other side of the ditch was, at the time, infested with bands of dakoits, but there was a high road which ran alongside the ditch,..."

খাদ খুঁড়তে-খুঁড়তেই বর্গীর হাঙ্গামা এল থিতিয়ে। খাদও আর এগোলো না। তারপর বহু বছর ধরে ঐ খাদের ভেতরেই শহরের যাবতীয় ময়লা আবর্জনা ফেলা হত। লর্ড ওয়েলেসলীর সময়ে এই খাদ বুজিয়ে ফেলার হুকুম হল। খাদের ওপর মাটি ফেলে ভরাট করতে-করতে দেখা দিল চওড়া ছাতিওলা দিব্যি এক রাস্তা। নাম হল সার্কুলার রোড। আপার আর লোয়ার।

এর পর আসছে দু-নম্বর প্ল্যান। কামান-বন্দুকের পাহারা। শহরের একেবারে উত্তর দিকে বসল একটা ঘাঁটি, চার কামানের। পেরিন সাহেবের বাগান সেখানে। সাহেবদের হাওয়া-খাওয়ার জায়গা। আরেকটা ঘাঁটি বসলো জোড়াবাগানে, ছ-কামানের।

দক্ষিণ দিকে গোবিন্দপুর আর কলকাতার মাঝামাঝি জায়গায় ঘাঁটি বসল আরেকটা। সেটা চার কামানের।

এত করেও ভয় যায় কই? তার চেয়ে বাবা সাবধানের মার নেই। একটু বেশী করেই সাবধান হওয়া যাক্।

কাঠ এল রাশি রাশি। সাহেব পাড়া রণরণিয়ে উঠল কোদাল, কুড়ুল, করাতের কোরাসে। কি হচ্ছে? না কাঠের রেলিং বানানো হচ্ছে।

পলাশী যুদ্ধের আগে সাহেব পাড়া বলতে বোঝাতো ডালহাউসী স্কোয়ারকে কেন্দ্র করে যে অঞ্চল, সেইটুকু। চৌরঙ্গী তখনো যে জংলীকে সেই জংলী।

তখন মিশন রো-র কাছে একটা থিয়েটার ঘর। রাইটার্স বিল্ডিং-এর পেছন দিকে আরেকটা। আরও একটা পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন হেষ্টিংস সাহেবের প্রথম পক্ষের শ্বশুর। ক্যাপ্টেন ক্যারোলাইন ফেড্রিক স্কট। তিনি বললেন, রেলিং দিয়ে সাহেব পাড়াকে ঘিরে রাখছো, খুব ভাল কথা। কিন্তু শত্রু যদি একবার রেলিং টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ে, কি হবে তখন? তখন দুর্গ-টুর্গ, ফোর্ট-ফাট কিছুই কাছে লাগবে না। ফোর্টের সামনেই তো বড় বড় বাড়ি। কামান ছুঁড়লে ক্ষতি হবে ঐ বাড়িগুলোরই। তাহলে? কি করা উচিত আমাদের? স্কট বললেন, দুর্গটাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। হয় বাগবাজারের দিকে, পেরিন সাহেবের বাগানের কাছে। না হলে পিছিয়ে নিয়ে যেতে হবে গোবিন্দপুরে। কথাটা কানে নিল সবাই। তাহলে ভেবে দেখা যাক্। কিন্তু এ নিয়ে তখনকার মত সব ভাবনাই চাপা পড়ে গেল। কারণ স্কট সাহেব নিজেই মারা গেলেন মাদ্রাজে বেড়াতে গিয়ে।

তখন লাল দিঘির পাশে আরেকটা ছোট্ট পুকুর ছিল। তার পাড়ে ছিল কোম্পানীর কর্মচারী কালিকো-প্রিন্টারদের কোয়ার্টার। কোয়ার্টার মানে

ছোট ছোট মেটে কি কোঠা বাড়ি। এই সব কোয়ার্টার পেরিয়ে দু-পা বাড়ালেই যে বাড়িটা, সেটা পলাশী আমলের পাদ্‌রী বেলামী সাহেবের। আরেকটু এগোলেই একটা খোলা-মেলা জায়গা। সেটার শেষেই কোম্পানীর আস্তাবল। আস্তাবল আর হাসপাতাল প্রায় গায়ে গায়ে। হাসপাতালের গায়ে গায়ে পাউডার ম্যাগাজিন। অর্থাৎ বারুদ-ঘর। বারুদ-ঘর ছাড়িয়েছো কি গোরস্থান। কলকাতার সবচেয়ে আদি গোরস্থান। এরই পাশের জমিতে মাথা উঁচু করে সেন্ট জন গির্জা।

এরই কাছাকাছি বাড়ি হলওয়েলের। মেটকাফ থাকেন তারই পাশে। মেট-কাফের বাড়িটা আগে ছিল শেঠেদের। কোম্পানীর সবচেয়ে প্রিয় দালালের। তাই সাহেব পাড়ায় তাঁকে মাথা গলাবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই সুযোগ বা সম্মান পেয়েছিল আরেকজন। তিনি উমিচাঁদ। চীনে বাজারের কাছে লিয়ন্স রেঞ্জের গায়েই তাঁর বাড়ি। বাড়ি তো নয় অট্টালিকা।

"ইতিহাস প্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেবের দুইখানি বাটি ছিল।…ইহার এক-খানির স্থান, বর্তমান ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের মোড়ে, যে স্থানে বর্তমান ছোট আদালত বা স্মল কজ্ কোর্ট বিচারালয় বিরাজিত—সান্নিধ্যে আর একখানি বর্তমান চার্চ লেন ও হেষ্টিংস-ষ্ট্রীটের সন্ধিস্থলে। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের সেই পুরাকালের খালের একাংশ এই বাটির দক্ষিণদিকে ছিল। আজকাল যেখানে স্ট্যাম্প ও স্টেশনারী অফিস বর্তমান, হলওয়েলের দ্বিতীয় বাসগৃহ ঠিক সেইখানে ছিল। এখন যেখানে স্ট্যাম্প ও স্টেশনারী আফিস হইয়াছে, ও পূর্বে যেখানে হলওয়েলের আবাসবাটী ছিল। সেই স্থানে পলাশী যুদ্ধের বহুকাল পরে—কোম্পানী বাহাদুরের পুরাতন ট্যাকশাল-গৃহ স্থাপিত হইয়াছিল।

"আজকালকার 'ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী" এবং সাবেক মেটকাফ-হলের বাটীর অধিকৃত স্থানটি-কাপ্তেন উইলসনের ম্যাপে শেঠদিগের আবাস-বাটী বলিয়া চিহ্নিত। কোম্পানী বাহাদুরের প্রধান দালাল রামকৃষ্ণ শেঠ মহাশয়ের বাস্তুভিটা এই স্থানেই ছিল। এই বাস্তুভিটার চারিদিকে বাগান বাগিচা থাকায়—বড়ই জাঁকাল দেখাইত। তখনকার কালে—রামকৃষ্ণ শেঠ ও অমিচাঁদ ব্যতীত আর কোন বাঙালীর কলিকাতার ইংরাজ টোলায় বাড়ী ছিল না। রামকৃষ্ণ শেঠের এই বাটী পরবর্তী কালে তাঁহার মৃত্যুর পর ভাড়া দেওয়া হয়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ অমিয়াট সাহেব—এই বাটী ভাড়া লন।

"আজকাল যাহা লিয়নস্ রেঞ্জ বলিয়া সাধারণে পরিচিত—সেই স্থানে তিন-খানি সারি সারি পাকা বাড়ি ছিল। এই তিনখানি বাড়ির একখানি ইতিহাস

প্রসিদ্ধ অমিচাঁদ বা আমীর চাঁদের। দ্বিতীয় খানি মিঃ কোলসের, (Coles) ইনি ব্ল্যাক-হোলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৃতীয় বাটীখানি মিঃ জন নক্‌সের। ইনি কোম্পানীর সেনানী ছিলেন। সেরাজকে দুর্গ সমর্পণ করিবার সময় কলিকাতা দুর্গ মধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ইনি সেই অবসরে প্রাণরক্ষার্থে দুর্গ হইতে পলায়ন করেন।

"অমিচাঁদের এই বাটীর সীমানার পার্শ্ব হইতে, একটি গলির চিহ্ন আপজনের ম্যাপে দেখা যায়। তাহা 'থিয়েটার ষ্ট্রীট' বলিয়া চিহ্নিত। আজকাল যেস্থানে লিয়নস রেঞ্জ ও পুরাতন চীনাবাজার রাস্তার সহিত নূতন চীনাবাজার রাস্তার মিলন হইয়াছে – ইহার সেকালের থিয়েটার ষ্ট্রীট। পাঠক যেন এই পথটাকে বর্তমান 'থিয়েটার রোড' বলিয়া ভ্রমে পতিত না হন।" কলিকাতা সেকালের ও একালের।

লালদিঘির উত্তর দিকে সেন্ট অ্যান গির্জা পেরোলে মিঃ এডওয়ার্ড আয়ার-এর বাড়ি। তার পিছনে মিঃ কুকের। এই মিঃ কুকই ঐতিহাসিক অর্মি সাহেবকে অন্ধকূপ হত্যার (?) অনেক তথ্য সরবরাহ করেছিলেন।

ওয়াটস্‌ সাহেব একটু স্বতন্ত্র। তিনি থাকেন নদীর দিকে। ফাঁকায় ফাঁকায়। ভিড়-ভাট্টাটা তাঁর মেজাজে সয় না।

আজকাল আমরা যে স্ট্রাণ্ড রোড দেখি, যার গা ছুঁয়ে নতুন হাওড়া ব্রীজের চূড়োটা, সেই স্ট্রাণ্ড রোড তখন ভাগিরথীর গর্ভে। কলকাতার প্রাচীন দুর্গের পাশ দিয়ে আর গঙ্গার ধার ঘেঁষে সরু একফালি রাস্তা ছিল বটে. কিন্তু সেটা স্ট্রাণ্ড রোড নয়। সেই রাস্তার পেছনে ইংরেজদের বাগানবাড়ি, দুর্গের মাল গুদামের একাংশ, জাহাজ মেরামতের ছোট্ট একটা ডক্‌ ছিল। হেষ্টিংস ষ্ট্রীট তখন খাল। খাল মানে যেমন-তেমন নয়। ১৭৩৭ সালের ঝড়ে এই খালেই একটা প্রকাণ্ড জাহাজ ডুবে গিয়েছিল।

ফ্যান্সী লেন আর ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। কিন্তু এই ফ্যান্সী লেনের জন্ম কাহিনীটা বড় মর্মান্তিক। মুসলমান রাজত্বে ফাঁসী দিয়ে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হত না। ইংরেজ রাজত্বেই এর শুরু। আর ওয়েলেসলীর বটগাছটাই ছিল তখন ফাঁসী-কাঠ। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই ফাঁসী কথাটা থেকেই ফ্যান্সী।

সেকালে 'মিশন রো'র নাম ছিল Rope-walk. ১৭৭৫ সালে একটা গির্জা তৈরি হয় ঐখানে। তারপর থেকেই নতুন নাম।

ইংরেজি আওতার কলকাতায় নবাবী আমলের কায়দা-মাফিক ফৌজদারী

বালাখানাও ছিল একটা। লোয়ার চিৎপুর আর কলুটোলার মোড়ে। ফৌজদারী বালাখানা মানে হুগলীর ফৌজদারের কাছারী। দেশীয়দের মামলা মোকর্দমার বিচারক তিনিই। জমজমাট, জঁাকাল ধরনের বিরাট কাছারী। হুগলী থেকে একজন ফৌজদার এলে ইংরেজদের মধ্যে সোরগোল পড়ে যেত, কেমন করে এই দেশীয় প্রভুর মনোরঞ্জন করা যায়। উপহার-উপঢৌকনের নৈবেদ্য আর নগদ টাকার দক্ষিণায় সে যেন এক যোড়শোপচারের পূজো।

মোটামুটি ভাবে ইংরেজি পাড়া বা ইংরেজি টোলার শেষ এইখানে। এর পরেই পর্তুগীজ আর আর্মানী-টোলার শুরু। এদিকে মুর্গীহাটার কাছ থেকে ওদিকে বড়বাজার আর তারই আওতায় গোরস্থান পর্যন্ত বিরাট জায়গা জুড়ে পর্তুগীজ আর আর্মানীদের ভিটে-মাটি। এরই ভেতরে তখন অনেকগুলো সাধারণের ব্যবহারের জন্যে স্নানাগার ছিল। এই স্নানাগারকে বলা হত হামাম। তার থেকেই হামাম গলির জন্ম। তাদের বাণিজ্য বা জীবিকার্জন সব কিছুই ইংরেজদের সঙ্গে বা ইংরেজদের অধীনে। বেশীর ভাগ পর্তুগীজ বা আর্মানী তখন ইংরেজ বাড়িতে ঝি-চাকরের চাকরি নিয়ে জীবন কাটাতো।

এ তো গেল শুধু সাহেবদের কথা। দেশীয়দের কি দশা হল দেখা যাক্।

কি আর হবে? কিছুই না, সব যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল। মারাঠারা তো কোনদিনই কলকাতা আক্রমণ করেনি। তারা গ্রাম-বাংলার নিরীহ প্রজা-পাঠকদের ওপর যতই তলোয়ারের ধার পরখ করুক, এটা বেশ হাড়ে-হাড়েই বুঝতো ইংরেজদের একটা কামান যদি একবার নাক-ঝাড়া দেয়, নস্যির মত উড়ে যাবে তারা দশ-বিশ-পঞ্চাশটা। সুতরাং কাজ নেই শত্রু ঘাঁটিয়ে।

মাঝখান থেকে হল কি, দেশীয় পাড়ায় আর লোক ধরে না। বসবাসের জায়গা নিয়ে দর-কষাকষি, মন-কষাকষি। বসবাসের না হোক্ বনবাসের মত একটু আশ্রয় পেলেই তখন প্রাণ বাঁচে অনেকের।

বড়বাজার লোকে-লোকে গাদাগাদি। সুতানুটির দিকটাও ক্রমশ ভরে যাচ্ছে। গঙ্গার ধারে-কাছে আদিবাসী বাসিন্দের পাড়া। জেলে-জোংলা চাষাভুষোদের ঘর গেরস্থালি। জনস্রোত সেই দিকেই ঠেলা মারল। জনমানবহীন শূন্য স্থান পূর্ণ হয়ে উঠল জনপদের পদমর্যাদায়। জোড়াবাগান, কুমারটুলী, হাটখোলা, বাগবাজার, জোড়াসাঁকো, এমনি আরও নানা অঞ্চল দেখতে-দেখতে দু-দিনেই চেহারা পাল্টে ধোপা-দুরস্ত পরিবেশে ঝলমলিয়ে উঠল। এক এক অঞ্চলে এক-একটা বাজার। শ্যামবাজার, বাগবাজার, শোভাবাজার, নতুন বাজার, হাটখোলা বাজার, চার্লস বাজার, বেগ বাজার, ঘাসতলা বাজার।

যে পাড়ায় যে সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে তাদের ভিত্তি করে পাড়াগুলোর নাম। হলওয়েল তখন জমিদার। কলকাতাকে ভাগ করেছিলেন, যে ধরনের জাত বা ব্যবসার লোক যেখানে বাস করে, সেই নামের সঙ্গে টুলি বা টোলা যোগ করে। যেমন কুমোররা যেখানে থাকে সেটা কুমোরটুলি, কলুদের বাস যেখানে, সেটা কলুটোলা। জেলেদের জন্যে জেলেটোলা। ডোমদের জন্যে ডোমটুলি। গোয়ালাটোলা গোয়ালাদের থেকে। আহিরীটোলা আহিরদের নামে। আহির বলা হতো বিহারী গোয়ালাদের। কসাইদের থেকে কসাইটোলা। পটুয়া থেকে পটুয়াটোলা। শাঁখারী থেকে শাঁখারীটোলা।

টোলা আর টুলি ছাড়া ছিল পাড়া। যেমন হাড়িপাড়া, মুসলমানপাড়া, ওড়িয়াপাড়া, দর্জিপাড়া, ধোবাপাড়া, তেলিয়াপাড়া। তখনকার কলকাতায় রাস্তাঘাটের অলি গলির নাম হয়েছে সাধারণ মানুষের নাম থেকে। কারণ তখনও, বর্গীর হাঙ্গামার আগে, শহরে সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত লোকের ভিড়ভাট্টা বেশ কম।

"A mid 18th century Calcutta was yet to develop the consolidoted society dominated by opulent and largly high caste groups of the Bengali community. The Maratha scare of the forties had just infused a large dose of high caste and opulent elements from surrounding districts." Pradip Sinha.

সাধারণ মানুষের নামেই তখন পথঘাটের নাম। যেমন ছিদাম মুদির গলি। ধোবানি গলি। শ্যামা বাঈ-এর গলি। অখিল মিস্ত্রীর গলি। রামকান্ত মিস্ত্রীর গলি। ছকু খানসামার গলি।

আবার কিছু কিছু নাম এসেছে গাছ-পালা থেকে। যেমন বটগাছ আছে, তাই বটতলা। হোগলার বন, তাই হোগলাকুড়িয়া। সিমূল গাছ থেকে, সিমলে পাড়া। হিন্তাল ও হঁাথাল গাছ থেকে হিন্তালী। হিন্তালীই রং বদলে বদলে এন্টালি।

"কলকাতা বেড়ে চলেছে। তবে বর্ণাশ্রমের উপর ভিত্তি করে নয়। জাতধর্ম নির্বিশেষেই তার উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধি।

"তাইতো দেখছি, কুলীন বামুন মনোহর মুখুজ্যে, রামানন্দ বাড়ুয্যে, কিনু চাটুয্যে, শ্রোত্রিয় বামুন কন্দর্প ঘোষাল, কষ্টশ্রোত্রিয় কৃষ্ণকান্ত পাঠক, পিরালি বামুন পঞ্চানন ঠাকুর, কুলীন কায়েত গোবিন্দরাম মিত্তির, তস্য পুত্র রঘুনাথ মিত্তির, দয়ারাম বোস, রামনাথ বোস, নীলমনি মিত্তির, মৌলিক কায়েত গোবিন্দশরণ দত্ত, কৃপারাম দত্ত, রামচরণ কর, রামচন্দ্র দে (দেব), রাজারাম পালিত,

বাহাত্তুরে কায়েত কৃষ্ণবল্লভ সোম, গোপাল ভদ্র, সবাই গা-ঘেঁষাঘেষি করে একত্র বেশ আছেন। মনের আনন্দে পাশাপাশি চলেছেন।

"আবার তাঁদেরই সঙ্গে একই রকমে আছেন তাঁতি কুলের বৈষ্ণবচরণ শেঠ, রাসবিহারী শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, পীতাম্বর শেঠ, শোভারাম বসাক, রাধামোহন বসাক, হরিমোহন বসাক, চৈতন্য বসাক, স্থবর্ণ বণিক শুকদেব মল্লিক, নয়নচাঁদ মল্লিক, নকুড় ধর, সদ্‌গোপ আত্মরাম সরকার, তাঁর ছেলে বনমালী সরকার, ধোবা রত্নেশ্বর সরকার, তিলি কালীচরণ পাল, লক্ষ্মী কুণ্ডু, কৃপারাম পাল, কৈবর্ত গৌরহরি হালদার।

"এ ছাড়া মদন কারফরমা, নন্দরাম কুড়রি, বলি কোঠমা, শচী কোঠমা, রাধানাথ কোঠমা, ব্রজবল্লভ কোঠমা, কানাই কোঠমা, বলরাম কোঠমা, লক্ষ্মী কোঠমা—এসব নামও পাওয়া যায়। কিন্তু এঁদের উপাধিগুলো কর্মসংক্রান্ত বলে এঁরা বর্ণচোরা। শুধু নাম দেখে এঁদের জাত কি, তা ঠাওর পাবার জো নেই। ওবে এঁরা যে কেউ কুলীন সম্প্রদায়ের মানুষ নন সে-বিষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই। কারফরমা, কড়ুরি এ-দুটো পদবি এখনো আছে। কিন্তু কোঠমাটা যে কিসের উপাধি তা এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার করে উঠতে পারি নি। এক সময় গঙ্গার উপর এঁদের একটা ঘাট ছিল, যার নাম—কোঠমার ঘাট। ইংরেজদের দিশি নাম বিকৃত করার ফলে সেটা দাঁড়িয়েছিল, কাটমার ঘাট।" পলাশীর যুদ্ধ।

বিভিন্ন জাত-ধর্মের মানুষের এতখানি মিলে-মিশে থাকার সবচেয়ে বড় কারণ, সকলেরই রোজগারের ধান্দাটা এক। ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা। আর হাতে পয়সা এলে জাত পাল্‌টাতেও বাধা নেই কারো। পয়সা এলে জাতে উঠে কায়েত হওয়া যায় এটা নাকি তখনকার কলকাতার প্রবাদ। সেকলের ছড়ার বয়ানে রয়েছে তার সমর্থনও।

> "জাতির কর্তা রাজীব রায়, মুলুকের শুবা।
> তাঁর হুকুম তুচ্ছ করে, দত্ত হলেন ধোবা॥
>
> *
>
> হাল বয়, তাল খায়, গিধনায় বাস।
> তার বেটা কায়েত হল, বিশ্বাস খাস॥
>
> *
>
> দুলোল হল সরকার, ওক্কুর হল দত্ত।
> আমি কিনা থাকবো যে কৈবত্ত সেই কৈবত্ত?

তখনকার কলকাতায় তাই গজিয়ে উঠেছিল নানান ধাঁচের কায়েত। যেমন জেলে-কায়েত, ছুতোর-কায়েত, চাষা-কায়েত ইত্যাদি।

শিক্ষা-দীক্ষা, সাজগোজ এসব ব্যাপারে তখনো কলকাতায় বাসিন্দেরা বেশ সেকেলে। ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা। কিন্তু ইংরেজীতে মা গঙ্গা। বরং সাহেবরাই বেশী মনোযোগ দিয়েছে দিশি ভাষা শিখতে। আর দিশি লোকদের জ্ঞান গম্যির দৌড় পাঠশালা পর্যন্ত। বর্ণপরিচয় আর শুভঙ্করীর আর্য্যা। টোলে গিয়ে খানিকটা ব্যাকরণ, খানিকটা কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়। ব্যস, এই-ই যথেষ্ট।

পোশাক-আশাক বলতে, মাথায় পাগড়ি, গায়ে জোব্বা, পায়ে চটি বা নাগরা। মাথায় বাবরি, গালে চওড়া কুলপি। চোমরানো গোঁফ।

সংস্কৃতি বলতে, রামায়ণ, মহাভারতের গান। কথকতা। হরি সংকীর্তন। কবিগান আছে। কবির লড়াই তখনো শুরু হয়নি। তবে আদি রসাত্মক গান রয়েছে।

"তখন কবিগানের গগনে গোঁজলা গুঁই-ই একশ্চন্দ্রঃ। তিনি আর তিন চেলা রঘুনাথ দাস, কালু নন্দলাল, রামজীদাস, এঁরা মিলে গান বাঁধতেন, সেই গান গেয়েই আসর গরম করতেন।

"আদি রসে ভরপুর বিদ্যাসুন্দরের কেচ্ছারও কলকাতায় খুব আদর। আত্মারাম দোষ বলে এক লিপিকার কলকাতাতে বসে কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ব্রজবল্লভবাবুর (কোঠমা?) জন্যে নকল করে দিয়ে দক্ষিণা পাচ্ছেন একজোড়া কাপড় আর ছটো আকট টাকা। পুঁথিটি নকল করা শেষ হচ্ছে, বাংলা ১০৫৯ সনের ২৭শে শ্রাবণ তারিখে। অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের ঠিক পাচ বছর আগে।" পলাশীর যুদ্ধ।

যে সময়ে মারাঠা-ডিচ, সেই সময়ে গোটা কলকাতাটা ছ'ভাগে ভাগ। একদিকে দিশি মানুষেরা। আরেকদিকে সাহেব সুবো। একদিকে হোয়াইট, আরেকদিকে ব্ল্যাক টাউন।

"The demarcation between the 'white' and 'black' towns, were even sharper. The people of the country were indispensible to the prosperity of the factory, but they were not permitted within the pallisades. Outside the stocaded two hundred and twenty acres which comprises Christian Calcutta there had therefore spring up to the north and last a large and flourishing 'Native-town' within the wider contour of the Marhatta Ditch. Its importance and extent were meterially

incressed by the influx of popolation from the Western bank of the river which accompanied the Mahratta Scare in 1742" Cotton.

ইংরেজদের প্যালিসিড অর্থাৎ রক্ষাবন্ধনীর বাইরে ছিল দেশীয়দের বসবাস। ১৭৯৩-এ আপজনের ম্যাপের হিসেবে, বড়বাজার থেকে বৈঠকখানা পর্যন্ত তার সীমারেখা। উত্তরে সুতানুটি থেকে আরম্ভ করে শোভাবাজার, কুমোরটুলি, বাগবাজার ঘুরে, মারাঠা-ডিচের ধার ধরে সার্কুলার রোড, হালসীবাগান, শিয়ালদহ, বৌবাজার, বৈঠকখানা এই হল পরিধি। অবশ্য বৌবাজার তখনো তৈরি হয়নি। চীৎপুর রোড সরু জংলী রাস্তা। বাড়ি ঘর আছে, গলি ঘুঁজি নেই। বাড়ি আছে। বাড়ির গায়েই জঙ্গল, পুকুর, নালা-নর্দমা। চোর-ডাকাতের ভয়। তাই দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করাই ছিল প্রথা। এক এক শ্রেণীর মানুষ বাস করতো এক এক জায়গায়।

ক্রমশঃ কেতাদুরস্ত হচ্ছে কলকাতা। গ্রামের গন্ধ গা থেকে একটু একটু করে মুছছে। শহরের সৌখিনতা বেদখল করছে সেই খালি জায়গা। নাচ গান, উৎসব, পুজো-আচ্চার ধুমধাম লেগে আছে রোজই। দোল, দুর্গোৎসব চড়ক, রাসযাত্রা, যে-সময়ের যে-পার্বণ, সে সময়ে সেটির কমতি নেই। কেনই বা হবে। টাকার জন্যে ভাবতে হয় না। কোম্পানীর রাজত্বে খাটতে জানলে আর খুঁটতে জানলে ভাতের অভাব নেই। টাকা আপনি এসে ধরা দেয় হাতের মুঠোয়। টাকা হলে কি হবে ইংরেজ বেটাদের ভারী কড়া শাসন। যা ইচ্ছে তা করবার জো নেই। পাকা বাড়ি তুলবে? তার জন্যে কোম্পানীর অনুমতি চাই। আবার পাকা বাড়ি উঠলেও নিস্তার নেই। চোরে ডাকাতে অমনি নজর দিতে শুরু করবে। তাদের মরচে পড়া সিঁদকাঠিতে লোভ লালসার শান পড়বে সঙ্গে সঙ্গে। আরেকদিকে জমিদারের হুমকি। ট্যাক্স দাও। তোমার তো বেশ টাকা-পয়সা হয়েছে হে!

মুর্শিদকুলীর আমলে কলকাতায় খাজনা উঠত চার হাজার। কোম্পানীর আমলে হল সতেরো হাজার। এ ছাড়া ট্যাক্স বা অন্যান্য কর থেকে আরো নব্বুই হাজার বাড়ল।

পয়সা যে সব সময় সৎ-পথ দিয়ে সোজাভাবে আসতো তা নয়। ঘুস-ঘাষ, উপরি-পাওনা, দালালী এমনি আরও কত আঁকা-বাঁকা গলি-ঘুঁজি ডিঙিয়ে উড়ো খৈ-এর মত উড়ে উড়েও আসতো। এই সব উড়ো-খৈ কিছুটা গোবিন্দায় নমঃ না করলে কি হয়? তাই আনন্দ-উৎসবের এত আড়ম্বর।

কলকাতায় তখন যে রথের মেলা বসতো সে এক দেখবার জিনিস। রথ কি আবার এক রকমের? রকমারী, রংদারী। বৈঠকখানার রথের উচ্চতা ৭০ ফিট। লালদিঘি থেকে বৌবাজার-এর সোজা সড়ক ধরে টানা হত এই রথ। আর বাকী সারা বছর বৈঠকখানার বিরাট বটগাছের তলায় চওড়া বুকে রোদ বৃষ্টি আটকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত অচল অটল।

এই রথের প্রতিষ্ঠাতা কলকাতার শেঠেরা। নাম ছিল গোবিন্দজীর রথ। কেউ বলেন ওটা বসাকদের। কেননা থাকতো চৈতন্যচরণ বসাকের বাগানে। শোভারাম বসাক এই রথের প্রতিষ্ঠাতা।

এই শোভারামেরই এক পুত্রবধূর নামে বৈঠকখানার কাছে একটা বাজার ছিল। তারই নাম বৌবাজার। বৌবাজার স্ট্রীট সেই বধূমাতারই স্মৃতিপথ।

পোস্তার জগন্নাথ দেবের রথ ছিল তিনটে। গরানহাটার কালাবাবুর বাড়ির উঠোনে সারা বছরের আশ্রয়। আকারে ৭০ ফিট না হলেও রথগুলো মাপে-জোপে জমকালোই।

রথ চলেছে আগে-আগে। পিছনে চার পাশের গ্রাম-গঞ্জের মানুষ। বামুন-পুরোহিত। বাজনা-বাদ্যি। সকলের হাতে রং-চঙে পতাকা। কারো হাতে ঝালর-ঝুলোনো ছাতা। ইয়া বড়-বড় তাল পাতার পাখা। পাখার গায়ে কত কি কারুকার্য! এদিকে মশাল। কোনটা কাপড়ের, কোনটা নারকেলের শাঁসের। আবার রংমশালও জলছে। ওদিকে চলেছে সংকীর্তন। সপ্তাহব্যাপী উৎসব।

রথের উৎসব অনেক দিন। দোল একদিনেই শেষ। কিন্তু সেই একদিনের দাপটেই সারা শহর দুলে উঠতো। দোলের পিচকিরির কাছে ছোট-বড়, মান্য-অমান্য, স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ নেই। ছুঁড়লেই হল। রং-এর বেলায় ছোঁড়া। আবীর আর কুমকুমের বেলায় ছড়ানো। মিছিল করে দল বেঁধে বেরুত সবাই। সকলের গলাতেই গান। তাতে চিৎকারটাই বেশী। দোলের উৎসবটা সবচেয়ে বেশী জাঁকতো লালদিঘির কাছে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারী বাড়িতে।

দোলের পর দুর্গোৎসব। গোবিন্দরাম মিত্রের তখন রাজার হাল। তাঁর বাড়িতে দুর্গোৎসবের কী ঘটা!

দোলের খেলা চলতো রক্তের মত লাল আবীর নিয়ে। দুর্গোৎসব তার চেয়ে অনেক বাস্তব। তার খেলা সত্যিকারের রক্ত নিয়ে। জয় মিত্রের বাড়িতে নবমীর দিন বলিদান দেওয়া হত অসংখ্য মহিষ, ছাগল। বলিদানের পর পথে

পথে বেরুত মিছিল। সারা গায়ে রক্ত-মাখা মানুষের নাচ, গান, বাজনা-বাদ্যির মিছিল।

দুর্গোৎসব যেমন রক্ত-মাখার উৎসব, জন্মাষ্টমী তেমনি কাদা-মাখার। শুধু কাদা নয়, দই আর কাদা। এই দধি-কর্দমে গড়াগড়ি দিয়ে সবাই যেতো গঙ্গাস্নানে। নৃত্য গীতের কথা বলা বাহুল্য।

তবে উৎসবের মধ্যে যদি কোনটা রসের উৎসব থাকে তো সেটা রাস। কলকাতায় রাসোৎসবের প্রতিষ্ঠাতা বলতে হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঠাকুর্দা রাজা পিতাম্বর মিত্রকে। বাগবাজারের গোকুল মিত্রের বাড়িতেও বারো মাসে তেরো পার্বণ। তার মধ্যে রাসলীলাটাই সবচেয়ে সরেস বা সরস। মিত্রদের ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণে এক দীঘি। সেই দীঘিতে নৌকোয় চেপে মেয়েদের কবিগান হত। সং-তামাসা, রং-তামাসা রসিয়ে উঠতো কি জলে কি ডাঙায়। রাধাকৃষ্ণের নানারকম চিত্র-বিচিত্র দিয়ে সাজানো হত ঠাকুরবাড়ি।

আহিরীটোলায় নিমু গোঁসাই-এর বাড়ি। তাঁর বাড়িতে রাস হত চৈত্র মাসে। বলরামের রাস। সকলের থেকে আলাদা এ-এক অভিনব রাস। একটা লৌকিক ছড়া আছে তাঁর প্রসঙ্গে।

"জন্ম মধ্যে কর্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস।
আলোর সঙ্গে খোঁজ নাইক বোঝা বোঝা বাঁশ।"

পরবের মধ্যে সবচেয়ে সরব হচ্ছে গাজন। গাজন আর চড়কের দিনগুলো ঢাকের বাদ্যিতে সদাসর্বদা রণ্ রণ্। অন্য সব পরব বড়লোকদের। কিন্তু গাজন বা চড়ক, জনসাধারণের। আর সব উৎসব হয় ধনীদের দালানে। গাজন জমে হাটে-বাজারে, অলিতে-গলিতে, পাড়ায়-পাড়ায়।

গাজনের দুটো বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে—বানফোঁড়া আর ঝাঁপ। বড়-বড় মোটা-সোটা বঁড়শী দিয়ে গাজন-সন্ন্যাসীদের ফোঁড়া হত। সন্ন্যাসীরা সূর্য ওঠার আগে না খেয়ে, না দেয়ে কালীঘাটে গিয়ে বান ফুঁড়িয়ে আসতো। আর ঝাঁপ ছিল নানা রকমের। কাঁটা-ঝাঁপ, ঝুল-ঝাঁপ, বঁটি-ঝাঁপ। ১৮৮৩ সালের আইনে বন্ধ করা হয় এই নিষ্ঠুর আমোদ। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বেরুত সং। কাঁসারী পাড়ায় তারকনাথ প্রামাণিকের উৎসাহে কাঁসারী পাড়ার সঙের মিছিল সেকালে খুব নাম কিনেছিল।

এত সবের পরেও আরো অনেক বাকি আছে। জগদ্ধাত্রী পূজো, সরস্বতী পূজো, গণেশ পূজো, বৃষ্টি আনাবার পূজো, শ্যামা পূজো আরো কত কি। এমন কি যখন আর কোন পূজো নেই তখন কি মানুষ আমোদ-আহ্লাদ

হারিয়ে ঘরের কোণে ঘুপটি মেরে বসে থাকবে নাকি? তা কি হয়। কানে এল কোথায় যেন সতীদাহ হচ্ছে। অমনি রব উঠল – চলো, চলো, দেখে আসি চলো।

দাউ-দাউ আগুনের চিতার ওপরে একটা পূর্ণ-যৌবনা নারী ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরবে। এ ওর হাত ধরে, ও এর গলা জড়িয়ে, হেসে, ইয়ার্কি-ঠাট্টা করে সবাই তাই দেখছে। তার মধ্যে সাহেবও আছে, নায়েবও আছে। ছোট-বড়, জাত-বেজাতের ভেদ-সীমা নেই।

কিন্তু ওপরে যা কিছু আমোদ-উৎসবের লম্বা ফর্দ ফাঁদা হল তার সবই হচ্ছে সাময়িক। এক এক ঋতুতে এক একটা আসে। আসে আর ফুরিয়ে যায়। কিন্তু চিরকাল থাকে শুধু একটা। কালী পূজো।

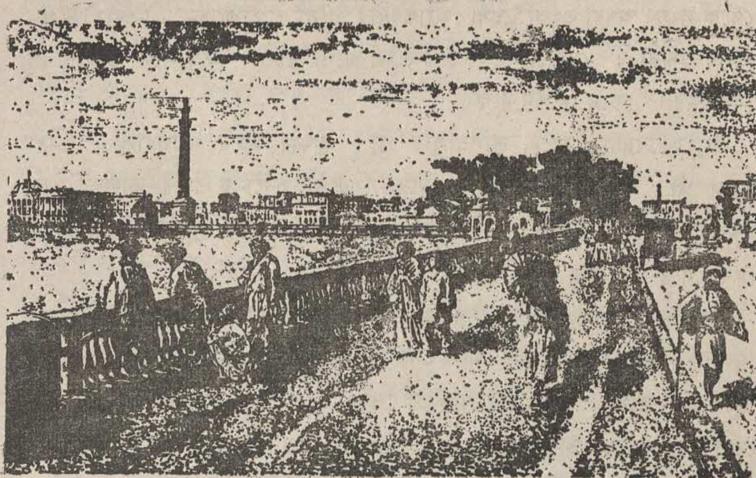
কালী বাড়ির দরজা সব সময়েই খোলা। কালী-বাড়ির দালান কোন সময়েই খালি পড়ে নেই। শুধু যে দেশীয়রাই ভিড় করছে তা নয়। ইংরেজরাও একটা কিছু ঘটলেই পূজোর উপচার নিয়ে উপস্থিত। পুরুতরা এই সময়ে সাহেবদের কাছ থেকে মোটা দক্ষিণা বাগিয়েছে।

আমোদ-উৎসবে, পূজোয় আর উপাসনায় কলকাতা বর্গী আক্রমণের পর বছর চার-পাঁচ বেশ বহাল তবিয়তেই কাটাল। এই ক'টা বছরে কলকাতার বরাতে শ্রী-সৌষ্ঠব, ধন-জন এবং লক্ষ্মী সবই জুটল একে-একে। যদিও কলকাতার বাসিন্দেদের মনে তখনও কলকাতার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এ যেন পদ্মপাতার জল। টলমল করছে। ঠেলা লাগলেই খসে পড়বে। ইংরেজরা এখন জাঁকিয়ে বসেছে। কাল যদি গুঁতো দেয় নবাব, বাপ্ বাপ্ বলে হয়তো পালাবে সবাই।

অনিশ্চয়তা ঠিকই। তবুও এ যেন এক নতুন রাজ্য। নতুন দেশ। মনের সুখকে এখানে ইচ্ছেমত খেলিয়ে বেড়ানো যায়। নবাবী শাসনের নিষ্ঠুরতা এখানে ছায়া ফেলেনি। সভ্যতার ধরণ-ধারণ এখানে কত আধুনিক। ইংরেজরা কত ভদ্র। নবাব বাদশা উচ্ছন্নে যাক্। বর্গীরা মরুক। ইংরেজরা দীর্ঘজীবী হোক।

কিন্তু এই শান্তি, এই আমোদ-উৎসবের খেলাধুলা ক-দিন আর। ইতিহাস পাশ ফিরবে যে। সে তো সোজা পথে এগোবে না। আঁকবে-বাঁকবে। ভাঙবে-চুরবে। তার অস্থির পায়ের চাপে দলা পাকাবে শান্তি। মোচড় দিয়ে কুণ্ডলী পাকাবে সুখ। চলতি জীবনের পথ-ঘাট ঝটপটিয়ে উঠবে ঝড়ে। ইতিহাস এগোবে সময়ের এই করুণ যন্ত্রণার মাঝখান দিয়ে।

ইতিহাসের সেই জন্মান্তরের অধ্যায় শুরু হবে এবার।



॥ মতিঝিল আর হীরাঝিল ॥

নবাব আলিবর্দী খাঁর বড় আদরের দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। নিজের হাতে গড়ে পিঠে মানুষ করেছেন তাঁকে আলিবর্দী। ১৭৪৫-এ বিয়ে দিয়েছিলেন সিরাজের। অবশ্য সিরাজের আগে বিয়ে দিয়েছিলেন সিরাজের পরের ভাই এক্রামদ্দৌলার। সেই বিয়ে সম্বন্ধে করম আলি-র 'মুজফ্‌ফর-নামা'র বিবরণ –

"The expenditure on scents, illumination and fire works was twelve lakhs of Rupees, besides the cost of the robes presented to the people, high and low. For full three months, day and night, one lakh of troopers, one lakh of infantry and krors of the ryots enjoyed the festivity and music.

সিরাজের বিয়ে নাকি ম্লান করে দিয়েছিল একেও। বিয়েটা হয়েছিল বর্ষাকালে। কারণ মুজফ্‌ফর-নামা-র বর্ণনায় পাই –

"Throughout the entire rainy season, in every house every night was like of Barat and every day like the New Years day."

সিরাজের বিয়ে তো হল। কিন্তু কার সঙ্গে? হাজী মহম্মদ আলিবর্দীর বড় ভাই। তাঁর দৌহিত্রী, আতাউল্লা খাঁ-র মেয়ের সঙ্গে ঠিক করা ছিল বিয়েটা। কিন্তু বিয়ের আগেই মারা গেল মেয়েটি। আলিবর্দী নতুন করে নাতির জন্যে কনে স্থির করলেন মির্জা ঈরাজ খাঁ-এর মেয়েকে। ইতিহাসে তার নাম নেই। কেউ-কেউ অনুমান করেন নাম ছিল ওমদাৎ উন্নেসা।

অনেকের ধারণা, লুৎফা সিরাজের বিবাহিতা স্ত্রী। তা নয়। খুব ছেলেবেলা থেকে লুৎফা অথবা লুৎফাউন্নেসা আলিবর্দীর প্রাসাদে থাকতেন ক্রীতদাসীরূপে। অপূর্ব সুন্দরী। যৌবনে দ্বিগুণ হয়ে উঠল রূপের ছটা। সঙ্গে-সঙ্গে চোখ টানল সিরাজের। টেনে নিলেন বুকে।

লুৎফাউন্নেসার মানে, ভালবাসার স্ত্রী। লুৎফা মানে ভালবাসা। নেসা মানে স্ত্রী। একাধিক বেগমের মধ্যে সিরাজ সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন লুৎফাকেই। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, সঙ্কটে-সংগ্রামে লুৎফাকেই চিরকাল দেখা গেছে সিরাজের পাশে-পাশে।

"লুৎফা উন্নেসার প্রতি সিরাজের অধিকতর ভালবাসার আর একটি কারণ ছিল। সিরাজ কোন একটি রমণীর সৌন্দর্য্য তরঙ্গে একবার আপনাকে ভাসাইয়া ছিলেন। রূপে পাগল হইয়া যাহাকে তিনি হৃদয়ে স্থান দান করেন, সে কিন্তু ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার হৃদয় ভাঙিয়া দেয়। এই রমণীর নাম ফৈজী অথবা ফয়জান। ফৈজী দিল্লীতে নর্তকীর ব্যবসায় জীবন অতিবাহিত করিত। তাঁহার আলোক সামান্য সৌন্দর্য্য দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। মুর্শিদাবাদে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, তৎকালে ফৈজীর ন্যায় সুন্দরী সমগ্র ভারত রাষ্ট্রে দৃষ্ট হইত না। তাহার উত্তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, কৃশ অঙ্গ যষ্ঠী ও মন্থর গমন অনেককে মোহিত করিয়া ফেলিত, সর্বাপেক্ষা তাঁহার কৃশাঙ্গের অধিক প্রশংসা ছিল। ফৈজীর অনুপম রূপরাশির কথা সিরাজের কর্ণগোচর হইল। সিরাজ লক্ষমুদ্রা সমর্পণ করিয়া বহু অনুনয়-বিনয়ে তাহাকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন ও নিজ অন্তঃপুরবাসিনীগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।" মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

ফৈজীর ওজন ছিল নাকি মাত্র ২২ সের। মুতাক্ষরীণের বর্ণনায়—

"She was, says amorous chronicle of the capital, a complete Indian beauty, of that right golden hue, so much coveted all over that region, and of that delicacy of person, which weight only two and twenty seers, or about fifty pounds overdupois, as mall delicate woman with a cool retreet, being the 'Summum Bonum' of an Indian."

জন্ম থেকেই সিরাজ অকুতোভয়। মেজাজটা বড় সৌখিন। বিলাসিতার দিকে নজরটা একটু বেশী। একটু যেন উগ্র ঔদ্ধত্য মিশে আছে স্বভাবের সঙ্গে। নিজের খেয়াল খুশি মত যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ান। আলিবর্দী শাসন করেন বটে। কিন্তু তাতে স্নেহের সুরটাই বাজে বেশী। সিরাজ দাদুকে চেনেন। আর দাদুই যখন তাঁর সহায়, তখন আর কাকে তোয়াক্কা! মাতামহের কাছ

থেকে আদর-সোহাগ জোটে অফুরন্ত। তবু সিরাজের মনে সুখ নেই। কারণ কি? কারণ আলিবর্দী নবাব হয়েও, প্রকৃতিতে ফকির। তাঁর রাজপ্রাসাদ যেন তপোবন। সেখানে মৌলবিরা করছে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। না আছে নাচ, না আছে গান। যদি বা থাকে, তাতে না থাকে রূপের জৌলুস, না দেহভঙ্গীমার জেল্লা। বারবণিতারা মাথা গলাতে ভয় পায় সিংহদ্বারে। এই রকম বাড়িতে, হোক সে রাজপ্রসাদ, থাকা যায় নাকি? অস্থির, অসন্তুষ্ট সিরাজ একদিন সরাসরি দাদুর কাছে পেশ করলেন এক প্রস্তাব।

"একটা জীর্ণ কম্বলে দশজন ফকির এক সঙ্গে বছরের পর বছর কাটাতে পারে। কিন্তু একটা পুরনো প্রাসাদে একজন প্রধান আর একজন নবীন নৃপতি একসঙ্গে বাস করতে পারে না। করলে তাদের মানসম্ভ্রম নিয়ে জনসমাজে দেখা দেবে নানান রকম উপহাস।"

কথাটা কানে লাগল বৃদ্ধ নবাবের। মঞ্জুর করলেন নাতির প্রার্থনা। আরম্ভ হল হীরাঝিল। দিশি লোকজন অনেক সময় হীরাঝিলকে বলেছেন 'মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ'।

আলিবর্দীর জামাই নোয়াজিস মহম্মদের তৈরী মতিঝিলের জেল্লা-জৌলুসকে মনে রেখেই সিরাজ গড়লেন নিজের হীরাঝিল।

"রাজধানীর নিকটে ভাগিরথীর পশ্চিমতীরে হীরাঝিল।···গৌড়ের ইতিহাস বিখ্যাত বাদশাহদিগের সযত্ন-সঞ্চিত কারুকার্যভূষিত বহুমূল্য প্রস্তর রাশি সংগৃহীত করিয়া প্রমোদভবন সুসজ্জিত করা হইল। হীরাঝিলের প্রমোদভবনে সিরাজের সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল। হীরাঝিলের প্রাসাদ ভবনেই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ক্লাইব সাহেবের হাত ধরিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজমুকুট মাথায় তুলিয়াছিলেন। এইখানে মুসলমানের অস্তগিরি। এইখানে আবার ইংরাজের উদয়াচল।" সিরাজদ্দৌলা।

"মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে বাদশাহ সাজাহানের ন্যায় মুর্শিদাবাদের নবাব-দিগের মধ্যে সিরাজেরও সৌন্দর্য্য প্রীতির কথা শুনা যায়।···আলিবর্দী খাঁর সহিত প্রতিনিয়ত অবস্থান করায়, তাঁহার বিলাসোপভোগের তাদৃশ সুযোগ ঘটিয়া উঠিত না। হীরাঝিলের প্রাসাদে সেই পিপাসা মিটাইতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। অপ্সরকণ্ঠ বিনিন্দিত নর্তকীবৃন্দ লইয়া তিনি সেই প্রাসাদে বিলাস তরঙ্গে ভাসমান থাকিতেন। এবং আসবপানে বিভোর হইয়া কলকণ্ঠীগণের মধুর সঙ্গীতে আরও আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। সিরাজ সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্বে মাতামহের অনুরোধে সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু যৌবনারম্ভে

অত্যন্ত সুরাসক্ত ছিলেন। কখনও কখনও মোসাহেব ও অনুচরবর্গের তোষামোদ বাক্যে এবং ভাঁড় বা কাহিনী-কথকদিগের রহস্যালাপে বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন। সময়ে সময়ে নর্তকী ও মোসাহেববৃন্দ লইয়া সাধের তরণী আরোহণে হীরাঝিলের স্বচ্ছ সলিল রাশি আন্দোলিত করিয়া বেড়াইতেন। জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীতে ঝিলবক্ষোবিহারিণী তরণী হইতে যখন নর্তকীগণের কণ্ঠধ্বনি দিগন্ত স্পর্শ করিয়া ধাবিত হইত, তখন তাহাদের মধুর চুম্বনে ভাগিরথীর তরঙ্গলহরীও মূর্ছিত হইয়া তীরক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িত।" মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

"মাতামহ আলিবর্দীর ক্রোড়ে নবাব-রাজহর্মে সিরাজদ্দৌলা যখন শিশু তখন ভাবী ইংরাজ মহিমাও কলিকাতায় সওদাগরের কুঠিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অসহায় শিশু জীবন যাপন করিতেছিল উভয়ের মধ্যে একটি অদৃষ্ট বন্ধন বাঁধিয়া দিয়া ভবিতব্যতা আপন নিদারুণ কৌতুক গোপন করিয়া রাখিয়াছিল।

"প্রমোদের মোহমত্ততায় এই প্রলয় নাট্যের আরম্ভ হইল। ভাগিরথীতটে হীরাঝিলের নিকুঞ্জবনে বিলাসিনীর কলকণ্ঠ এবং নর্তকীর নুপুরধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিল। লালসার লুব্ধহস্ত গৃহস্থের রুদ্ধগৃহের মধ্যেও প্রসারিত হইল।" রবীন্দ্রনাথ।

এই হীরাঝিলে বসে ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে পান-ভোজন, গান-বাজনা, এবং রমণী সুখ আস্বাদনে দিন কাটে সিরাজের। সিরাজের লোভ-লালসা নিয়ে ইতিহাসে নানা কথা। কেউ বলেন সিরাজের নাম শুনলেই আতঙ্কে শিউরে উঠতো সম্ভ্রান্ত লোকেরা। কেউ বলেন, এমন কোন কুকার্য নেই যা করা সিরাজের পক্ষে অসম্ভব। কোনো রমণীর রূপ একবার তাঁর চোখ কাড়লে, আর নিস্তার থাকতো না তার। কোনো সুন্দরী হিন্দু স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নানে নেমেছেন শুনলেই তাঁর চরেরা গিয়ে খবর দিতো সিরাজকে। তারপরই সে রমণী হয়ে যেতো নিখোঁজ।

ফৈজুর সঙ্গে বেশ চলছিল উদ্দাম প্রণয়-পর্ব। হঠাৎ একদিন টের পেলেন ফৈজু তাঁর বদলে তাঁরই এক আত্মীয়ের সঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছে প্রেমে। ফৈজুকে একটা খালি ঘরে পুরে, দরজা জানলা ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দিলেন। ফৈজু মারা গেল সেই রুদ্ধ ঘরের ভিতরে।

ফৈজু সম্বন্ধে রস-সাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর কবিতা।

"যে নারী ওজনে লঘু, রূপে গুণবতী
সেই নারী সিরাজের প্রিয় ছিল অতি।
একদিন সিরাজের মোসাহেবগণ
তাঁহার নিকটে গিয়া করে নিবেদন।"

"ফাইজী বাঈজী আছে দিল্লী সহরেতে
তার মত গুণবতী না দেখি জগতে।
ওজন বাইস সের, পরমা রূপসী
নৃত্যগীত লইয়াই থাকে দিবানিশি।
তার রূপ গুণ কভু না হয় বর্ণনা
হুকুম করিলে তাঁরে আনি জাঁহাপনা।"
ইহা শুনি সিরাজের চিত্ত চমকিল
লক্ষ টাকা দিয়া তারে ধরিয়া আনিল।
কুচরিত্র শুনি তার কিছুদিন পরে
সিরাজের ক্রোধানল জ্বলিল অন্তরে।
ছিদ্রশূন্য গৃহে এক পুরিয়া তাহারে
নবাব রাখিয়া দিল জনমের তরে।
কিছুদিন পরে দেখা যায় দেহ তার
কেবল কঙ্কালখানি হইয়াছে সার।
কস্তূরী মৃগের নাভি মহামূল্য ধন
কিন্তু তাই হয় তার মৃত্যু কারণ।
ফৈজী বাঈজীর রূপ গুণ-সমুদায়
তাই বলি, হায় হায়, মৃগনাভি প্রায়।"

সিরাজের নিষ্ঠুরতা প্রসঙ্গে সব ইতিহাসকারই সরব। নিন্দার কলরবে ঢাকা পড়ে গেছে যৎসামান্য সদ্‌গুণটুকু। সেটা হল যুদ্ধের সাহস। দাদু আলিবর্দীর সারা জীবনটাই যুদ্ধে জড়ানো। সিরাজ যখন বালক, তখন থেকেই দাদুর সঙ্গে যুদ্ধের শিবিরে-শিবিরে নির্ভয় চলা-ফেরা। কখনো-কখনো দাদুর নির্দেশে কাঁধে তুলে নিয়েছেন সৈন্য পরিচালনার ভারও। বড়বাটী নামে একটা দুর্গ জয় করে সিরাজ এক সময় প্রমাণ করেছিলেন তাঁর রণ-কুশলতা। মুসলমান ইতিহাস রচয়িতাদের লেখায়, তা নিয়ে ঝুড়ি-ঝুড়ি প্রশংসা।

গুণ ছিল। কিন্তু সমস্যা হল চারপাশের ইয়ার-দোস্ত আর মোসাহেবদের নিয়ে। তারা সিরাজকে ক্রমশ টানতে লাগল নীচের দিকে। অধঃপতনের উচ্ছৃঙ্খল অন্ধকারে।

"রাজপ্রাসাদের আশে পাশে যাহাদের গতিবিধি, তাহারা একেবারে স্বার্থশূন্য নহে। কেহ পরের খরচে বাবুগিরি চালাইবার আশায়, কেহ বা পরের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া ডুব দিয়া জল খাইবার ভরসায়, রাজকুমারদিগের সহবাসে

মিলিত হইতে আরম্ভ করে। আলিবর্দীর ধর্মজীবন এই শ্রেণীর লোকের নিকট চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছিল। আলিবর্দী কর্তব্য-পরায়ণ, কর্তব্যপালনে ধর্ম আছে, পুণ্য আছে, যশোগৌরব আছে; কিন্তু নিয়ত কর্তব্যপালনে আমোদ কোথায়? নবাব হইয়াও যদি একটিমাত্র মহিষী এবং রাজ্যচিন্তা লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবেন, তবে আলিবর্দী নবাব হইলেন কেন? আলিবর্দীর উন্নত জীবন যাঁহাদের নিকট এই সকল কারণে নিতান্ত উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা পছন্দমত নবাব গড়িবার আশায় গায়ে পড়িয়া সিরাজের হিতাকাঙ্ক্ষায় নিযুক্ত হইতে লাগিলেন।" —সিরাজদ্দৌলা।

আলিবর্দী যে সব সময়েই প্রশ্রয় দিয়েছেন নাতিকে, তা নয়। প্রয়োজনে শাসনও করেছেন চোখ রাঙিয়ে। কিন্তু তাতেও সিরাজের চোখ খোলেনি।

একবার দাদুর কাছে এসে আবদার জানালেন, দেওয়ান মাণিকচাঁদের গাড়ী-বারান্দাটা ভেঙে ফেলার হুকুম দিন।

—কেন?

—ঐ গাড়ী বারান্দাটা আমার বাড়ির সামনে। ফলে আমার বাড়ির খোলা-মেলা ভাবটা থাকছে না। অনেকখানি আড়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে চোখের সামনে।

আলিবর্দীর কণ্ঠে সবল উত্তর।

—তুমি তো বাড়ি তৈরী করেছো প্রকাণ্ড। দেওয়ানজীর চেয়ে বহুগুণ বড়। তোমার বাড়ি তার বাড়িকে আড়াল করে রেখেছে। সে সামান্য মানুষটা তোমার জন্যে কষ্ট পাচ্ছে। তোমার যেহেতু আরো অনেক জায়গা রয়েছে. তোমার উচিত নিজের বাড়িটা ভেঙে ঐ বাড়িটাকে আলো-হাওয়ার জায়গা করে দেওয়া।

আর একদিনের ঘটনা। কোতোয়াল আটক করেছে একটা গাড়ি। তখন গভীর রাত। অত রাত্রে কারুর যাওয়ার কথা নয়। কোতোয়াল নিয়ম-মাফিক গাড়িটাকে নিয়ে গিয়ে পুরে দিলে হাজতে।

পরে দাদুর কাছে এসে অগ্নিশর্মা নাতির অভিযোগ, কোতোয়ালকে শাস্তি দেওয়া হোক।

—কেন?

—ঐ গাড়ীতে ছিল ফৈজু। আমার প্রিয় বান্ধবী। আমার কাছ থেকেই সে যাচ্ছিল নিজের বাড়িতে। তাকে গাড়ি সুদ্ধ আটক করে পুরে দিয়েছে গারদে।

আলিবর্দীর কণ্ঠস্বর অকম্পিত।

—শোনো! বন্ধ গাড়িতে কে আছে না আছে সেটা কোতোয়ালের দেখার

কথা নয়। তা ছাড়া কোতোয়াল যদি তাকে ছেড়ে দিত, তাহলে বুঝতাম চোর-ডাকাত-বদমাইসদেরও সে এমনিভাবে ছেড়ে দেয়। সুতরাং কোতোয়ালের কোনো দোষ নেই।

আলিবর্দীর তখন খুব টাকার প্রয়োজন। নাতি ছুটে এল দাদুকে পরামর্শ দিতে। তোমার নাকি টাকার অভাব? আমি জানি, তোমার রাজ্যের মুৎসুদ্দি, আহল-কার ইত্যাদি রাজকর্মচারীদের ঘরে থরে-থরে জমে উঠছে টাকা। আমাকে হুকুম দাও। আমি এখুনি তোমাকে এক কোটি টাকা এনে দিচ্ছি ওদের কাছ থেকে।

আলিবর্দী বললেন, এদেশের মানুষের কাছে যে টাকা রয়েছে, সেতো আমারই টাকা। কার ঘাড়ে এমন ক্ষমতা আছে সে টাকার দিকে হাত বাড়াবে লুণ্ঠনের?

মৃত্যুর কিছু আগে আলিবর্দী পড়লেন মহা-ফাঁপরে। মৃত্যুর পর সিংহাসন দিয়ে যাবেন কাকে? বড় মেয়ে ঘসেটি বেগমের ছেলেপুলে কেউ নেই। সিরাজের ছোট ভাই এক্রামদ্দৌলা তাঁর পুষ্যিপুত্র। তাকে? কিন্তু শৈশবেই এক্রাম মারা গেল বসন্ত রোগে। ছোট জামাই জৈনউদ্দিন—সেও বহুদিন গতায়ু। এক্রামের মৃত্যু-শোক আলিবর্দীর বড় জামাই নোয়াজিশ খাঁ সইতে পারলেন না। বড় জামাইয়ের পিছু-পিছু দু-এক মাসের তফাতে মারা গেলেন মেজ জামাই সৈয়দ আহম্মদ। আছে একমাত্র মেজো মেয়ের ছেলে শৌকতজঙ্গ। কিন্তু সে তো আবার পূর্ণিয়ার নবাব। তাহলে সিংহাসনের ভার কার হাতে তুলে দেব? সিরাজ—সে তো ছেলেমানুষ। অক্ষম। রাজ-কাজ কিছুই বোঝে না। বাঈজীর বাড়ি রাত কাটায়। সিংহাসনের গুরুভার তার হতে তুলে দেওয়া যায় কি করে? দেশের সাধারণ লোক তার ওপর চটা। তারা বলে সিরাজ অত্যাচারী। সিরাজ কামাতুর। নারীমাংস-প্রিয়। আলিবর্দী চিন্তিত। সিরাজ অস্থির। দাদু তাঁকে সিংহাসনে বসার অনুমতি দিতে দেরী করছে কেন? যে-দাদুর আদরে-আহ্লাদে আজীবন মানুষ, যৌবনের দোরগোড়ায় পা দিয়ে সেই দাদুর উপরেই মনে-মনে তাঁর নানান অভিযোগ। দাদু তাঁকে বিহারের নবাবী পদ উপহার দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সে তো কেবল নামেই। আসল শাসনকর্তা তো রাজা জানকীরাম। রাজ্যশাসন করেন তিনি। রাজসুখও ভোগ করেন তিনি। সিরাজ পান মাসোয়ারা। সামান্য কিছু টাকা। এতে মন ভরে না তাঁর। জানকীরামের উপরেও জাগে প্রতিশোধের নেশা।

"রাজা জানকীরাম বঙ্গীয় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। ইনি বাঙ্গলা হইতে দেওয়ান হইয়া আলিবর্দীর নায়েবী আমলে পাটনায় আগমন করেন। নাজিম হইয়া

আলিবর্দী খাঁ ইঁহাকে প্রথমতঃ দেওয়ান-ই-তন্ ও সামরিক বিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত করেন।...প্রকৃতপক্ষে ইনিই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বলিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণবধের কারণ প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ভিন্ন কেবল ইহারই নিকট পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।...অতঃপর রাজা জানকীরামের প্রভুত্ব এত অধিক হইাছিল যে, নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রেরাও কোনও বিষয়ে দরবার করিতে হইলে, মন্ত্রীবরের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

বছর খানেক চুপচাপ থাকার পর বর্গির হাঙ্গামা আবার যখন জেগে উঠল উড়িষ্যায়, আলিবর্দী স্থির করলেন, মেদিনীপুরে বাড়ী তৈরী করে সেখানেই থাকবেন। তাই করা হল। বর্গির হাঙ্গামা মিটল। দাদু যখন রণক্ষেত্রে সিরাজ সব সময়েই সঙ্গী। এটা তার একটা মস্ত গুণ। এবারেও তেমনি সিরাজ ছিলেন সঙ্গে। দাদু রয়ে গেলেন মেদিনীপুরে। দাদুর অনুমতি নিয়ে সিরাজ চলে এলেন মুর্শিদাবাদে।

মুর্শিদাবাদে পা দিয়েই অন্য পরিকল্পনা। পা বাড়ালেন পূর্ণিয়ার দিকে। যেন যাচ্ছেন বেড়াতে। দেশভ্রমণে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য আলাদা। রাজা জানকীরামের হাত থেকে বিহারের সিংহাসনের ভার ছিনিয়ে নেওয়া। সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর। আর প্রণয়িনী লুৎফা। যাত্রা করলেন এক দ্রুতগামী গো-যানে।

মুতাক্ষরীনে আছে –

"সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার প্রিয়সহচরী লুৎফউন্নিসা বেগমকে সঙ্গে লইয়া গো শকটে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করেন। হোসেন কুলী খাঁ কিয়দ্দুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, ধরিতে না পারিয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। সিরাজউদ্দৌলার বলীবর্দ্দ দিন বিশ ক্রোশ করিয়া ছুটিত।"

মুতাক্ষরীনের অনুবাদক মুস্তাফা, নিজের চোখে দেখেছেন সেই বলীবর্দ্দ দুটি। দাঁড়িয়েও তিনি নাকি ছুঁতে পারেননি তাদের কুকুদ।

যথাসময়ে সিরাজের পাটনা যাওয়ার সংবাদ পৌঁছে গেল আলিবর্দীর কানে। ছুটে এলেন মুর্শিদাবাদে। সেখান থেকে বেগমকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলেন পাটনার দিকে। তার আগে নাতির কাছে চলে গেছে তাঁর অনুনয় মাখানো চিঠি। ফিরে এসো। তুমিই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী।

সিরাজের কাছ থেকে উত্তর এল ভিন্ন ভাষায়।

"বালকের ন্যায় আমাকে আর ভোলাতে পারবেন না। আপনি আমাকে

অনেক সময়েই বানানো আদরে, বাহ্যিক স্তোকবাক্যে ভুলিয়েছেন। আমার পিতৃব্যদের রাজপদ দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন। এই বিবাদ হয় আপনার মাথা আমার ঘরে, নয়তো আমার মাথা আপনার পদতলে ঠাঁই নেবে। সেইটেই শেষ মীমাংসা। আমার নিজের বলে নিজের ন্যায্য দাবি আদায় করতে চাই। আপনার বাধা দেওয়া উচিত নয়—সিরাজ"।

নবাব আলিবর্দী প্রত্যুত্তরে জানালেন।—

"গাজিকে পায়ে সাহাদাৎ আন্দার্ তাগো পোস্ত।
গাফেল কে শাহীদে এস্ক্ ফাজেল্ তার্ আজ্ দোস্ত।
ফার্দায় কেয়ামাৎ ই বা আঁ কায়মানাদ
ই কোস্তা দুশ্‌মানাস্ত ওঁয়া কোস্তায়ে দোস্ত।"

অর্থাৎ—ধর্মের জন্যে যুদ্ধ করে যারা প্রাণ দেয় তারা জানে না যে সংসারের রণক্ষেত্রে স্নেহের সঙ্গে যুদ্ধ করা কত গুরুতর। এই যুদ্ধে যে জয়ী হয়, সেই সবচেয়ে বড় বীর। নির্বোধ। তুমি ভ্রান্ত, নইলে তুমি অনায়াসেই বুঝতে পারতে যে আমার ক্ষমতার ভেতর থাকলে শুধু বিহার কেন, সারা ভারতবর্ষের আধিপত্য দিতাম তোমাকে। তুমি জানো না যে, শেষ বিচারের দিনে ঐ দুই বীরদের—একজনকে শত্রুর হাতে, আরেকজনকে প্রাণাধিক বন্ধুর হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়।"

আলিবর্দী যখন সিরাজের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ, তখনও তাঁর চিঠির ভাষায় কত স্নেহের ভৎসনা। নিজের রাজ্যের ক্ষয়-ক্ষতির চেয়ে আদরের নাতি পাছে যুদ্ধ বিগ্রহে কষ্ট পায় তাঁর বড় ভাবনা সেইটেই।

পূর্ণিয়া জয় করতে গিয়ে সিরাজদ্দৌলা বন্দী হলেন সেখানকার শাসনকর্তা জানকীরামের হাতে। আলিবর্দী পৌছলেন পাটনায়। এবার দৌহিত্র আর দাদামশায়ের সাক্ষাৎ ঘটল শিবিরের ভেতরে। চোখের জলে ধুয়ে গেল পরস্পরের মনের মালিন্য। কদমবোসী, অর্থাৎ পদচুম্বন করে সিরাজ শ্রদ্ধা জানালেন দাদুকে।

নবাব এসেছেন শুনে খুলে দেওয়া হল দুর্গের দরজা। মহাকলরবে সিরাজের সৈন্যরা ঢুকে পড়ল দুর্গে। দরবার বসল দুর্গের ভিতরে। আলিবর্দীর পাশে সিরাজ। আলিবর্দী ঘোষণা করলেন, আজ থেকে সিরাজই হল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব। দাদু এবং নাতি দুজনেই ফিরে এলেন মুর্শিদাবাদে।

মুর্শিদাবাদের কাছেই মতিঝিল। প্রচুর টাকা খরচ করে এই প্রমোদ-ভবন তৈরী করেছিলেন নোয়াজিস মহম্মদ। আলিবর্দীর বড় জামাই। নোয়াজিস ছিলেন ঢাকার নবাব। কিন্তু বর্গির হাঙ্গামার সময় থেকেই বেশীর ভাগ থাকেন

মুর্শিদাবাদে। তাই মুর্শিদাবাদেই এই রাজকীয় ভবন। যখন কানে এল বৃদ্ধ নবাব সিরাজদ্দৌলাকেই সিংহাসনে বসাতে আগ্রহী, নোয়াজিস স্থির করলেন মুর্শিদাবাদ ছেড়ে আর এক পাও নড়বেন না। সেই থেকে মতিঝিল হয়ে উঠল শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, বাংলার রাজনীতির এক গোপন আড্ডা। বিদ্রোহীদের বৈঠকখানা।

কিন্তু মতিঝিলের একমাত্র পরিচয় বিদ্রোহীদের আড্ডাখানা নয়। সেটা ঘটেছে নোয়াজিস-এর মৃত্যুর পর। তার আগে এটা ছিল প্রধানতঃ বিলাস-ভবন।

"নওয়াজেস খাঁ অত্যন্ত আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। মুর্শিদাবাদের মধ্যস্থিত স্বীয় প্রাসাদ তাঁহার সর্বদা ভাল লাগিত না। এই সময়ে আবার আলিবর্দী খাঁ সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্যভার দিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলে, তাঁহার পরিবার মধ্যে ভীষণ মনোবিবাদ উপস্থিত হয়। সিরাজ ধীরে ধীরে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন। নওয়াজেস সিরাজের প্রভুত্ব অসহ্য বিবেচনা করিয়া রাজধানী হইতে কিছু দূরে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন। তৎকালে মহারাষ্ট্রীয় দস্যুদিগের ভয়ও প্রবল ছিল, তাঁহারা দুই একবার মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠনও করে। সুতরাং একটি সুরক্ষিত স্থানের জন্যও তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মোতি-ঝিলের সুন্দর অবস্থান দেখিয়া তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। অশ্বপদাকার ঝিল তিন দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, অধিকন্তু স্থানটি রমণীয়। তখন তিনি ইহার তীরে প্রাসাদ নির্মাণের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

"বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের অগণ্য ভগ্নস্তূপ হইতে প্রস্তর-স্তম্ভ ও মর্মর প্রস্তর আনীত হইয়া প্রাসাদ নির্মিত হইল।...তৎকালে মুসলমানদিগের গৃহ প্রায়ই সুবিস্তৃত হইত না। অনেকস্থলে এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাসাদের সোপানাবলী সলিলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। চারিদিকে নানাবিধ বৃক্ষ রোপণ করিয়া একটি রমণীয় কানন নির্মাণ করা হয়। ফলফুলে শোভমান, বৃক্ষরাজি সমন্বিত, রম্যকাননের মধ্যস্থ, জলমধ্যগত সোপানাবলী সংলগ্ন সুচারু প্রাসাদ পরপার হইতে দেখিলে বোধ হইত, যেন উদ্যান সহিত প্রাসাদটি ঝিল মধ্য হইতে ভাসিয়া উঠিতেছে।

"এই রম্যপ্রাসাদে নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ প্রায়ই বাস করতেন। তিনি ইহাতে কোকিলকণ্ঠী কামিনীগণের সঙ্গীত সুধাপানে অনেক সময়ে পরিতৃপ্ত হইতেন। ভগবাই নামে একটি রমণী তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তিনি তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য অনেক অর্থ ব্যয় ও তাহাকে হীরা জহরত উপহার দিয়াছিলেন।... তিনি যখন মোতিঝিলে আগমন করিতেন, এক্রামউদ্দৌলাও তাঁহার সহিত

আসিত। তাঁহার ন্যায় তাঁহার প্রিয় পুত্রও নর্তকীগণের কণ্ঠসুধা পান করিত। এক্রামের মনোরঞ্জনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নর্তকী নিযুক্ত হইত।" মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

"মতিঝিলের পূর্ব সৌভাগ্য এখন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এখন মতিঝিল কেবল কণ্টক বনে বেষ্টিত। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে মতিঝিলের নাম বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজ-মহিলা বিবি কিন্ডারলি ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মতিঝিলের রমণীয় স্থান পরিদর্শন করিয়া বিলাতে যে পত্র লিখিয়াছেন, সে পত্র-খানির কিয়দংশ এখন এদেশেও প্রচারিত হইয়াছে।...মতিঝিলের সে নবাব-ভবন এখন ধুলি-বিলুণ্ঠিত; তাহার কৃষ্ণমর্মর রচিত সুরচিত তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষমাত্র বর্তমান; তাহাও লতাগুল্মে ঢাকিয়া পড়িতেছে। ভাগিরথী আর তাহার পাদধৌত করিয়া প্রবাহিত হয় না। ঝিলের নীল সলিলে আর পদ্মকোরক তেমন শোভায় বিকশিত হয় না। চারিদিক হইতে কি এক গভীর মর্ম বেদনার হাহাকার বহন করিয়া তীরতরুগুলি বায়ুভরে নিরন্তর শন্ শন্ করিতেছে।... যে দিন লর্ড ক্লাইব 'দেওয়ানী সনন্দ' ঘোষণা করিয়া মতিঝিলের প্রাসাদ-কক্ষে প্রথম পুন্যাহের সূচনা করিয়াছিলেন, যে দিন মতিঝিলের শূন্য কক্ষে ওয়ারেন হেষ্টিংস, জন শোর প্রভৃতি ইংরাজ কর্মচারীগণ বাসভবন নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে দিনও কেহ জানিত না যে, মতিঝিলের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইবে।" সিরাজদ্দৌলা।

এই মতিঝিলে বসে নোয়াজিস শুরু করলেন দান-ধ্যান। ক্ষুধিতকে অন্ন। পীড়িতকে ওষুধ। দরিদ্রকে অর্থ। ঢাকা থেকে তাঁর প্রতিনিধি রাজা রাজবল্লভ পাঠান রাজকর। তাতেই চলে দুহাতে দান। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলের কাছেই নোয়াজিস যেন দেবতা। কিছুদিন পরে রাজবল্লভও ঢাকা ছেড়ে চলে এলেন মুর্শিদাবাদে। সিরাজের বদলে নোয়াজিসকেই বসাতে হবে সিংহাসনে। নোয়াজিসের পক্ষে কে কে? আছে উপকৃতের দল। আছে স্বার্থলোলুপ রাজ-কর্মচারীরা। আছে সেই সব জমিদার যারা সিরাজের অত্যাচারে মর্মাহত, নোয়াজিসের উদারতায় মুগ্ধ। আর আছেন রাজা রাজবল্লভ। আছেন নোয়াজিসের বেগম, ঘসেটি। এবং সর্বশেষে হোসেনকুলী। হোসেনকুলীর হাতেই নোয়াজিসের রাজকোষ। এই পরিবারের তিনি প্রিয়জন। সিরাজের বিরুদ্ধে আক্রোশের আগুন ছাই-চাপা হয়ে আছে আরো এক শ্রেণীর মানুষের মনে। তারা ইংরেজ।

হীরাঝিলে বসে সবই টের পান সিরাজ। জন্ম থেকেই ইংরেজ জাতটার

উপর তার রাগ। পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরে তিনি চোখ ফেরালেন এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাটা কোথায় কি রকম, তার অনুসন্ধানে। আসলে ইংরেজদের দিকেই ভাল করে তাকানো। কারণ, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ বণিকেরা বাণিজ্য করে শুল্ক দিয়ে। ইংরেজরা বিনা শুল্কে। এখন দেখতে হবে আসলে ব্যবসাটা করছে কারা। যথার্থ ব্যবসায়ীরা না কোম্পানীর কর্মচারীদের আত্মীয় স্বজন। অর্থাৎ যে কোন ইংরেজই কোম্পানীর নামে পাওয়া সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছে কি না।

একাধিকবার দাদুর কানে তুলেছেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। বারবার তাঁর মনে হয়েছে, ইংরেজরা কি একটা গূঢ় ষড়যন্ত্রের ছক কেটে চলেছে চারপাশে। মনে হয়েছে, ওদের বিনা শুল্কের বাণিজ্য বন্ধ করতে না পারলে দেশীয় বাণিজ্যের সুরাহা হবে না কোন দিন।

দাদু কথাগুলো শুনতেন কান পেতে। কিন্তু কাজে করতেন না কিছু। ইংরেজদের ক্ষমতার দৌড়টা তাঁর জানা ছিল। সিরাজের ছিল না। তিনি ভাবতেন, সারা ইউরোপের লোক সংখ্যা দশ হাজারের বেশী নয়। দেশে-দেশে মালপত্র বেচা-কেনা করে কোনমতে বেঁচে আছে ওরা। ওদের শায়েস্তা করতে এমন কি লাগে?

সেই সিরাজ পা বাড়ালেন হুগলীতে। ইংরেজরা আঁতকে উঠল এই খবরে। আসলে রাজদরবারে কেউ-কেউ একজন নামজাদা হয়ে উঠলেই, অমনি করে ভয়ে সিঁটিয়ে উঠতো তারা। ভয়টা অন্য কিছুর নয়। নজরানা অর্থাৎ উৎকোচ দেওয়ার ভয়। অর্থাৎ খরচ।

সিরাজদ্দৌলা হুগলীতে এসেছেন খবর পেয়ে সবার আগে ছুটে এল ফরাসী আর দিনেমার। মহারাজা নন্দকুমার আর খোজা বাজিদ তখন হুগলীর সর্বময়কর্তা। তাঁরাই ব্যবস্থা করলেন অভ্যর্থনার। সিরাজের চোখে পড়ল, ইংরেজরা অনুপস্থিত। তখুনি তাদের তলব করলেন হুগলীর ফৌজদার। ছুটে এল ইংরেজ প্রতিনিধি। সঙ্গে বহুবিধ উপঢৌকন। বসে পড়লেন সিরাজের সামনে হাঁটু মুড়ে, সবিনয়ে, সশ্রদ্ধায়।

ইতিহাস বলে, এই উপলক্ষে ইংরেজদের খরচ হয়েছিল মোট ১৫৫৬০ টাকা। উপহারের মধ্যে ছিল ৩৫ থান মোহর, নগদ ৫৫০০ টাকা, ১১০০ টাকার মোমবাতি, ৮৮০ টাকার ঘড়ি, ৫৫০ টাকার দুটো আরসী, ২২০ টাকার দুখণ্ড শ্বেত পাথর, ১১০ টাকা দামের একটা পিস্তল, ১৪৩৬ টাকার একটা হীরের আংটি ইত্যাদি।

ইংরেজরা ভেবেছিল, এই উপঢৌকনে মন গলে যাবে ভাবী নবাবের। তা গেল না।

"রাজকার্য পরিদর্শন উপলক্ষে ইংরাজদিগের বাণিজ্য-কৌশল এবং ছল প্রতারণা ধরিতে পারিলেই, সিরাজদ্দৌলা তাহাদের লাঞ্ছনার একশেষ করিতে আরম্ভ করিলেন।...ক্রমে এই সকল কথা বিলাতের কর্তৃপক্ষীয়দিগের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা পূর্বরীতির অনুসরণে নবাবের তুষ্টি সম্পাদনের জন্য আরও কিছু অর্থব্যয় করিয়া কলহ বিবাদ নিবারণ করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

"কলিকাতার ইংরাজগণ অগত্যা আরও কিছু উপহার উপঢৌকন লইয়া সিরাজ-উদ্দৌলার নিকট হাজির হইলেন। কিন্তু তাহাতেও উভয়ের মনোমালিন্য দূর হইল না। কেবল প্রকাশ্যে উৎপীড়ন কিছুদিনের জন্য রহিত হইল।" সিরাজদ্দৌলা।

পরবর্তী দৃশ্য মুর্শিদাবাদের রাজপথ। এবং একটি আকস্মিক হত্যাকাণ্ড।

নিহতের নাম, হোসেন কুলী। হত্যাকাণ্ডের উদ্যোক্তা স্বয়ং সিরাজ। রাজ-প্রাসাদের অন্দরে-অন্দরে দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল এক কানাকানি। দাসদাসীদের মুখে ফিসফাস। কর্মচারীদের চোখে-চোখে গোপন হাসি ঠাট্টা। হঠাৎ সেই চাপা খবর একদিন কানে পৌঁছল সিরাজের। হোসেন কুলী ঘসেটি বেগমের সঙ্গে পরিণয়ে লিপ্ত। সংবাদ শোনা মাত্রই জ্বলে উঠলেন সিরাজ। ছুটে এলেন রাজপথে। আক্রান্ত হলেন হোসেন কুলী।

"হোসেন কুলীকে সিরাজদ্দৌলা স্বহস্তে নিহত করেন নাই। মাতামহীর উত্তেজনায়, মাতামহ এবং নোয়াজেসের সম্মতিক্রমে সিরাজের উপর এই পারিবারিক কলঙ্কমোচনের ভার পতিত হওয়ায় তাঁহার সম্মুখে ও তাঁহার আদেশে এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়।" সিরাজদ্দৌলা।

হোসেন কুলী হত্যার কাহিনীর পিছনে রয়ে গেছে অনেক রহস্য। দোষটা চাপে সিরাজের ঘাড়ে। কিন্তু পিছন থেকে ক্রমাগত চাপ দিয়েছেন যাঁরা, তাঁরা আড়ালে রয়ে গেছেন নিরপরাধী সেজে। এমন কি আলিবর্দীর বেগম, যিনি ইতিহাসে অনেকটা গুণবতী-দয়াবতীর গড়নে আঁকা, তিনিও তাঁর বিরাগ ব্যক্ত করেছেন হোসেন কুলীর বিরুদ্ধে। হোসেন কুলীর অপরাধ শুধু ঘসেটি বেগমকে জড়িয়ে নয়, 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র রচয়িতার মারফতে আমরা জানতে পারি সিরাজ-জননী আমিনা বেগমও জড়িয়ে আছেন এই হত্যাকাণ্ডের আরও এক কারণ হিসেবে।

"ঘেসেটী বেগম অনেক দিন হইতে পাপপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জৈনুদ্দীনের মৃত্যুর পর আয়মানাও (আমিনা) ভগিনীদের পথের

অনুসরণ করেন।…অবশেষে ঘেসেটী ও হোসেনকুলা খাঁর মধ্যে মনোবিবাদের সৃষ্টি হয়। এই মনোবিবাদের কারণই আয়মানা বেগম।…নিজ কন্যাগণের কুপথ গমনের কথা জ্ঞাত হওয়া অবধি নবাব-বেগম তাহা নিবারণের জন্য অশেষ রূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন না। ক্রমে যখন তাঁহাদের গুপ্ত প্রণয়ের কথা লইয়া সমস্ত মুর্শিদাবাদে আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন নবাব-বেগম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা পূর্বে সচ্চরিত্র থাকিয়া এক্ষণে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া এবং হোসেনকুলী খাঁকেই সেই অধঃপতনের কারণ জানিয়া তিনি তাহার প্রতিবিধানে যত্নবতী হইলেন।"

তবু সিরাজের বিরুদ্ধেই সকলের অভিযোগ। সম্ভ্রান্তরা শংকিত। জমিদারেরা আতংকিত। আতংকিত আরো একজন। তিনি রাজা রাজবল্লভ। কারণ ঘসেটি বেগমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাও বড় নিবিড়। অন্ততঃ ইংরেজ ঐতিহাসিক অর্মের মতটা তাই।

"A Gentoo, named Rajah-Ballab, had succeeded Hussein Cooley Khan in the Post of Duan or prime minister to Nowagis; after whose death his influence continued with the widow, with whom he was supposed to be more intimate than became either her rank or his religion."

এর আগে আরো একবার জমিদার শ্রেণী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল সিরাজের ভয়ে। সে কাহিনীর নায়িকার নাম তারা। রাণী ভবানীর বিধবা মেয়ে। গঙ্গাবাসের জন্যে মুর্শিদাবাদের কাছে বড় নগরের রাজবাড়িতে বাস করছেন তখন রাণী ভবানী, বিধবা মেয়েকে নিয়ে।

"বৈধব্যের কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের এই অনুপম রূপরাশি মলিন না হইয়া, আরও যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সিরাজদ্দৌলার নিকট অনুপম রূপলাবণ্যের কথা অধিক দিন লুক্কায়িত রহিল না। একদিন প্রমোদ শিখরে পাদচারণা করিতে করিতে, আজানুলম্বিত কেশপাশ উন্মুক্ত করিয়া, রাজকুমারী তারা স্বচ্ছন্দভাবে বায়ুসেবন করিতেছিলেন। সেই সময়ে ক্রোড়বাহিনী ভাগীরথীর জলে সিরাজদ্দৌলার বিলাসতরণী মন্থরগতিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। কুক্ষণে সেই অতুলনীয় রূপের ফলিতজ্যোতিঃ চকিতের ন্যায় সিরাজের পাপচক্ষে পতিত হইল।…যদি রাজ্য বিনিময়েও সিরাজের মতিভ্রম দূর করা সম্ভব হইত, রাণী-ভবানী হয়ত তাহাতেও ইতস্ততঃ করিতেন না। কিন্তু সিরাজের নামে সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন।" সিরাজদ্দৌলা।

অবশেষে, অনেক গোপন যুক্তি-পরামর্শের পর স্থির হল, চিতা সাজানো। চিতার কাঠে জ্বালানো হল আগুন। ভাগিরথীর তীরে আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠল অগ্নিশিখার আলো এবং কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। চারিদিকে রটনা করে দেওয়া হল, মারা গেছে রাজকুমারী তারা।

হোসেন কুলীর হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজা রাজবল্লভ দেশের সম্ভ্রান্ত লোকজনকে খেপিয়ে তুলতে লাগলেন গোপনে। একদিকে দেশের মাথা-মাতব্বরদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা। অন্যদিকে ইংরেজদের সঙ্গেও ভাব-ভালবাসাটা বেড়ে চলেছে ক্রমশঃ। রাজবল্লভ যখন ঢাকার নবাব, তখন এই ইংরেজদেরই নাস্তানাবুদ করেছেন একাধিকবার। এখন সে সব ঘটনা তুচ্ছ। কাশিম-বাজারের ইংরেজ কুঠীর গোমস্তা ওয়াটস সাহেব। তাঁর সঙ্গে রাজবল্লভের খাতির। ওয়াটস মুর্শিদাবাদ দরবারের যা কিছু খবর নিয়মিত পাঠাতেন কলকাতায়। সিরাজ আঁচ পেলেন এসব ঘটনার। কিন্তু হাত পা বাঁধা। কারণ দাদু রোগশয্যায়। তাঁর উদরী রোগটা এখন হয়ে উঠেছে আরোগ্যের অযোগ্য। সিরাজের এখন প্রধান কাজ, দাদুর শিয়রে জেগে থাকা।

রাজবল্লভ ভেবেছিলেন আলিবর্দীর মৃত্যু আসন্ন। তারপরেই নোয়াজেসকে তাঁরা বসিয়ে দেবেন সিংহাসনে। কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়ল অচিরাৎ। বৃদ্ধ এবং অসুস্থ নবাব রইলেন বেঁচে। পুত্রশোকে মারা গেলেন নোয়াজিস। মতিঝিল কেঁপে উঠল ঘসেটি বেগমের আর্তনাদে। রাজবল্লভ এবং তাঁর সহযোগীরা মন্ত্রণায় বসলেন, তাহলে কাকে বসানো হবে সিংহাসনে? এক্রামদ্দৌলার ছিল কম বয়সের একটি পুত্র। রাজবল্লভ স্থির করলেন, এই শিশুকেই সিংহাসনে বসাবেন তাঁরা। আর সিংহাসনের আসল চাবিকাঠিটা থাকবে ঘসেটি বেগমের হাতে।

ইতিমধ্যে আরও একটা বুদ্ধির কাজ করে বসলেন রাজবল্লভ। ছেলে কৃষ্ণবল্লভকে চিঠি পাঠালেন ঢাকায়। এখনো সময় আছে। নবাব চোখ বুজলে কখন কি ঘটবে তার ঠিক নেই। আত্মীয়-স্বজন আর ধন-সম্পত্তি যা আছে তাই নিয়ে নৌকো চেপে পাড়ি দাও কলকাতায়।

কি ভাবে পালাতে হবে, কে আশ্রয় দেবে, সে সব ব্যবস্থাও পাকা করে রেখেছেন তিনি মুর্শিদাবাদে বসে। ওয়াটস-এর মারফৎ চিঠি পৌছে গেছে কলকাতায়। কৃষ্ণবল্লভ যাচ্ছে জগন্নাথ দর্শন করতে, সপরিবারে। কিছুদিন যেন আশ্রয় পায় কলকাতায়।

পিতার নির্দেশ মত কৃষ্ণবল্লভ পা বাড়ালেন কলকাতার দিকে। টাকাকড়ি

সব কিছু বোঝাই হয়ে গেল নৌকোয়। টাকা-কড়ির অন্ত ছিল না রাজবল্লভের। বাঙালী বৈদ্য। বিক্রমপুরের লোক। বৈদ্য সমাজের শিরোমণি। বৈদ্যরা উপবীত পরবে, এটা ঘটেছিল তাঁরই চেষ্টায়। একবার উদ্যোগী হয়েছিলেন বিধবা বিয়েতেও। অবশ্য বিধবাটি ছিলো নিজেরই মেয়ে। নবদ্বীপের পণ্ডিতদের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন শাস্ত্রীয় সমর্থনও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেননি। আটকে গিয়েছিলেন লোকলাজে। পূর্ববঙ্গের মানুষ রাজবল্লভের মত বড়-মানুষি দেখেনি কখনো আগে। তাই কাউকে বড়-মানুষি দেখাতে দেখলে তাদের মুখে শোনা যেতো, যেন রাজা রাজবল্লভের নাতি। এই রাজবল্লভের উপর সিরাজ হাড়ে-হাড়ে চটা। নোয়াজিস-এর মৃত্যুর পর তিনিই ঘসেটি বেগমের দেওয়ান। ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে এসেছেন কাজে। সিরাজ তাঁকে বন্দী করলেন। আলিবর্দীকে জানালেন, প্রচুর সরকারী টাকা সরিয়েছেন ইনি। শয্যাশায়ী আলিবর্দী হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। শুধু তাঁর অনুরোধে রাজবল্লভ অব্যাহতি পেলেন দৈহিক অত্যাচার থেকে। সিরাজ বললেন, সমস্ত টাকা-কড়ির হিসেব বুঝিয়ে দিন।

হিসেব বুঝে তখন আর লাভ হল না কিছু সিরাজের। কারণ তার আগেই টাকাকড়ি যা ছিল, সব চালান হয়ে গেছে কলকাতায়। ওয়াটস কৃষ্ণবল্লভের পক্ষে একটা প্রশংসাপত্র লিখে দিয়েছিলেন গভর্ণর ড্রেক-এর নামে। কিন্তু কৃষ্ণবল্লভ যখন কলকাতায় পৌঁছলেন, ড্রেক তখন বালেশ্বরে। গেছেন হাওয়া বদলে। ড্রেক-এর অনুপস্থিতিতেও কোন ক্ষতি হল না। উদ্যোগী হলেন হলওয়েল। কাউন্সিল সম্মত হল তাঁর অনুরোধে। অনেকেরই অনুমান, হলওয়েল আর মানিংহাম এই সুযোগে হাতিয়েছিলেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা।

কৃষ্ণবল্লভ কলকাতায় পা দিয়ে আর নড়েন না। কেউ প্রশ্ন করলে বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তীর্থে যাবো বলেই তো এসেছি। তবে কিনা আমার স্ত্রী গর্ভবতী। ওঁর প্রসবের পর রওনা দেবো। তারপরেও দিন যায়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তানের বয়স বাড়ে। কৃষ্ণবল্লভের পা নড়ে না। ক্রমে কলকাতাও ভুলে গেল তীর্থের কথা।

ইতিমধ্যে দেশীয় জমিদার, জগৎশেঠ ইত্যাদিরা মিলে গোপনে স্থির করে ফেলেছেন বাংলার সিংহাসনের আরেক ভাগীদার। আলিবর্দীর মেজ জামাই সাইয়েদ আহম্মদের ছেলে শওকতজঙ্গ। পূর্ণিয়ার নবাব। নতুন প্রস্তাবে রাজী হলেন রাজবল্লভও।

ইতিমধ্যে বিলেত থেকে এসেছে এক আচমকা সংবাদ। ফরাসীরা তৈরী

হচ্ছে ভারত আক্রমণে। কলকাতার ইংরেজ মহলে পড়ে গেল সাজ সাজ রব। আগে সারাতে হবে দুর্গ। চিঠি চলে গেল বিলেতে। ভাল কারিগর পাঠান। বিলেত থেকে চিঠি এল, এই সময়ে নবাবের সঙ্গে কেউ কোনরকম বিবাদ বিসম্বাদে জড়াবে না। কলকাতার ইংরেজ সে কথা কানে ঢোকাল। কিন্তু মাথায় নিল না। বরং পা বাড়াল উল্টো পথে। যারা নবাবের বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গেই বাড়িয়ে চলল ভাব-ভালবাসা। এমন কি দুর্গ মেরামত করতে গেলে যে নবাবের একটা অনুমতি নেওয়া দরকার, সেটাও ভুলে গেল ইচ্ছে করেই।

আলিবর্দীর অবস্থা দিনে দিনে ক্রমশঃ খারাপের দিকে। এক সময়ে ওষুধ খাওয়াও ছেড়ে দিলেন তিনি। বুঝতে পারলেন শেষ দিন আসন্ন। একদিন নাতিকে শোনালেন কিছু উপদেশ। তার মধ্যে প্রধান ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। তবে যেন সমস্ত ইউরোপীয় বণিকের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করা না হয়। ইংরেজরাই সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। ওদের দমন করতে পারলেই আর কেউ মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস পাবে না।

১৭৫৬। ৯ এপ্রিল। পরলোক গমন করলেন নবাব আলিবর্দী।

আলিবর্দীর মৃত্যু সম্পর্কে করম আলি-র 'মুজফ্‌ফর্‌-নামা'-র একটি পরিচ্ছেদ—

"যখন অসুখ আলিবর্দীকে জীর্ণ করে তুলল, তিনি নিজেকে সমর্পণ করলেন হাকিম হাদী খানের কাছে। হাদী খানকে বলা যেতে পারে ধন্বন্তরী। গালেন বা টলেমিও তাঁর হাটুর যোগ্য নয়। কিন্তু অসুখের তখন চরম অবস্থা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধ্যের বাইরে। যখন বুঝলেন মৃত্যু একেবারে আসন্ন, তখন ডেকে পাঠালেন সিরাজকে। উপদেশ দিলেন, 'আমার মৃত্যুকাল আসন্ন। তোমার প্রতি আমার শেষ উপদেশ বাক্যগুলি শোন। শত্রুকে উচ্ছেদ করার জন্যে কাজে লাগাবে তোমার সমস্ত শক্তি। এবং বন্ধু অর্থাৎ মিত্রদের যশ বা মর্যাদা বৃদ্ধির দিকে হবে মনোযোগী। নিজেকে সব সময় নিয়োজিত করে রাখবে দেশের উন্নতির কাজে, অত্যাচার এবং বিশৃঙ্খলাকে শক্ত হাতে দমন করে। মানুষের জীবনে সুখ শান্তির পরিমাণকে বাড়িয়ে তোলাই হবে তোমার একমাত্র লক্ষ্য। তার ফলে তোমার নিজের জীবনও হয়ে উঠবে শান্তি এবং সৌভাগ্যময়। রাজ্যের উন্নতি নির্ভর করে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর। কলহ বিবাদ আনে রাজ্যের পতন। আমার পথ বা আচরণ অবলম্বন করে তুমি যদি শক্ত হাতে, শান্ত ভাবে, ন্যায় নীতি মান্য করে চলতে থাকো, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সহস্র শত্রুর চক্রান্তের মধ্যে অম্লান থাকবে তোমার নিরাপদ ভাগ্য।

আর যদি অকারণ কলহ-বিবাদের রাস্তায় হাঁটো, এই রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে অচিরাৎ। মুছে যাবে যাবতীয় সুনাম। বহু দিনের জন্যে শোক এবং সন্তাপ ঘুরে বেড়াবে এই রাজ্যের আকাশে বাতাসে।'

"শুক্রবার, প্রাতঃকালীন প্রার্থনা করতে করতেই, ১১৭০-এর ৯ই রজব তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। চারিদিক ভেঙ্গে পড়ল শোকে এবং কান্নায়। খোশবাগে, যেখানে তাঁর মায়ের ঘর, সেইখানে রচনা করা হল সমাধি। মহান ঈশ্বর! তিনি ছিলেন বিরাট ভাগ্যবান পুরুষ। তাই তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী বিদায় নিলেন বাংলা দেশ থেকে। দেশের ধ্বংস, যাকে তিনি এতদিন বেঁধে রেখেছিলেন ন্যায়-বিচারের শিকলে, ফিরে এল অচিরাৎ।

"তাঁর আমলে বাংলার রাজধানীর (মুর্শিদাবাদ) আয়তন বৃদ্ধি হয়েছিল দৈর্ঘে ১২ ক্রোশ, প্রস্থে ৭ ক্রোশ। শহরের বাইরে ধনী ব্যক্তিরা তৈরী করার অনুমতি পেয়েছিলেন বড় বড় অট্টালিকা। রাজ্যের মোট ১২ জন ধনী-মানি ব্যক্তিকে সকাল সন্ধ্যে নহবত বাজানোর অধিকার দিয়েছিলেন তিনি। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁর আমলে সমবেত হতেন রাজধানীতে।"

নবাব আলিবর্দী নেই। শূন্য সিংহাসনে বসলেন সিরাজ। নাম হল, নবাব মনসুরোল মোলক-সিরাজদ্দৌলা শাহকুলী খাঁ মীরজা মোহম্মদ হায়রৎজঙ্গ বাহাদুর। সিরাজের বয়স তখন উনিশ। সুন্দর, লাবণ্যময় স্বাস্থ্য। মুখে আবছা গোঁফের রেখা। সিংহাসনে বসেই স্থির করে নিলেন প্রধান চারটি কাজ। এক, মতিঝিল থেকে ঘসেটি বেগমকে সরিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা। দুই, রাজদরবারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিতদের অদল-বদল। তিন, কলকাতার ইংরেজদের বাড়-বাড়ন্ত বন্ধ করা। চার, পূর্ণিয়ায় গিয়ে শওকতজঙ্গকে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার শাস্তি দেওয়া।

প্রথম কাজটাই প্রথমে।

"রাজ্য প্রাপ্তির পর সিরাজদ্দৌলা কয়েকদিন শোক-প্রকাশে অতিবাহিত করিলেন। পরে রাজকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমেই পিতৃব্যপত্নী ঘেসেটী বেগমকে মতিঝিল প্রাসাদ হইতে অন্যত্র আনাইয়া অবরুদ্ধ করার কল্পনায় একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি অনুমতি হইল,বেগমের সমস্ত সম্পত্তি, নগদ টাকা ও মণিমুক্তা, এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি আয়ত্ব করিয়া, রাজকোষে আনিয়া পঁহুছিয়া দিবেন। গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন – নির্বোধ বেগম এখন অনুচরবর্গের মধ্যে অজস্র অর্থবৃষ্টির ফল হৃদয়ঙ্গম করিলেন। আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর হইতে

যে সমস্ত সেনানী তাঁহার অর্থে উদরপূর্তি করিতেছিল, তাঁহার মূল্যবান উৎকোচ উপহারে নবাবীগিরী আরম্ভ করিয়াছিল, সেই অর্থগৃধ্নু বন্ধুগণ কার্যকালে সরিয়া পড়িল। অনেক সৈন্যও তাহাদের দলপতিগণের পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিল। সামান্য যে কতকগুলি সৈন্য ছিল তাহারাও আক্রান্ত ও বেষ্টিত হইয়া হতবুদ্ধি হইল। বেগমের প্রিয়পাত্র মির নজর আলিও স্বয়ং অন্যের অপেক্ষা বেশী সাহস দেখান নাই। সম্ভবতঃ বয়োবৃদ্ধা বেগমের প্রেম অপেক্ষা অর্থভাণ্ডারের দিকেই তাঁহার অধিক লক্ষ্য ছিল। ঐতিহাসিক বলেন, সিরাজদ্দৌলার বিপক্ষে বাধা-দানের যে ব্যক্তি প্রধান পরামর্শদাতা, বিবির বিষয়কর্মের ও তৎসহ হৃদয়ের উপর যাহার বিশেষ অধিকার ছিল, সেই নজর আলিও এক্ষণে হতবুদ্ধি হইলেন। দোস্ত মহম্মদ ও রহিম খাঁ নামক সিরাজের দুইজন সেনানীকে উৎকোচ দ্বারায় বশীভূত করিয়া নজর আলি নিজের পলায়নের পথ পরিষ্কার করিলেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

মুতাক্ষরীণের অনুবাদক মোস্তাফার বর্ণনা অনুযায়ী নজর আলি ছিলেন হোসেন কুলীর মতই উন্নত স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। পালাবার সময় সম্ভবত ১২ থেকে ১৫ লাখ টাকার মণিমুক্তো সঙ্গে নিয়েছিলেন তিনি। ১৭৮০তে আবার ফিরে এসেছিলেন মুর্শিদাবাদে। তখন দীন দরিদ্র অবস্থা। থাকেন এক বাঈজীর আশ্রয়ে। অত বিপুল টাকা পয়সা, ধনরত্ন ? সে সবই নাকি উড়িয়ে দিয়েছিলেন বেনারসে গিয়ে। জুয়া খেলে।

"রাজবল্লভের স্বার্থসিদ্ধির সহজ পথ চিররুদ্ধ হইতেছে বলিয়া, তিনি (ঘসেটি বেগম) তূরি ভেরী বাজাইয়া, মতিঝিলের সিংহদ্বারে সেনাসমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিরাজদ্দৌলা ইহাতে উত্যক্ত না হইয়া, তাঁহাকে রাজসদনে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার সকল প্রকার কুচরিত্রের কথা অবগত থাকিয়াও, তাঁহার পদগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বিনা রক্তপাতে মতিঝিল অধিকার করিয়া, পিতৃব্য রমণীকে রাজ অন্তঃপুরে আনয়ন করিলেন। যেরূপ সুকৌশলে বিনা রক্তপাতে এই প্রধুমিত বিবাদবহ্নি নির্বাণলাভ করিল, তাহার জন্য ইতিহাস একবারও সিরাজ-সাধুবাদ করে নাই।" সিরাজদ্দৌলা।

ঘসেটি বেগম মতিঝিল ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন শূন্য হৃদয়ে। এবং শূন্য হাতেও। কিন্তু ইতিহাস বলে, বিশ্বস্ত দাসীর সাহায্যে আগেই প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা সরিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। এবং সেই টাকা কাজে লেগেছিল পরবর্তী সিরাজদ্দৌলা বিরোধী চক্রান্তের সময়।

সিরাজের প্রথম দফার কাজ শেষ। এবার দ্বিতীয়টি। শুরু হয়ে গেল অদলবদলের কাজ। মীরজাফরের জায়গায় মীরমদন। প্রধানমন্ত্রী হলেন

মোহনলাল। প্রবীণরা রুষ্ট হয়ে উঠলেন মনে মনে। এই প্রবীণদের দলে প্রধান দুজন হলেন, মীরজাফর আর রাজা দুর্লভরাম।

"মীরজাফর খাঁ বহুদিন হইতেই দেওয়ান-ই-তন অর্থাৎ সৈন্য পরিসংখ্যার প্রধান সদস্য ছিলেন। তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, ঐ পদে নতুন লোক মীরমদনকে নিয়োজিত করা হইল। মীরমদন ঢাকায় হোসেনকুলী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হাসান উদ্দীনের পার্শ্বচর ছিলেন। পরে মুর্শিদাবাদে আসিয়া সিরাজদ্দৌলার অনুগত হন। সিরাজদ্দৌলার নিজের দেওয়ান মোহনলাল, দেওয়ান-ই-আলা, মোদার-উল-মোহান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীত্ব পদে উন্নীত হইলেন। রাজকার্য্যের প্রত্যেক বিভাগের উপর তাঁহার হস্তে কর্তৃত্বভার ন্যস্ত হইল। তাঁহাকে মহারাজা উপাধি ও তৎসহ বাদশাহী প্রথমত নকড়া, ঝালরদার পালকী, ও পাঁচহাজারী মনসবদারীও (সেনানায়কত্ব) প্রদত্ত হইল।...ইহাই মীরজাফর খাঁ, রাজা দুর্লভ-রাম এবং অন্যান্য সদস্যের মনোভঙ্গের মূল কারণ। ...বিশেষতঃ মোহনলালের সগর্ব ব্যবহার তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল, তজ্জন্য প্রধান প্রধান নাগরিক ও সামন্তগণ এই অপদার্থ নবীন নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য কল্পনা করিতে লাগিলেন, ছল, বল, বা রাজদ্রোহ যে কোন উপায়ে ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কামনাই তাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান হইল। কয়েকজন দুষ্ক্রিয়াশালী যুবক ভিন্ন ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোকের কেহই প্রায় আর সিরাজদ্দৌলার প্রতি আসক্ত রহিলেন না।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে, মোহনলালের প্রতি সিরাজের এতখানি কৃপা-করুণার মূল কারণ নাকি, মোহনলালের ভগিনী। মোহনলাল নাকি নিজের বোনকে সিরাজের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন ভোগের নৈবিদ্যি হিসেবে। সে ভগিনী কে? অনেকের মতে ঐ লুৎফাই। অনেকের মতে অন্য কেউ। কিন্তু এ ঘটনা সম্ভবত এক ধরনের মুখরোচক কল্পনাই। আবার কোন কোন লোক-গাথায় লুৎফাকে বলা হয়েছে মোহনলালের বেটি।

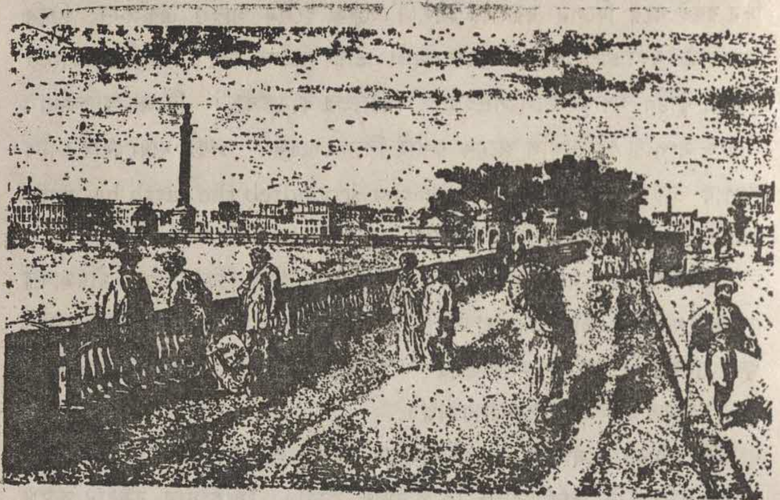
রিয়াজ-উস-সালাতিন-এ এই সময়কার সিরাজ চরিত্রের যে ছবি, তার সবটাই কালো রঙে আঁকা। সিরাজের অন্যায় ব্যবহার, মিষ্টতাহীন কঠোর বাক্যের ভয়ে সকলেই তখন ভীত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দরবারে আসতেন, প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে। যে কোন মুহূর্তে মান-সম্মান ধুলোয় লুটোতে পারে, এই আশঙ্কায় সকলেরই বুক সদাসর্বদা দুরু দুরু। সিরাজের হুকুম, দরবারে এলেই মোহনলালকেও নবাবের মত কুর্নিশ করে সম্মান জানাতে হবে। মীরজাফর এ রকম হীন প্রস্তাবে রাজী হতে পারলেন না। মোহনলাল তাঁর কাছে একটা

নগণ্য লোক। সেদিনকার ছেলে। তাকে করবো কুর্নিশ? রাগে দুঃখে কিছু-দিন বন্ধই করে দিলেন দরবারে আসা। ক্রুদ্ধ হলেন আরও একজন। তিনি জগৎশেঠ মহাতাপ রায়। মোহনলাল তাঁর দুচক্ষের বিষ। কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জাঁল সাহেব। সিরাজের কনিষ্ঠ বন্ধু। নিজের স্মৃতিকথায় সিরাজ সম্পর্কে খোলাখুলি অনেক কথাই লিখে গেছেন। তারই মধ্যে মোহনলাল সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হল—"The greatest scoundreb the earth has ever borne." জগৎশেঠের ধারণাও তাই।

জগৎশেঠ শুধু মোহনলালের দাপট দেখেই সিরাজের বিরুদ্ধে এবং মীরজাফর দুর্লভরামের দলে ভীড়লেন তা নয়। স্বয়ং নবাবের উপরও তিনি নানা কারণে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত। নবাব আলিবর্দীর আমলে যে সম্মান পেয়েছেন রাজদরবারে, এখন সে সব যেন অতীতকালের স্বপ্ন।

সিংহাসনটা সোনার ভেবেই সেটায় বসেছিলেন সিরাজ। কিন্তু তখনো বুঝতে পারেন নি, তার সর্বাঙ্গে কি পরিমাণ কাঁটা। সিংহাসনে বসবার আগে তাঁর শত্রু ছিল শুধু বাইরে। ইংরেজ। সিংহাসনে বসবার পর শত্রু জন্ম নিল ঘরে। রাজকীয় মর্যাদা থেকে অপসারিত বয়স্ক অমাত্যবর্গ।

সিরাজ তখনও বৃহত্তর গোপন চক্রান্তের হদিশ পাননি। তিনি অতঃপর মন দিলেন তাঁর তৃতীয় দফা দায়িত্বে। ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়ায়।



॥ আলিনগর / খালিনগর ॥

ওয়াটস ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠির গোমস্তা। একদিন তাঁর ডাক পড়ল মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে। ওয়াটস হাজির। সিরাজদ্দৌলার গলায় কড়া ধমক।

তোমার চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে আমি অসন্তুষ্ট। শুনছি, তোমরা নাকি কলকাতায় দুর্গ বানাচ্ছ একটা? আমি তোমাদের বণিক বলেই জানতাম। বণিক হিসেবে যদি শান্তভাবে থাকতে চাও ভাল। না হলে বিপদ ঘটবে। মনে রেখো, আমি এ দেশের নবাব। আমি তোমাদের জোর-জুলুম একদম সহ্য করতে রাজী নই।

ওয়াটস চুপ করে সব শুনে গেলেন। তখুনি কোন উত্তর দিলেন না। ওয়াটস নাকি সিরাজের এই ধমকের কথা জানিয়েছিলেন কলকাতার কাউন্সিলকে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে ওয়াটসও কোন উত্তর পাননি। সিরাজদ্দৌলাও পাননি। উত্তর না পেয়ে সিরাজদ্দৌলা যে ক্ষেপে লাল হয়ে গেলেন, তা নয়। কাজ করতে লাগলেন মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা রেখেই। তিনি চাইলেন ইংরেজদেরও মাথাটা যাতে ঠাণ্ডা হয়, তার ব্যবস্থা করতে। খোজা বাজিদকে রাজদূত হিসেবে পাঠালেন কলকাতায়। খোজা বাজিদ কলকাতার মাথা-মাতব্বরদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নবাবের মনের কথা জানালেন।

"কিন্তু সে কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। বরং হিতে বিপরীত হইল।

ইংরাজেরা নবাবের পত্রের কোনরূপ প্রত্যুত্তর না দিয়া, সেই সম্ভ্রান্ত রাজদূতকে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া নগর-বহিষ্কৃত করিলেন। ইহা কাহারও স্বকপোল কল্পিত নতুন কথা নহে। বিলাতের বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত হস্তলিখিত পুরাতন কাগজপত্রে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।" সিরাজদ্দৌলা।

এরপর আবার দূত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন সিরাজ। ডাক পড়ল রামরাম সিংহের। বর্গির হাঙ্গামার সময় রামরাম সিং, কারো কারো মত রামরাম নয়, রাজারাম, মেদিনীপুরের ফৌজদার হিসেবে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন আলিবর্দীকে। আলিবর্দীই তাঁকে মনোনয়ন করেছিলেন চরাধিপতি হিসেবে। সিরাজ সেটা জানতেন। দাদুর মত সিরাজও শ্রদ্ধা করতেন রামরামকে। বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে দাদু যেমন পরামর্শ নিতেন রামরামের, সিরাজও তেমনি নেবার জন্যেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে।

রামরাম পৌঁছলে, সিরাজ সব জানালেন। রামরাম সবটা শুনে বুঝলেন, দূত পাঠিয়ে লাভ হবে না। খোজা বাজিদের মত সম্ভ্রান্ত শক্তিমান মানুষকে অপমান করতেও যাদের ভয় করে না, তারা অন্য যে-কোন দূতকে মেরে ভাগিয়ে দেবে। সুতরাং দূতের বদলে পাঠানো হোক চর।

সিরাজ রাজী হলেন এ প্রস্তাবে। রামরাম সিংহের ভাই নারান সিংহকে মনোনীত করা হল চর হিসেবে। তাঁকে সাজানো হল ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে। তারপর ডিঙ্গীতে চাপিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হল কলকাতার দিকে। আর হাতে তুলে দেওয়া হল একটা চিঠি, ইংরেজ প্রতি নবাবের সবিনয় নিবেদন। চিঠির ভিতরে তিন দফা প্রস্তাব। এক, নতুন করে যে গড়বন্দির ব্যবস্থা করছো, সেটা বন্ধ করবে পত্রপাঠ। দুই, মারাঠা ডিচটা বুজিয়ে ফেলবে। তিন, কৃষ্ণদাসকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে মুর্শিদাবাদে।

নারান সিংহ কলকাতায় পৌঁছে সোজা গিয়ে উঠলেন উমিচাঁদের বাড়িতে। এখানে উমিচাঁদের খানিকটা পরিচয় দেওয়া দরকার। কেননা এখন থেকে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে আমাদের।

উমিচাঁদের অনেক নাম। কেউ লেখেন উমাচাঁদ। কোথাও আবার আমির চাঁদ বা আমিন চাঁদ। হাণ্টারের বইয়ে উমাচরণ। কেউ স্থির করেছেন আসল নামটা অমিচাঁদ।

"অমিচাঁদের নাম লইয়া একালে বিভ্রাট ঘটিয়াছে। স্বর্গীয় পণ্ডিত আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় বিশ্বকোষে প্রথম আমিরচাঁদ নামে ইহার উল্লেখ করেন। বৎসরেক পূর্বে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় লেখককে হাইকোর্টের রেকর্ড আফিসে

রক্ষিত একখানি উইলের কথা বলেন; সম্প্রতি তিনি উইল প্রকাশ করিতেছেন (সাহিত্য-সংহিতা, ১ম খণ্ড)। আত্মীয় সাক্ষীগণ জবানবন্দীতে তাঁহাকে আমিরচাঁদ বলিয়াছেন। মুতাক্ষরীণে আমিরচাঁদ রুড়ী আছে। পারসী 'ন' ও 'র' এর গোলযোগ হইতে পারে না। মুস্তাফা ও উর্দু অনুবাদক আমিনচাঁদ গ্রহণ করিয়াছেন। হলওয়েল প্রথম হইতেই 'Omychand' লিখিয়াছেন। পরবর্তী ইংরেজ লেখকদের হস্তে শেষে উমিচাঁদ দাঁড়াইয়াছে। হণ্টার উমাচরণ করিয়া কোন কোন লেখককে ভ্রমের পথে লইয়া গিয়াছেন। আমরা পরিচিত অমিচাঁদ নামেই উল্লেখ করিলাম।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

উমিচাঁদ সম্পর্কে লর্ড মেকলের মন্তব্য, 'ধূর্ত বাঙালী'। উমিচাঁদ কিন্তু বাঙালী নন। লাহোরের লোক। জাতিতে শিখ। বিহার থেকে বাংলাদেশে আসেন আলিবর্দীর সৈন্যদলে ভীড়ে। কলকাতায় এসে গোমস্তাগিরি করতেন শেঠদের বাড়িতে। তারপর নিজেই হয়ে উঠলেন কোম্পানীর দালাল। তারপর কোটিপতি হতে আর বেশী সময় লাগল না। তখন ধরলেন জাল-জুয়াচুরি। যে মালের নমুনা দেখান সে মাল যোগান দেন না। ওদিকে আবার দামটাও চড়া। একদিন ইংরেজদের কড়া নজরে ধরা পড়ে গেল এই কারসাজি। ১৭৫৩। ডিরেকটরদের হুকুম এল, দালালির পদটা তুলে দাও। তার বদলে রাখো গোমস্তা। যখন দেখলেন বিষয়-সম্পত্তি বেশ জবর রকম গোছানো হয়ে গেছে, উমিচাঁদ নামলেন রাজনীতিতে।

"উমিচাঁদকে 'বণিক' বলিয়া পরিচয় দিলে, সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাঁহার শতসৌধ-বিভূষিত বিচিত্র রাজপুরী, তাঁহার কুসুমদাম সজ্জিত সুবিখ্যাত পুষ্পোদ্যান, তাঁহার মণিমানিক্যখচিত রাজভাণ্ডার, তাঁহার সশস্ত্র সৈনিক বেষ্টিত সুগঠিত সিংহদ্বার দেখিয়া, অন্যের কথা দূরে থাকুক, ইংরাজেরাও তাঁহাকে একজন রাজা বলিয়া মনে করিতেন। শেঠদিগের মধ্যে যেমন জগৎ শেঠ, বণিকদের মধ্যে সেইরূপ উমিচাঁদ নবাব দরবারে সবিশেষ সুপরিচিত ও পদগৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। ...ইংরাজেরা উমিচাঁদের সহায়তা লাভ করিয়াই বাঙ্গলাদেশে বাণিজ্য-বিস্তারে সুবিধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার যোগে গ্রামে গ্রামে টাকা 'দাদন' করিয়া ইংরেজরা কার্পাস এবং পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জন করিতেন।" সিরাজদ্দৌলা।

নবাব পরিবারের সঙ্গে খাতির আছে বলেও ইংরেজরা বেশ তোয়াজ করতো উমিচাঁদকে। মধ্যস্থতা করে ইংরেজদের বিপদে-আপদে বাঁচিয়েছেও উমিচাঁদ। কিন্তু দালালি তুলে গোমস্তা রাখার সিদ্ধান্তের পর থেকেই উমিচাঁদের সঙ্গে

কোম্পানীর মনোমালিন্যটা ক্রমশঃ চেহারা নিচে লাগল পারস্পরিক অবিশ্বাস-এর।

নারান সিংহ উমিচাঁদের অট্টালিকায়। নারান সিংহের হাতে পাঠানো নবাবের চিঠি নিয়ে উমিচাঁদ হাজির হলেন ইংরেজ দরবারে। আর নারান সিংহ ছদ্মবেশে ঘুরতে লাগল শহরের এদিক ওদিক। কোথায় কি হচ্ছে, কে কি গড়ছে ভাঙছে, সব নিজের চোখে দেখতে হবে তো। ছদ্মবেশীকে পাকড়াও করলে ইংরেজরা। তারা ভাবলে লোকটা কারো চর। কোনও একটা দুরভিসন্ধি নিয়ে ঢুকেছে শহরে। গভর্ণর ড্রেক সাহেব হুকুম দিলেন, কান পাকড়ে লোকটাকে বের করে দাও কলকাতা থেকে। আর উমিচাঁদের হাত থেকে পাওয়া চিঠিটাকে তারা কোন আমলই দিলেন না। মিটিংয়ে বসে কাউন্সিলের কর্তারা ধরে নিলেন চিঠিখানা উমিচাঁদেরই চক্রান্ত। কারণ মাত্র কিছুদিন আগে কাশিমবাজার থেকে গোপন সংবাদ এসেছে, ঘসেটি বেগম এখনো আশা ছাড়েননি। এখনো শুকিয়ে যায়নি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার সব সম্ভাবনা। তাহলে সিরাজকে অত ভয় কিসের? এ চিঠির উত্তর না দিলেও চলবে।

কাউন্সিল কোন উত্তর দিল না। ড্রেক সাহেব নিজে একটা উত্তর দিয়ে দিলেন, কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ না করেই।

নারান সিংহকে কলকাতায় পাঠিয়ে সিরাজ পা বাড়ালেন তাঁর চতুর্থ দফা দায়িত্ব পালনের জন্যে পূর্ণিয়ার দিকে। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে বুঝিয়েছে, শওকতজঙ্গ শুরু করেছে বাড়াবাড়ি। স্বপ্ন দেখছে বাংলার সিংহাসনের। পিছন থেকে উস্কানি আছে ঘসেটি বেগমের আর রাজবল্লভের মত অকৃতজ্ঞদের। সুতরাং শওকতজঙ্গকে শিক্ষা দিতে হবে উচিত মতই।

মুর্শিদাবাদ ছাড়ার আগে গভর্ণর ড্রেক সাহেবকে লিখে পাঠালেন আরো একটা চিঠি। পত্রপাঠ কলকাতার দুর্গটিকে না ভাঙ্গলে, আমি নিজে গিয়ে ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো ভাগিরথীর জলে। পূর্ণিয়া যাবার পথে রাজমহলে পৌছবেন সিরাজ। সেই সময়ে নবাবের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কলকাতা থেকে তাড়া খাওয়া নারান সিংহ।

—হুঁজুর, জাঁহাপনা! আমাদের মান-ইজ্জত সব গেল। কতকগুলো ক্ষুদে ব্যবসায়ী, যারা কিনা এখনো জলশৌচ করতে শেখেনি, তারা অপমান করতে সাহস পায় নবাবের দূতকে?

"Narayan Singh arrived at the Nawab's camp when he was at Rajmahal, cast his turban down on the ground and said,

"what honour is left to us, when a few traders, who have not yet learnt to wash their bottoms (hamoz bakun-shustan Khogar nashuda), reply to the ruler's order by expelling his envoy". Bengal Nawab.

সিরাজ জ্বলে উঠলেন দাউ-দাউ করে। এবং সেই আগুনে ঘি জোগালেন ফখর-উল-তোজার অর্থাৎ খোজা বাজিদ। ওটা তাঁর উপাধি। আলিবর্দীর কাছ থেকে পাওয়া। খোজা বাজিদও উমিচাঁদের মত ইংরেজদের উপর হাটে চটা। তিনি ইংরেজদের হাল-চালের বিরুদ্ধে হাজার রকম গাওনাকি গাইলেন সিরাজের কানের কাছে।

আর ঠিক সেই সময়েই তাঁর হাতে এসে পৌছল ড্রেক সাহেবের চিঠি। তাকে লেখা – তারা কেল্লা বানাচ্ছে নতুন করে, এটা আগাগোড়া মিথ্যে কথা। পুরনো দুর্গটাকেই একটু একটু মেজে-ঘসে সাফ করা হচ্ছে। কারণ ফরাসীরা যে কোনও দিন আক্রমণ করতে পারে কলকাতা। তাই নতুন করে কামানগুলো পাততে হবে তো। ইত্যাদি ইত্যাদি।

গর্জে উঠল সিরাজদ্দৌলার হুকুম। পূর্ণিয়া নয়, চলো কাশিমবাজার।

১৭৫৬। ২৭ মে। সোমবার।

জমাদার উমরবেগের নেতৃত্বে তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য হাজির হল কাশিমবাজারে। ভোর হতে না হতেই আরো দুশো অশ্বারোহী। সেই সঙ্গে বেশ কিছু বরকন্দাজ এসে জমা হল উমরবেগের শিবিরে। কাশিমবাজার কুঠীর ইংরেজরা চমকে উঠলেন ভয়ে। কি ব্যাপার ? চতুর্দিকে এমন রণসাজ কিসের ? বাতাসে যেন একটা যুদ্ধ যুদ্ধ গন্ধ ! তাহলে কি নবাবের রাজদূতকে তাড়ানোর প্রতিশোধ নিতে এসেছে নাকি নবাবী সৈন্যরা ? কাশিমবাজার কুঠীর সাহেবেরা নড়ে চড়ে বসলেন। কি করা যায় ? দুর্গদ্বারটাকে অবশ্যই আটকাতে হবে সবার আগে।

"তখন দূর্গমধ্যে কেবল ৩৫ জন কালা সিপাহী, আর জনা কতক লস্কর ভিন্ন সেনাদল ছিল না। তাহারাই অগত্যা তুরী ভেরী বাজাইয়া, শিরস্ত্রাণ বাঁধিয়া, কোমরবন্ধ আঁটিয়া, তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে, বন্দুকের উপর সঙ্গীন চড়াইয়া সগর্বে সিংহদ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সিপাহীরা সেদিনও দুর্গ আক্রমণের কোনরূপ আয়োজন করিল না। বরং জমাদার উমরবেগ নথাগ্রগণনীয় ইংরাজ সেনাগণকে সগর্ব্ব পদচালনা করিতে দেখিয়া, সূচনাতেই বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যুদ্ধ করিতে আসেন নাই। সে কথায় কেহ কর্ণপাত

করিল না। ওয়াটস্ সাহেব আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ে সমুদয় রজনী অন্নপান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; অগণিত নবাবসেনা বাহুবলে দুর্গ আক্রমণ করিলে, তাঁহারাও বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিবেন না, তাহারই আভাস প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বড় বড় কামানগুলি গোলা বারুদ বোঝাই করিয়া, আক্রমণ প্রতীক্ষায় সিংহদ্বার রোধ করিয়া সসৈন্যে আক্রমণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।" সিরাজদ্দৌলা।

উমরবেগ যে জানাল, আমরা আক্রমণ করতে আসিনি, তার কারণ উমরবেগ সত্যিই জানতো না সিরাজের সত্যিকারের ইচ্ছেটা কি।

"Omar Beg, one of the Nowab's officer, thought even up to the last that the Nrwab merely intended to frighten the English and that all would be put right at Calcutta, According to Seir Mutagherin Seraj-ud-daula treated his officers so badly that they were quite indifferent as to what might happen." The House of Jagatseth.

সোম, মঙ্গল, বুধ তিন দিন চলে গেল। সৈন্য, সামন্ত, কামান, বন্দুক সবই প্রস্তুত। অথচ যুদ্ধ আর ঘটে না। ইংরেজরা হতবাক। একি ব্যাপার? নবাবের মতলবটা কি? উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে ওয়াটস্ ডাক্তার ফোর্থকে পাঠালেন উমরবেগের কাছে। উমরবেগের কাছ থেকে ফিরে এসে ডাক্তার ফোর্থ জানালেন আসল ঘটনা। ওয়াটসকে যেতে হবে নবাবের দরবারে। গিয়ে সই করতে হবে মুচলেকা-নামায়। যদি সহজে যেতে রাজী না হন, তার জন্যেই এত সৈন্য-সাবুদ।

ওয়াটস সব শুনলেন, কিন্তু সবটাই বিশ্বাস করলেন না। উমরবেগের চালাকি নেই তো এর মধ্যে? ওয়াটস ঠিক করলেন, ডালপালার কথায় কান না দিয়ে একদম মূল শিকড়ের কাছেই পৌছান যাক। ওয়াটস চিঠি লিখলেন নবাবকে। আপনার অভিপ্রায় জানতে আমরা ইচ্ছুক। আপনি যা বলবেন, তাতেই আমরা সম্মত হবো। উত্তর এল নবাবের কাছ থেকে। দুর্গ ভেঙ্গে ফেল। ওয়াটসের মাথায় হাত। তাই কথনো হয় নাকি? দুর্গ ভাঙতে বললেই ভাঙা যায়? তাহলে বাঁচার রাস্তা? ওয়াটস ধরলেন রায়দুর্লভকে। আপনি একটা বিহিত করুন।

রায়দুর্লভ বা দুর্লভরাম রাজা জানকীরায়ের ছেলে। পদবী সোম। চুঁচড়োর কায়স্থ সোম বংশে জন্ম। জানকীরায় ছিলেন আলিবর্দীর বিশ্বস্ত কর্মচারী। রায়দুর্লভ আলিবর্দীর আমলে ছিলেন সেনা বিভাগের দেওয়ান। একসময়ে

মহারাজা নন্দকুমার কাজ করতেন তাঁর অধীনে পেশকার হিসেবে। রায়দুর্লভ বোঝালেন, সোজাসুজি গিয়ে নবাবের সঙ্গে দেখা করুন। মিটে যাবে। ওয়াটস ভেবেছিলেন, রায়দুর্লভ বলবেন অন্য কথা। কিছু উৎকোচ-উপঢৌকনের পরামর্শ। তাতো কেউ উচ্চবাচ্য করছে না। না রায়দুর্লভ, না জগৎশেঠ। তাহলে কি ব্যাপারটা সত্যিই খুব গুরুতর?

অগত্যা ওয়াটস হাজির হলেন নবাবের দরবারে। প্রথমেই তো সিরাজ ওয়াটসকে একচোট নিলেন ইংরেজদের উদ্ধত-দুর্বিনীত ব্যবহারের জন্যে। ওয়াটস সিরাজের সেই অগ্নিমূর্তি দেখে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। তারপরই সিরাজ এগিয়ে দিলেন মুচলেকা-নামা। বাধ্য হয়ে, সুবোধ বালকের মত ওয়াটস সই করলেন সেটাতে। তাতে ছিল –

১। কলকাতার পেরিন দুর্গ ভাঙতে হবে।

২। যে সব বিশ্বাসঘাতক রাজ-কর্মচারী রাজদণ্ড থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে কলকাতায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকে, তাদের নবাবের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

৩। বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার ফরমান দেখিয়ে কোম্পানীর লোকজনের ব্যক্তিগত ব্যবসা চলবে না। এবং এই ব্যবসার ফলে রাজকোষের যে ক্ষতি হচ্ছে তা পূরণ করতে হবে।

৪। কলকাতার জমিদার হলওয়েল সাহেব দেশীয় প্রজাদের উপর নানান রকম নির্যাতন করে চলেছেন। সেগুলো বন্ধ করতে হবে।

মুচলেকা-নামা সই করার সঙ্গে সঙ্গে নাকি বন্দী করা হল ওয়াটস এবং তাঁর সঙ্গী ম্যাথিউ কলেটকে, এবং সেই সময়েই, নবাবের ইঙ্গিতে রায়দুর্লভ কাশিম-বাজার কুঠীর যাবতীয় মালপত্তর, কামান বন্দুক সব দখল করে নিলেন।

সে ঘটনার তারিখটা কবে? তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পলাশীর যুদ্ধে ২৪ মে। অক্ষয় মৈত্রের সিরাজদ্দৌলায় ৪ জুন।

এর পরেই সিরাজ ঘোষণা করলেন, যাবেন কলকাতা দখল করতে। চমকে উঠল পাত্রমিত্রের দল। কেন? কলকাতা দখল করার কি দরকার? যুদ্ধের এমন কি জরুরী প্রয়োজন? কলকাতার গভর্ণর ড্রেক সাহেবকে মুর্শিদাবাদে ডেকে এনে একটু ধমক দিলেই তো সব ঠিক হয়ে যাবে। ওয়াটস-এর সইকরা মুচলেকা-নামার শর্তগুলো মানতে বাধ্য হবে ঘাড় হেঁট করে।

সিরাজ জননীও কলকাতা আক্রমণের বিপক্ষে। তিনিও বোঝালেন ছেলেকে। কিন্তু কাজ হল না। সিরাজ কেবল পালন করলেন মায়ের অন্য

একটি অনুরোধ। সেটা হল ওয়াটসের মুক্তি। বিবি ওয়াটস-এর সঙ্গে আমিনা বেগমের চেনাজানা ছিল। তাঁর আসা-যাওয়া ছিল বেগম মহলে। সেই সূত্রেই তিনি বেগম সাহেবাকে কান্নাকাটি করে ভেজালেন।

যুদ্ধযাত্রায় আপত্তি ছিল জগৎশেঠ ভ্রাতাদেরও। সিরাজ তাদের কথাতেও কান দিলেন না। উল্টে শোনালেন কেন তাঁর ইংরেজদের উপর এতখানি ক্রোধ এবং জ্বালা তারই নানান ঘটনা। তার মধ্যে একটা হল এই রকম—

একদিন আমি আমার মাকে নিয়ে এদের একটা ফ্যাকটরীর ভিতরে ঢুকতে চেয়েছিলাম। ফ্যাকটরীর কর্তা আমাদের ঢুকতে দেয়নি। সে বেদনা এবং অপমান আমি কোনদিন ভুলব না। ওটা ভোলার নয়।

জগৎশেঠদের প্রস্তাব তো সিরাজ মানলেন না। উল্টে তাঁদেরই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করলেন এই বলে যে, তাঁরা যেন ইংরেজদের কোনো ব্যাপারে আর মাথা না গলান।

"He exacted an oath from jagatseat (who had always acted as mediator between the government and the Europeans) not to interfere or offer any argument to make him alter his mind. After this, no one dared to plead for the unfortunate English." The House of Jagatseth.

সিরাজ কলকাতা আক্রমণে এতখানি উৎসাহী হয়ে উঠলেন কেন? এ নিয়ে নানা ইতিহাসে নানা মত। কেউ মনে করেন ইংরেজদের আচার-আচরণের বিরুদ্ধে তাঁর সহজাত বা স্বাভাবিক ক্রোধ। কেউ মনে করেন পরিষদবর্গের কান-ভাঙানো পরামর্শ।

"Fakhr-ut-tujar, had assured the Nawab that three krors of Rupees could be taken at Calcutta and there were not more than 200 Englishmen in that Kuthi. Mr. Md. Jafar Khan, in eagerness to secure the post of Bakhshi which the Nawab had promised to him confirmed the words of Fakhar-ut-Tujar." Bengal Nawabs

সিরাজ বেরিয়ে পড়লেন কলকাতা অভিযানে। সঙ্গে ত্রিশ হাজার সৈন্য। কামান বন্দুক। ফরাসীরা নবাবকে জুগিয়েছিল বারুদ। যুদ্ধের নেশায় ছুটে চলল সৈন্যরা, কুচকাওয়াজের তালে তালে। তার সঙ্গে মুখে মুখে গান—

"নবাব বাহাদুর কা ফৌজ
যৈসি খোলা তলোয়ার
ঘাড় ভরমে জিত লিয়া
কেল্লা কলকাতা বাজার।"

সৈন্য-সামন্ত ছাড়াও সঙ্গে রয়েছে সেনাপতির দল। মীরজাফর, রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদ, মীরমদন প্রভৃতি। আর আছে ওয়াটস এবং কলেট। বিবি ওয়াটকে রেখে আসা হয়েছে ফরাসি কুঠীর অধ্যক্ষ জাঁল সাহেবের জিম্মায়। অভিযানতো শুরু। কিন্তু তারিখটা কবে? কোনো বইয়ে ৫ই জুন। কোনো বইয়ে ৯। 'সিরাজদ্দৌলা'য় তারিখ বোঝা মুশকিল। সেখানে রয়েছে "৭ই জুন প্রাতঃকালে কলিকাতার ইংরেজ সওদাগরেরা সংবাদ পাইলেন যে, কাশিমবাজার নবাবের হস্তগত হইয়াছে; স্বয়ং সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন।"

এবার চোখ ফেরানো যাক কলকাতায়। আত্মরক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে ইংরেজরা কি করছে সেই দিকে।

কলকাতায় ইংরেজের সৈন্য সংখ্যা তখন ২৭৫। তার মধ্যে ৭০ জন নাকি অসুস্থ। আর ২৫ জন রয়ে গেছে মফঃস্বলে। তার মধ্যে ৪১ জন খাস য়ুরোপের। যাদের বলে গোরা সৈন্য। বাকীরা ফিরিঙ্গী, আরমানী ইত্যাদি। এদের মধ্যে অনেকেই বন্দুক ধরতেই জানে না, ছোঁড়া তো দূরের কথা। ঢাল-তরোয়াল হাতে নিয়েও নিধিরাম সর্দার এক একজন। রাতারাতি সৈন্য সংগ্রহ করা হল বেশ কিছু। পাওয়া গেল কিছু ইংরেজ ভলান্টিয়ার। তার সংখ্যা, অর্মির হিসেবে ১৭৪। অন্য মতে ২৫০। জাহাজি গোরাদেরও টেনে আনা হল সৈন্য দলে। ফরাসী, ডাচ সব মিলিয়ে সৈন্য সংখ্যা বাড়ল ৫১৫ জন। ফৌজ-এর ক্যাপটেন তখন জর্জ মিন্‌সিন। জীবনে কখনো যুদ্ধ করেননি তিনি। যুদ্ধের নামটুকু শুনেছেন কেবল। তাতেই সেনাপতি। ডাচদের কাছে সাহায্য চাইল ইংরেজেরা। নবাবের ভয়ে তারা কোন উত্তর দিল না। ফরাসীদের কাছে হাত পাতা হল। তারা বললে, আমাদের লোক কলকাতায় যেতে পারবে না। পারলে তোমরাই বরং চলে এসো চন্দননগরে। ইংরেজরা তখন বললে, ঠিক আছে, সৈন্য-সামন্ত দরকার নেই। কিছু গোলা বারুদ দাও, গোলা-বারুদ? হ্যাঁ, তা দিতে পারি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পাঠাচ্ছি, পাঠাচ্ছি করে দিন চলে গেল। এক ছটাকও সাহায্য এসে পৌছলো না ফরাসীদের কাছ থেকে।

চিঠি পাঠানো হল মাদ্রাজে। এখুনি সৈন্য পাঠাও জাহাজ বোঝাই করে। কিন্তু যেতে যেতেই অনেক সময় লেগে গেল সে চিঠির। একদিকে চলেছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। অন্যদিকে চলেছে নবাবের মন ভেজানোর ব্যবস্থা। ইংরেজদের মনে তখনও খানিকটা ক্ষীণ আশা ছিল। উৎকোচ দিয়ে ঠাণ্ডা করা যাবে নবাবের বজ্রগর্জন। খোজা ওয়াজেদ হুগলীর একজন নামকরা সদাগর।

তাকে পাঠানো হল, টাকার অঙ্কটা রফা করতে। খোজা ওয়াজেদ ফিরে এলেন শুকনো মুখে। কি ব্যাপার? ব্যাপার গুরুতর। টাকা পয়সা দিয়ে নবাবকে এবার আটকানো যাবে না। তিনি এখন কৃষ্ণনগর পেরিয়ে কলকাতার দিকে।

ড্রেক সাহেবের টনক নড়ল। আর দেরী করা নয়। কামান সাজাও। মাস দুয়েকের মত খাবার-দাবার সংগ্রহ করে মজুত রাখো কেল্লায়।

কেল্লা তো নামেই। কবেকার পুরনো। ঘুণ ধরে গেছে হাড়ে-মাসে। মেরামতি হয়নি বহুকাল। কেল্লার বুরুজের উপরে যে কামান, সেগুলোর গায়েও মরচের পুরু জং। যত্ন-আত্তি করেনি কেউ। যুদ্ধও তো ঘটেনি কোনদিন। তাই এমন দুরবস্থা। ওদিকে আবার তোপখানায় বারুদও বাড়ন্ত। কেল্লার পল্‌কা দেয়ালের উপরে নতুন করে ভারী ভারী কামান বসানোও সম্ভব নয়। যে কোন মুহূর্তে দেওয়াল ধ্বসে পড়তে পারে। তখন শহর জুড়ে ধাপে ধাপে বসানো হল তোপমঞ্চ। ওল্ড কোর্ট হাউসের কাছে তৈরী করা হল দুটো তোপমঞ্চ। ক্লাইভ স্ট্রীটে একটা। লালবাজারের কাছাকাছি একটা। হেষ্টিংস স্ট্রীটে একটা। এ ছাড়া বাগবাজারে পেরিন সাহেবের বাগানের উত্তর দিকে একটা। এটা অবশ্য আগে থেকেই ছোটোখাটো দুর্গের আকারে তৈরী হচ্ছিল। যার খবর পেয়েই নবাবের এত রাগ। পেরিন পয়েন্টের সেনাপতি হলেন এডওয়ার্ড পিকার্ড। সঙ্গে ২৫ জন সৈন্য। আর যথেষ্ট পরিমাণ কামান-বন্দুক, গোলা-বারুদ।

মোটামুটি যখন আত্মরক্ষার একটা ভালরকম ব্যবস্থা হয়ে গেছে, সেই সময় এক আচমকা বীরত্বে নেচে উঠল কিছু কিছু বীর ইংরেজের হৃদয়। কানে খবর পৌঁচেছে, সিরাজ প্রায় পেরিয়ে এসেছেন আধখানা পথ। এই সময় তাঁকে একবার ভয় পাইয়ে দিতে হবে। সিরাজকে সমঝে দিতে হবে, দেখো হে দেখো, কত বড় বীর আমরা। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ-টুদ্ধ করে স্থবিধে হবে না।

১৩ জুন। সবে ভোর হয়েছে। চারখানা যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ইংরেজরা। জাহাজ চলল ভাগিরথীর পশ্চিম কিনারের দিকে মুখ করে। কি আছে ওখানে? আছে টানা অথবা থানা নামের দুর্গ। এখন যেখান বোটানিক্যাল গার্ডেন, ঐখানেই ছিল দুর্গটা। আকারে মোটেই বড় সড় নয়। ১৩টা কামান। ৫০ জন সেপাই। জলপথে শত্রুদের আটকানোর জন্যে একটা ব্যবস্থা হিসেবে। বহুদিন যুদ্ধ-দাঙ্গা নেই। দুর্গের সেপাইরা মনের স্থখে ঘুমোচ্ছে। সেই সময়ে গর্জে উঠল ইংরেজদের কামান। দুর্গের দেয়ালে আছড়ে পড়তে লাগল গোলা। হঠাৎ আক্রমণে হতচকিত সেপাইরা কি করবে না-করবে কুল-কিনারা পেল না

এরপর তেসরা দফার কাণ্ডকারখানা।

নবাব কলকাতা আক্রমণ করতে আসছেন শুনে কলকাতার মানুষ পালাতে লাগল ঘর বাড়ি ছেড়ে। পালাতে লাগল ইংরেজ পরিবারের দিশি চাকর-বাকরের দল। পালাতে লাগল সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরাও। সংখ্যায় তারা অনেক। এক আধ হাজার নয়। প্রায় ৫০ হাজারের মত লোক কলকাতা ছেড়ে যে যেদিকে পারলে পালাল। দিশী পাড়া বলতে গেলে একদম ফাঁকা। রয়ে গেল মাত্র দু-চার ঘর। তার মধ্যে প্রধান হলেন কলকাতার কালা-জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র। তিনি ভেবেছিলেন, নবাব আসছেন সত্যিকারের যুদ্ধ করতে নয়, নিছক ভয় দেখাতে। তাই তাঁর নিজের বুকে ভয় ঢোকে নি তখনও। গোবিন্দরাম ছাড়া আরো রয়ে গিয়েছিলেন ১২ জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শুকদেব মল্লিক, শোভারাম বসাক, রতন সরকার, নয়নচাঁদ মল্লিক ইত্যাদি। এঁদের কথা পরে পরে জানা যাবে আরো।

দিশী পাড়াটা যখন প্রায় ফাঁকা, ইংরেজরা ভাবলে, একে বাঁচাতে যাওয়া মানে পণ্ডশ্রম এবং মুখ্যমি। সুতরাং দাও আগুন লাগিয়ে। পুড়তে লাগল খড়ের চালা, মাটির বাড়িগুলো, দাউ দাউ আগুনে।

১৫ জুন। কলকাতায় খবর এল সিরাজদ্দৌলা সৈন্য সামন্ত নিয়ে হুগলীর কাছে নদী পেরিয়ে উঠেছেন গঙ্গার এপারে। বসে গেল কাউন্সিলের মিটিং। মাদ্রাজে আবার চিঠি গেল, সৈন্য পাঠান। কাউন্সিল ভাবলে যদি নবাবকে মাস দেড়েক ঠেকিয়ে রাখা যায়, তাহলেই কেল্লা ফতে। কেননা তখন মাদ্রাজের সৈন্যরা এসে যাবে। মেটানো যাবে নবাবের যুদ্ধ করার সখ।

নবাব হুগলী পেরিয়েছেন খবরটা সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সাহেব পাড়ায়। ঘরে ঘরে আর্তনাদ করে উঠলেন বিবিরা। অগত্যা মেমসাহেবদের বাঁচানোর জন্যে দুর্গের মধ্যে ব্যবস্থা করা হল আশ্রয়ের। দুর্গের ভিতরটা ভরে গেল মেমসাহেব আর তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের চেল্লাচিল্লিতে।

১৬ জুন। নবাব এসে থামলেন বরানগরের কাছে। একদল সৈন্য সহ মীরজাফর এগিয়ে এলেন চীৎপুর খালের ধারে। ইচ্ছে ছিল ঐখান দিয়েই কলকাতায় ঢোকা। তাছাড়া অন্য রাস্তা জানাও নেই কারো। কিন্তু সমস্যা হল খালের সাঁকো পেরোনো নিয়ে। অতটুকু সরু সাঁকোর উপর দিয়ে এত সব হাতী ঘোড়া কামান বন্দুক পার করানো সম্ভব নয়। অগত্যা ঐখানেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত। কিন্তু রাত হতে না হতেই পেরিন পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে গেল আক্রমণ, পিকার্ড সাহেবের নেতৃত্বে। নবাবী-সৈন্য মারা পড়ল অনেক।

হতবুদ্ধি মীরজাফর পিছু হটতে হটতে পালিয়ে গেলেন দমদমের দিকে। যুদ্ধের প্রথম দফায় ইংরেজরা জিতে গেল।

নবাবের মনে চিন্তা, কলকাতায় তাহলে ঢুকবেন কি করে? সেই সময় দেখা দিল উদ্ধারকারী। খানিক আগে আমরা জগন্নাথ সিং নামে উমিচাঁদের যে জমাদারের কাহিনী শুনেছি, তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মারা যাননি। ইংরেজদের কড়া নজর এড়িয়ে তিনি এসে হাজির হলেন নবাবের ছাউনীতে। তিনিই সিরাজকে জানিয়ে দিলেন শহরে ঢোকার দু-দুটো রাস্তা। একটা টালার কাছ দিয়ে। আর একটা শিয়ালদা-র কাছে মারাঠা ডিচ দিয়ে।

তাই হল। নবাবী সৈন্য ঢুকে পড়ল কলকাতায়, মারাঠা ডিচ-এর নীচু সাঁকো পেরিয়ে। শহরে ঢুকেই সৈন্যরা নাকি ছুটে গিয়েছিল বড়বাজারের দিকে। এবং সেখানে যে-কটা অক্ষত বাড়িঘর ছিল সেগুলো পুড়িয়ে, জিনিষপত্র লুটপাট করে নিল সৈন্যরা। নবাব আশ্রয় নিলেন হালসীবাগানে, উমিচাঁদের বাগান বাড়িতে।

পরের দিন ১৮ জুন। শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। যুদ্ধটা প্রথম শুরু হল লালবাজারে। দিশী পাড়া পার হয়ে সাহেব পাড়ায় মাথা গলাতে গেলে, লালবাজারে আসতেই হবে। তাই ইংরেজরা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লালবাজারের কাছাকাছি তোপখানায়। লালবাজারে ঢোকার মুখে ইংরেজদের ছেড়ে যাওয়া শূন্য বাড়ি ঘরগুলো দখল করে নিয়ে তার ভিতর থেকে নবাবের সৈন্যরা গুলি চালাতে লাগল। ইংরেজদের তোপমঞ্চ কামান দাগতে লাগল বটে ঘন ঘন, কিন্তু সেগুলো আঘাত করতে লাগল ভুল জায়গায়। সামনেই বড় বড় বাড়ি। তার দেয়ালে আটকাতে লাগল গোলাগুলো। লোক মরতে লাগল ইংরেজদেরই বেশী। লালবাজার তোপমঞ্চের অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন ডেভিড ক্লেটন। তিনি বুঝলেন, যে-ভাবে পটপট করে সৈন্যরা মরছে, তাতে আর যুদ্ধ করা চলে না। প্রাণভয়ে এখন সবাই মেয়র্স কোর্টের দিকে পালাচ্ছে। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা অবস্থা সৈন্যদের। ক্লেটনের নীচে হলওয়েল। তিনি হলওয়েলকে ডেকে বললেন, গভর্ণরকে খবর দিন। এ ঘাঁটি আর রক্ষা করা যাবে না। যদি বাঁচাতে হয়, সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্র-শস্ত্র দরকার। হলওয়েল ছুটলেন ড্রেক সাহেবের কাছে।

"কিন্তু হলওয়েলের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আর কাপ্তেন সাহেব অপেক্ষা করিলেন না। তিনি কামানের ছিদ্র রোধ করিয়া পলায়নপর হইলেন। নবাব সৈন্য মহোল্লাসে পূর্ব তোপমঞ্চ অধিকার করিল। অপর দুটি তোপমঞ্চ রক্ষকদেরও

ঐ দশা ঘটিল। সকলেই কায়ক্লেশে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া হাঁফ ছাড়িলেন।… আর্মানী ও ফিরিঙ্গী সখের সৈন্যগণের প্রাণভয়ে হৃদপিণ্ড শুকাইল।……এইরূপে প্রথম দিনেই দুর্গের বহির্ভাগ নবাব-সৈন্যের করকবলিত হওয়ায়, দুর্গবাসিগণের মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। দুর্গের সম্মুখে ভাগিরথীগর্ভে একখানি বৃহৎ ও সাতখানি ক্ষুদ্র জাহাজ ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় ডিঙ্গি নৌকাও প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। রজনীযোগে ইংরাজ মহিলাগণকে জাহাজে পাঠাইবার পরামর্শ হইল।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

ম্যানিংহাম আর ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড এই দুজন সাহেবের উপর ভার পড়েছিল, মহিলাদের জাহাজে পৌঁছে দিয়ে আসার। তাঁরা রমণীকুলকে জাহাজে তুলে দিয়ে, নিজেরাও আর নামলেন না। রমণীসুলভ আতংকে, রয়ে গেলেন রমণীদের আড়ালেই। তাঁদের চেয়ে আরো সাহসী যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি মিন্‌সিন। তিনি অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চেপে বসলেন জাহাজে নয়, একটা ছোট্ট ডিঙ্গিতে।

রাত দুটো। সামরিক সভার মিটিঙ বসে গেল। নীচু তলার সৈন্যরা ছাড়া আর সকলেই হাজির। প্রশ্ন উঠল, কি করা উচিত? একটা উত্তরেই একমত হলেন সকলে। কলকাতা ছেড়ে পালানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ। দুর্গটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা মানেই আরো লোকক্ষয়। এবং বাঁচানোর আশাটাও দুরাশা। তবে পালানোর সময় তহবিলের টাকা-পয়সাটার দিকে যেন নজর রাখা হয়।

পালানোর প্রস্তাবটাই গ্রহণ করা হল। কিন্তু কখন পালাতে হবে, কিভাবে পালাতে হবে, সে সব খুঁটিনাটি রয়ে গেল আলোচনার বাইরে।

"নদীতীরে যে সকল ডিঙ্গী-নৌকা বাঁধা ছিল, তাহার অনেকগুলিই রাতারাতি চলিয়া গিয়াছিল। পর্তুগীজ রমণী ও বালক-বালিকাদিগকে জাহাজে উঠাইবার জন্য প্রভাতে গুপ্তদ্বার উন্মোচন করিবামাত্র, ভাগিরথী তীরে মহাকলরব উপস্থিত হইল। সে কলরবে কেহ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিবার অবসর পাইল না; সকলেই সর্ব্বাগ্রে জাহাজে উঠিয়া পলায়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহাতে যাহা হইবার তাহাই হইল; কেহ কেহ ডিঙ্গী উল্টাইয়া জলমগ্ন হইল, কেহ কেহ নবাব শিবিরের তীরন্দাজদিগের হাতে দেহত্যাগ করিল, কেহ বা কায়ক্লেশে জাহাজে উঠিবামাত্র, নোঙ্গর তুলিয়া জাহাজখানি অবলীলাক্রমে ভাসিয়া চলিল।…যাঁহারা পলায়নের অবসর না পাইয়া দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ রহিলেন, তাঁহারা তাড়াতাড়ি দ্বাররোধ করিয়া পলায়িত

বন্ধুদিগের নামোল্লেখ করিয়া নানারূপে হৃদয়-বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।” সিরাজদ্দৌলা।

গভর্ণর ড্রেক সাহেবও পালিয়েছেন। কলকাতা প্রায় নেতাহীন। সবাই যখন পলাতক, তখন সেনাপতি হবে কে? যারা পলাতক নন, তারা বললেন একজনই আছেন। কে তিনি? হলওয়েল। হলওয়েল বয়সে বড় ঠিকই। কিন্তু কাউন্সিলে তাঁর পদমর্যাদাটা খুব বড় মাপের ছিল না। দুর্গের মধ্যে তাঁর চেয়েও সিনিয়র ছিলেন অন্য একজন। হলওয়েল বললেন, রাজী আছি, তবে আমার উপর কারো খবরদারি করা চলবে না। রাজী হল সবাই। হলওয়েল একই সঙ্গে হয়ে গেলেন কলকাতার গভর্ণর আর সেনাপতি। সেনাপতি হয়েই হলওয়েল হুকুম জারি করলেন, যেখানে যত সৈন্য আছে, সবাইকে এনে জড়ো করো দুর্গে। সৈন্যরা এল। কিন্তু কারোর মধ্যে কোনো রকম উৎসাহ-উদ্যম নেই। সকলেই বুঝে গেছে, পরাজয় এবং প্রাণনাশ অবধারিত। অতএব মদ খাও আর বুঁদ হয়ে পড়ে থাকো।

১৯ জুন এইভাবে কাটল। রাত্রে নবাবী সৈন্য আগুন লাগাতে লাগল কেল্লার আশেপাশের বাড়িগুলোয়। আগুনের আলোয় রাঙা হয়ে উঠল কলকাতার আকাশ।

২০ জুন নবাবী সৈন্য একটু একটু করে এগিয়ে এসে তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলল দুর্গ। যুদ্ধটাও জমে উঠল হঠাৎ। গোড়ার দিকে কাবু হল নবাবী-সৈন্যরা। পরে ইংরেজ সৈন্যরাই মরতে লাগল বেশী। তখন সবাই মিলে হলওয়েলকে চাপ দিতে লাগলেন আত্মসমর্পণের জন্যে। দুপুর বারোটার সময় যুদ্ধের ঝাপটা খানিকটা কমলে, হলওয়েলের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আরে, উমিচাঁদতো রয়েছে দুর্গে। তাকে ধরেই তো সন্ধির একটা ফয়শালা করা যায়। হলওয়েল গিয়ে হাজির হলেন বন্দী উমিচাঁদের কাছে। কাকুতি-মিনতির এক শেষ। যেভাবে পারেন আমাদের বাঁচান।

উমিচাঁদ না-না করেও রাজী হলেন শেষ পর্যন্ত। চিঠি লেখা হল সেনাপতি মানিকচাঁদকে উদ্দেশ্য করে। যুদ্ধ বন্ধ করা হোক। নবাবের যে-কোন আদেশ ইংরেজরা মানতে রাজী।

বেলা তখন দুটো। কারো কারো মতে চারটে। সেই সময় দেখা গেল নবাব পক্ষের একজন সৈন্য এগিয়ে আসছে সন্ধির পতাকা উড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকেও উড়িয়ে দেওয়া হল শান্তির পতাকা। ইতিমধ্যে ঘটে গেল একটা কাণ্ড। একদল ডাচ পল্টন পালাবার জন্যে ছটফটিয়ে ভেঙে

ফেলল পশ্চিম দিকের দুর্গদ্বার। ঐ দরজা দিয়ে দুর্গ থেকে গঙ্গার ঘাটে যাওয়া যায়। আর সেই খোলা দুর্গদ্বার দিয়ে প্রচুর নবাবী-সৈন্য ঢুকে পড়ল দুর্গে। হলওয়েল তখনও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু নবাবের সৈনাধ্যক্ষ জানালে, অস্ত্র ফেলে দিলে. তাদের শাস্তি দেওয়া হবে না। হলওয়েল অস্ত্র ত্যাগ করলেন। যুদ্ধ থেমে গেল।

"নবাব-সৈন্যও রক্তপাতে বিরত হইল। লুণ্ঠন চলিতে লাগিল। ইংরাজগণের ঘড়ি, গগলস, বোতামও বাদ পড়িল না। ২০ জন লোক উত্তর-পূর্ব বুরুজ দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ ধৃত ও অন্যে পলায়িত হইল। এক্ষণে অন্য সকলেই বন্দীভাবে রহিল। বণিক কোম্পানীর দুর্গশিরে নবাবের অর্ধ-চন্দ্র শোভিত বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইল।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

বিকেল ৫টা। একটা চতুর্দোলা এগিয়ে আসছে দুর্গের দিকে। ইংরেজদের কানে খবর গেল আসছেন নবাব সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং। সঙ্গে পাত্র-মিত্র-সভাসদরা। আর আছেন সেনাপতি মীরজাফর। হলওয়েল ছুটে এসে ফোর্টের দেওয়ালে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকলেন। দুর্গে পৌঁছে, দরবারের আসনে বসেই নবাব খোঁজ করলেন দুই বন্দীর। একজন কৃষ্ণবল্লভ, আরেকজন উমিচাঁদ। খানিক পরে দুজনেই সামনে এসে দাঁড়ালেন নবাবের। দুজনকেই সাদর সম্ভাষণ জানালেন সিরাজ। দুজনকেই দিলেন শিরোপা। মুক্তি পেল দুই বন্দীই। এরপর ডাক পড়ল ইংরেজ বন্দীদের। তাদের মধ্যে হলওয়েল একজন। বেশ কিছু বন্দীকে সিরাজ তখুনি মুক্ত করে দিলেন। তারা অবশ্য বেশীর ভাগ পর্তুগীজ আর ডাচ। মুক্তি পেলেন হলওয়েলও। সিরাজ বললেন, তোমাদের উদ্ধত ব্যবহারের জন্যেই আজ তোমাদের এই দুর্গতি। তোমরাই জেদ করে আমাকে যুদ্ধে নামিয়ে এমন সুন্দর শহরটাকে ধ্বংস করালে।

দরবারে বসেই নবাব মানিকচাঁদের হাতে তুলে দিলেন দুর্গের শাসনভার। ঐ সময়েই কোষাগারের দখল নিয়ে নিলেন নবাব। কোষাগার থেকে হাতে এল নগদ ৪০ হাজার টাকা। দরবার ভাঙল। মুক্তি-পাওয়া সৈন্যরা মনের আনন্দে যে যেদিকে পারল পালাল। কেউ জাহাজের খোঁজে স্থরম্যান সাহেবের কুঠির দিকে। কেউ চুঁচড়ো চন্দননগরের দিকে। ইংরেজদের চেয়ে ফরাসী বা ডাচরাই এখন ভাল, এই ভেবে। দুর্গের মধ্যে রয়ে গেল কেবল ৬০।৬৫ জন ইংরেজ সৈন্য আর তাদের ব্যর্থ, পরাজিত সেনাপতি হলওয়েল। তাঁরা বন্দী নন। তবে নজরবন্দী।

২১ জুন সকাল হতে না হতেই নবাবের দরবারে ডাক পড়ল হলওয়েলের। নবাব তখন উমিচাঁদের বাগান বাড়িতে নয়, আছেন ফোর্টের কাছাকাছি এক সাহেব বাড়িতে। হলওয়েল নবাবের সামনে এসে, কুর্নিশ ঠুকেই, শুরু করে দিলে এক শোচনীয় ঘটনার পালাকীর্তন। হলওয়েলের তখন বাকশক্তিহীন অবস্থা।

কি ব্যাপার হে? কি হয়েছে তোমার?

হুজুর জাহাঁপনা! যা বলছি এক বিন্দু মিথ্যে নয়। সব সত্য ঘটনা। কাল রাত্রে ঘটেছে। প্রচণ্ড গরমে, একজনের ঘাড়ে আর একজন চাপাচাপি হয়ে, ১৪৬ জন ইংরেজ সৈন্যের ১২৩ জন হতভাগ্যই মারা গেছে অন্ধকূপে। সে ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা করা অসম্ভব। হুজুর! লম্বায় ১৮ ফুট, চওড়ায় ১৮ ফুট, এইটুকু একটা ঘরে ১৪৬ জনকে পুরে দিয়েছিল আপনার সিপাইরা। জানলা বলতে ছোট ছোট মাত্র দুটো। লোহার গরাদ দেওয়া।

আরো অনেক কথাই বলার ছিল নবাবকে। সব বোধহয় বলা সম্ভব হয়নি তখন। পরে বলেছিলেন। অর্থাৎ লিখেছিলেন। সে লেখা উপন্যাসের চেয়ে রোমাঞ্চকর। কল্পনার কল্পতরু বলা চলে তাকে। একটু পরেই সে কাহিনীতে আসছি।

হলওয়েল নাকে কাঁদলেন অনেক। সিরাজের সে দিকে কান নেই। সিরাজ বললেন, রাজকোষে কি আছে, নিয়ে এস।

রাজকোষে যা ছিল আগের দিনই হস্তগত হয়েছে নবাবের। হলওয়েল বললেন, মাথা খুঁড়লেও আর একটা পাই-পয়সা বেরোবে না।

গুপ্তধন নেই কোথাও?

আজ্ঞে না, হুজুর।

হলওয়েলেয় কথা মিথ্যে নয় এক তিল। টাকা পয়সা আর যা ছিল সব সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কবে। নবাবী সৈন্যরা গুপ্তধনের খোঁজে দুর্গ ঘেঁটে-ঘুঁটে কানাকড়িও যোগাড় করতে পারল না।

রেগে লাল হয়ে উঠলেন নবাব। এত বড় যুদ্ধ যাত্রা। এত লটবহর। এত বড় একটা শহর জয় করে তার সিকি খরচাও উঠল না?

নবাব হুকুম দিলেন একসঙ্গে অনেকগুলো। সাহেব পাড়ার আস্ত বাড়ি-গুলোকে পুড়িয়ে দাও। প্রেসিডেন্ট ড্রেকের বাড়িটাকে ভেঙে গুঁড়ো করে মিশিয়ে দাও ধুলোর সঙ্গে। কেল্লার ভিতরে একটা মসজিদ বানাও। কলকাতার নাম পাল্টে দাও আজ থেকে। আজ থেকে এ শহরের নাম হবে, আলিনগর।

আমার দাদুর নামে নাম। আর দুর্গের মধ্যে যে-কজন ইংরেজ আছে, তাদের বলে দাও, এক্ষুনি কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে। যারা যাবেনা, তাদের হাত-পা, নাক কান কেটে দাও। হলওয়েল আর তার দুই সঙ্গীকে বন্দী করে পাঠিয়ে দাও মুর্শিদাবাদে। আর শোন, মানিকচাঁদ এখন থেকে যাবে কলকাতায়। এখন থেকে মানিকচাঁদই কলকাতার গভর্ণর।

'সিরাজদ্দৌলা'-য় এই ২১ জুন সকালের আর এক রকম বর্ণনা ও ব্যাখ্যা।

"প্রাতঃকালে নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন হলওয়েলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, প্রহরীগণ তখন দুর্দশার কথা জ্ঞাপন করিল। হলওয়েল নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিবামাত্র সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। হলওয়েল যখন নবাব দরবারে উপনীত হইলেন, তখন তিনি এরূপ শক্তিহীন, শুষ্ককণ্ঠে জিহ্বার জড়তা বৃদ্ধি হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত করিয়া দিয়াছে। হলওয়েল লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া নবাব তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দান করিয়া জলপান করিতে দিয়াছিলেন। ইংরেজ-দিগের রাজকোষ কোথায় লুকায়িত আছে, হলওয়েল তাহার কিছুই বলিতে পারিলেন না। রাজা মানিকচাঁদ তাঁহাকে এবং তাঁহার তিনজন সঙ্গীকে উঠাইয়া লইয়া বন্দীবেশে মুর্শিদাবাদ প্রেরণ করিলেন। আর আর সকলেই মুক্তিলাভ করিল।

"হলওয়েল ও তাঁহার সঙ্গীগণ কারারুদ্ধ হইলেন কেন, সেকথা হলওয়েল নিজেই প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, উমিচাঁদের উত্তেজনায়, রাজা মানিকচাঁদের আদেশেই তাঁহারা বন্দীভাবে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইয়াছিলেন। …হলওয়েলের বিশ্বাস এইরূপ যে, উমিচাঁদ কারারুদ্ধ হইয়া যে সকল মর্ম-পীড়া ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উমিচাঁদ যে নিতান্ত অন্যায় উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, সে কথা হলওয়েলও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।…যাঁহারা সন্দেহবশে তাঁহাকে ধনে-বংশে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, উমিচাঁদ যে তাহাদের জন্য যৎকিঞ্চিৎ উৎপীড়নের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা একেবারে অস্বাভাবিক নহে।"

সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণ ও লুণ্ঠন শেষ। এবার পা বাড়ালেন মুর্শিদাবাদের দিকে। এখানেও তারিখ নিয়ে নানা মত। কোথাও ২ জুলাই। কোথাও ২৪ জুন। ২৪ তারিখটাই স্বাভাবিক ঠেকে। ২ জুলাই হলে, মাঝের দিনগুলো তিনি কোথায় কাটালেন? কলকাতায় যে এত দীর্ঘদিন ছিলেন এমন কথা কোথাও নেই।

সিরাজদ্দৌলা যে-কলকাতাকে পিছনে রেখে গেলেন, সেটা নামে আলিনগর, কিন্তু দৃশ্যত খালিনগর। মানুষ নেই। প্রাণের সাড়া নেই। গীর্জায় ঘণ্টাধ্বনি নেই। চারিদিকে শুধু পোড়া ইট-কাঠের কালো স্তূপ। দরজা-জানলাহীন ভাঙা বাড়ি কিছু। দরজা-জানলা খুলে নিয়ে গিয়ে নবাবী সেনারা কাজে লাগিয়েছে রান্নাবান্নার। এক কথায়, কলকাতা সেদিন শ্মশান। ভস্মমাখা এক ধ্বংসের শহর।

এই অধ্যায় শেষ করার আগে আমরা অল্প একটু সময়ের জন্যে ফিরে যাবো সেই ফেলে-আসা প্রসঙ্গে, যার নাম অন্ধকূপ হত্যা। অন্ধকূপ হত্যা নিয়ে ইতিহাসে-ইতিহাসে অনেক গবেষণা। অনেক মতামতের লড়াই। পুঁথির পাতা ছাপিয়ে তর্ক-বিতর্ক। কেউ এর পক্ষে। কেউ বিপক্ষে। কারো কাছে এটা সত্য। কারো কারো কাছে আজগুবী ঘটনা। ইংরেজদের মধ্যে প্রধানত মেকলে এবং অর্মে এই দুজনেই সবচেয়ে বেশী লাফালাফি করেছেন, অন্ধকূপ হত্যার শোক নিয়ে। অন্ধকূপ-হত্যার বিপক্ষে কিছু মতামত তুলে ধরা হচ্ছে এখানে।

"ইংরাজ-ইতিহাস লেখকদিগের বর্ণনালালিত্যে মুগ্ধ হইয়া, অন্ধকূপ হত্যার শোক-সমাচার পাঠ করিতে করিতে, কতবার সাশ্রুনয়নে হাহাকার করিতেছি; কত ছন্দোবদ্ধে কবিতা রচনা করিয়া স্বজাতি সমাজে সেই শোক-সমাচার প্রচারিত করিয়া সহৃদয়তায় পরিচয় প্রদান করিতেছি, কখন বা রঙ্গমঞ্চের সুশিক্ষিত অভিনেতৃদলের নাট্য নৈপুণ্যে আত্মহারা হইয়া 'নিরখি নিবিড় নৈশ আকাশের পানে' শত বিভীষিকা-মূর্তিতে বারংবার শিহরিয়া উঠিতেছি। যাঁহারা সেকালের লোক, যাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে ইংরাজ বাঙালীর কুটীল কৌশলজালে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া সিরাজদ্দৌলা ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু এই অন্ধকূপ-হত্যার বিন্দু-বিসর্গ জানিতেন না।

"মুসলমানদিগের ইতিহাসে অন্ধকূপ হত্যার নামগন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না। সাইয়েদ গোলাম হোসেনের রচিত 'মুতক্ষরীণ' গ্রন্থ সেকালের সর্বজন-সমাদৃত সুবিস্তৃত ইতিহাস—তাহাতে সিরাজদ্দৌলার অনেক কুকীর্তির উল্লেখ আছে। ইংরাজদিগেরও অনেক দুঃখ-দৈন্যের সমাচার আছে। কিন্তু সমগ্র মুতক্ষরীণ গ্রন্থে, আকারে-ইঙ্গিতেও অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ নাই। হাজি মুস্তাফা নামধারী সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত মুতক্ষরীণ-এর যে সুবৃহৎ অনুবাদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি টীকাচ্ছলে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, 'সমসাময়িক বাঙ্গালী-দিগের নিকট সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন, অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, নিজ কলিকাতার অধিবাসীরাই অন্ধকূপ হত্যার সংবাদ জানিত না।' যাহাদের বুকের

উপর এরূপ ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারা ইহার কিছুই জানিল না, ইহা কি আদৌ সম্ভবপর হইতে পারে?……মুসলমানদের কথা ছাড়িয়া দাও।…যাঁহারা নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্মপীড়িত হইয়া অন্ধকূপ কারাগারে জীবন-বিসর্জন করিলেন, তাঁহাদের স্বদেশীয় স্বজাতীয় সমসাময়িক ইংরাজদিগের কাগজপত্রে অন্ধকূপ হত্যার নাম পর্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?" সিরাজদ্দৌলা।

"As to the Black-Hole tragedy – the unburied site of which is the subject of so much fuss in our day – I have a very doubtful faith in its account. Holwell, one of the fellow-sufferers, was the first to publish it to the world. But I have always questioned it to myself, how could 146 beings be squeezed into a room 18 feat square even if it were possible to closely pack them like the seeds within a pomegranate or like the bags in a ship's hold made into one mass by packets, shoved in here and there into the interstices?" Dr. Bhola Nath Chunder.

"অন্ধকূপ-হত্যার সত্যাসত্য সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করা অপেক্ষা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহার জন্য নবাব কোনরূপে দায়ী নহেন।…নবাব যে বন্দী ইংরাজগণের প্রতি সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, একথা ক্লাইবের ইংরাজী জীবন চরিত লেখক কর্নেল মালিসন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।…কি মাদ্রাজের পিগট সাহেব, কি ক্লাইব, কাহারও পত্রে সেই অন্ধকূপ-হত্যার কথা নাই। এমন কি, সিরাজদ্দৌলার নিকট হইতে কলিকাতা অধিকার বা নবাবের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল উহাতেও উহার উল্লেখ করেন নাই।…আরও ক্লাইব বিলাতের কোর্ট অফ ডাইরেকটরগণের নিকট নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুতাদির জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহাতেও সেই নৃশংস অন্ধকূপ হত্যার কোন কথাই নাই, বা হলওয়েল যে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা আগস্ট তারিখের Select Committee-র বিশেষ অধিবেশনের নিকট ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনার সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যলিপি পাঠ করেন উহাতেও সেই অতীত অন্ধকূপ হত্যার কথা নাই। পরবর্তীকালেই ইংরাজগণ উহা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। উহাই সিরাজদ্দৌলার প্রতি অমানুষিক হত্যার কলঙ্ক দূর করিবার অমোঘাস্ত্র হইয়াছিল। ইহাই অনেকের ধারণা।" কলিকাতার কথা।

"Geometry disproving arithmetic gave lie to the Story." এই উক্তি এ্যানি বেসান্তের।

"ইদানীং কয়েকজন দেশীয় লেখক অন্ধকূপ হত্যাবিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দিহান হইয়াছেন। হলওয়েল সাহেবেন পোতারোহনে স্বদেশ যাত্রার সময়ে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী বন্ধু উইলিয়ম ডেভিসকে পত্র লিখিবার ভাবে অন্ধকূপ-হত্যার বিস্তৃত বিবরণ দেন। কেহ কেহ ইহাই অন্ধকূপ হত্যার প্রথম উল্লেখ বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। ১৭৫৬ নভেম্বরে লিখিত সর্বত্র উল্লিখিত ফলতা পত্রেও ইহার সামান্ত উল্লেখ আছে—

"I was the rest of my fellow-sufferers, about eight at night crammed into Black Hole prison and past a night of horers. I will not attempt to describe, as they bar all description &."

"অবশ্য হলওয়েলের এই দ্বিতীয় বর্ণনার পরে এই ঘটনা জনসমাজে বিশেষ প্রচারিত হইয়াছে এবং বর্ণনা যে সবিশেষ অতিরঞ্জিত, তাহা কোম্পানীর কর্মচারীগণের পরবর্তী কার্যেই প্রকাশিত হয়। ভবিষ্যৎ লেখকগণ সিরাজের অধঃপতনের সহিত ইহার যোগ করিয়া ভীষণতর করিয়াছেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

হলওয়েলের মতে কারাগারের আয়তন ছিল দৈর্ঘে প্রস্থে ১৮ ফুট। ক্যাপ্টেন কুক জানান, দৈর্ঘে ১৮, কিন্তু প্রস্থে ১৪। মেকলের মতে, দৈর্ঘে ২২ ফুট। প্রস্থে সাড়ে চৌদ্দ ফুট। হলওয়েলের মতে বন্দীর সংখ্যা ১৪৬। কুকের মতে ১৫০। মুতক্ষরীন-এর মতে ১৩১। হলওয়েলের হিসেবে ১৪৬-এর মধ্যে বেঁচে গেছেন মাত্র ২৩ জন। কুকের মতে ২২ জন। হলওয়েলের এই ১৪৬ সংখ্যাটি নিয়েও সন্দেহ রয়ে যায় যথেষ্ট।

"গোড়া থেকেই তো কলকাতার ইউরোপীয়দের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তার উপরে চিৎপুরের এক যুদ্ধে, লালদিঘির প্রথম যুদ্ধে, কোর্টের কাছে লালদিঘির দ্বিতীয় যুদ্ধে বড় কম লোক মারা যায়নি। তার চেয়ে বেশী লোক আবার পালিয়েছিল। কোর্টের লড়াই শেষ হবার পরেও অনেক ইওরোপীয়ান ছাড়া পেয়ে এদিক ওদিক সরে পড়েছিলেন। সবশুদ্ধ ষাটের বেশী লোক কিছুতেই কোর্টে থাকতে পারেন না। আসল কথা, পরে যাঁরই কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি তাঁকেই অন্ধকূপে ফেলে হত্যা করা হয়েছে এরকম করলে, গণিতের নিয়ম অনুসারে অঙ্ক তো বেড়ে যাবেই।

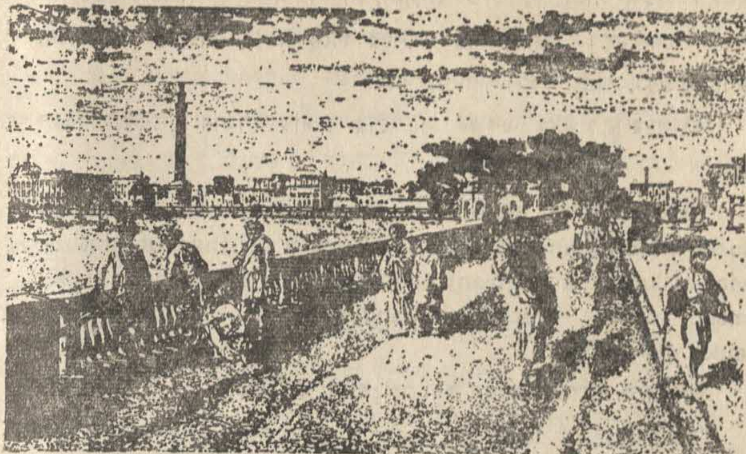
"খবর পাওয়া যায় মিসেস ক্যারী বলে একটি স্ত্রীলোক তাঁর স্বামীকে ছেড়ে যেতে না চাওয়ায় স্বামীর সঙ্গে তাঁকেও অন্ধকূপে যেতে হয়েছিল। ভাগ্যিস সকালবেলা তিনি জ্যান্ত বেরিয়েছিলেন। আর পরেও তাঁর দেখা পাওয়া গিয়েছিল নইলে লোকে এখনো হলওয়েল-সাহেবের কাহিনীতে বিশ্বাস করত

যে, ঐ মহিলা সিরাজউদ্দৌলার অন্তঃপুরে নবাবের ভোগে লেগেছিলেন।" পলাশীর যুদ্ধ।

"হলওয়ের স্বরচিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণের কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতা দুর্গবাসী ইংরাজদিগের যে জনসংখ্যা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাদের সর্বসাকল্যে ১৯০ জন যোদ্ধা গণিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৬০ জন মাত্র ইউরোপীয়। ইহাদের মধ্যে গভর্ণর ড্রেক, সেনাপতি মিনচিন, কাপ্তান গ্রান্ট, ম্যাকেট, ম্যানিংহাম, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড, রেভারেণ্ড কাপ্তান লেপ্টেনাণ্ট মেপল্‌টফট, কাপ্তান হেনরী ওয়েডারবরণ, সম্নার, চার্লস ডগলাস, প্রভৃতি দশজন বীরপুরুষের পলায়নের কথা হলওয়েলের পুস্তকেই প্রকাশিত আছে। ইহাদের পলায়নের পর ১৭০ জন দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, তন্মধ্যে ২৫ জন গতাসু এবং ৭০ জন আহত ও মৃতকল্প হইয়াছিল। হলওয়েলের হিসাব অনুসারে দুর্গজয়ের সময় দুর্গমধ্যে ৫০ জনের অধিক ইউরোপীয় থাকা প্রমাণ হয় না। ৫০ জনের মধ্যে ১২০ জন ইউরোপীয় অন্ধকূপে মরিল, ২৩ জন অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াও জীবিত রহিল-ইহা কি নিতান্তই হাস্যাস্পদ কথা নহে?" সিরাজদ্দৌলা।

সম্ভবত এই সব কারণেই আধুনিক ইতিহাসে হলওয়েলের আখ্যা জুটেছে – 'the romancer of the details of the Black Hole horror'.

অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভটা খাড়া করেছিলেন হলওয়েল সাহেব নিজেই। নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে। কোম্পানীর উৎসাহে-আগ্রহে অথবা অর্থে তৈরী হয়নি সেটা। হেষ্টিংসের গভর্ণরগিরির সময়, ১৮২১-এ ঐ স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে ফেলে ঐখানেই তৈরী হয় কাষ্টমঘর। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন যখন ভারতের সিংহাসনে, পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে তাঁর নজরে পড়ল হলওয়েল মনুমেণ্টের ব্যাপারটা। অতীতের শোককাহিনী দুলে উঠল তাঁর বুকের মধ্যে। আগাগোড়া মার্বেল পাথরে মুড়ে ক্লাইভ ষ্ট্রীট আর ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড়ে, অর্থাৎ সেই পুরনো জায়গাতেই আবার নতুন করে বানিয়ে দিলেন স্মৃতিস্তম্ভটা। তারপর এল ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের যুগ। তখন সুভাষ বসুর চোখে পড়ল ঐ কলঙ্ক। তিনি সেটাকে উপড়ে ফেলে দিলেন সেণ্ট জন্‌স-এর গোরস্থানে।



॥ ফলতা থেকে কলকাতায় ॥

কলকাতা ছেড়ে সিরাজ যখন মুর্শিদাবাদের দিকে, ইংরেজরা তখন ফলতায়। নদীর ওপারে। এবং ভোগান্তির একশেষ। একে গ্রীষ্মকাল। রোদের তাপ। গরমের চাপ। তার উপরে জায়গাটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। চারপাশে বন-বাদাড়। জল হাওয়া জঘন্য। অসুখ-বিসুখের আড়ত। তার উপরে না আছে মুখের ভাত। না আছে পরনের কাপড়। জাহাজে গুদামজাত খাবার-দাবার আর তহ্বিলের টাকা ফাঁকা হবার মুখে। ধারে কাছে দোকান-বাজার নেই। পলাতক ইংরেজদের দিন কাটে কোন মতে চেয়ে-চিন্তে। ডাচরা আছে। তাদের কাছেই ভিক্ষের হাত পাতা। হাত পাতলে ভাত না হয় এল। কিন্তু জামা-কাপড়ের কি হবে ? সেই যে এক-বস্ত্রে পালিয়েছে সবাই, সেগুলো এখন নোংরা-ভূত। মেয়েদের তো লজ্জা রাখার জায়গা নেই। মাথা বাঁচাবারও জায়গা আছে নাকি ? ছিল ডাচদের একটা পোড়ো আস্তানা। মাটির কেল্লা। ঝরঝরে। তারই সঙ্গে লাগোয়া কয়েকটা গুদামঘর। সেইটেই এখন প্রধান আশ্রয়। আর বাকি লোক থাকে জাহাজে। কেল্লা আর গুদামঘরের ঐ যৎসামান্য পরিসরে বলতে গেলে গুষ্টিশুদ্ধ কলকাতা। সাহেব, মেম, তাদের ছেলেমেয়ে, দাস-দাসী সব। যেন একটা খাঁচায় সারা বনের পাখি। দমবন্ধ হয়ে মরবার অবস্থা সকলের। মরতেও লাগল অনেকে। কী বীভৎস সেই খাঁচা !

আশে-পাশের বণিকরা বুঝতে পারছে, ইংরেজরা নাকানি-চোবানি খাচ্ছে কি

রকম। কিন্তু সাহায্যের হাত বাড়াবে, সে পথ বন্ধ। মানিকচাঁদের চোখে পড়লে রক্ষে নেই। ফরাসী আর ডাচদের কাছে সাহায্য চাইলে, উত্তর আসে, নবাবের হুকুম অমান্য করলে গর্দান যাবে।

উইলিয়ম টুকি নামে একজন সাহেবের বর্ণনায় ফলতার ইংরেজদের করুণ ছবি –

"It was a most melancholy sight, to see such a number of men, women, and children, without a change of clothes, victuals or drink and many obliged to be exposed to the inclemency of the weather day and night, the shipping was so much crowded."

আর ড্রেক সাহেবের আপন কথা তো আরো মর্মান্তিক।

"No shift of linen for eight days untill relieved by one of the pilots, and the deck was my bed, the concious of a hatchway my pillow, my substance rice half mized with paddy, slain starved animals that hunger reduced me to eat, muddy river water for my drink."

কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে ফেরার পথে সিরাজ থামলেন হুগলীতে। হুগলীর চুঁচড়োয়। একটানা ভ্রমণে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন ভেবেই মাঝপথে এই বিশ্রামের ব্যবস্থা।

"পথশ্রম দূর করিবার জন্য হুগলীতে বিচিত্র পটমণ্ডপ সুবিস্তৃত হইয়াছিল। সেখানে আসিতে না আসিতে, অভ্যর্থনার সমারোহে জলস্থল টলমল করিয়া উঠিল। সেকালের বাদশাহ বা নবাবেরা যেখানে ছাউনী ফেলিতেন, সেই স্থান বহুজনাকার্ণ রাজনগর হইয়া উঠিত। চারিদিকে যথাযোগ্য দূরস্থানে পাত্র মিত্র ও সামন্তবর্গের পট্টবাস, তাহার বাহিরে চক্রাকারে সেনানিবাসের সহস্র বস্ত্রগৃহ, তাহার পার্শ্বদেশে অগণিত বিপণীশ্রেণী, কেন্দ্রস্থলে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সুরচিত কনকপদ্ম বিভূষিত নবাবের গর্বোন্নত পটমণ্ডপ, সেই হস্ত্যশ্বপদাতিসেনা, সেই প্রহর-গণনানিপুণ প্রহরিদল, সেই সর্বজনভৈরব মোগল বিভবের সমুজ্জ্বল চিত্রপট শ্মশানভূমিকেও নন্দন শোভায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত, দ্বারে দ্বারে দৈবারিকদল করাল কৃপাণস্কন্ধে নিঃশব্দে পদচালনা করিয়া বেড়াইত, প্রভাত সায়াহ্নে রাজ-বৈতালিকগণের তানলয় সংযুক্ত সুমধুর যন্ত্রসঙ্গীত বায়ুভরে দূর দূরান্তরে ভাসিয়া চলিত, তিমিরাবগুণ্ঠিত নিশীথ সময়েও প্রদীপ্ত প্রদীপালোকে চারিদিক ঝলমল করিত।" সিরাজদ্দৌলা।

দরবার বসে গেল হুগলীতে। বিদেশী বণিকরা এসে কুর্নিশ ঠুকল সঙ্গে সঙ্গে। শুকনো কুর্নিশেই আনুগত্য জানানোর শেষ নয়। আগে পিছে রয়েছে নৈবিত্তির থালা। অর্থাৎ উপহার-উপঢৌকন, নজরানা। এতে ডাচদের গাঁট থেকে খরচ হল সাড়ে চার লাখ। ফরাসীদের সাড়ে তিন। ইংরেজরা আসবে কি করে? তাদের তো গাঁ উজাড়। দরবারে ইংরেজদের গর-হাজিরা চোখে পড়ল সকলেরই। এমন কি নবাবেরও। তিনি জানালেন, ইংরেজদের খেদিয়ে বৃন্দাবন পাঠাবেন এমন ইচ্ছে তাঁর নেই। ওরা বাড়াবাড়ি করেছিল বলেই, এই শাস্তি।

ডেকে পাঠালেন ওয়াটস এবং কলেটকে। খোঁজ করলেন হলওয়েল এবং তাঁর তিন সঙ্গীর। ওয়াটস এবং কলেট হাজির ছিলেন হুগলীতে। মুক্ত করে দিলেন সিরাজ। মীরমদন, নবাবের হুকুম পাওয়ার আগেই হলওয়েল আর তাঁর সঙ্গীদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে। সুতরাং হলওয়েল তখনি মুক্তি পেলেন না। সিরাজ হুকুম দিলেন, যে সব ইংরেজ ফলতায় না গিয়ে এদিক সেদিক লুকিয়ে জীবন কাটাচ্ছে, তারা যদি শুধুমাত্র সওদাগরিই করতে চায়, তাহলে কলকাতায় ফিরে যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। এই রকম একটা সাধারণ হুকুম জারী করে সিরাজ হুগলীর তাঁবু গুটিয়ে রওনা হলেন মুর্শিদাবাদের দিকে।

১১ জুলাই। মুর্শিদাবাদের মাটিতে পা পড়ল তাঁর। বিজয়ী নবাব ফিরে এসেছেন নিজের রাজধানীতে। সুতরাং রাজধানী জুড়ে সেদিন তুমুল আনন্দ উচ্ছ্বাস। ঘন ঘন কামানের গর্জন। ওদিকে নাচ গান। এই হৈ হৈ রৈ রৈ-এর ভিতর দিয়ে সিরাজের চতুর্দোলা এগিয়ে চলেছে মতিঝিলের দিকে। যেতে যেতে হঠাৎ সিরাজের চোখে পড়ল হলওয়েলের কারাগার। থামাতে বললেন চতুর্দোলা। থেমে গেল বাজনাবাদ্যির কলরব। সিরাজ চতুর্দোলা থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলেন কারাগারের দিকে। চোপদারকে হুকুম দিলেন, হলওয়েলের হাতের শিকল খুলে দাও। এবং হুকুম দিলেন, মুক্ত চারজন ইংরেজ ইচ্ছে করলে নিজেদের খুশীমত জায়গায় যেতে পারেন।

"He ordered a Suttaburder and Chopder to see our irons cut off and to conduct us wherever we chose to go and to take care that we received no trouble nor insult."

এ হল হলওয়েলের নিজের মুখের কথা।

মুক্তি পেয়ে হলওয়েল ফিরে এলেন কলকাতায় নয়, ফলতায়।

ফলতা থেকে ঘন ঘন চিঠি যাচ্ছে মাদ্রাজে। আমরা ধনে-প্রাণে মারা যেতে

বলেছি। শিয়রে সর্বনাশ। কলকাতা বুঝি হাত ছাড়া হয়ে গেল চিরকালের জন্যে। এখুনি সৈন্য সামন্ত পাঠাও। ইংরেজদের এই হা-হুতাশ এবং আর্তনাদ মাদ্রাজে পৌঁছতে সময় নিল অনেক। নবাব কাশিমবাজার অবরোধ করেছেন সে সংবাদ গিয়ে পৌঁছল ১৪ জুলাই। অর্থাৎ আসল ঘটনার প্রায় মাস দেড়েক পরে। খবর পেয়েও যে মাদ্রাজ খুব বিচলিত তা নয় মোটেই। কারণ এ রকম চিঠি প্রায়ই আসে। আবার কিছুদিন গেলে জানা যায়, গণ্ডগোল যা ঘটেছিল, মিটমাট হয়ে গেছে উৎকোচ-উপঢৌকনের দাওয়াই-এ।

তবু অন্যান্য বারের চেয়ে এবারের কান্নাকাটির চোটটা একটু বেশী মাত্রায় করুণ বলে মাদ্রাজ ১৫০ জন গোরা সৈন্য দিয়ে মেজর কিলপ্যাট্রিককে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতার দিকে।

কলকাতা জয় করে এসে সিরাজের বুকের ছাতি, ফুলে-ফেঁপে হাতীর মত। তিনি দিল্লীর বাদশাকে লিখে ফেললেন একটা চিঠি। তৈমুরলঙের পর হিন্দুস্থানে এত বড় একটা যুদ্ধ আর কেউ করেনি কখনো। সিংহাসনে বসে পাত্র-মিত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঐ টুপিওয়ালাগুলোকে শায়েস্তা করতে অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্য-সামন্ত কিছুই লাগে না। আমার এই চটি জুতোটাই যথেষ্ট।

যথাসময়ে কিলপ্যাট্রিক এসে পৌঁছলেন ফলতায়। এসে বুঝলেন, না এলেও চলতো। কারণ একে তো সৈন্য সংখ্যা নস্যির মত। তার উপর জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর। পৌঁছতে না পৌঁছতেই অর্ধেক সেপাই অসুস্থ। কলকাতার বাসিন্দে যারা রয়েছে, তারা জীবিত হয়েও জীবন্মৃত। সুতরাং আরো সৈন্য যতক্ষণ না মাদ্রাজ থেকে আসছে, কারো কিছু করার নেই।

ঠিক এই সময়ে শুরু হয়ে গেল মরার উপর খাঁড়ার কোপ। নিজেদের মধ্যে লেগে গেল ঝগড়া-ঝাটি। এ বলে, অমুকের দোষেই আজ ইংরেজদের এই দুর্গতি। ও বলে, দোষটা অমুকের নয়, তমুকের। যারা কাউন্সিলের সদস্য তারাও পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত। বেশীর ভাগের মত, যাঁরা ঘুষ খেয়ে কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়েছে, যাকে-তাকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার সুযোগ-সুবিধে পাইয়ে দিয়েছে, তারাই হল যত নষ্টের গোড়া।

হলওয়েলের মত ছিল, সিরাজের কলকাতা আক্রমণের জন্যে কেউই দায়ী নয়। না ইংরেজ, না কাউন্সিল। আসল কারণটা হল, সিরাজের ইংরেজ-বিদ্বেষ আর দাদু নবাব আলিবর্দীর অন্তিম উপদেশ।

সিরাজের কলকাতা আক্রমণ কেন, তাই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলেছে নানা জনের নানা গবেষণা। মিঃ বেচার এবং ঢাকার কাউন্সিলের মতামত, কৃষ্ণদাসকে

আসল সেওয়াটাই ভুল কারণ। মিঃ উইলিয়াম হিকি-এর বর্ণনা, কারণ-টারণ কিছুই নয়। ইংরেজ বলবার ওটা একটা ছিল। মিঃ ম্যাকিন্তাস জানিয়েছেন, এর পিছনে কোনো মুর্শিদাবাদের কারণ খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। যখন তিনি ক্লাইভের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে, তখন ব্যক্তি সিরাজের বিশ্বস্ত কর্মচারী, সরকার, এবং লোকের সঙ্গে কথা বলে, বারবার প্রশ্ন করে এর পিছনে উদ্দেশ্যকে খুঁজে বের করার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন প্রাণপণ। কিন্তু উত্তর মেলেনি।

মিঃ ক্রাফ্‌টনের মতে, এটা হল এমন একটা "State mysteries that die with their authors. I have made it my study since our intercourse with the great men at court, to penetrate into the course of this event but could never obtain anything satisfactory···Perhapes it is a vain research to trace the motives of a capricious tyrant."

অর্থের বাসনা ছিল, ইংরেজদের একেবারে দেশ ছাড়া করাটাই ছিল সিরাজের আসল মতলব। দুর্বলচিত্ত বলেই পারেন নি।

কলকাতায় একদিকে যেমন চলেছে গঙ্গাজলের সঙ্গে গঙ্গাজলের কৌশল, অন্যদিকে তেমনি চলেছে মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ এবং শলাপরামর্শ। আবার নবাবের কাছেও পাঠানো হচ্ছে বিনীত নিবেদন পত্র। আর সেই সঙ্গে মাদ্রাজ-কাউন্সিলকে খবর দেবার ব্যবস্থাও পাকা হচ্ছে মনে মনে।

১১ আগস্ট। জাহাজের নিরাপদ আশ্রয়ে কাউন্সিলের বৈঠক। সভাপতি ড্রেক সাহেব। সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ওয়াটস, হলওয়েল আর মেজর কিলপ্যাট্রিক। মেদিনের সভার পর কলকাতার ইংরেজদের জানিয়ে দেওয়া হল, আর ভয় নেই। মাদ্রাজ থেকে আসছে আরো সৈন্য।

ইংরেজদের মনের অবস্থা আগের চেয়ে একটু ভাল কিছুটা। তার কারণ ম্যানিংহাম আগের চেয়ে এখন কিছুটা বেশ সদয়। জাহাঙ্গীর আর্মেনিয়ান-সওদাগর বিশ্বস্ত ব্যক্তি রাজী হয়েছেন নবাবের কাছে ইংরেজদের চিঠি পৌঁছে দিতে, যাতে আবার আগের মত ব্যবসা-বাণিজ্য করার দিতে পারেন।

নিমন্ত্রক জাহাজে আগে রাজী হয়েছিলেন খাজা ওয়াজিদ, ইংরেজদের চিঠি নবাবের কাছে পৌঁছে দিতে। কিন্তু ঐ ১১ তারিখেই খবর এল, তিনি নারাজী।

ইংরেজরা মুষড়ে পড়ল কিছুটা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই দিনই কলকাতা থেকে দুজন লোক এসে হাজির। পাঠিয়েছেন উমিচাঁদ। একজন খোজা পিদ্রু। আর্মেনিয়ান এপ্রাকিম জোহানস্। দুজনেই আত্মীয় বণিক। সঙ্গে উমিচাঁদের গোপন চিঠি—

"চিরদিনও যেমন এখনও সেইরূপভাবে তিনি ইংরাজের কল্যাণ কামনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। আর ইংরেজরা যদি রাজা রাজবল্লভ, রাজা মানিকচাঁদ, জগৎশেঠ, খোজা ওয়াজেদ প্রভৃতি পাত্রমিত্রের সঙ্গে গোপনে চিঠিপত্র চালাইতে চান, তিনি তাহাও যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয়া সদুত্তর আনাইয়া দিবেন।"

শুরু হইল জগৎশেঠের সঙ্গে যোগাযোগ।

"২২ শে জুন কলিকাতা অধিকৃত হয়। ইংরাজেরা ২২শে আগষ্ট জগৎশেঠকে উক্ত পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা জগৎশেঠের প্রতিনিধি আমীরচাঁদ বা আমীনচাঁদ (উমিচাঁদ) দ্বারা পত্রাদি পাঠাইতেন। ৫ই সেপ্টেম্বর ইংরাজেরা জগৎশেঠকে আর এক পত্র পাঠাইতে চান। কিন্তু আমীরচাঁদ কোনো কারণবশতঃ তাহা পাঠাইতে অস্বীকৃত হন। ২৩শে নভেম্বর ফলতা হইতে মেজর কিলপ্যাট্রিক পুনর্বার জগৎ-শেঠকে লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহারই উপর সমস্ত বিষয় নির্ভর করিতেছে এবং একমাত্র তাঁহারই দ্বারা তাঁহারা নবাবের সহিত বিবাদ-নিষ্পত্তির আশা করেন। এই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস কাশিমবাজার কুঠী হইতে বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনিও আপনাদিগের উদ্ধারের জন্য গোপনভাবে জগৎশেঠের সহিত পরামর্শ করিতেন।" মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

কাশিমবাজার থেকে গোপন খবর পাঠাচ্ছেন হেষ্টিংস। নবাবকে আর চিঠি লেখার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ নবাবের অবস্থা টলোমলো। দেশের অধিকাংশ লোক এখন নবাবের চেয়ে নবাবের ভাই শওকতজঙ্গকেই সিংহাসনে বসাতে উৎসাহী। তারই গোপন শলা-পরামর্শ চলছে।

কিলপ্যাট্রিক তাইই করলেন। নবাবকে এড়িয়ে মন দিলেন মানিকচাঁদের দিকে। যদি কোনভাবে মনটা ভিজোনো যায় তাঁর। খুব বেশী কাঠ-খড় পোড়াতে হল না, মানিকচাঁদকে টলাতে। গোপনে গোপনে ইংরেজদের স্থখ-স্থবিধার দিকে কিছুটা নজর দিলেন তিনি।

"মাণিকচাঁদ ইতিহাসে চতুর চূড়ামণি বলিয়া স্থপরিচিত। নবাব দর-বারের স্রোত কখন কোন দিকে প্রবাহিত হয়, সে দিকে সর্বদাই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সে স্রোত আবার ধীরে ধীরে ইংরাজদিগের অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, তখন তিনিও ইংরাজের সঙ্গে আত্মীয়তা সংস্থাপনের জন্য অসম্মত হইলেন না।…উমিচাঁদের সহায়তাগুণে রাজা মানিকচাঁদ সহজেই বশীভূত হইলেন। একদিন যে মাণিকচাঁদ ইংরাজ-দলনে অপরিসীম উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা মন্ত্রৌষধিগুণে সহসা শিথিল হইয়া পড়িল। ৫ই সেপ্টেম্বরের বৈঠকে স্বয়ং মাণিকচাঁদের পত্র

ইংরাজ দরবারে সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল। সে পত্রে ইংরাজ সাহস পাইলেন। রাজা মাণিকচাঁদ যে যথাশক্তি ইংরাজের সহায়তা করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন পাইতে বিলম্ব হইল না। ফলতায় বাজার বসিল, ইংরাজের অন্নকষ্ট দূর হইয়া গেল।" সিরাজদ্দৌলা।

"ফরাসী ওলন্দাজ ও দেশীয় বণিকগণ গোপনে যাহা কিছু আহার্য্য প্রেরণ করিতেন, তাহাতেই ইংরাজদের কোনরূপ দিনপাত হইতেছিল। নবকৃষ্ণ (ভবিষ্যতে রাজা) প্রভৃতি কলিকাতার কয়জন লোক প্রাণ হস্তে করিয়া বাঙালী স্বভাবসুলভ দয়াগুণে আহার্য্য পাঠাইয়া ইংরাজগণের কষ্ট মোচনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। অমিচাঁদ প্রভৃতি যে সকল বণিকের উপর সৌভাগ্যের সময় ইংরেজগণ সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই, পতনের পূর্বে যাঁহাদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার হইয়াছিল, তাঁহারাও এ দুর্দ্দিনে দয়াপরবশ হইয়া ইংরেজগণের বিনীত দরখাস্ত লইয়া নবাব দরবারে মন্ত্রীগণের দ্বারায় নবাবের তুষ্টিসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে মন্ত্রৌষধির বশে রাজা মাণিকচাঁদও হস্তগত হইলেন। ইংরাজেরা ফলতায় বসিয়া যাহাতে খাদ্যাদির কষ্ট না পান, তাহার ব্যবস্থা হইল। তাঁহার আদেশে ফলতায় বাজার বসিল। অনেক লোকে ইংরেজ পুনরায় নবাবের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইবে ভাবিয়া আবার তাঁহাদের প্রতি অনুকূল হইলেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

"When the English quitted the Fort, they and the Gevernment remained for several months on board at Falta. Some of provisions were supplied by Nobokissen at the risk of his life, the Nawab prohibited under penalty of death any one supplying the English. This led to Warren Hestings taking Nobokissen as his Munsi and the subsequent elevation of his family." Long.

সেপ্টেম্বরের ৫। কাউন্সিলের হাতে এল মিঃ হিথ-এর চিঠি। মিঃ হিথ জানাচ্ছেন কাশিমবাজার থেকে, মিঃ বিস্‌ডম এর কাছ থেকে পাওয়া ঘোড়ার মুখের খবর। বাদশা পূর্ণিয়ার নবাবকেই দিয়েছেন বাংলার নবাবী করার ফরমান। এবং এই খবর পেয়ে সিরাজউদ্দৌলা শওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় তৈরী। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহা খুশীতে ফলতার ইংরেজরা উঠল উথলিয়ে। ঘটনাটা সত্যিই। তবে ফরমান যেটা এসেছে, সেটা বাদশার দেওয়া নয়। ঘাজীউদ্দিন উজীরের হুকুমৎ-নামা। এক কোটি টাকা ঘুষের প্রতিশ্রুতির বদলে। ইংরেজরা সঙ্গে সঙ্গে

পূর্ণিয়ার নবাবকে তুষ্ট করতে উঠে পড়ে লাগল। ১৫ সেপ্টেম্বরের কনসালটেশন বুকে লেখা হল।

"The Board agreed to send a lerter in Persian to the Pyrnea Nabab with presents, hoping he might defeat Sirajed Dowla."

মুর্শিদাবাদেও ছড়িয়ে পড়ল শওকতজঙ্গের নবাব হওয়ার সমাচার। সেই সঙ্গে আরও কিছু। বাদশা নাকি অনেকদিন যাবৎ রাজকর পাননি। সেজন্যে তিনিও সিরাজের উপর অসন্তুষ্ট। তিনি এবং শওকত দুজনে মিলে তাই এখন ঠিক করেছেন মুর্শিদাবাদে এসে সিরাজকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবেন।

সিরাজ শুনলেন। শোনামাত্র রক্তে টগবগিয়ে উঠল প্রতিশোধের আগুন। তখুনি সৈন্যদের ডেকে 'সাজো সাজো' হুকুম দেন, এমনি অস্থির তাঁর মনের অবস্থা। তিনি জানেন, কারা তাঁর বিরুদ্ধে এবং শওকতের পক্ষে। শওকতকে আগে শায়েস্তা করে তারপর তিনি শিক্ষা দেবেন ঘরের শত্রু বিভীষণদের। সৈন্যদের সাজতে বলার আগে তাঁর মনে হল, শোনা কথায় নির্ভর করে যুদ্ধের দামামা বাজানো কঠিন। তা ছাড়া শওকতও আলিবর্দীর বংশধর। চট করে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করতে যাওয়ায়, সকলের সমর্থন নাও মিলতে পারে। একটা কিছু অছিলার দরকার, যেটাকে সামনে রেখে বলা যাবে, এই দেখ শওকতের শয়তানী। তবেই তো সৈন্যদের রক্তে চলকে উঠবে রাজভক্তির লাল উত্তেজনা।

পূর্ণিয়ার বীরনগরে খালি পড়েছিল একজন ফৌজদারের পদ। মুর্শিদাবাদ থেকে রাসবিহারী নামের একজন অনুগতকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন বীরনগরে। শওকতকে লিখলেন, ওকে ঐ শূন্য পদে বহাল করতে। তারই কদিন বাদে জবাব এল শওকতের কাজ থেকে।

"আমি বাদশাহী সনন্দ পাইয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব হইয়াছি। তুমি আমার নিতান্ত পরমাত্মীয়; তোমার প্রাণবধ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। যদি প্রাণ লইয়া পূর্ববঙ্গের কোন নির্জন পল্লীতে পলায়ন করিতে চাও, আমি তাহাতে বাধা দিতে চাহি না। বরং তুমি অন্নবস্ত্রের কষ্ট না পাও, তাহারও ব্যবস্থা করিতে সম্মত আছি। আর বিলম্ব করিও না—পত্রপাঠ রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন কর। কিন্তু সাবধান! রাজকোষের কপর্দকেও হস্তক্ষেপ করিও না! যত শীঘ্র পার প্রত্যুত্তর পাঠাইও। সময় নাই। অশ্ব সুসজ্জিত, আমিও রেকাবদলে পা তুলিয়া দিয়াছি। কেবল তোমার প্রত্যুত্তর পাইতে যাহা কিছু বিলম্ব।"

শওকতের চিঠি হাতে নিয়ে ডাকলেন পাত্র-মিত্রদের। পাত্র-মিত্ররা নবাবকে বোঝাতে লাগলেন, এ যুদ্ধযাত্রায় আমাদের সমর্থন নেই।

"জগৎশেঠ মুখপাত্র হইয়া বুঝাইতে লাগিলেন—'দিল্লীশ্বরই বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যার স্বামী। সুবেদার তাঁহার সনন্দবলে শাসনভার পরিচালন করেন। সিরাজদ্দৌলার সনন্দ নাই। শওকতজঙ্গ সনন্দ পাইয়াছেন। এরূপ স্থলে কে রাজা, কে প্রজা, তাহার মীমাংসা হইতে পারে না'। সিরাজ বুঝিলেন যে, চক্রান্ত বড়ই কুটীল পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া জগৎশেঠকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া সভাভঙ্গ করিয়া দিলেন। কেহ কেহ এরূপও রটনা করিতে লাগিলেন যে, নবাব ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে জগৎশেঠের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেন, তাহাতেই সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।" সিরাজদ্দৌলা।

অন্য ইতিহাসে অন্য বিবরণ।

"মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, সিরাজ মহাতাপচাঁদকে প্রায়ই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেন। এবং সময়ে সময়ে 'মুসলমানী' করার ভয়ও দেখাইতেন। এই সমস্ত কারণে জগৎশেঠ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ক্রমে ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠে। পূর্বে নিয়ম ছিল যে, কোন নূতন নবাব মসনদে উপবিষ্ট হইলে, জগৎশেঠ দিল্লী হইতে তাঁহার সনন্দ আনাইয়া দিতেন। সিরাজের সিংহাসনা-রোহনের সময় সনন্দ আনীত হয় নাই। সিরাজ সনন্দ না পাওয়ায়, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও মাতৃস্বসার পুত্র পূর্ণিয়ার নবাব সকতজঙ্গ বাঙ্গলার সুবেদারী লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। সিরাজ মোহনলাল ও মীরজাফর প্রভৃতিকে সকতজঙ্গের দমনে পাঠাইয়া, জগৎশেঠকে সনন্দ না আনার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু জগৎশেঠ তাহার কোনও সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। এই অবহেলার ক্ষতিপূরণের জন্য সিরাজ জগৎশেঠকে বণিক মহাজনদের নিকট হইতে তিন কোটী টাকা সংগ্রহ করিবার আদেশ দিলেন। জগৎশেঠ পীড়িত লোকদিগকে পুনঃ পীড়ন করিয়া অর্থশোষণ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি নবাবের আদেশের প্রতিবাদ করায়, সিরাজ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাঁহার মুখে এক মুষ্ট্যাঘাত করেন। পরে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে আদেশ দেন। মীরজাফর প্রভৃতি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জগৎশেঠকে মুক্ত করার জন্য নবাবকে অনুরোধ করেন। নবাব তাঁহাদের কথায় প্রথমে কর্ণপাত করেন নাই। পরে ক্রোধের উপশম হইলে জগৎশেঠকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন।" মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

কাশিমবাজার থেকে পাঠানো হেষ্টিংসের চিঠিতে ছিল –

'Surajed Dowla had ordered Jaffar Alli Cawn and other principal officers to march with a force to oppose him (Nobob of Purnia), which they did, but returned on the

29th on account of a dispute between the Nabab aud Juggerseat, in which the formar reproched the latter for not getting a phirmaund and then ordered him to raise from the merchants three crore of rupees, but Juggerset pleading the hardships of his already oppressed people received a blow on the face and was confined. Jaffar Alli Cawn rerurning upon went with the other principle officers and insisted on Juggerseat being set at liberty, but were refused, on which they declared that they would not draw their swords in his service till he should be appointed Nabab by the King."

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার দত্তের ধারণা, চড় মারার ঘটনাটা ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে হেষ্টিংসের এই চিঠি থেকেই। অথচ হেষ্টিংসের পক্ষে মুর্শিদাবাদ রাজদরবারের ঘটনা জানা সম্ভব নয়। কারণ তখন তিনি কাশিমবাজারে। চড় না মারলেও সিরাজ যে জগৎশেঠকে বন্দী করেছিলেন, সেটা সব ইতিহাসেই স্বীকৃত। পরে মুক্তিও দিয়েছিলেন। খানিকটা চাপে পড়ে। খানিকটা নিজের অন্যায় বুঝে।

এই ঘটনার পরই সিরাজ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন যুদ্ধে। এবং যুদ্ধে জয় হল তাঁরই। কারণ শওকতজঙ্গ লড়াই করার মানুষ নন।

"শওকতজঙ্গ ইন্দ্রিয়াসক্ত, গর্বোন্মত্ত, অকর্মণ্য যুবক। তিনি কাহারও পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া, নিজেই সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া নবাবগঞ্জ নামক স্থানে শিবির সন্নিবিষ্ট করিলেন। জীবনে একদিনের জন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই। ধূম্রপুঞ্জে আকাশ অন্ধকার করিয়া গোলন্দাজগণ কামান মুখে মুহুঃমুহুঃ গোলাবর্ষণ করিলে কোথায় কেমন করিয়া সেনা সমাবেশ করিতে হয়, তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। অথচ প্রধান সেনানায়কগণ কোন বিষয়ে পরামর্শ দিবার চেষ্টা করিলে, শওকতজঙ্গ স্পষ্ট বলিয়া উঠেন – তিনি এই বয়সে এমন একশত যুদ্ধে সেনাচালনা করিয়াছেন।" সিরাজদ্দৌলা।

তাঁর সৈন্যরা যখন কচুকাটা হচ্ছে সিরাজ সৈন্যের কাছে, তখন তিনি নিজের তাঁবুতে নাচ-গানে এবং সুরাপানে ব্যস্ত এবং ভাঙ খেয়ে মত্ত। আর সারেঙ্গীর তালে তালে মাথা নাড়ায় মগ্ন। এমন কি শেষ পর্যন্ত দায়ে পড়ে যখন নিজেকেই ছুটে যেতে হল রণক্ষেত্রে, তখনও তিনি নেশায় বুঁদ। কামানের গর্জনের মধ্যে চোখ বুজে তাল দিয়ে চলেছেন 'বহুৎ আচ্ছা বিবিজান' বলে। এমন বীরপুরুষ যে অচিরাৎ মাথায় কামানের গোলা খেয়ে চিরকালের জন্যে চোখ ওল্টাবেন, সেটা অনুমান করতে বুদ্ধি লাগে না।

সিরাজ জিতে গেলেন। ভয়ে গা ছমছমিয়ে উঠল একদিকে ইংরেজদের, অন্যদিকে বিরোধীদলের। ইংরেজরা বুঝল, এখন তাদের বাঁচাতে পারে ঐ বিরোধীপক্ষ। বিরোধীপক্ষ বুঝল, এখন ইংরেজরাই ভরসা!

চুঁচড়োর পাদরী সাহেব, নাম বেণ্টু। কলকাতায় কিছুদিন কাটিয়ে তিনি এই সময় ফলতায় খবর পাঠালেন, কলকাতায় মানিকচাঁদের যা কিছু আড়ম্বর, সব বাহ্য। কতকগুলো তোপ সাজানো আছে। দুর্গে সেপাই মোটে দেড় হাজার। অধিকাংশ কামান অকেজো।

উমিচাঁদ খবর পাঠালেন – নবাবের ভয়ে কেউ কিছু বলছে না। কিন্তু সকলেই এখন কায়মনোবাক্যে কলকাতায় ইংরেজদের আবার ফিরে আসার দিকে তাকিয়ে।

হলওয়েল খবর পেলেন, নবাবের কাছ থেকে আবার ইংরেজদের কলকাতায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি আসতে পারে এ রকম একটা উড়ো খবর সেপাইদের কানে এসেছে। তাই তারা ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে। দুর্গ-ফুর্গ নিয়ে কারো কোনরকম মাথা-ব্যথা নেই।

ইংরেজরা বুঝতে পারল স্বুবর্ণসুযোগ আসছে। এখন শুধু মাদ্রাজ থেকে সৈন্য বোঝাই জাহাজগুলোর পৌছনোর অপেক্ষা।

মাদ্রাজের গভর্ণর পিগট সাহেব, কলকাতা থেকে যতদিন চিঠি পেতেন, ভাবতেন ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। কিন্তু কলকাতা থেকে পালিয়ে ৫ আগস্ট ম্যানিংহাম যেদিন মাদ্রাজে গিয়ে পৌছলেন, তাঁর মুখে কলকাতা এবং ফলতার যাবতীয় ধ্বংস এবং দুর্দশার বিশদ বিবরণ শুনে, চোখ উঠল কপালে। কলকাতা কি চিরকালের মত হাতছাড়া হয়ে যাবে নাকি?

সেই থেকে মাদ্রাজে চলেছে মন্ত্রণা। কাকে পাঠানো যায় কলকাতায়, নেতা সাজিয়ে? এ বলে ওর নাম। ও বলে এর নাম। এই করেই মাস কয়েক কেটে গেল। তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই।

শেষ পর্যন্ত নাম ঠিক হল একজনের। তিনি ক্লাইভ। কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ। মাদ্রাজের ডেপুটি গভর্ণর।

"পিগট সাহেব মাদ্রাজের গভর্ণর। পদগৌরবে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধ ব্যবসায় তাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। সেনানায়কদিগের মধ্যে কর্ণেল অল্ডারক্রণ (?) সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধ-কলহে তাঁহারও কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই। কর্ণেল লরেন্স-এর যোগ্যতা আছে, ও অভিজ্ঞতাও আছে, সকল বিষয়েই তিনি পরিপক্ক। কিন্তু তিনি হাঁপানি রোগে জর্জরিত – বাঙ্গলার জলবায়ু তাঁহার ধাতুতে সহ্য হইবে না। এইরূপে যখন একে একে সকল সেনাপতি

পশ্চাৎপদ হইলেন, তখন কর্ণেল ক্লাইবের উপর অগত্যা এই ভার ন্যস্ত হইল। যাঁহারা ক্লাইবের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিলেন যে, ইংরাজ ভাগ্যে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইল।" সিরাজদ্দৌলা।

"Governor Pigot himself would like to have gone but he was a civilian ; Stringer Lawrence as cemmender-in-chief was the obvius choice, but he was too infirm. Colonel Adlorcron commanded the royal regiment which came out with Watson's fleet. A difficult man by all accounts, he made so many conditions and cavets that the Madras Council finally draw back. The lot once more fell upon Clive. He was to be responsible to the Madras Council because it was felt the Calcutta rump were not to be relied upon, and he was to return to Madras as soon as his misson was completed." Master of Bengal,

ক্লাইভ কিন্তু একা যাচ্ছেন না। সঙ্গে দেওয়া হল ওয়াটসনকে। এ্যাডমিরাল ওয়াটসন। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া এই খেতাব। ক্লাইভ কর্ণেল বটে। তবে সে খেতাব দিয়েছে কোম্পানী। দুটোর মধ্যে অনেক ফারাক। ওয়াটসন তাই একটু বাঁকা চোখে দেখতেন ক্লাইভকে। যেন ক্লাইভ লোকটা এমন কিছু নয়। আমিই আসলে এই যুদ্ধযাত্রার আসল নায়ক। তাঁকে যদি কখনো কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় কোনো কাজের, তিনি মাদ্রাজ-কাউন্সিলকে দেবেন না। দেবেন নিজের দেশের খোদ রাজার কাছে।

যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি, আলাপ-আলোচনা, মালপত্র সাজানো-গোছানো করতে করতে লেগে গেল দুমাস। কলকাতা পতনের সংবাদ এসেছিল ১১ আগস্ট। আর অক্টোবরের ১৬ তারিখে মাদ্রাজ উপকূল থেকে জাহাজ ছাড়ল কলকাতার দিকে। সমুদ্র তীরে রুমাল উড়িয়ে বিদায় জানাল মাদ্রাজের ইংরেজরা। জাহাজ ছাড়ল পাঁচখানা। তাতে কামান-বন্দুক, গোলা-বারুদ, অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া সৈন্য রয়েছে ৯০০ ইউরোপীয়ান, ১০০০ দেশী। কোন কোন মতে দেশী সিপাহের সংখ্যা হাজার নয়, পনেরশো। পথে উঠল ঝড়। দুখানা জাহাজ যথাসময়ে পৌঁছতে পারল না কলতায়। তার মধ্যে একটার নাম, মার্লবরা। তাতেই ছিল গুলি-গোলা বোঝাই। আরেকটার নাম, কামবারল্যাণ্ড। এরা পৌঁচেছিল দুমাস পরে।

মাদ্রাজ ছেড়ে কলকাতা-মুখো জাহাজে চাপার আগে ক্লাইভ স্বদেশে বাবার কাছে লিখলেন এক চিঠি। তার প্রতিটি অক্ষরের পিছনে আত্মবিশ্বাস এবং দুরাকাঙ্খা এবং তাঁর দুঃসাহসী চরিত্রের আগুনে ঝলক।

"……This expedition if attended with success may enable me to do great things. It is by far the greatest of my undertakings. I go with great forces and great authority."

১৭৫৬। ১৫ ডিসেম্বর। ফলতায় পা দিয়েই লণ্ডনের সিক্রেট কমিটিকে লিখলেন একটা চিঠি। তার মধ্যেই সেই অনাগত ভবিষ্যতের সোনার রঙে আঁকা ছবি এবং স্বপ্ন দেখা একটা সাহসী মন।

"I flatter myself that this Expedition will not end with the retaking of Calcutta only; and that the Company's Estate in there parts will be settled in a better and more lasting condition than ever."

ফলতায় পা দিয়ে ক্লাইভ নিজের চোখে দেখতে পেলেন ইংরেজ-দুর্দশার এক শেষ। পরনে নেই পোষাক। পেটে নেই খাদ্য। মান সম্মান ভেসে গেছে গঙ্গার জলে। তার উপরে অসুখ-বিসুখের শেষ নেই। সবাই যেন ধুঁকছে। ক্লাইভ নিজেই উঠেছেন সদ্য অসুখ থেকে। তাঁরও শরীর খারাপ। তাই তিনি ছটফট করে উঠলেন, ফলতায় চুপচাপ বসে না থেকে, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কলকাতা দখল করতে।

ফলতার ইংরেজরা যুদ্ধজাহাজ আর দু-দুজন টাটকা সেনাপতিকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। তার উপরে কিলপ্যাট্রিকের চেষ্টায় সিরাজের সঙ্গে যে সব চিঠি চালাচালি হয়েছে, হচ্ছে, তাতে সন্ধি হয়-হয় অবস্থা। অর্থাৎ সুখের দিন সামনে। অর্থাৎ সামনেই আবার কলকাতা।

ক্লাইভ এবং ওয়াটসন যখন মাদ্রাজ থেকে যাত্রা করে উড়িষ্যার কাছাকাছি, সেই সময়ে জাহাজের ডেকেই তাঁদের দুজনের মধ্যে বসেছিল এক গোপন সভা। বাংলাদেশ লুণ্ঠন করতে পারলে, পাওনা-গণ্ডা হবে কার কি রকম। ওয়াটসন বললেন, সুবর্ণ দুর্গ জয় করে যে রকম ভাগাভাগি হয়েছে, সেই রকম। ক্লাইভ বললেন, না। আমি চাই সমান সমান। তুমি অর্ধেক, আমি অর্ধেক।

"After they had been some time at sea, a council was held on board Admiral Watson's ship the distribution of prize-money." Clive's Evidence.

সুবর্ণ দুর্গ জয় করার ব্যাপারটা হল এই রকম। অঙ্গীরা ছিলেন মহারাষ্ট্রদের ডাকসাইটে নৌ-সেনাপতি। হঠাৎ তিনি মহারাষ্ট্রকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেই শুরু করে দিলেন লুঠ-পাট। সমুদ্র দিয়ে যারই জাহাজ যায়, তাকেই আক্রমণ করে বসেন। সকলেই যখন তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ, মহারাষ্ট্রীয়রা ছুটে

এলেন ক্লাইভ আর ওয়াটসনের কাছে। তখন তাঁদের সঙ্গে ছিল প্রচুর সেনা। অনেক যুদ্ধ জাহাজ। মহারাষ্ট্রীয়রা বললে, আমাদের সাহায্য করুন, স্বর্ণ দুর্গ আক্রমণ করতে। এর জন্যে আপনাদের দেব দেড় লক্ষ টাকা। সেই টাকা ভাগাভাগি হয়েছিল দুজনের মধ্যে।

ক্লাইভরা মাদ্রাজ ছাড়ার সময়, মাদ্রাজের কর্মকর্তারা তাঁদের হাতে দিয়েছিলেন সিরাজের নামে গোটা কয়েক সুপারিশ পত্র। একটা দাক্ষিণাত্যের নিজাম, আরেকটা আর্কটের নবাবের। সেই সঙ্গে পিগট সাহেবেরও ব্যক্তিগত চিঠি রইল একটা। যাতে বিনা রক্তপাতে ইংরেজরা কলকাতায় ফিরে যেতে পারে, সেই বিষয়েই নবাবের কাছে বিনীত নিবেদন। কিন্তু ক্লাইভ এবং ওয়াটসনের মেজাজ আলাদা। তাঁরা সন্ধি চান না। চান যুদ্ধ।

ফলতায় পা দিয়েই ওয়াটসন এক চিঠি লিখে বসলেন সিরাজকে।

"I am come down to Bengal to re-establish the said Company's servants in their formar factories and houses and hope to find you willing to restore them their ancient rights and immunities. As you must be sensible of the benifit of having the English settled in your country, I doubt not you will consent to make them a reasonable satisfaction for the losses and injuries they have suffered and by that means put an amicable end to the troubles and secure the friendship of my King, who is a lover of peace and delights to act in equity. What can I say more ?"

ক্লাইভও বাদ দিলেন না। তিনিও লিখে বসলেন আর একটা চিঠি। সে চিঠিতে ভাষা এবং ভদ্রতার মা বাপ নেই। 'গর্ব্বোন্নমস্তকে অনেক কটু-কাটব্য প্রয়োগ' করে লেখা সে চিঠিটি তুলে দিলেন মানিকচাঁদের হাতে, নবাবের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে। মানিকচাঁদ তো সে চিঠি পড়ে থ। ইতর ভাষায় গালি-গালাজ করে লেখা এমন একটা চিঠি নবাবের হাতে পৌঁছে দেওয়ার অপরাধে নিজের মাথাটা বিসর্জন দেবেন নাকি তিনি? মানিকচাঁদ ক্লাইভকে সে চিঠি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এটাকে যদি ভদ্র ভাষায় আবার নতুন করে লিখে দেন, তবেই এটা আমার পক্ষে নবাবের কাছে পাঠানো সম্ভব, নইলে নয়। ক্লাইভের লাল মুখ রাগে আরো লাল। তিনি বললেন, ওহে আমি যে মাদ্রাজ থেকে এতটা পথ জাহাজ বেয়ে ছুটে এসেছি, সেকি তোমাদের ঐ নবাবের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে? ঠিক আছে। তোমার মধ্যস্থতার কোনো দরকার নেই। আমি নিজেই পাঠাচ্ছি নবাবের কাছে।

আগে নবাবের হাতে পৌঁছল ওয়াটসনের চিঠি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব পাঠালেন। কিন্তু সে চিঠি ইংরেজদের হাতে এসে পৌঁছল না, ইতিমধ্যে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছ থেকে চিঠি এসেছে, কাউন্সিল বন্ধ থাক। তার বদলে এখন থেকে কাজ করবে সিলেক্ট কমিটি। সেই মত তৈরী হল সিলেক্ট কমিটি। প্রেসিডেন্ট রয়ে গেলেন রোজার ড্রেকই। তাঁর খুঁটির জোর ছিল। তাঁর কাকা বিলেতে কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর। ক্লাইভ এবং ওয়াটসনও সদস্য হলেন সিলেকট কমিটির। পরামর্শ হল, তাড়াতাড়ি করে কিছু করার দরকার নেই। মাদ্রাজ থেকে আরও সৈন্য-সামন্ত আসছে। যখন এসে পৌঁছবে তখন দেখা যাবে। ক্লাইভ বললেন, না। শুভস্য শীঘ্রম্। আবার অপেক্ষা করে কালক্ষয় কেন?

ক্লাইভ আর ওয়াটসন চেপে বসলেন সৈন্য-সামন্ত বোঝাই জাহাজে। মেজর কিলপ্যাট্রিককে নির্দেশ দেওয়া হল স্থলপথে আসতে।

"ক্লাইভ ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ময়দাপুরের ময়দানের নিকটে জাহাজ লাগাইয়া স্থলপথে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভাগিরথী-তীরে বজবজ নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। ওয়াটসন জলপথে সেই দুর্গ আক্রমণ করিবেন এবং যদি কেহ দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়নের আয়োজন করে, স্থলপথে ক্লাইভ তাহাদের ভবযন্ত্রণা দূর করিতে ত্রুটি করিবেন না,—এইরূপ সংকল্পে যুদ্ধ যাত্রা আরম্ভ হইল। কিন্তু যুদ্ধের উপক্রমেই গৃহ কলহের সূত্রপাত হইল। স্থলপথে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলে, কামান টানিবার জন্য, গরু ঘোড়া মহিষের প্রয়োজন। কলিকাতার পলায়িত ইংরাজগণ এই সকল জীবজন্তু সংগ্রহ করিয়া না দিলে ক্লাইভের উপায়ন্তর নাই। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই নবাবের ক্রোধোদ্দীপন করিয়া ক্লাইবের সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন না। ক্লাইব তাঁহাদিগকে ভীরু কাপুরুষ প্রভৃতি সুমিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া, স্বয়ং অধ্যবসায় বলে সমস্যা পূরণ করিতে অগ্রসর হইলেন; দুইটি মাত্র কামান এবং একখানি মাত্র বারুদের গাড়ি সজ্জীভূত হইল; পদাতিকগণ পর্যায়ক্রমে তাহা টানিয়া চলিতে লাগিল।" সিরাজদ্দৌলা।

অক্ষয় মৈত্র এবং কালীপ্রসন্ন লিখেছেন ময়দাপুর। অন্যত্র এর নাম মায়াপুর। বজবজ থেকে আটক্রোশ দূরে। ভাল রাস্তা-ঘাট নেই। চারদিকে বন-জঙ্গল। এই মায়াপুরেই ওয়াটসন তাঁর জাহাজ থেকে নামিয়ে দিলেন ক্লাইভ আর তাঁর সৈন্য-সামন্তদের। এখান থেকেই, বন-জঙ্গলে ঢাকা বেয়াড়া ধরনের রাস্তা ঠেলে সসৈন্যে ক্লাইভ এগিয়ে চললেন বজবজের দিকে। ওয়াটসন জাহাজে চেপে চললেন পিছনে পিছনে।

ইংরেজরা কলকাতার দিকে পা বাড়িয়েছে এই খবর কানে যেতেই নড়েচড়ে উঠলেন মানিকচাঁদ। তাইতো, কি করা যায় এখন ? শ্যাম রাখবো ? না কুল রাখবো ? নবাবের সঙ্গে নিমকহারামি করলে গর্দান যাবে। অথচ সন্ধি হবে, হতে চলেছে, এই ভেবে যুদ্ধের জন্যে কেউ প্রস্তুত নয়। সে যা হয় হবে, সৈন্য-সামন্ত যে-কজন আছে, তাই নিয়ে বজবজে বোঝাই করা যাক্। মানিকচাঁদও কলকাতা থেকে যাত্রা করলেন বজবজের দিকে।

১৭৫৬। ২৯ ডিসেম্বর। বজবজের মুখে এসে থামল ওয়াটসনের জাহাজ। তখন সকাল সাড়ে আটটা। তার খানিক আগে ক্লাইভ এবং কিলপ্যাট্রিক এসে পৌচেছেন সেখানে। এবার দু-পক্ষ মুখোমুখি হতে না হতেই যুদ্ধের শুরু। প্রথম আক্রমণ করলেন মানিকচাঁদই। মানিকচাঁদ আগের লড়াইটায় জিতে ভেবেছিলেন, ইংরেজ খেদানো এমন আর কি ব্যাপার ! ক্লাইভ নামক যোদ্ধার দাপটটা তখনো টের পাননি তিনি। ক্লাইভের কামান যখন গর্জন শুরু করল, তখন মানিকচাঁদের সেপাইদের মধ্যে গেল গেল রব। দুচারটে গোলা ফাটতে না ফাটতেই দুর্গ ছেড়ে চম্পট দিলেন তিনি। ইংরেজদের ইতিহাসে শোনা যায়, একটা গোলা নাকি লেগেছিল মাথার পাগড়িতে। পাগড়ীটা উড়ে যায়। বেঁচে যায় মাথাটা। সেনাপতি পালালেও, কিছু কিছু নবাবী সৈন্য তখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে ওয়াটসনের জাহাজ থেকে গোটাকতক কামানের গোলা ডাঙায় এসে পড়তেই, এদিকে সব চুপচাপ।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে এল। ওয়াটসনের সহকারী ক্যাপ্টেন আয়ার কুটের ইচ্ছে ছিল রাত্রের ভিতরেই দখল করে নেয় দুর্গটা। ক্লাইভ রাজী হলেন না। বললেন, আমি আর আমার সৈন্য-সামন্ত সকলেই সারা রাত মার্চ করে ক্লান্ত। আজ থাক। যা কাল সকালে হবে।

সেই রাত্রেই ঘটল এক মজার ব্যাপার।

নাম তার স্ট্রন। জাহাজের গোরা সৈন্য। মদের নেশায় মাতাল। নেশার ঘোরে সে করছে কি, বজবজের দুর্গের সামনে যে খাত, সেই খাতটা সাঁতরে সোজা গিয়ে উঠেছে কেল্লার দেওয়ালের উপর। এক হাতে একটা পিস্তল। আরেক হাতে একটা খাঁড়া। দুহাতে দুই অস্ত্র নিয়ে মাঝরাতে সে শুরু করে দিয়েছে চীৎকার, কেল্লা দখল করেছি আমি। এ কেল্লা আমার, এ কেল্লা আমার। চীৎকার শুনে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল কয়েকজন নবাবী সৈন্য। তাদের এক আধজন মারা পড়ল স্ট্রনের গুলিতে। একজন খাঁড়ার ঘায়ে। আর একজন এগিয়ে এসেছিল খাঁড়াটা ছাড়াতে। তাকে মেরে বসল এমন এক

ঘুঁসি, সে তো ধরাশায়ী। ইতিমধ্যে ইংরেজদেরও অনেকে এসে পৌছল সেখানে, ইংরেজদের দেখে নবাবী সৈন্যের যে যেদিকে পারে দৌড়।

এইভাবে রাত কাটল যখন, নেশাও কাটল স্ট্রন সাহেবের। নেশা কাটতেই কানে এল, কোর্ট মার্শাল হবে। তখন হাতে পায়ে ধরে মিনতি। জীবনে আর কোনদিন এমন কাজ করব না। এবারের মত প্রাণটা ভিক্ষে দিন।

পরের দিন সকালে বলতে গেলে বিনা লড়াইয়ে বজবজ দুর্গটা হাতে এসে গেল ক্লাইভের। এবার কলকাতা জয়ের পালা। ক্লাইভ পা বাড়ালেন কলকাতার দিকে। পা বাড়াবার আগে বজবজের দুর্গটাকে ভেঙে-গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিলেন ধুলোয়। পাছে কোনো ফাঁকতাল পেয়ে নবাবের সৈন্যরা আবার না সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হাজির হয়। দুর্গটাকে ভেঙে ফেললে, এখান দিয়ে জাহাজ নিয়ে আসা যাওয়ার সময় কেউ বাধা দিতে পারবে না।

পথে আরো দুটো দুর্গ দখল হয়ে গেল। একটা মেটেবরুজের। আরেকটা থানা। থানা-য় মিলে গেল গোটা চল্লিশেক কামান। আসলে সেগুলো ইংরেজদেরই। ফোর্ট উইলিয়মের সম্পত্তি। মানিকচাঁদ টেনে এনেছিল শত্রুদের সঙ্গে লড়তে।

মেটেবরুজে পৌছে ক্লাইভ নেমে পড়লেন ডাঙায়। সেখান থেকে পায়ে হাঁটা। ওয়াটসন আগে আগে জাহাজে।

১৭৫৭। ২ ডিসেম্বর। ফোর্ট উইলিয়মের প্রায় কাছাকাছি পৌছে ওয়াটসন জাহাজ থেকে ছুঁড়লেন গোটা কতক গোলা। বেলা দশটার সময় ফোর্ট উইলিয়মের সামনে এসে জাহাজ থামল যখন, তখন সব শান্ত। মানিকচাঁদ পালিয়েছেন হুগলীর দিকে। জাহাজ থেকে একে একে নামলেন ক্যাপটেন আয়ারকুট আর ক্যাপটেন কিং। দখল করে নিলেন ফোর্ট উইলিয়ম।

ক্লাইভের সৈন্যরা এসে পড়ল খানিক পরে। সৈন্যরা মহানন্দে ফোর্টের ভিতরে ঢুকতে গেল। হুমকি দিয়ে উঠল ফটকের শান্ত্রীরা, হুকুম নেই। হুকুম নেই? কার হুকুম? এ্যাডমিরাল ওয়াটসনের।

যথাসময়ে ক্লাইভেরও কানে এল এই খবর। ওয়াটসন নাকি আয়ারকুটকে করে দিয়েছেন ফোর্ট উইলিয়মের গভর্ণর। ক্লাইভ যখন ফটকের সামনে এলেন শান্ত্রীরা তাঁকে পথ ছেড়ে দিল। কারণ তারা ক্লাইভকে চেনে। ক্লাইভ ভিতরে গিয়ে আয়ারকুটের কাছে চাবি চাইলেন দুর্গের। আয়ারকুট লোক পাঠালেন জাহাজে; ওয়াটসনের কাছে, মতামতের জন্যে। ওয়াটসন বলে পাঠালেন, ক্লাইভ যদি জেদ ধরে চাবির জন্যে, তাহলে সেটা ঘটবে, যেটা খুবই অপ্রীতিকর। ক্লাইভ

ওয়াটসনকে জানালেন, ওয়াটসন নিজে এসে ফোর্টের দায়িত্ব নিলে, সেটা তাঁকেই দেওয়া হবে। পরের দিন সকালে জাহাজ থেকে ফোর্টে পা দিলেন ওয়াটসন।

ডাক পড়ল সেই ড্রেক সাহেবের। তাঁরই হাতে তুলে দিলেন দুর্গের চাবি। গভর্ণর হলেন তিনি।

এই ঘটনার আরও এক সংস্করণ –

"ক্লাইব এবং ওয়াটসন দুজনেই চতুর চূড়ামণি। চতুরে চতুরে সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার উপক্রম হইল। উভয়েই বুঝিলেন যে, দুর্গ যাঁহার হস্তে থাকিবে, লুঠের ধনে তাঁহারই আধিপত্য জন্মিবে। সুতরাং ওয়াটসন দুর্গ দখল করিবার জন্য কাপ্তেন কুটকে এক পরোয়ানা প্রদান করিলেন। কাপ্তেন কুট পরোয়ানা লইয়া দুর্গ-দ্বারে উপনীত হইবামাত্র ক্লাইব তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'ওয়াটসনের অধিকার মানিনা ; আমি দুর্গাধিপতি – যদি আজ্ঞা পালন করিতে ইতস্ততঃ কর, এখনই কারারুদ্ধ করিব !' কুট সাহেব কূট-কৌশলে পরাস্ত হইয়া, ওয়াটসনকে পরোয়ানা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ওয়াটসন সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি কাপ্তেন স্পিককে পাঠাইয়া দিলেন। স্পিক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহার আজ্ঞায় দুর্গাধিকার করিয়াছ ?' ক্লাইভ বলিলেন যে, তিনিই প্রধান সেনাপতি, সুতরাং দুর্গাধিকারে তাঁহারই একমাত্র ক্ষমতা, ওয়াটসনের কোন ক্ষমতা নাই! এই সংবাদে ওয়াটসন বলিয়া পাঠাইলেন যে, ক্লাইব সহজে দুর্গাধিকার পরিত্যাগ না করিলে, তাঁহাকে কামানের গোলায় উড়াইয়া দিবে। ক্লাইব বলিলেন, তথাস্তু। কিন্তু এই আত্মকলহের জন্য ওয়াটসন দায়ী। অবশেষে কাপ্তেন লাথাম ও স্বয়ং ওয়াটসনও দুর্গমুখে শুভাগমন করিলেন এবং এবং অনেক তর্ক-বিতর্কের পর উভয় পক্ষেই সন্ধি হইয়া ক্লাইবের হস্তেই দুর্গাধিকার সমর্পিত হইল।......উভয় দলের মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য ড্রেক সাহেবকে কলিকাতার শাসনভার প্রদান করা হইল।" সিরাজদ্দৌলা।

এই ঘটনার কদিন পরেই ক্লাইভ চিঠি লিখেছিলেন মাদ্রাজের গভর্ণর পিগট সাহেবকে, মনের জালা জুড়োতে। তাতে লিখেছিলেন, বন্ধুবান্ধবের কাছে আমার মনের অনুতাপ আপনা থেকেই ফেটে পড়ে। সত্যি! কি কুক্ষণে যে যে এই অভিযানের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। মিঃ ওয়াটসন আর স্কোয়াড্রনের লোকজনের কাছ থেকে যে ধরণের অপমান-অসম্মান পেয়েছি, বিশেষ করে আমার পদ-মর্য্যাদার ব্যাপারে, কোম্পানীর স্বার্থ এবং সেবা যদি আমার কাছে একটা বড় ব্যাপার না হতো, কোনদিনই ওদের কাছে মাথা নোয়াতাম না আমি।

আবার কলকাতা। হারানিধি আবার হাতের মুঠোয়। খবর ছুটল ফলতায়। সবাই ফিরে এসো।

নেতারা দেখলেন, দুর্গের ভিতরে কোম্পানীর জিনিষপত্র যেখানে যেমনটি ছিল, তেমনটিই রয়েছে। লুটপাট হয়নি কিছুই। হয়েছে যা, সেটা দুর্গের বাইরের বাড়ি-ঘরে। দেখতে-দেখতে আবার ভরে উঠল কলকাতার সাহেব পাড়া। সেটার অবস্থা যদিও তখন ভাগাড়ের মত। ঘর আছে। দরজা-জানলা নেই। নবাবের সেপাইরা উপড়ে নিয়ে গিয়ে উহুন ধরিয়েছে। হাত লাগানো হল মেরামতির কাজে। ফোর্টের ভিতরে একটা মসজিদ তোলা হয়েছিল। ভেঙে ফেলা হল। সেই সঙ্গে বদলে দেওয়া হল কলকাতার নতুন নাম। অর্থাৎ আলিনগর বদলে দিয়ে আবার কলকাতা।

সকলেই রইলেন কলকাতায়। ব্যতিক্রম শুধু ক্লাইভ। তার কারণ কি? কারণ একাধিক। পয়লা নম্বর কারণ, দুর্গটা ভাঙা। দু নম্বর, এখানে বসবাস করে আর যাইহোক, লড়াই বাধলে যুদ্ধ করা যাবে না। তার যে অনেক বাধা সেটা আগেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তিন নম্বর, ওয়াটসন তাঁর উপর খাপ্পা। কাছাকাছি থাকলে কখন বলতে কখন কি নিয়ে খটাখটি লাগবে, তার স্থিরতা নেই। চতুর্থ, সিলেকট কমিটির অন্য সদস্যরাও তাঁর উপর সদয় নন। সুতরাং দূরে থাকাই শ্রেয়। এই সব সাত পাঁচ ভেবে ক্লাইভ গিয়ে তাঁবু খাটালেন বরানগরে। কাশীপুরের উত্তর দিকে একটা ফাঁকা মাঠে।

পরের দিন ৩ জানুয়ারী। ক্লাইভ এবং ওয়াটসন আলাদা-আলাদা করে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন সিরাজের বিরুদ্ধে।

বরানগর সুখের জায়গা নয়। বন জঙ্গলের দেশ। দিনে-রাতে বন-বরার উৎপাত। সেই এঁদো জায়গাতে বসেই ক্লাইভ পরিকল্পনা করতে লাগলেন, কি ভাবে বদলা নেওয়া যায় সিরাজের কলকাতা আক্রমণের। তাঁর হাত-পা নিস্ পিস্ করছে তখন, আরো যুদ্ধের জন্যে। এই অল্পদিনে তিনি বুঝে গেছেন দেশীয় লোকদের হালচাল। সামান্য একটু ভয় দেখালেই এঁরা কাঁপতে থাকে আতংকে উদ্বেগে। তাহলে এদের আরও একটু ভয় দেখানো যাক।

সিলেকট কমিটিতে পেশ করলেন প্রস্তাব। প্রস্তাব গৃহীত হল। হুগলী লুণ্ঠনের প্রস্তাব। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ থেকে পৌঁছে গেছে ওয়ালপোল নামের জাহাজটা, সেটা হারিয়ে গিয়েছিল ঝড়ে। তার মধ্যে রয়েছে ক্লাইভের নিজের হাতে গড়ে-পিটে মানুষ-করা শ' চারেকের মত সেপাই। যুদ্ধের বহুরকম সরঞ্জাম। সুতরাং বুকের সাহসটাও অনেক চওড়া হয়ে গেল ইংরেজদের।

ইংরেজরা আক্রমণ করবে। এই খবরটা হুগলীতে পৌঁছতেই, সেখান থেকে লোক পালাতে লাগল দলে-দলে। কাশিমবাজার কুঠির সার্জন হলেন ডাক্তার উইলিয়ম ফোর্থ। তিনি তখন কাশিমবাজার থেকে পালিয়ে লুকিয়ে আছেন ডাচদের আশ্রয়ে, চুঁচড়োয়। তিনি খবর পাঠালেন কলকাতায়, হুগলী ফাঁকা হতে চলেছে। আক্রমণ করার স্বর্ণ সুযোগ এখনই।

জানুয়ারীর ৪ তারিখ। ওয়াটসন আর ক্লাইভ তাঁদের দুজনের সৈন্য থেকে বেছে-বেছে জড়ো করলেন, হুগলী আক্রমণের জন্যে। শ' তিনেক দেশী সিপাইও রইল তাদের সঙ্গে। এই নিয়ে তৈরী হল সেনাবাহিনী। অভিযানের নেতা হলেন মেজর কিলপ্যাট্রিক। সঙ্গে সেনাধ্যক্ষ হিসেবে রইলেন ক্যাপ্টেন আয়ার কূট আর কিং। জাহাজের নাম ব্রীজওয়াটার।

অভিযান শুরু হল বটে। কিন্তু বিপদ ঘটতে লাগল প্রতি পদক্ষেপে। প্রথম বিপদ ঘটল বাগবাজারে পেরিন সাহেবের বাগানের কাছে এসে। ব্রীজওয়াটার আটকে গেল চড়ায়। সেটা থেকে যদিবা উদ্ধার ঘটল, পরের ধাপে আটকাল বরানগরে পৌঁছে। জাহাজ যে হুগলীতে যাবে, চালাবে কে? পাইলট কই?

কিলপ্যাট্রিক সাহায্য চাইলেন ডাচ গভর্ণর বিসডোমের কাছে। তিনি সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন, অসম্ভব। পাইলট জুগিয়ে নবাবকে চটাবো নাকি? তাহলে উপায়? ঠিক সেই সময়ে বরানগরের কাছে ডাচদের একটা জাহাজ ছিল নোঙর করা। ব্রীজওয়াটার থেকে কাপ্টেন স্মিথ নামে এক সাহেব সোজা হানা দিলেন সেই জাহাজে। চ্যাং-দোলা করে তুলে নিয়ে এলেন পাইলটকে।

পরের দিন থেকে যুদ্ধ। বেশী লড়াই করতে হল না। দুচারটে কামানের গর্জন শুনেই দুর্গের সৈন্যরা যে-দিকে পারল পালাল। ইংরেজ সৈন্য দুর্গ জয় করে শুরু করে দিলে লুটপাট।

"On the 12th, Captain Cook, with fifty Europeans and one hundred sepoys, marched to Bandel, a large village three miles north of the fort, where they destroyed several granaries of rice and in their turn were surrounded in the village by the fugitive garrison, and the troops which has been sent from Moorshedabad, from whom they disengaged themselves without losing a man. On the 16th, a party proceeded in boats some miles to the northward and destroyed several more granaries on each side of the river; and on the 19th. the Europeans with the smaller vessels returned to Calcutta."

এ হল অর্মে সাহেবের বর্ণনা। ক্লাইভ নাকি হিসেব কষে দেখেছিলেন, লুটের মালের দাম হবে দেড় লক্ষ টাকার মত।

হুগলী লুঠ করা হল কেন, এ প্রশ্নের জবাবে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সকলেই প্রায় এক মত। সিরাজকে নিজেদের দাপট দেখানো। যাতে নবাব তাদের ভয় করতে শেখেন। উইলসন বলেছেন শত্রুপক্ষের একটা সমৃদ্ধ শহরের উপর এই 'successful blow', যুদ্ধের একটা সাধারণ নিয়মকানুনের চেয়ে বেশী কিছু নয়।

"১০ই জানুয়ারী ইংরেজ জাহাজ হুগলীর সম্মুখীন হইয়া অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল ; দুর্গরক্ষক সৈন্যদল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। দুর্গ ও ফৌজদারী সম্পত্তি এবং সমৃদ্ধ হুগলী নগর লুণ্ঠিত হইল। ১২ই হইতে ১৮ই পর্যন্ত উভয় পার্শ্বে ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি স্থানের গোলাবাড়ি ও প্রজাগণের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া ইংরেজদল কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

কলকাতায় ফিরেই ক্লাইভ চিঠি লিখলেন মাদ্রাজে। হুগলী দখল বেশ ভালভাবেই শেষ হয়েছে। কলকাতাকে মজবুত করা হচ্ছে নবাবের সঙ্গে লড়বার জন্যে। সিলেকট কমিটি এখন আমার আর ওয়াটসনের উপর ভার দিয়ে দিয়েছে, নবাবের সঙ্গে মোকাবিলার। নবাব পা বাড়িয়েছেন কলকাতার দিকে। তিনি জানিয়েছেন, গভর্ণর ড্রেককে যদি কোম্পানীর 'ম্যানেজমেণ্ট' থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি মিটমাটের আলোচনায় বসতে রাজী আছেন।

এই সময়কার চিঠিতে ক্লাইভ আরো একটা কথার উপর জোর দিতে লাগলেন। সেটা তাঁর মাদ্রাজে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে। ২০ জানুয়ারী মাদ্রাজের পিগট সাহেবকে একটা ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখলেন, হয় যুদ্ধ, নয় সন্ধি, এর যে কোন একটা না-ঘটা পর্যন্ত, কলকাতার প্রতি আমার কর্তব্যকে অর্ধসমাপ্ত রেখে এখনই মাদ্রাজে ফিরতে পারবো না।

এই সময়েই বিলেত থেকে চিঠি এল, আবার আমাদের যুদ্ধ বেধেছে ফরাসীদের সঙ্গে। তোমরাও সাবধান হও বাংলাদেশে। সংবাদ পেয়ে মুষড়ে পড়লেন ক্লাইভ। ফরাসীরা যদি হাত মেলায় নবাবের সঙ্গে ? এই বিপদে কে বাঁচাতে পারে ? মনে পড়ল দুটো নাম। জগৎশেঠ এবং খোজা ওয়াজেদ। চিঠি লিখলেন দুজনকেই। আগেও লিখেছেন। এবারের প্রার্থনা, নবাবের সঙ্গে সন্ধি। জগৎশেঠ ক্লাইভের চিঠির জবাবে লিখলেন, খুব বাজে কাজ করে বসে আছ তোমরা। গায়ের জোরে দখল করলে কলকাতা। তারপরই আক্রমণ করলে হুগলী। এসব দেখে অনুমান হয়, তোমাদের মতলবটা কেবল যুদ্ধ

করার। এই রকম একটা অবস্থায় আমি নবাবের কাছে কোন মুখে তোমাদের হয়ে সুপারিশ করবো বলতে পার? তোমরা এই সব জোর-জবরদস্তি চালিয়ে যাবে আর নবাব না-দেখার ভান করে চোখ বুজে সে সব সয়ে যাবেন, এটাই বা আশা করো কি করে? যাই হোক, তোমাদের সত্যিকারের দাবী-দাওয়াগুলো কী, সেটা জানাও। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো তোমাদের বিপদ থেকে বাঁচাতে।

খোজা ওয়াজেদ তাঁর উত্তরে জানালেন, নবাব বনাম তোমাদের এই বিবাদ মেটাতে চন্দননগরের গভর্ণর মঁসিয়ে রেনলকে মধ্যস্থতা করার ভার দেওয়া যেতে পারে।

২১ জানুয়ারী ক্লাইভ উত্তর দিলেন দুজনকে। জগৎশেঠকে লিখলেন, আপনার সদিচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ। সিরাজদ্দৌলা কলকাতাকে কী ভাবে ধ্বংস করেছেন, সে কথা বহুজনের মুখে শুনেছেন। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। নবাবের ধনৈশ্বর্যের মূলে অনেকখানি অবদান রয়েছে যাঁদের, সেই সব মানুষের উপর কি ভাবে তিনি চালিয়ে গেছেন নির্যাতন-নিপীড়ন, সে সব বীভৎস কাহিনীরও উল্লেখ করতে চাই না। ১২০ জনের মত সম্ভ্রান্ত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে কলকাতার দুর্গে। আপনাদের নবাবের কাছ থেকে এটা আমরা প্রত্যাশা করিনি। কারণ শুনেছি তিনি যেমন সবল চরিত্রের মানুষ, তেমনি হৃদয়বানও। আমার মনে হয়, এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে নবাবের অগোচরে। এই রকম পরিস্থিতিতে আমরা কি শুধু হা-হুতাশ করে দিন কাটাবো? আমরা কি নবাবের কাছে একাধিক চিঠি পাঠাইনি? ফলতায় কি আমরা দীর্ঘদিন হাত গুটিয়ে বসে থাকিনি? বজবজের গভর্ণরই কি প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেননি আমাদের বিরুদ্ধে? এসব সত্ত্বেও আমরা শান্তি চুক্তিতে রাজী। আপনার কাছে এই চিঠির সঙ্গে আমাদের প্রস্তাবগুলো পাঠালুম। আপনি বিবেচক মানুষ। পড়লেই বুঝবেন প্রস্তাবগুলো কতখানি ন্যায়সঙ্গত। এবং আপনি নিশ্চয়ই আপনার প্রভাব খাটাবেন, নবাবকে দিয়ে এগুলো আদায় করে নিতে। তাহলেই আপনি যথার্থ দেশ-প্রেমিকের কাজ করবেন। এবং এই দেশটাকে বাঁচাবেন চরম ধ্বংসের হাত থেকে।

ইত্যাকার সবিনয় নিবেদনের শেষে ক্লাইভের রক্তচক্ষুর হুমকী। মনে রাখবেন ইংরেজ একটা বিরাট জাত। আমাদের দেশের রাজা আপনাদের নবাবের চেয়ে মোটেই দুর্বল নয়। আমরা এমনি-এমনি ছুটে আসিনি। আপনাদের নবাবের মত আরও অনেক শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা হয়েছে

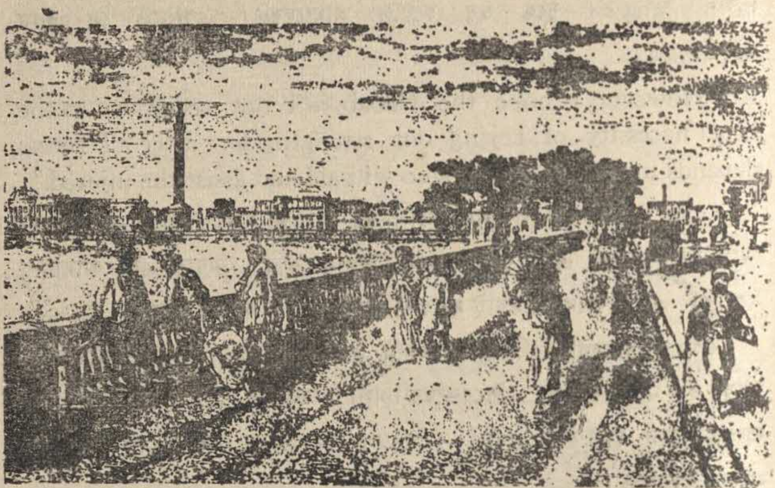
দক্ষিণ ভারতে। যুদ্ধে জয় হয়েছে আমাদেরই। এখানেও সে রকম ঘটতে পারে।

"However I hope the Nabab will not reduce us to the cruel necessity of tryjng our strength, for after all sucess depends upon God alone, who will aid and assist the injured."

খোজা ওয়াজেদকে লিখলেন, ফরাসীদের মধ্যস্থতা মানতে রাজী নই আমরা। আপনাদের সততা এবং বন্ধুত্বে আমি বিশ্বাস করি। নবাব এবং আমাদের মধ্যেকার এই বিবাদে শেঠেরাই মধ্যস্থতা করুক, এটাই আমার ইচ্ছে।

জগৎশেঠরা তখুনি এগিয়ে আসেননি মধ্যস্থতা করতে। অর্মের মতে তার কারণ হল নবাবের ভয়। ইংরেজদের হুগলী আক্রমণের খবর পেয়ে নবাব তখন জ্বলছেন যেন দাউ-দাউ মশাল। শেঠদের সাহসে কুলোয়নি সেই আগুনের সামনে দাঁড়াতে।

ক্লাইভ মনে-প্রাণে চাইছিলেন সন্ধি। এবং দ্রুত। কারণ বাংলাদেশের ফরাসীদের কানে তখনো এসে পৌঁছয়নি, স্বদেশের যুদ্ধের খবরটা। এসে পৌঁছলেই ফরাসীরা ঝুঁকে পড়বে নবাবের দিকে। নবাব তখন ধরবেন রুদ্রমূর্তি। সুতরাং যা করতে হবে, সব তড়িঘড়ি।



॥ আলিনগরের সন্ধি ॥

হুগলী লুণ্ঠনের খবর পেয়েই সিরাজদ্দৌলা বেরিয়ে পড়লেন রাজধানী ছেড়ে, সসৈন্যে। সঙ্গে উমিচাঁদ এবং রণজিৎ রায়। তাঁদের পরামর্শে হুগলী থেকে ওয়াটসনকে লিখলেন এক সন্ধিপত্র।

"তোমরা হুগলী লুটপাট করেছ। লড়াই করেছ আমার প্রজাদের সঙ্গে। এটা নিশ্চয়ই সওদাগরের উপযুক্ত কাজ নয়। তাই আমাকে রাজধানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে হুগলীতে। আমার অগ্রবর্তী সেনাবাহিনী এখন নদী পার হচ্ছে। এখনো সময় আছে। যদি আগেকার মত নিয়ম-কানুন মেনে কোম্পানীর বাণিজ্য চালাতে চাও, তাহলে তোমাদের পক্ষ থেকে একজন যোগ্য প্রতিনিধি পাঠাতে পার আমার সঙ্গে তোমাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে কথা বলতে। আমি সেই মত সন্ধি করতে চাই। তোমরা যদি আমার সঙ্গে বনিকের মত ব্যবহার করো, আমার আদেশ মত চলতে চাও, অকারণে আমাকে উত্ত্যক্ত না করো, আমি কোনদিনই তোমাদের ক্ষতির চিন্তা কোরবো না। বরং তোমাদের সুখ-সুবিধের কথাটাই ভাববো। তুমি খ্রীস্টান। বিবাদকে জীইয়ে রাখার চেয়ে শান্তির জন্য চেষ্টা করাটাই যে সবচেয়ে কল্যাণকর, সেটা তুমি জান। তবুও তোমরা যদি নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যাবতীয় স্বার্থকে নষ্ট করে যুদ্ধ করার জন্যেই কোমর বেঁধে থাক, তাহলে আমাকে দোষ দিও না। যুদ্ধ মানেই সর্বনাশ। সেই অশুভ পরিণাম রোধ করার জন্যেই এই চিঠি।"

উত্তরের অপেক্ষা করলেন না আর। ৩০ জানুয়ারী। হুগলী থেকে গঙ্গা পার হয়ে কলকাতার দিকে রওনা দিল নবাবের সৈন্যবাহিনী। এদিকে কলকাতায় ইংরেজরাও প্রস্তুত। বাগবাজার থেকে আধ ক্রোশ দূরে ক্লাইভের ঘাঁটি। ২রা ফেব্রুয়ারী অগ্রগামী সৈন্যদল পৌঁছে গেল কলকাতায়। একেবারে ক্লাইভের ঘাঁটির মুখোমুখি। সঙ্গে-সঙ্গে গর্জে উঠল কামান। সঙ্গে-সঙ্গে নবাবী সৈন্যরাও জবাব দিল তার। ক্লাইভ কি ভেবে থামিয়ে দিলেন গোলা বর্ষণ। সৈন্যদের বললেন, থামো। সন্ধ্যে পর্যন্ত সব চুপচাপ।

নবাব তখন কলকাতা থেকে দূরে, নবাবগঞ্জে। ডেকে পাঠিয়েছেন ইংরেজদের দূতকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। ক্লাইভের কানে পৌঁচেছে সে খবর। ক্লাইভ সন্ধির জন্যে ব্যাকুল। অন্য কারণ ছাড়াও সবচেয়ে জরুরী কারণ ছিল আরো দুটো। এক নবাবের ভয়ে কেউ ইংরেজদের খাবার দাবারের জিনিষ বেচতে রাজী নয়। দুই, আবার কলকাতা আক্রমণ করতে আসছেন নবাব, এই শুনে সাহেবদের চাকর-বাকরেরা যে যেদিকে পারে চম্পট দিতে শুরু করেছে। ইংরেজদের মরার অবস্থা।

নবাবের কাছে ক্লাইভ দূত পাঠালেন দুজন। দুজনেই ক্লাইভের বিশ্বস্ত। জন ওয়ালস আর লুক স্ক্রাফটন। কিন্তু তারা যখন নবাবগঞ্জে গিয়ে পৌঁছল, নবাব তখন কলকাতায়। সেটা ৩ ফেব্রুয়ারী। হালসিবাগানে উমিচাঁদের বাগানবাড়ি। সেইখানে তাঁবু পড়ল নবাবের।

"সেকালের কলিকাতা সহরে বনিকরাজ উমাচরণের রাজবাটীই সর্বাপেক্ষা পরম রমণীয় স্থান বলিয়া সুপরিচিত ছিল। সুতরাং তাঁহার দীপালোকবিভূষিত সুসজ্জিত পুষ্পোদ্যানেই সিরাজদ্দৌলার দরবার বসিল। চারিদিকে গর্বোন্নতমস্তকে সশস্ত্র সেনাপতিগণ দণ্ডায়মান, যথাযোগ্য রাজ-পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া অমাত্যদল যথাস্থানে করযোড়ে উপবেশন করিয়াছেন, মধ্যস্থলে সিংহাসন, তাহার উপর সুবিস্তৃত মসনদ, কনকদণ্ডের উপর বিবিধ রত্নরাজি-বিজড়িত বিচিত্র চন্দ্রাতপ, সেই স্বর্ণসিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া সিরাজদ্দৌলার যৌবনোন্নত সুকুমার দেহকান্তি সদ্যোজাত প্রফুল্ল চম্পকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে; ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়ালস ও স্ক্রাফটন দরবারে পদার্পণ করিয়া সিরাজদ্দৌলার সৌভাগ্য-গর্বে ফলিত জ্যোতিতে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এই রত্নসিংহাসন যাঁহার পাদপীঠ, এই সুশিক্ষিত দৃঢ়োন্নত বীরমণ্ডলী যাঁহার সেনানায়ক, এই বিবিধ বিদ্যাবিশারদ মন্ত্রীদল যাঁহার মন্ত্রণাসহায়, এই বিভাচ্ছটা যাঁহার রত্নমুকুট সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, সর্বনাশ! ইংরাজ বনিক কোন সাহসে তাঁহার সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন?" সিরাজদৌলা।

দুই দূত যখন নবাবের দরবারে ঢুকছে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মন্ত্রী দুর্লভরাম। তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছিল, এরা হয়তো দূত নয়। আততায়ী। নবাবকে হত্যা করাই এদের আসল মতলব। তাই তল্লাস করে দেখা হল তাদের সর্বাঙ্গ। লুকনো পিস্তল-টিস্তল আছে নাকি কোনখানে। না, নেই। তখন অনুমতি দেওয়া হল দরবারে ঢুকতে।

দুই সাহেব কুর্নিশ ঠুকলেন দরবারে গিয়ে। ইতিহাস বলে, এঁদের সঙ্গে ছিলেন আরো একজন। তিনি অবশ্য সাহেব নন, বাঙালী মুন্‌শী নবকৃষ্ণ। নবাবও সাদর সম্ভাষণ জানালেন দূতদের। জানালেন, যুদ্ধ নয়, শান্তি স্থাপনের জন্যেই এত দূরে ছুটে এসেছেন তিনি। দূতদ্বয় জানালেন, আমরাও যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। বেশ! তাহলে চলে যাও দেওয়ানের পটমণ্ডপে। সন্ধির খসড়া তৈরী কর।

সিরাজ দরবার ভেঙে দিয়ে চলে গেলেন বিশ্রাম করতে। দূতদ্বয় দরবার থেকে বেরিয়ে পটমণ্ডপে যাবেন। মাঝপথে দেখা উমিচাঁদের সঙ্গে। উমিচাঁদ তাদের কাছে এসে কানে কানে জানালেন, কোথায় যাচ্ছ? সন্ধির খসড়া বানাতে? তাহলে শুনে রাখো, এই যে সন্ধি, এটা আসলে একটা ছল। নবাবের সৈন্যরা এসেছে। কিন্তু কামানগুলো এখনো এসে পৌঁছায়নি। এখন সন্ধির কথা বলে তোমাদের ভুলিয়ে রাখছে। কামান এলেই আর এক মুহূর্ত দেরী করবেন না। তোমাদের নিপাত করবেন ঝাড়ে-বংশে। আর দেওয়ানের পটমণ্ডপের ধার-কাছ মাড়িও না। গেলেই বন্দী করবে তোমাদের।

উমিচাঁদের কথা শুনে দূত দুজনের প্রাণ তো খাঁচা ছাড়ার মত অবস্থা। তাঁরা মশাল নিভিয়ে রাতের অন্ধকারে পালাল দুর্গের দিকে।

অন্য ইতিহাসে আমরা খবর পাই অন্য রকম। ক্লাইভের দূত নাকি নবাবের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেছিল এই বলে যে, নবাবকে এখুনি চলে যেতে হবে কলকাতা ছেড়ে। এবং প্রস্তাবটা ক্লাইভের শিখিয়ে দেওয়া। আরো জানা যায় ক্লাইভ নাকি দূত দুজনকে পাঠিয়েছিলেন গুপ্তচরের কাজ করতে। নবাবের ফৌজের বহরটা কি রকম, সেটা জেনে আসাটাই আসল কাজ। সেই জন্যেই ফার্সি জানা নবকৃষ্ণকে পাঠিয়েছিলেন সঙ্গে।

গভীর রাতে চুপিসাড়ে দূত দুজন এসে ঢুকলেন ক্লাইভের তাঁবুতে, বরানগরে। ক্লাইভ সব শুনলেন। সঙ্গে-সঙ্গে স্থির করে নিলেন নিজের সিদ্ধান্ত। আর কালক্ষয় নয়। এই সুযোগে নবাবকে দেখিয়ে দিতে হবে আমাদের শক্তির দাপট।

রাত্রেই লোক পাঠালেন ওয়াটসনের কাছে। এখুনি কিছু সৈন্য দাও আমাকে। অন্য সময় ওয়াটসন ক্লাইভের খবরদারি শুনতে নারাজ। সেদিন কিন্তু শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন ৫০০ গোরা সৈন্য জাহাজে চাপিয়ে। জাহাজ যখন বাগবাজারে পেরিন সাহেবের বাগানের কাছে এসে থামল, তখন রাত একটা। ক্লাইভের সৈন্যরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত।

রাত তিনটে। শুরু হল অভিযান। ক্লাইভ চললেন হালসিবাগানের দিকে। সঙ্গে ৫০০ গোরা পল্টন। ৫০০ জাহাজি গোরা। ৮০০ দিশি সেপাই। ৬০ জন গোলন্দাজ। আর দুটো কামান।

আর নবাবের সৈন্যসংখ্যা তখন ৬০০০ সেপাই। ১৮০০০ অশ্বারোহী। ৪০টা কামান। কিন্তু তারা মনের সুখে ঘুমিয়ে রয়েছে তখন। লড়াই-এর ল নিয়েও তাদের মাথা ব্যথা নেই।

উপরের সৈন্য সংখ্যার হিসেব অক্ষয় মৈত্রের। যদুনাথ সরকার জানান অন্য হিসেব। নবাবের সঙ্গে ছিল ৪০ হাজার অশ্বারোহী, ৬০ হাজার পদাতিক, আর ৩০টা কামান। আর ইংরেজদের ৭১১ জন ইউরোপীয় পদাতিক, ১০০ জন গোলন্দাজ, ১৩০০ সেপাই আর ১৪টা কামান।

"তিনজন করিয়া পাশাপাশি সাজাইয়া ইংরেজদলকে সুদীর্ঘ করা হইল। গোরা সৈন্যের পূর্ব ও পশ্চাদ্ভাগে চিরপ্রথানুসারে কালাসিপাহী দ্বারা আচ্ছাদন দেওয়া হইল। লস্করগণ ও জাহাজী গোরা পশ্চাতে থাকিল। তাহাদের মধ্যেই পর্য্যায়ক্রমে কামানের গাড়ী টানিবার ব্যবস্থা হইল। পূর্বপ্রেরিত লোকগণের সাহায্যে নবাব সৈন্যের অবস্থান সুপরিজ্ঞাত ছিল ; সুতরাং ইংরেজ সৈন্য নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিপক্ষ শিবিরের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

"একে নিশাকাল, তাহাতে দারুণ শীত। সকলেই নিঃশব্দ নিঝুম। সেই নৈশ নীরবতা আলোড়ন করিয়া ইংরাজের কামানগুলি ভীম কলরবে গর্জন করিয়া উঠিল। গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্ ! ; গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্ ! ; গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্ ; ইংরাজদের কামান ঘন ঘন ডাকিতে লাগিল গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম ! সহসা সুপ্তোত্থিত হইয়া সিপাহী সেনা কামান গর্জনের কারণ বুঝিতে পারিল না। তাহারা তুমুল কোলাহলে নবাব-শিবির আকুল করিয়া তুলিল এবং যে যেখানে ছিল, হাতিয়ার বাঁধিয়া, মশাল জ্বালাইয়া কামানের নিকট দাঁড়াইতে লাগিল। তখন নবাব শিবিরের কামানগুলিও প্রচণ্ড বিক্রমে অনলবর্ষণ করিতে ত্রুটি করিল না।" সিরাজদৌলা।

কামান গর্জন করছে, গোলা ফাটছে, সবই ঠিক। কিন্তু যুদ্ধটা চলল

এলোপাথাড়ি, কে যে কার শত্রু, কে যে আক্রমণ করছে কাকে, সে সব না বুঝেই। কারণ হালসিবাগানের চারপাশের ধানক্ষেতে তখন গাঢ় কুয়াশা। তার উপরে রাতের অন্ধকার। ফলে অনেকে তাদের নিজের দলের লোককেও শত্রু ভেবে মেরে বসল অন্ধকারে। কুয়াশা কাটল সকাল ন'টায়। ক্লাইভ তখন দেখতে পেলেন, তিনি একেবারে নবাব শিবিরের ভিতরেই। চারদিকে নবাবী সৈন্য। তখন শুরু করলেন পিছু হটা। হালসীবাগান থেকে শিয়ালদহের দিকে। সেখান থেকে বৌবাজার, মারাঠা ডিচ পেরিয়ে। বৌবাজার থেকে লালবাজার। সেখান থেকে ফোর্ট উইলিয়ম। বেলা তখন দুপুর বারোটা।

ক্লাইভের ইচ্ছে ছিল নবাবকে বন্দী করা। সেটা সম্ভব হল না। ক্লাইভের পাঠানো দূত দুজন দেওয়ানের পটমণ্ডপে না গিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে গেছে, এই এই খবর পেয়েই তিনি উমিচাঁদের বাগানবাড়ি থেকে সরে গিয়ে পাশেই গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানবাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। অন্য মতে ঢাকুরিয়ার দিকে।

ক্লাইভের ক্ষতি হল অনেক। সৈন্য মারা গেছে অনেক। দু-দুটো কামান দখল করে নিয়েছে নবাবী সৈন্য। ক্ষয়-ক্ষতি যাই হোক, ভাঙবো তবু মচকাবো না, এই রকমই স্বভাব তাঁর। ফোর্ট উইলিয়মে পৌঁছেই নবাবকে লিখে বসলেন একটা চিঠি। আজ সকালে আপনার ছাউনী পর্যন্ত ধাওয়া করে দেখিয়ে দিয়ে এসেছি, ইংরেজরা চাইলে কি না করতে পারে। সুতরাং আপনি আমাদের তুচ্ছ ভাববেন না। ইত্যাদি।

সেদিনের তারিখটা ছিল ৫ ফেব্রুয়ারী।

এই ভোর-বেলার যুদ্ধে কোন পক্ষের কতটা ক্ষতি হল, তা নিয়েও ইতিহাসে নানান মতভেদ। এক পক্ষ নবাবের দিকে। আরেকপক্ষ ইংরেজদের।

"Nawab lost 1,300 men five or six hundred horse with four elephants and decamped to Dumdum." The House of Jagatset.

যদুনাথ সরকার জানিয়েছেন অন্য হিসেব।

"In this action the British lost 57 men killed and 137 wounded besides abandoning 2 guns." নবাবের ক্ষতির হিসেবটা আগের হিসেবের সঙ্গে এক।

"এই সামান্য ব্যাপারে ইংরেজদের দিকে সাতাশ জন গোরা পল্টন, বারো জন জাহাজি গোরা, আঠারোটা দিশি সিপাই মারা পড়ল। সত্তরটা গোরা পল্টন, বারো জন জাহাজি গোরা আর পঞ্চাশজন দিশি সিপাই জখম হল। দুটো ভালো

কামান নবাবের ছাউনীতে ফেলে আসতে হল, পলাশীর যুদ্ধেও ইংরেজদের অতটা লোকসান হয়নি।" পলাশীর যুদ্ধ।

অর্মের ইতিহাসে এদিনের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ। তা থেকে জানা যায়, যথেষ্টই ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল ইংরেজ পক্ষের। এবং হয়েছিল বলেই ক্লাইভের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তাঁর পরাজিত সেনাবাহিনী। ক্লাইভ হারিয়েছিলেন দুজন দক্ষ ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন পে আর ক্যাপ্টেন ব্রিজেস। আর নিহত হয়েছিল তাঁর বিশ্বস্ত সেক্রেটারী, মিঃ বেলচার।

মুতাক্ষরীন আরও মারাত্মক। সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে গোলাম হোসেনের ব্যক্তিগত ক্রোধ অথবা বিদ্বেষ এমনই প্রবল যে, তিনি অবলীলাক্রমে লিখে বসলেন—

"ইংরাজ সৈন্যরা একটা মাত্রও সৈন্য না হারিয়ে মনের সুখে, যুদ্ধ জয় করে ফিরে এল নিজেদের ঘাঁটিতে।"

ক্লাইভ রাতারাতি আক্রমণ করেছিলেন যুদ্ধের জন্যে নয়। আসল লক্ষ্য ছিল সন্ধি, এবং সেটা দ্রুত ঘটাতে। বুসী এসে পড়ার আগে।

কিন্তু ওয়াটসনের ভিন্ন মত। তিনি যুদ্ধের পক্ষে। জাহাজ থেকে ক্লাইভকে লিখে পাঠালেন, নবাব মোটেই সন্ধির ব্যাপারে আগ্রহী নন। সন্ধির নামে আমাদের ভুলিয়ে রেখে নিজের সেনাবাহিনীকে বাড়িয়ে নিচ্ছেন। সন্ধি নয়, আক্রমণই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য।

"Till he is well thrashed don't sir flatter yourself he will be inclined for peace."

পরের দিন ক্লাইভের হাতে এসে পৌছল আর এক চিঠি। লিখেছেন রনজিৎ রায়।

"আমার ধারণা ছিল ইংরেজরা এক কথার লোক। নিজেদের প্রতিশ্রুতি অথবা চুক্তির প্রতি তারা দায়িত্বশীল। এইটা মনে রেখেই আমি নবাবের সঙ্গে তোমাদের বিরোধ মেটাতে এগিয়ে এসেছিলাম। এবং তোমাদের পাঠানো প্রতিনিধিদের হটিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ তাদের ঘটে নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান নেই। আর সেই জন্যেই তোমাকে লিখেছিলাম, তোমাদের দাবী দাওয়া কাগজে লিখে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। আমি অনায়াসে সে কাগজে সই করিয়ে নিতে পারতাম নবাবকে দিয়ে। নবাব রাজী ছিলেন তোমাদের হাতে কলকাতা ফিরিয়ে দিতে, পুরনো ফরমান অনুযায়ী সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধে সহ। কলকাতা অথবা আলিনগরে তোমাদের জন্যে টাঁকশাল তৈরীর

অনুমতিটাও দেবার ইচ্ছে ছিল নবাবের। এমনকি কলকাতায় দরকার মত দুর্গ তৈরী করারও। কিন্তু গতকাল সকালে তুমি যে ব্যবহার করেছ সেটা আমাকে বিস্মিত করেছে। নবাবের কাছে লজ্জায় এখন আমার মুখ দেখানোই দায়। যাই হোক, এসব ব্যাপার নিয়ে নবাবের সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছে তা খোজা পিক্রু জানে এবং তোমাকে জানাবে। যদি সব কিছু মেটাতে চাও, নবাবকে এখুনি তোমাদের সব বক্তব্য জানিয়ে একটা চিঠি লিখে পাঠাও। আমি সে চিঠিতে নবাবের সই করিয়ে তোমার কাছে ফেরৎ পাঠাবো। সেই সঙ্গে থাকবে, শিরোপা, হাতী এবং মণিমুক্তোর উপহার। তারপরেই নবাব ফিরে যাবেন মুর্শিদাবাদে।"

রনজিৎ রায়ের চিঠি পেয়েই ক্লাইভ সম্মতি জানালেন সন্ধির। তিনি বুঝলেন সবুরে মেওয়া ফলবে না। নবাবের মেজাজ এখন একরকম। পরে অন্য রকম হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তখন সন্ধি হলে, নবাবের মর্জিমাফিক হবে। আমরা জোর করে শর্ত চাপাতে পারব না।

সন্ধির কাগজপত্র সিরাজের হাতে গিয়ে পৌঁছল যথাসময়ে। কিন্তু সই আর হয়না। সিরাজ তখনও অপেক্ষা করছিলেন ফরাসী সৈন্যদের জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তড়িঘড়ি সইটা যে করলেন, তার মূলে ছিল দুটো কারণ। প্রথমটা হল, তিনি আঁচ পেলেন মীরজাফর প্রমুখ সেনানায়কেরা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত নন। দ্বিতীয়টা হল, বিদেশী শত্রু, আহম্মদ শা আবদ আলী, মথুরা লুটপাট করে দিল্লীর দোরগোড়ায়। তাহলে কি আর বাংলাদেশটাকে বাদ দেবে? সুতরাং মুর্শিদাবাদে ফেরার প্রয়োজনটা জরুরী। অবশ্য সন্ধির আগে একটা কাজ করলেন তিনি। হালসিবাগান থেকে চলে গেলেন নিজের তাঁবু গুটিয়ে, দমদমের দিকে। শত্রু, এবং বিশেষ করে যে শত্রু যুদ্ধের নিয়ম-কানুন না মেনে রাত-বিরেতে আক্রমণ করে, তার এত কাছাকাছি থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।

সন্ধির শর্ত নিয়ে ইংরেজ পক্ষের হয়ে মুসাবিদা করলেন দুজন। রনজিৎ রায় আর উমিচাঁদ। ৯ ফেব্রুয়ারী। সন্ধি হয়ে গেল। তার শর্তগুলো হল এই রকম।

"বাদশাহী ফর্মান-অনুসারে কোম্পানী সমস্ত বাণিজ্যাধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। ফর্মানের উল্লিখিত ৩৮ খানি গ্রামের জমিদারীও এখন হইতে কোম্পানীকে ক্রয় করিতে দেওয়া হইবে। কোম্পানী কলিকাতার দুর্গসংস্কার করিতে পারিবেন। কলিকাতায় টাঁকশাল নির্মাণ করিয়া, কোম্পানীর নামে মুদ্রিত টাকা প্রচলন করিবার অধিকার পাইবেন। এই মুদ্রায় কোন বাটা দিতে

হইবে না। কোম্পানীর যে সমস্ত কুঠী নবাব দখল করিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া দিবেন। বিগত আক্রমণে তাঁহাদের যে সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যর্পণ অথবা নষ্ট দ্রব্যের মূল্য পরিমাণ ক্ষতিপূরণ ; নবাবের ন্যায় বিচারে যাহা বোধ হয়, দিবেন।"

সন্ধি-পত্রের বাইরে আরও একটা ব্যবস্থা হল। সিরাজই নিজে থেকে পেশ করলেন এই প্রস্তাব। এখন থেকে নবাবের রাজদরবারে একজন করে ইংরেজ-প্রতিনিধি থাকবে। এবং সে প্রতিনিধিটিকেও বেছে নিলেন তিনি। ওয়াটস্ সাহেব। ইতিহাসে এই সন্ধির নাম, আলিনগরের সন্ধি। ইংরেজদের অনুরোধে এতে সই করেছিলেন মীরজাফর এবং দুর্লভরাম।

সন্ধিপত্রে সই হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নবাব ক্লাইভ, ওয়াটসন আর ড্রেক সাহেবের জন্যে পাঠালেন শিরোপা। সেটা ঘটেছিল ১১ ফেব্রুয়ারী। শিরোপার সঙ্গে ছিল খেলাৎ। সকলেই শিরোপা ও খেলাৎ নিলেন। ওয়াটসন নিলেন না। শিরোপা প্রত্যাখ্যান করে নবাবকে লিখে পাঠালেন –

"আমি ইংলণ্ডেশ্বরের প্রজা। সিরাজদ্দৌলার নিকট হইতে শিরোপা লইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে পারি না।"

আসলে আলিনগরের সন্ধিতে সন্তুষ্ট হননি তিনি। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি একা নন, সঙ্গী অনেক। সিরাজের প্রথম বারের কলকাতা আক্রমণের সময় যাঁরা দে-ছুট দে-ছুট করে গঙ্গা ঝাঁপিয়ে পালিয়ে ছিলেন ওপারে, তারাও এখন ক্লাইভের বিরুদ্ধে কাপুরুষ বলে চীৎকার শুরু করে দিয়েছেন। মোটামুটি কলকাতার একদল ইংরেজ ক্লাইভের এই সন্ধি নিয়ে খুবই সোরগোল তুলল কিছুদিন। ইংরেজদের মান-সম্মান সব নবাবের পায়ে বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে। পরে কোনও কোনও ঐতিহাসিকও অসন্তুষ্ট হয়েছেন এই সন্ধিপত্রে অন্ধকূপ-হত্যার বাবদে ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়নি বলে। ক্লাইভ জানতেন, তাঁর আচরণে অনেকেই ক্ষুব্ধ। নিজের কাজের কৈফিয়ৎ হিসেবে তিনি বিলেতে মিঃ পেনি-র কাছে লিখলেন এক চিঠি। মিঃ পেনি তখন বোর্ড অব ডাইরেকটর্স-এর চেয়ারম্যান। চিঠির তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারী।

"If I had consulted the interest and reputation of a solder, the conclusion of this peace might easily have been suspended. I know at the same time, theire are many who think I have been too precipitate in the conclusion of it ; but surely those who are of this opinion never knew that a delay of a day or two might have ruined the Company's affairs, by

the junction of the French with the Nabab, which was on the point of being carried into execution.······they never considered that, with a war upon the Coast and in the provinee of Bengal at the same time, a trading company could not subsist without a great assistance from the Government ; and last of all, they never considered that a long war, attened through the whole course of it with success and many great actions, ended at last with the expense of more than fifty lacs (Lacks) of rupees to the Company."

আরো অনেক পরে, বিলেতে তখন পার্লামেন্টের হুকুমে তাঁর বিরুদ্ধে যখন তদন্ত, সেই সময়েও তিনি এই একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন—

"এই সময়ে আমার সৈন্যদল ছিল সামান্য। এই সময়ে ফরাসীরা নবাবের পক্ষভুক্ত হলে ইংরাজের সর্বনাশ সংঘটিত হত। বীর হৃদয়ের উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য হলে, আমিও সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করতাম না। কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের মুখের দিকে চেয়েই, বাণিজ্য রক্ষার জন্যে এই রকম সন্ধিবন্ধনে সম্মত হয়েছিলাম।"

১৬ ফেব্রুয়ারী আরও একটা চিঠি লিখলেন ক্লাইভ। সেটা জগৎশেঠকে। অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে। কারণ যে রনজিৎ রায় আর উমিচাঁদের মধ্যস্থতায় এই সন্ধি, তাঁরা জগৎশেঠের মনোনীত। ক্লাইভ কাজ করেছেন তাঁদের পরামর্শ মত। চিঠির শেষ লাইনে ছিল—

"The signal kindness which you have shown in your endeavours to restore the currency of the Company's trade, I have made particular mention of in my latters to Europe."

এই সন্ধির পর থেকেই ক্লাইভের চরিত্রে এবং ব্যক্তিত্বে দেখা দিল নতুন দৃঢ়তা। নিজেকে আরো বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে অথবা পটভূমিকায় ভাবতে লাগলেন তিনি। একদিন হয়তো দায়ে পড়ে 'ভারত-ভাগ্য-বিধাতা'ও হতে হবে তাঁকে, এমন উজ্জ্বল ভাবনাও আসা-যাওয়া করতে লাগল তাঁর মনে। দুঃসাহস এবং স্বপ্ন এই দুটোই তাঁর রক্তের ভিতরে ছিল প্রচুর পরিমাণে।

তাঁর সাম্প্রতিক জীবনীকার Percival Spear, ক্লাইভের এই সময়কার জটিল মানসিক প্রকৃতিটা তুলে ধরেছেন চমৎকার।

"Energy and will-power, rather than military expertise, had again brought Clive through. We can see signs that Clive was increasingly aware of his limitations as a regular military commander. His amateur origins and lack of formal training,

reinforced by the mishaps which we know occured, deprived him of full military self-confidence. The ambition, the energy, the resolution remained as stong as ever. He was already thinking of the 'Governor Generalship of India,' if such an appointment should be necessary. We can detect an increasing tendency towards politics and administration, as in, for example, his letter dated 13 February 1757 to Mr. Payne, the Chairman of the Directors."

সন্ধি-পর্ব চুকিয়ে সিরাজদ্দৌলা পা বাড়ালেন নিজের রাজধানীর দিকে। সবে মাত্র অগ্রদ্বীপে এসে পৌঁচেছেন। এমন সময় কানে এল, ইংরেজরা নাকি ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে আট-ঘাট বাঁধছে। শুনেই রেগে উঠলেন তিনি। সঙ্গে ছিলো ওয়াটস। ওয়াটসকে প্রশ্ন করলেন, এসব কি শুনছি? সত্যি নাকি? ওয়াটস আমতা-আমতা করে জবাব দিলেন, আজ্ঞে না, এসব নিছক রটনা। ওয়াটস নিজেকে বাঁচানোর জন্যে ডেকে পাঠালেন উমিচাঁদকে। উমিচাঁদ এসে সিরাজের সামনে ব্রাহ্মণের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'ইংরেজরা কখনও সন্ধি-ভাঙবে না। ওদের মত সত্যপ্রিয় জাত ভূ-ভারতে কোথাও নেই।'

এতেও নবাবের মনের কোণের আশংকা পুরোপুরি নিভল না। তিনি চিঠি লিখলেন ওয়াটসনকে।

"সমুদায় কলহ-বিবাদ সমূলে ধ্বংস করিবার জন্যই বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রদান করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলাম। তুমিও তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, এ-দেশে আর যুদ্ধকলহ উপস্থিত করিবে না। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে, তোমরা বুঝি হুগলীর নিকটস্থ ফরাসীকুঠি আক্রমণ করিয়া শীঘ্রই সমরানল প্রজ্বলিত করিবে। আমার রাজ্যে আবার কলহ সৃষ্টির আয়োজন করিতেছ কেন? ইহা ত সকল দেশেরই সুনীতি-বিরুদ্ধ ব্যবহার। তৈমুরলঙ্গের সময় হইতে আজ পর্যন্ত ফিরিঙ্গিরা ত এদেশে পরস্পরের মধ্যে কোনদিনই যুদ্ধ-কলহ উপস্থিত করিতে পারে নাই। তোমরা রণোন্মুখ হইয়া থাকিলে, আমি কি করিব? বাদশাহের কর্তব্যপালন ও সম্মানরক্ষার জন্য আমাকে অগত্যা সসৈন্যে ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। এই সেদিন সন্ধি করিয়াছ, ইহারই মধ্যে আবার যুদ্ধ। মহারাষ্ট্রীয়েরা বহুকাল শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল। কিন্তু যেদিন সন্ধি করিল সেদিন হইতে আর কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই; ভবিষ্যতেও করিবে বোধ হয় না, ধর্মশপথপূর্বক সন্ধি-সংস্থাপন করতঃ জানিয়া শুনিয়া তদ্বিপরীতাচরণ করা বড় গুরুতর অপরাধ। তোমরা সন্ধি করিয়াছ, সন্ধিপালন

করিতেই বাধ্য। সাবধান! যেন আমার অধিকারে যুদ্ধকলহ উপস্থিত না হয়, আমি যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে।"

চিঠি লেখার সঙ্গে-সঙ্গে ডাক পড়ল মহারাজ নন্দকুমারের। হুকুম দিলেন—হুগলী, অগ্রদ্বীপ আর পলাশীতে সেনা সাজাও। তারপর ফিরলেন রাজধানীতে।

ক্লাইভ পড়লেন দোটানায়। তাঁর ধারণা ছিল কলকাতার সন্ধি-পর্বটা মিটে গেলেই চলে যাবেন মাদ্রাজে। মাদ্রাজে যাওয়াটাই এখন সবচেয়ে জরুরী। কেননা ইউরোপে জ্বলে উঠেছে ইংরেজ বনাম ফরাসীদের সাত বছর ব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩) আগুন। তাঁর আঁচ ছড়িয়ে পড়বে ভারতবর্ষেও। দাক্ষিণাত্যে ফরাসী আধিপত্যের সঙ্গে লড়াই অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যেমন এসেছিলেন, তেমনি ফিরে যাওয়ার দরকার মাদ্রাজে। কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই। নবাবের সঙ্গে সন্ধি হয়েছে ঠিকই। নবাব এখন মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত। ফোঁস নেই, ফণা নেই। কিন্তু আজ যদি কলকাতার অর্ধেক ইংরেজ সৈন্য চলে যায়, নবাব তখন ফরাসীদের সাহায্য নিয়ে ইংরেজদের নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়তে পারেন। নবাবের যা চরিত্র, তাতে সবই সম্ভব। ক্লাইভ স্থির করলেন, কলকাতা ছেড়ে, এই রকম সংকটের সময়, এক পাও নড়বেন না।

১৭৫৬। ১২ নভেম্বর। মাদ্রাজেই প্রথম খবর পৌঁচেছিল বিলেত থেকে, ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা চিঠি পাঠিয়েছিলেন এ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে। তাতে ছিল অনুরোধ মেশানো আদেশ। 'যদি সম্ভব হয়, চন্দননগর আক্রমণ কর।' কলকাতায় সে চিঠি এসে পৌঁচেছিল ১৩ জানুয়ারী। ওয়াটসন চিঠি পেয়েও সাড়াশব্দ করেন নি। কারণ তখন নবাবকে নিয়ে কলকাতা অস্থির।

৯ ফেব্রুয়ারীর সন্ধি-উপলক্ষে রনজিৎ রায় যেদিন নবাব-পক্ষের শিরোপা এবং খেলাৎ নিয়ে ক্লাইভের কাছে হাজির, ক্লাইভ তুললেন চন্দননগরের প্রসঙ্গ। আমরা তো আগেও ফরাসীদের ব্যাপারে নবাবের কাছে আমাদের মনোভাবটা জানিয়েছি। নবাব হ্যাঁ না কিছুই বলেন নি। তাহলে নিশ্চয়ই চন্দননগর আক্রমণে নবাবের অমত নেই। রনজিৎ রায় এসব শুনে ক্লাইভকে কোন রকম উৎসাহ দিলেন না। রনজিৎ রায়ের চুপ করে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তিনি যাঁর কর্মচারী, সেই জগৎশেঠরা ইংরেজদের মত ফরাসীদেরও টাকা ধার দিয়ে বসে আছেন অগাধ। রনজিৎ রায় প্রভুর স্বার্থটা দেখবেন না? ফরাসীরা ভরাডুবি হলে, সর্বনাশ তো তাঁদেরই। ক্লাইভের অবস্থা তখন সাপের ছুঁচো গেলা। চন্দননগর ধ্বংস করার জন্যে তাঁর হাত-পা কামড়াচ্ছে। অথচ নবাবের ভয়ে এক পা বাড়াতে গিয়েও পাঁচ পা পিছিয়ে আসছেন।

মুর্শিদাবাদে ফিরেই সিরাজদ্দৌলা আরেকটা চিঠি লিখলেন ওয়াটসনকে।

"গতকল্য তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহা বোধ হয় হস্তগত হইয়াছে। সেই পত্র লিখিবার পরেই ফরাসীদিগের উকীলের নিকট অবগত হইলাম যে, তোমরা নাকি চার পাঁচখানি অতিরিক্ত যুদ্ধ জাহাজ আনাইয়াছ, এবং আরো আনাইবার চেষ্টায় আছ। ইহাও শুনিলাম যে, তোমরা চন্দননগর ধ্বংস করিয়াও নিরস্ত হইবে না। বর্ষাশেষে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্তও আগমন করিবে। ইহা কি বীরোচিত অথবা ভদ্রজনোচিত ব্যবহার? সন্ধিপালন করিবার ইচ্ছা থাকিলে, জাহাজগুলি ফেরত পাঠাইয়া দিবে।...ইত্যাদি"

ক'দিন পরেই এসে গেল ওয়াটসনের উত্তর।

"আপনার ১৯ ফেব্রুয়ারীর পত্র অদ্য ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে হস্তগত হইল। পত্র পাঠে জানিতে পারিলাম যে, ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা আপনার অভিপ্রেত নহে। ইহাতে আপনি যে এতদূর অসন্তুষ্ট হইবেন, একথা জানিতে পারিলে আমরা আপনার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিবার আয়োজন করিতাম না। ফরাসীরা সন্ধি-সংস্থাপন করিলে আমরা আর যুদ্ধ করিতে চাহি না। কিন্তু তাহারা সন্ধি করিলেই ছাড়িব না। সুবাদারস্বরূপ আপনাকে জামিন সাজিতে হইবে। পৃথিবীতে আমাদের মত সত্য-পরায়ণ লোক যে আর কোন দেশে নাই, তাহা বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নাই। আমি আপনাকে সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা কিছুতেই সত্য লঙ্ঘন করিব না। প্রভু যীশুখৃষ্ট এবং পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আবার বলিতেছি যে, আপনি যদি ফরাসীদের সঙ্গে সন্ধি করাইয়া দেন, তবে আর কিছুতেই আমরা সত্য ভঙ্গ করিব না।"

ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ হয়ে উঠেছে সরগরম। কেউ ইংরেজের পক্ষে। কেউ ফরাসীদের পক্ষে। কেউ চায় ইংরেজ-ফরাসী সন্ধি। যারা জগৎশেঠের দলের লোক, তারা ফরাসীদের বিরুদ্ধে খুব একটা মুখ খুলতে রাজী নয়। খোজা বাজিদের ব্যবসা ফরাসীদের সঙ্গে। তাই উমিচাঁদ কোনমতেই তার মন ভেজাতে পারল না। মীরজাফরের মন মেজাজ কিছুদিন বেশ প্রসন্ন ছিল নবাবের উপর। কলকাতা আক্রমণের সময় তিনিই ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক। মুর্শিদাবাদে ফিরে আবার তাঁর মনের গতিটা বাঁক নিল উল্টো মুখে। রাজদরবারে আসা প্রায় ছেড়ে দিলেন। রাজা দুর্লভরাম মোহনলালের কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারবেন না বলে, রাজধানী থেকে খানিকটা দূরে আস্তানা পাতলেন। রাজা মাণিকচাঁদতো এরই মধ্যে বন্দী হয়েছিলেন একবার। প্রথম বারের কলকাতা আক্রমণের সময় প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধে।

মুক্তি পেয়েছেন দশলাখ টাকা জরিমানা দিয়ে। সিরাজের বিশ্বস্ত সেনানায়ক দোস্ত মহম্মদ খাঁ এই সময় রাজধানীতে অনুপস্থিত। কলকাতার নৈশ যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন তিনি। কিছুকাল নিরাপদে দূরে থাকবার জন্যে নবাবের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে গেছেন সাসারামে।

এই রকম একটা পরিবেশে নবাব সিরাজদ্দৌলা নিতান্তই অসহায় এবং নিঃসঙ্গ। মুতাক্ষরীণ-এর অভিযোগ, নবাবের উচিত ছিল শক্ত হাতে এই সময় নগর-প্রধানদের শাসন করা। প্রয়োজন পড়লে বন্দী করা। নবাব তা করেননি কারণ তিনি কাপুরুষ। এবং যারা তাঁর প্রিয়পাত্র এবং পারিষদ তারাও কাপুরুষ। নবাব নিজে বুদ্ধিহীন। তাঁর স্তাবকেরা নির্বোধ। তারা নবাবকে কোনদিন সৎ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারেনি।

নবাবের এই সময়কার দোদুল্যমান চরিত্রের ইঙ্গিত প্রায় সব ইতিহাসেই।

"In Indian side, the Nawab feared a junction of the British with the French. He feared the British after his Calcutta experience ; but he also feared the French more than the facts warrented because of reports of de Bussy's prowess in the Deccan. In adition there were continued reports of Afghan and Maratha movements round Delhi and possible marches eastwards. To meet such a menace European support would be very desirable, but what if the Europeans had been liquidated ? Seraja's dilema was real, his tragedy that lack the wit and the resolution to resolve it." Percival spear.

"পূর্ব্বাপর ভাবিয়া কার্য্য করিতেও সিরাজদ্দৌলা কোনকালেই অভ্যস্ত হন নাই। বলপ্রয়োগে না হইলে, সদাচারণে কিরূপে প্রবীণপক্ষকে সংযত বা সন্তুষ্ট করিতে হয়, তাহার উপায়ও তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল না। স্বীয় গর্ব ও অভিমান তাঁহাকে অনুনয়-বিনয়ে মন্ত্রিদলের মনস্তুষ্টি সাধন হইতে নিবৃত্ত করিত। বুদ্ধিবৃত্তি যেমন এইরূপ কার্য্যের প্রতিকূল, সাহস ও মানসিক দৃঢ়তা সেইরূপ প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের শাস্তিপ্রদানেরও প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, ইচ্ছা সত্বেও ভয়ক্রমে তত দূর অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। নবীন মন্ত্রী ও পরামর্শদাতৃগণের মধ্যেও কেহ এ অবস্থায় কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারেন নাই। আপনাদের ক্ষমতার অভাব বুঝিয়া প্রবীণদলকে স্বপদে পুনস্থাপনা করিবার পরামর্শ দেওয়ার সৎসাহসও কাহারও ছিল না।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

এ সব অভিযোগ সত্যি। কিন্তু সেই সঙ্গে এও সত্যি কোনো কোনো

ইতিহাস তাঁকে যতটা মাথা গরম মানুষ হিসেবে এঁকেছে, তিনি তা নন। তা যদি হত তাহলে ওয়াটসনের চিঠিখানা হাতে পেয়েই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতে পারতেন তিনি। তখুনি লিখতে পারতেন, আমি কি তোমাদের মাইনে-করা কেনা গোলাম নাকি হে? ফরাসীর সঙ্গে সন্ধি হবে কি না-হবে তাতে তোমাদের কি? আমাকেই বা তার জামিন থাকতে বল কোন্ সাহসে? কিন্তু ওয়াটসনের চিঠির জবাবে যা লিখলেন, তাতে এই জাতীয় রূঢ় কথার একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনখানে। প্রতিটি কথা যেন মাপ-জোপ করে, বিচক্ষণ রাজনীতি-বোদ্ধার ভঙ্গীতে লেখা।

"ফরাসী যুদ্ধ সংক্রান্ত পত্র পাইয়া তাহার মর্মার্থ জ্ঞাত হইলাম। আমি ফরাসীদিগের কলহ বৃদ্ধির সহায়তা করিব না, সে জন্য নিশ্চিন্ত থাকিবে। বরং তাহারাই যদি গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করে, তবে সসৈন্যে বাধা প্রদান করিব। তোমরা চন্দননগর আক্রমণ করিবে শুনিয়া যাহা সঙ্গত বোধ হইয়াছিল, তাহাই লিখিয়াছিলাম। আমি ফরাসীদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য সেনাদল পাঠাই নাই। তোমরা কলহ-বিবাদ উপস্থিত করিলে আমারই প্রজাদিগের সর্বনাশ হইবে, সুতরাং প্রজারক্ষার জন্যই স্থানে স্থানে, সেনা-সমাবেশ করিয়াছিলাম। আমার পত্র পাইয়া তোমরা যে চন্দননগর আক্রমণ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছ, এ সংবাদে আমি যারপর নাই প্রীতিলাভ করিলাম। ফরাসীদিগকে সন্ধি সংস্থাপন করিবার জন্য পত্র লিখিলাম। সন্ধি হইলে আমি একজন রাজকর্মচারী পাঠাইয়া দিব। এবং তোমাদের সন্ধিপত্র আমার দপ্তরে জারি করাইয়া রাখিব। মিত্রভাবে থাকিবার জন্যই সন্ধি করিয়াছি সে কথায় কখনও অন্যথা হইবে না।

"আর একটি কথা। শুনিতেছি যে, দিল্লীর ফৌজ আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তজ্জন্য বোধ হয় শীঘ্রই পাটনা অঞ্চলে গমন করিব। সে সময়ে তোমরা সেনা সাহায্য করিলে আমি লক্ষ টাকার পুরস্কার প্রদান করিব।"

সিরাজের এই চিঠি যখন কলকাতায় গিয়ে পৌঁছল, তখন কলকাতাতেও চলেছে এক নাটকের মহড়া। ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনদিনই নবাবের সম্মতি মিলবে না এটা বুঝে গিয়ে ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সন্ধির জন্যেই হাত বাড়াল। চন্দননগর থেকে হাজির হল ফরাসীদের প্রতিনিধি। সন্ধির কাগজ পত্র সব তৈরী। শুধু সইটা হলেই হয়। এমন সময় সব ভেস্তে দিলেন ওয়াটসন। হঠাৎ বেঁকে বসলেন তিনি। আমি সই করবো না এই সন্ধিপত্রে। কারণ কি? কারণ হল, আমরা যখন কলকাতায় বসে এই

সন্ধিপত্রে সই করবো, তখন আমাদের সমগ্র কোম্পানীই হবে তার জন্যে দায়ী। কিন্তু চন্দননগরের ফরাসীরা সই করলে, তার জন্যে পণ্ডিচেরীর ফরাসীরা দায়ী হবে না। সুতরাং সন্ধিপত্রে যদি পণ্ডিচেরীর কর্তৃপক্ষরা সই করে তবেই আমি রাজী।

ক্লাইভ কমিটির অন্য সদস্যদের বোঝান। তারা তো রাজী। তারা সন্ধিপত্রে সই পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে। বাকী শুধু ওয়াটসনের সইটাই। একবার নয়, দুবার নয়, তিন তিনবার সন্ধির কাগজ ওয়াটসনের কাছে পাঠিয়েছিলেন ক্লাইভ। তিনবারই ফেরত এল। ক্লাইভ এই সময় কমিটির কাছে যে-মন্তব্য পত্র পেশ করেছিলেন তার মধ্যেই ফুটে আছে তাঁর মনের গণগণে রাগ।

"সদস্যগণ! আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন, আমাদের এই সকল আচরণ সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকের কিরূপ ধারণা জন্মিবে? ভাগীরথী প্রদেশ মধ্যে নিরপেক্ষ-ভাবে বাণিজ্য করিবার নিয়মে চন্দননগরের কৌন্সিলের এবং অধ্যক্ষের প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা প্রতিনিধি পাঠাইলে আমরা সম্মত হইব ও তাঁহাদের সহিত নিরপেক্ষভাবে বাণিজ্যাধিকার রক্ষা করিব বলিয়া আমরা কি প্রকারান্তরে অভিমত বিজ্ঞাপিত করি নাই? তাঁহারা আসিবার পর সন্ধির নিয়ম উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে লিখিত ও উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও গৃহীত হইবে বলিয়া কি স্থিরীকৃত হয় নাই? নবাব কি ভাবিবেন?......তিনি এবং পৃথিবীর সকল লোকেই বলিবে আমরা নগন্য সঙ্কল্পের লোক, অথবা আমরা ধর্মাধর্ম-বিবর্জিত।"

ওয়াটসন ক্লাইভের এই তীব্র সমালোচনাতেও অটল। তাঁর মনের হিসেব-পত্র অন্য রকম। নবাব দিল্লীর আক্রমণের ভয়ে ভীত। তাই সাহায্য চেয়েছেন ইংরেজদের। সাহায্য করার সর্ত হিসেবে এখন যদি আমরা দাবী করি চন্দননগর দখলের, নবাবকে রাজী হতে হবে বাধ্য হয়েই। এই সব ভেবেই ওয়াটসন নবাবকে লিখলেন—

"চন্দননগরের দুর্গ বোঝাই হয়ে আছে সৈন্য-সামন্তে। ওদেরকে জীইয়ে রেখে আমরা দূরদেশে যেতে পারি না। আপনি অনুমতি দিলে চন্দননগরকে ধ্বংস করে, সসৈন্যে আপনার সঙ্গে পাটনা অঞ্চলে যাই।"

ওয়াটসনের চিঠি পেয়ে সিরাজ স্তম্ভিত এবং বিচলিত। একদিকে বাদশাহী সেনা। আরেকদিকে উদ্ধত, উদ্যত ইংরেজ। মাঝখানে আশ্রিত ফরাসী। কোনদিকে পা ফেলবেন?

নবাব ইংরেজদের কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়েছিলেন লক্ষ টাকার বিনিময়ে। অর্মে আমাদের জানিয়েছেন, এর অর্থ মাসিক লক্ষ টাকা। ঐতিহাসিকরা কেউ

কেউ এই সাহায্য চাওয়ার মধ্যে সিরাজের দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছেন। কেউ-কেউ মনে করেন, এটা তাঁর একটা বুদ্ধির চাল। নবাব পাটনায় রওনা দিলে সেই ফাঁকে ইংরেজরা ফরাসীদের আক্রমণ করতে পারে, এই ভেবেই তিনি ইংরেজ সৈন্যের একটা বড় অংশকে দূরদূরান্তে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সিরাজ সাত-পাঁচ ভেবে ওয়াটসনের চিঠির কোন উত্তর দিলেন না। নিজের ক্ষমতাতেই হাত লাগালেন সৈন্য সংগ্রহে।

এদিকে কলকাতায় বসে গেছে সিলেকট কমিটির সভা। সভাপতি ক্লাইভ। "ক্লাইভের বক্তৃতা শেষ হইলে, সকলেই বুঝিলেন যে আর নবাবের অনুমতি লাভের আশা নাই। বরং তাঁহার পক্ষে সসৈন্যে ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করাই সম্ভব। সুতরাং সহসা চন্দননগর আক্রমণ করিলে, আলিনগরের সন্ধিভঙ্গ হইয়া নবাবের সঙ্গে পুনরায় শত্রুতার সূত্রপাত হইবে। মেজর কিলপ্যাট্রিক এবং বীচার বলিলেন, 'এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা অনুচিত।' ক্লাইভ তাঁহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—'কিসের সন্ধি? এই তো চন্দননগর আক্রমণের উপযুক্ত অবসর।' তখন সকলেই ড্রেক সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি অনেকটা হত ইতি গজ করিলেন, কিন্তু উপস্থিত সমস্যার কোনই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। তাঁহার মত কেহ গণনার মধ্যে আনিলেন না। দুইজন সন্ধির পক্ষে, একজন যুদ্ধের পক্ষে, এরূপ অবস্থায় সন্ধি করাই স্থিরীকৃত বটে। কিন্তু মেজর সাহেব সহসা ক্লাইভকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, এখন আমাদের যত সেনাদল সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা লইয়া নবাব এবং ফরাসী দুই দলকেই পরাস্ত করা কি সম্ভব নহে?' ক্লাইভ বলিলেন, 'নিশ্চয়ই সম্ভব।' তখন কিলপ্যাট্রিক মত পরিবর্তন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তবে আমি সন্ধি চাহি না।' দরবার ভঙ্গ হইল। ক্লাইভ বাহিরে আসিয়া ফরাসী দূতকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আর সন্ধি হইবে না, অতঃপর কেবল যুদ্ধ।' " সিরাজদ্দৌলা।

কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ ল সাহেবের মন্তব্য ভিন্ন। তিনি লিখে গেছেন ফরাসীদের সঙ্গে সন্ধি করার ইচ্ছেটা ইংরেজদের মন থেকে হঠাৎ কর্পূরের মত উবে গেল কেন।

"ভিতরকার কথাটা এই যে, ইংরেজরা যেসব জাহাজের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই জাহাজের গঙ্গার মুখে আগমন-কথা তাহারা অবগত হন। কাজেই তাহাদের মতের পরিবর্তন হইল। ইংরাজ সৈন্য চন্দননগরাভিমুখে অগ্রসর হইল। জাহাজ সকলও তদভিমুখে প্রস্তুত হইল। আমিও নবাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি নবাবের সহিত প্রধান দেওয়ান

মোহনলালকে দুইবার দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার যতই দোষ থাকুক না কেন, তিনিই একমাত্র নবাবের অনুগত ছিলেন। তাঁহার দৃঢ়তা ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, নবাবের পতনে তাঁহার পতন অনিবার্য্য। তিনিও তাঁহার প্রভুর ন্যায় অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।...দূরদৃষ্টক্রমে এই বিপদের সময় তিনি অত্যন্ত রুগ্ন হইয়া পড়েন। এ সময় তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির করা সহজ নহে। তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়। সিরাজ এই সময় তাঁহার একমাত্র সহায় হইতেও বঞ্চিত হন।”

ওয়াটসনের কানে খবর পৌঁছল এই যুদ্ধ প্রস্তাবের। তিনি বললেন, না, আমি যুদ্ধে নেই। যুদ্ধে নেই? কেন? নবাব অনুমতি না দিলে যুদ্ধ করা যায় না। ক্লাইভ পড়লেন জলে। ওয়াটসনকে চটিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। জাহাজগুলো তাঁরই হুকুমে চলে। বিনা জাহাজে চন্দননগর আক্রমণ করা অসম্ভব। ওয়াটসন যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তা নয়। আসলে তিনি চান ছলে-বলে-কৌশলে নবাবের কাছ থেকে যুদ্ধের স্বপক্ষে যে কোনো রকম একটা কথা আদায় করতে। সেটা হাতে পৌঁছলেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন ভাগিরথীর জলে, কামান-সাজানো জাহাজ নিয়ে।

৪ মার্চ। ওয়াটসন চিঠি লিখলেন নবাবকে। ভাষায় আর আগেকার সেই মিনমিনে-পিনপিনে ভাবটা নেই। সবিনয় নিবেদনের বদলে তর্জন-গর্জন। দিল্লীর আক্রমণে জড়োসড়ো হয়ে থাকা নবাবকে সুযোগ বুঝে দাবড়ানো।

“স্পষ্ট কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। শান্তিরক্ষা করা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, অসহায় প্রজাপুঞ্জের ধনপ্রাণ রক্ষা যদি আপনার রাজধর্ম হয়, তবে অদ্য হইতে দশ দিবসের মধ্যে আমাদের প্রাপ্য শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ করিয়া দিবেন। অন্যথাচরণ করিলে সমূহ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবে। আমরা কেবল সরল ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, এখনও সরল ব্যবহার করিবার জন্যই বলিতেছি যে আমাদের অবশিষ্ট সেনাদল শীঘ্রই কলিকাতায় উপনীত হইবে এবং আবশ্যক বুঝি তো আরও জাহাজ ও ফৌজ লইয়া আসিব। ইহাদের সহায়তায় এ দেশে এমন ভয়ানক সমরানল জ্বালিয়া দিব যে, সমস্ত জাহ্নবী জল শুষ্ক করিয়াও আপনি তাহা নির্বাণ করিতে পারিবেন না। আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু যিনি এ জীবনে কাহারও সঙ্গে কথার অন্যথা করেন নাই, তিনিই যে স্বহস্তে এই পত্র লিখিতেছেন এ কথা আপনি কদাচ বিস্মৃত না হন।”

ওয়াটসনের চিঠির প্রাপ্য টাকা মানে কলকাতা আক্রমণের সময় ইংরেজদের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তারই ক্ষতিপূরণ। আলিনগরের সন্ধিতে তার উল্লেখ ছিল।

নবাব উত্তরে জানালেন, টাকা পাঠাচ্ছি। দেরী হয়ে গেল, তার কারণ এখন দোলযাত্রা চলেছে। এই সময়ে আমার কর্মচারীরা ব্যস্ত ছিল উৎসবে। সন্ধিভঙ্গ করা আমার স্বভাব নয়। যা একবার দেবো বলে স্বীকার করেছি, তা দিতে কোনদিনই দেরী করব না। অন্য কেউ যদি তোমাদের আক্রমণ করে, আমি তখন তোমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে এক মুহূর্ত দেরী করবো না। এ পর্যন্ত আমি ফরাসীদের একটা কানাকড়ি দিয়েও সাহায্য করিনি। হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকে যে কিছু সৈন্য পাঠিয়েছি, সেটা প্রজাদের মুখের দিকে তাকিয়ে। আমার রাজ্যে যেন কোনরকম যুদ্ধের আগুন না জ্বলে, তার দিকে তোমরা নজর রাখবে ; এটাই আমার অনুরোধ।

নবাবের চিঠি পেয়ে ইংরেজরা বুঝল, নবাব কোনদিনই ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি দেবেন না। ক্লাইভ নবাবকে লিখলেন, পাঠানরা আপনাকে আক্রমণ করলে, আমরা আপনাকে সাহায্য করবো। আপাততঃ চন্দননগর পর্যন্ত এগিয়ে থাকছি।

একদল সৈন্য নিয়ে ক্লাইভ রওনা দিলেন চন্দননগরের দিকে। ওয়াটসন তখনও যুদ্ধ-যাত্রায় রাজী নয়। কারণ নবাব তখনও অনুমতি দেননি। ওয়াটসন নবাবকে জবাব দিলেন, ফরাসীদের সঙ্গে সন্ধি করার জন্যে আমরা যথেষ্টই চেষ্টা করেছি। কিন্তু সন্ধি যে হল না, তার দোষ আমাদের নয়।

নবাব ওয়াটসনকে লিখলেন—

"একজন ফরাসী যাহা স্বাক্ষর করিল, আর একজন আসিয়া তাহার অন্যথা করিলে তাহাদিগকে আর কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়? ফরাসীরা আমার প্রজা। তোমাদের ভয়ে তাহারা আমার শরণাগত হইয়াছে। সেই জন্যই সন্ধি করিতে বলিয়াছিলাম। তুমিও তো একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ সদাশয় মহাত্মা, তুমিই বিচার করিয়া দেখ যে, পরম শত্রুও যদি শরণাগত হয়, তবে তাহাকে প্রাণভিক্ষা প্রদান কর কি না? তাহাদের সরলতায় যদি সন্দেহ না থাকে, তবে তুমি তাহাকে দয়া করিয়া থাক। সরলতায় সন্দেহ পৃথক কথা—তখন যেমন বুঝিতে পার, সেইরূপ আচরণ করিয়া থাক।"

"এই পত্রের শেষোক্ত কথাগুলি সিরাজদ্দৌলার লিখিত কিনা, তদ্বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন সমসাময়িক ইংরাজ লিখিয়া গিয়াছেন যে, পত্রখানি যাহাতে এইরূপভাবে লিখিত হয়, তজ্জন্য মুন্সিখানায় সময়োচিত অর্থব্যয় করিতে ত্রুটি হয় নাই।" সিরাজদ্দৌলা।

"This letter may be very well understood, as a consent to

our attacking the French, though it certainly was never meant as such." Scrafton.

যেদিন এই চিঠিখানা লেখা হয়, তার তারিখটা ছিল ১০ মার্চ। সেই দিন বিকেলেই নবাব বসেছিলেন এক পাশে ফরাসী ল সাহেব আর একদিকে ওয়াটসকে নিয়ে।

"In the evening a discussion took place in the Nawab's presence between Watts and law on the question of a neutrality and the Nawab decided to write to Admiral. Law indiscreetly remarked that the Admiral would certainly not pay more attention to this letter than to the preceeding ones. "What!", said the Nawab, looking angrily to him, "who then am I" The wound of his vanity was the last straw. He ordered his Secretary to write to the Admiral. The Secretary was in the pay of Mr. Watts and wrote the letter immediately. It was brought to the Nawab, sealed and despatched."

The House of Jagatseth.

ঐ একই দিনে, একই সঙ্গে আরেকখানা চিঠিও রওনা দিল কলকাতার দিকে। সেটা ওয়াটস-এর। সিলেকট কমিটিকে লেখা।

"নবাব নিজে লিখতে চাননি কিন্তু আমাকে জানাতে বলেছেন, তোমরা যদি চন্দননগর আক্রমণ করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাক, তাহলে করতে পার। তিনি মাঝপথে কোন রকম বাধা দেবেন না বা সাহায্য করবেন না। তাঁর অনুরোধ কেবল একটাই। যুদ্ধ আরম্ভ করার তিন চার দিন আগে যেন খবরটা জানানো হয় তাঁকে।"

ওয়াটসন যা চেয়েছিলেন, এতদিনে সেটাই এসে পৌঁছে গেল তাঁর হাতে। নবাবের চিঠির শেষ লাইনকে তিনি ধরে নিলেন তাঁর সম্মতি হিসেবে। ব্যস! সঙ্গে-সঙ্গে তৈরী হলেন যুদ্ধের জন্যে।

৭ ফেব্রুয়ারী সই হয়েছিল আলিনগরের সন্ধি পত্রে। ৭ মার্চ ক্লাইভ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাত্রা করেছিলেন চন্দননগরের দিকে। যাবার আগে নবাবকে লিখেছিলেন, আপনি যখন আমার এই চিঠি পাবেন, তখন আমি চন্দননগরের পথে। তবে ওখানে গিয়েই আমি ফরাসীদের আক্রমণ করবো না। অপেক্ষা করবো আপনার অনুমতির জন্যে। আশা করি আপনার কাছ থেকে আশাপ্রদ চিঠিই পাব।

১২ মার্চ ক্লাইভ পৌঁছে গিয়েছিলেন চন্দননগরে। তাঁবু পড়ল চন্দননগরের

পাশে গেরেটির বাগানে। নন্দকুমার তখন সেখানে। ক্লাইভ উমিচাঁদের উপর ভার দিলেন নন্দকুমারকে গোপন-মন্ত্রে বশীভূত করার। বলা বাহুল্য, সে মন্ত্র একটাই। উৎকোচ। উমিচাঁদের মাধ্যমে নন্দকুমারের হাতে পৌঁছে দেওয়া হল, 'another well-applied bribe'. নন্দকুমার টাকা খেয়ে এমন ভাণ করে রইলেন, যেন ক্লাইভ আর তাঁর সৈন্যদলকে তিনি চোখেও দেখতে পাননি। ক্লাইভ এবার সোজাসুজি হুকুম করলেন চন্দননগরের গভর্ণর পিয়ের রেনল সাহেবকে। কেল্লাটা ছেড়ে দিন আমাদের হাতে। রেনল সাহেবকে লেখা ক্লাইভের চিঠির ভাষাটা ছিল এই রকম—"মহাশয়! গ্রেট ব্রিটেনের অধীশ্বর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার নামে আমি আপনাকে আদেশ করিতেছি যে, আপনি চন্দননগর দুর্গ অর্পণ করুন। অস্বীকৃত হইলে ইহার জন্য আপনাকে জবাব দিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধের নিয়ম আপনার প্রতি ব্যবহৃত হইবে। আপনার একান্ত অনুগত বিনীত ভৃত্য আর. ক্লাইভ।"

রেনল জানেন, ইংরেজদের সঙ্গে লড়বার মত ক্ষমতা তাঁর নেই। তবু বিনা যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে সব তুলে দিতে মানে লাগল তাঁর। কেল্লাটা আঁকড়ে রইলেন।

ক্লাইভ জানতেন, ওয়াটসনের জাহাজ না পৌঁছলে, আসল যুদ্ধ শুরু হবে না। তবুও চুপচাপ বসে থাকার স্বভাব নয় তাঁর। চন্দননগর শহরের দক্ষিণ পূর্ব দিকটা ঘিরে ফেলে, আচমকা গোটা কতক গোলা ছুঁড়ে মারলেন কেল্লার উপর। ফরাসীদের আগাম ভয় দেখিয়ে রাখাটাই ছিল তাঁর আসল অভিপ্রায়।

ওদিকে নবাব, ১০ মার্চ-এর চিঠিখানার পর আরও কয়েকটা চিঠি লিখলেন ওয়াটসনকে। পাছে তাঁর চিঠির ভুল ব্যাখ্যা করে ইংরেজরা ফরাসীদের আক্রমণ করে, সেই আশংকায়। প্রত্যেক চিঠিতেই নিষেধ। চন্দননগর যেন আক্রমণ না করা হয়।

তারই মধ্যে নবাবের কানে এল, ক্লাইভ ফরাসী দুর্গের উপর কামান দেগেছেন। ল সাহেব এসে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন সিরাজের কাছে। আপনি আমাদের দিকে তাকান। না হলে চন্দননগরের ফরাসীরা ধনে-প্রাণে মারা যাবে। সিরাজ ডাক দিলেন দুর্লভরাম আর মীরমদনকে। যাও এক্ষুণি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রওনা হও চন্দননগরের দিকে।

ল সাহেব গোপনে দুই সেনাপতিকে উৎকোচ দিলেন বেশ কিছু টাকা। কাজ হাসিল হলে, অর্থাৎ ইংরেজদের ঠেকাতে পারলে, প্রতিশ্রুতি দিলেন, আরও দেবেন কোঁচড় ভর্তি করে। কিন্তু ঘুষ খেয়েও হুঁস নেই দুর্লভরামের। ল দেখলেন,

ইংরেজদের নাম শুনলেই হাত পা ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে থাকে তাঁর। দুর্লভরামের ভাবভঙ্গী দেখে ল সাহেবের মনে হল, গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অর্থ এনে উপহার দিলেও দুর্লভরামের ইংরেজ-ভীতি যাবে না। তিনি চন্দননগরের দিকে রওনা হলেন বটে, কিন্তু চলার গতি বড় মন্থর। কে বলবে যে সেটা যুদ্ধযাত্রা। যেন হাওয়া খেতে চলেছে সৈন্য-সামন্তরা।

"ইংরেজ পক্ষ চন্দননগর আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া সিরাজদ্দৌলা রাজা দুর্লভরামের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। হুগলীর দশ ক্রোশ উত্তরে নন্দকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। 'সাহায্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ফরাসীরা আত্মসমর্পণ করিবে, আর যাইবার প্রয়োজন নাই' বলিয়া নন্দকুমার তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। 'প্রবল ইংরেজ সৈন্যের নিকটে পরাজিত হইলে নবাবের অপমান হইবে ভাবিয়া, নিরস্ত করিয়াছিলাম' ইত্যাদি বলিয়া কৈফিয়ৎ দিলেও, নন্দকুমার পরিত্রাণ পান নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত হইলেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

১৫ মার্চ। কলকাতা থেকে চন্দননগরের দিকে এগোতে লাগল তিনটে জাহাজ। কেণ্ট, টাইগার আর সল্‌সবেরী। চন্দননগরের ওপারে কৌগাছিতে গিয়ে থামল সেগুলো। ইতিমধ্যে ক্লাইভ একটা জবর বুদ্ধি খাটিয়ে বসেছেন চন্দননগরে। চারদিকে রটিয়ে দিলেন, যে-কেউ ফরাসীদের দল ছেড়ে ইংরেজদের দলে ভিড়লে শাস্তি তো পাবেই না, বরং যা পাবে সেটা হল নগদ টাকা পুরস্কার। ক্লাইভ ভেবেছিলেন, ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসবে অনেকে। তেমন কিছু ঘটল না। আসবার মধ্যে এল শুধু একজনই। নাম সেজার তেরানো। ফরাসী গোলন্দাজ ফৌজের সর্দার লেফটেন্যাণ্ট। ক্লাইভের আর দশজনের দরকার হল না। ঐ একজনই যথেষ্ট।

ইংরেজদের জাহাজ যাতে চন্দননগরে সহজে পৌঁছতে না পারে, তার জন্যে ফরাসীরা শহরের কাছাকাছি নদীর উপরে তৈরী করেছিল একটা বেড়া, অসংখ্য ডিঙি নৌকোকে উপুড় করে চেন দিয়ে গায়ে-গায়ে বেঁধে। সেগুলো আবার বাঁধা ছিল বয়ার সঙ্গে। তার ফলে ইংরেজরা কোনো সময়েই শহরের কাছাকাছি এসে জাহাজ ঠেকাতে পারবে না। কেবল নিজেদের জাহাজের জরুরী আসা যাওয়ার জন্যে খোলা ছিল একটা গুপ্ত পথ। আর গুপ্ত পথের কাছাকাছি ফরাসীরা মাটি ভর্তি করে লুকিয়ে ডুবিয়ে রেখেছিল নিজেদের যুদ্ধ জাহাজ। তেরানো সেই গুপ্ত পথের হদিশটা বাৎলে দিলেন ক্লাইভকে।

এই তেরানোর জীবন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুখের হয়নি। ইংরেজদের কাছে

থেকে পাওয়া টাকার কিছু অংশ স্বদেশে পাঠিয়েছিল, বাবার কাছে। কিছুদিনের মধ্যেই সে টাকা ফেরত চলে এল তেরানোর কাছে। সঙ্গে একটা চিঠি। চিঠির অক্ষরে-অক্ষরে জলন্ত ধিক্কার। যে ছেলে নিজের দেশ বা জাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়, তার দেওয়া অর্থ ছুঁতে ঘেন্না করে আমার। বাবার এই চিঠি অপমানের কামান দেগেছিল তেরানোর বুকে। একদিন দেখতে পাওয়া গেল গলায় রুমাল বেঁধে, নিজের বাড়ির গেটে ঝুলছেন। দেশদ্রোহীতার জ্বালা জুড়োতে হল তাকে আত্মহত্যা করে।

২২ মার্চ। ওয়াটসনের সব ক'টা যুদ্ধ জাহাজ এসে পড়ল চন্দননগরে। সেই সঙ্গে আরও জাহাজ এসে পৌঁছল ক্যাপ্টেন পোককের নেতৃত্বে। তিনি আসছেন সোজা মাদ্রাজ থেকে। কলকাতায় পৌঁছে খবর পেলেন ওয়াটসন গেছেন চন্দননগর আক্রমণে। পোকক আর এক সেকেণ্ড দেরী না করে রওনা দিয়েছেন চন্দননগরের দিকে।

২৩ মার্চ। ভোর হতে না হতেই ক্লাইভ আক্রমণ শুরু করলেন ডাঙায়। ওয়াটসন জলে।

"২৩ মার্চ প্রাতঃকালে ৫টার সময় কেল্লার দক্ষিণ দিকে গঙ্গার নিকট হইতে ফরাসীদের উপর গোলা ছুঁড়িতে লাগিলেন। ইহাতে ইংরেজদের জাহাজ গমনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। ৭টার সময় টাইগার, কেণ্ট, সলিশবেরি নামের যুদ্ধ জাহাজ দুর্গের নিকটবর্তী হইল। নবাগত এ্যাডমিরল পোকক টাইগারে এবং কেণ্ট জাহাজে ওয়াটসন অবস্থান করিলেন। চতুর্দিক হইতে আক্রমণের চিহ্ন স্বরূপ রক্তপতাকা উড্ডীন হইল। ঘোরতর বিক্রমে ইংরাজ সৈন্য যেন স্বর্গ-মর্ত ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়া কামান ছুঁড়িতে লাগিলেন। ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটে ঘোরতর অগ্নিবর্ষণে ফরাসীদের মাটির বুরুজ ধূলিস্মাৎ হইয়া গেল। ইহা মেরামতের জন্য ফরাসীরা যথেষ্ট চেষ্টা করিল। সে সময়ে মাটি পাওয়া বড় সোজা কথা নহে। তাহারা মাটির অভাবে উৎকৃষ্ট কাপড়ের বস্তা ও অন্যান্য বহুমূল্য পণ্যদ্রব্যে ভগ্নস্থান পূরণ করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দুর্গরক্ষার যখন কোনরূপ আশা রহিল না, তখন বৃথা হত্যা অনর্থক বিবেচনা করিয়া ৯॥ টার সময় ফরাসীর বড় সাহেব রেনল রক্তপ্রবাহ রোধ করিবার জন্য শান্তির চিহ্ন শ্বেত পতাকা উত্থাপন করিলেন।" ক্লাইভ চরিত।

"গঙ্গা-তীরে, নীরে
জ্বলিল সমরানল ধরি ভীম সাজ ;
ভয়ে ভীতা ভাগিরথী বহিলেক ধীরে !

নবম দিবস পরে নভঃ আলো করে
উঠিল ব্রিটিশ-ধ্বজা চন্দননগরে।
"ফরাসীর সম যোদ্ধা নাহি ভূভারতে"
বঙ্গদেশে একবাক্যে বলিত সকলে।
সে ফরাসী যশো-রবি সেই দিন হতে
ক্লাইবের 'কটাক্ষেতে' গেল অস্তাচলে"

পলাশীর যুদ্ধ।

১০ এপ্রিল কলকাতায় সিলেকট কমিটির অধিবেশন। ক্লাইভ, কিলপ্যাট্রিক, হলওয়েল প্রমুখেরা উপস্থিত। সেদিনের সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল দুজন দেশীয়কে প্রাণখোলা ধন্যবাদ জানিয়ে। তার একজন উমিচাঁদ। আরেকজন নন্দকুমার।

"We the servants of the East India Company should always be greatful to that noble-minded and wealthy native merchant of Calcutta – Omichand. It was through his agency that we succeded to secure the assistance and co-operation of Dewan Nun-coomar, Phoujdar Hoogly. A body of Subedhar's troops was stationed within the bound of Chandernagar previously to our attack of that place. These troops belonged to the garrison of Hoogly and were under the command of Dewan Nun-coomar. If these troops were not withdrawan, it would have been highly improbable to gain the victory."

চন্দননগর ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বাসিন্দেরা প্রাণভয়ে পালাতে লাগল ঘর-দোর ছেড়ে, বন-জঙ্গল, খাল-বিল, নদী-নালা পেরিয়ে। পিছনে ইংরেজদের তাড়া। তাড়া খেয়ে সবাই এসে হাজির হল মুর্শিদাবাদে।

"ইংরাজেরা শত্রুসেনার সন্ধান না পাইয়া নিরীহ প্রজাপুঞ্জের শস্যক্ষেত্র পদদলিত করিতে করিতে, গ্রাম নগর উৎসন্ন করিতে করিতে, হুগলী, বর্দ্ধমান এবং নদীয়ার বিস্তীর্ণ জনপদ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

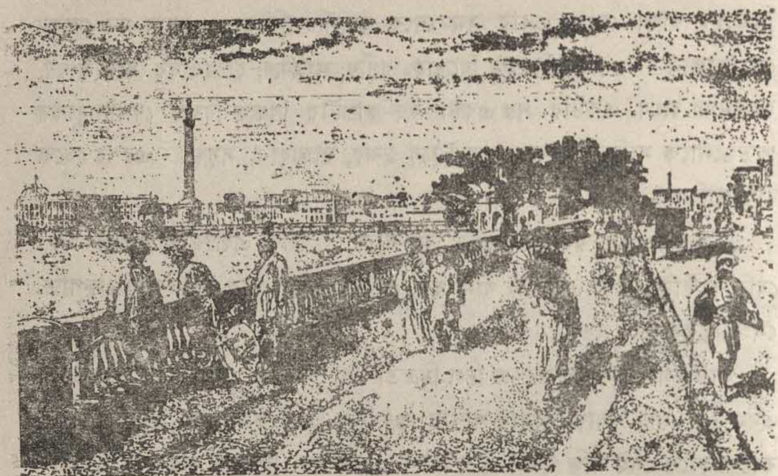
"মুর্শিদাবাদের লোকে, ফরাসীদিগের মলিন মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। সিরাজদ্দৌলা দেশের রাজা। সুতরাং ফরাসীরা তাঁহার শরণাগত হইলেন। তিনি ফরাসীদের কাতরক্রন্দন উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে কাশিমবাজারে আশ্রয় দান করিতে বাধ্য হইলেন।" সিরাজদ্দৌলা।

সবাই ভেবেছিল, এবার বুঝি শান্তি। আর যুদ্ধ নয়। ইংরেজরা যুদ্ধ-বিগ্রহের রাস্তা ছেড়ে এবার মন দেবে ব্যবসা-বাণিজ্যে। নবাব মন দেবেন প্রজাপালনে। শোভা সিংহের বিদ্রোহ, বর্গীর আক্রমণ, ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ, চন্দননগর ধ্বংস, একটার পর একটা ঝড়-ঝাপটায় বিধ্বস্ত-বিব্রত দেশটা বুকের ক্ষতগুলোকে সারিয়ে আবার হয়ে উঠবে সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, সমৃদ্ধ। এরপর থেকে বুঝি শান্তিপর্ব।

কিন্তু ইতিহাস রমণীয় চলনটি বড় বাঁকা। আর এইটির তার মস্ত গর্ব। যেদিকে কাঁটা ঝোপ, যেদিকে খানা-খন্দ, যেদিকে হত্যা আর ধ্বংস আর রক্তপাত, সেই দিকেই তার যত টান।

আলিনগরের সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল মিত্রতা এবং শান্তি। অর্থাৎ সে হয়ে উঠবে এমন এক গাছ, যার শাখায়-শাখায় শুধু ফুল এবং ফুলে-ফুলে সুগন্ধ। কিন্তু কালে-কালে সেই সন্ধি পত্রটা হয়ে উঠল এমন এক বিষবৃক্ষ, যার পত্র-পুষ্পহীন ডালপালাগুলো অক্টোপাসের মত আঁকড়ে ধরল বাংলার ভাগ্যকে। আলিনগরের সন্ধির সূত্র ধরেই বাংলাদেশের ইতিহাস মোড় নিতে লাগল অপ্রত্যাশিত এক নতুন পথের দিকে।

যেন মনে হয়, কলকাতায় যেদিন সই পড়ল সন্ধিপত্রে, অলক্ষে ইতিহাসের বিধাতা সেইদিনই জেনে গিয়েছিলেন, একদিন এই কলকাতাই হয়ে উঠবে এই বিদেশী বণিকদের দখল-করা সাম্রাজ্যের রাজধানী।



॥ পলাশীর প্রস্তুতি ॥

নবাবের কাছে আশ্রয় পেয়েছে ফরাসীরা। তাদের জীবন এখন নিরাপদ। অনেকদিন পরে তাদের চোখে ঘুম এল। কিন্তু ঘুম নেই ইংরেজদের চোখে। চোখ জ্বলছে, রাগে-বিদ্বেষে। ফরাসীদের বিরুদ্ধে নয় শুধু। নবাবের বিরুদ্ধেও। আমরা ইংরেজরা চাইছি ফরাসীদের ঝাড়ে-বংশে শেষ করতে। আর নবাব তাদের দিয়ে চলেছেন আশা এবং আশ্রয়? এরপর এমন একদিন আসবে, যেদিন ফরাসীরা আস্তে-আস্তে নিজেদের হাতের আস্তিন গুটোবে। এদিক-ওদিক থেকে সবাই এসে জমা হবে এক জায়গায়। তারপর নবাবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বদলা নেবে আমাদের চন্দননগর দখলের। কোন সাহসে নবাব আশ্রয় দেন ওঁদের? নবাবতো আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যারা আমাদের শত্রু, তারা নবাবেরও শত্রু। তাহলে?

চন্দননগর ধ্বংস করার সঙ্গে-সঙ্গে সিরাজকে একটা চিঠি লিখেছিলেন ওয়াটসন।

"আমি গুরুতর কার্যের জন্য এখানে (চন্দননগরে) আসিয়াছি। তাহাতেই ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া, আপনার কয়েকখানি পত্র পাইয়াও, যথাসময়ে উত্তর দিতে পারি নাই। তজ্জন্য ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। আমাদের সৌভাগ্যবলে, আপনার সৌহার্দ্দ সহায়তায়, এবং মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছায়, দুই ঘণ্টামাত্র যুদ্ধ করিয়াই ২৩ মার্চ তারিখে চন্দননগর অধিকার করিয়া লইয়াছি। ফরাসীরা অনেকেই

বন্দী হইয়াছে। যে কয়েকজন পলায়ন করিয়াছে, তাহাদিগকেও ধরিয়া আনিবার জন্য অস্ত্রধারী নিযুক্ত করিয়াছি, তাহারা আর কাহারও উপর উপদ্রব করিবে না। সুতরাং আপনি তজ্জন্য অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমরা যে সন্ধিপালন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না, সে কথা পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়াছি। আপনার শত্রু যখন আমাদের শত্রু, তখন আমাদিগের শত্রুও অবশ্যই আপনার শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং ফরাসীরা যদি আপনার নিকট উপস্থিত হয়, আপনি অবশ্যই তাহাদিগকে বাঁধিয়া পাঠাইয়া দিবেন।…"

সিরাজ এ চিঠির উত্তর দিলেন। তাতে ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে অনেক কথা। কিন্তু ফরাসীদের বেঁধে পাঠানোর ব্যাপারে উচ্চবাচ্চ নেই কোনরকম। ওয়াটসন তাঁর পরের চিঠির ভাষাটাকে শান দিলেন রূঢ়তার পাথরে।

"পরমেশ্বর এবং মহম্মদের পবিত্র নামে আপনি যে ধর্মপ্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করিতেছেন না বলিয়াই, আমাকে পুনঃপুনঃ পত্র লিখিতে হইতেছে। কোম্পানীর যে সকল কামান আপনার অধিকারে রহিয়াছে, তাহা ওয়াটস সাহেবকে প্রত্যর্পণ করিবেন। বন্ধুভাবে থাকিবার জন্যই যে সন্ধিস্থাপন করিয়াছেন, সে কথা কদাচ বিস্মৃত হইবেন না। এবং পলায়িত ফরাসীদিগকে অবিলম্বে বাঁধিয়া পাঠাইয়া দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি ইহার বিপরীতাচরণ করিবার জন্য পরামর্শ দেন, তবে নিশ্চয়ই জানিবেন যে, সে কদাচ আপনার বন্ধু নহে। সে উপদেশে দেশের মধ্যে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিবে। আপনি সত্যভঙ্গ না করিলে, আমরা কিছুতেই যুদ্ধ ঘোষণা করিব না। এইমাত্র সংবাদ পাইলাম যে, ফরাসীরা পলায়ন করিয়া আপনার নিকট উপনীত হইয়াছে এবং আপনার সেনাদলে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছে। আপনি তাহাতে সম্মত হইলে আমাদের সঙ্গে আর বন্ধুভাব থাকিবে না। আপনি সে-দিনও আমাদের নিকটে সেনা-সাহায্য চাহিয়া ছিলেন, তাহার পর লিখিয়াছেন যে আর চাহেন না। ইহাতে বুঝিতেছি যে, ফরাসীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করাই বোধহয় আপনার অভিমত।"

ওয়াটসনের এই চিঠিতে রয়েছে কোম্পানীর কামান ফেরত পাঠানোর কথা। ইংরেজদের এই কামানগুলো সিরাজের হাতে এসেছিল কলকাতা আক্রমণের সময়। কিছু কাশিমবাজার থেকে। বাকী সব ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করে। মুর্শিদাবাদে নবাবের তোপখানায় তখন যেসব কামান তৈরী হতো সেগুলো হতো ওজনে ভারী। জরুরী প্রয়োজনে যে কোন জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। কাশিমবাজার থেকে ফিল্ডপিস নামের একধরনের ছোট

করেছেন। নবাবের রাগের বহর দেখে জগৎশেঠেদের হাড়ে-মাসে কাঁপুনী। নিজেদের গর্দান বাঁচাতে গিয়ে সব দোষ চাপিয়ে দিলেন তাঁদের এজেন্ট রণজিৎ রায়-এর ঘাড়ে। হুঁজুর! এই জাল শীল মারার ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। আমাদের অগোচরে এসব করে থাকতে পারে রণজিৎ রায়। তখুনি ডাক পড়ল রণজিৎ রায়ের, দরবারে। রণজিৎ রায়কে হুকুম দিলেন মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার। এবং পথে নিহত হলেন তিনি।

ল সাহেবের এই কাহিনীর সবটুকু তথ্য নির্ভুল নয়। রণজিৎ রায়কে আর যা শাস্তি দেওয়া হোক, হত্যা করা হয়নি। পলাশী যুদ্ধের পরেও তিনি বেঁচে ছিলেন। ল সাহেব এই প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছেন, গোপনে জগৎশেঠের শীল ব্যবহারের জন্যে রণজিৎ রায় ইংরেজদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিলেন দুলাখ টাকা।

মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে ওয়াটস রয়েছেন ইংরেজ পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে। যতক্ষণ নবাবের কাছে, যেন ভিজে বেড়াল। যেন ভাজা মাছ কেমন করে উল্টে খেতে হয়, শেখেননি এখনো। কিন্তু দরবারের বাইরে এলেই বেরিয়ে পড়ে তাঁর থাবার নখ।

১১ এপ্রিল। ওয়াটস-এর একটা চিঠি পৌঁছল ক্লাইভের হাতে।

"উমিচাঁদের সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্তা হয়েছে। আপনাকে কি ভাষায় সে সব জানাবো বুঝতে পারছি না। স্ক্রাফটনকে জানিয়েছিলাম, তিনি বললেন, উমিচাঁদ এবং আমার এই উদ্যম আপনার এবং মেজর-এর যথেষ্ট উপকারে লাগবে।"

একদিকে ওয়াটস বাইরে চালিয়ে যাচ্ছেন নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্র। অন্য দিকে নবাবের উপর দিয়ে চলেছেন তীব্র চাপ। ফরাসীদের তাড়াতে হবে। ওয়াটস-এর ঔদ্ধত্যে সিরাজের চোখে একদিন জ্বলে উঠল আগুন।

"On the 13th. in the presence of Jagatseth and others he theratened to impale Watts or cut off his head."

কেউ-কেউ লিখেছেন ওয়াটসকে শূলে চড়ানোর ভয় দেখিয়েছিলেন নবাব। শেষ পর্যন্ত ওয়াটসকে শূলেও চড়তে হলনা, মাথাও কাটা পড়লনা। বরং ঘটল সেটাই, ওয়াটস যা চেয়েছিলেন।

ফরাসীদের তাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে ছিলনা নবাবের। কিন্তু পাত্র-মিত্র সভাসদেরা তাঁকে বোঝাতে লাগলেন, সামান্য কয়েকটা ফরাসীর জন্যে দেশে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠুক, এটা কখনই নবাবের অভিপ্রেত হওয়া উচিত নয়। নবাব বসলেন ল সাহেবের সঙ্গে গোপন আলোচনায়। ল বললেন—

"ফরাসী কোম্পানীকে সাহায্য দানের জন্যে যদি পলাতক ফরাসীগণকে আশ্রয় দেওয়া হইত, তাহা হইলে সন্ধি-ভঙ্গের কথা উঠিতে পারে। কিন্তু যাঁহার অধীনে নানাজাতীয় হাজার হাজার লোকে চাকরি করিতেছে, পলাতক কয়েকজন আশ্রিত ফরাসী তাঁহার চাকরী করিলে সন্ধির অমর্যাদা হয় না।"

সিরাজ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এই উত্তরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হল বিরোধী পক্ষের ফাঁদে।

"নবাব দরবারের সুচতুর পাত্রমিত্রগণ বুঝিলেন যে, ইহাই উপযুক্ত অবসর। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, ফরাসীদিগকে কাশিমবাজারে আশ্রয়দান করার জন্যই পুনরায় শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইয়াছে। অতএব তাহাদিগকে পাটনা প্রদেশে প্রেরণ করা হউক। সিরাজদ্দৌলা এই নিঃস্বার্থ হিতবাক্যের মধ্যে কোনরূপ দুষ্টাভিসন্ধির সন্ধান পাইলেন না। তিনি ফরাসী সেনানায়ক লাস সাহেবকে তদনুরূপ আদেশ প্রদান করিলেন।" সিরাজদ্দৌলা।

ল নবাবকে জানালেন তাঁর সতর্কবাণী—

"আপনার মন্ত্রীবর্গ ও অধিকাংশ সেনানায়কগণ আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই ইংরাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ফরাসীগণ দূরে চলিয়া গেলে তাঁহাদের চক্রান্তের আরও সুবিধা হইবে। তাঁহারা প্রভুর সর্ব্বনাশ করিয়া, নিজের স্বার্থসাধন জন্য ইংরেজদের সহিত নবাবের গোলযোগ বাধাইবেন। সহচরবর্গসহ যতদিন আমি আপনার নিকট থাকিব, ততদিন তাঁহাদের অভিপ্রায়-সিদ্ধির আশা নাই। যুদ্ধের সময় কেহই আমাদের মত আপনার কার্য করিবে না। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।"

সিরাজ সব বুঝলেন। কিন্তু ফরাসীদের আশ্রয় দিতে আর সাহস পেলেন না। ল-কে বললেন, আপনারা আপাতত পাটনায় গিয়ে থাকুন। বিদ্রোহের আভাস পেলে আমি যথাসময়ে আপনাদের ডেকে পাঠাবো।

নবাবের কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে ল শুধু বললেন, 'এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।'

১৬ এপ্রিল ফরাসীরা কাশিমবাজার ছেড়ে যাত্রা করল পাটনার দিকে। ওয়াটস মনের আনন্দে এক দিনে দশখানা চিঠি লিখে বসলেন কলকাতায়।

যথাসময়ে ক্লাইভ এবং ওয়াটসনের কাছে গিয়ে পৌঁছল ফরাসীদের কাশিমবাজার ছেড়ে পাটনা যাওয়ার খবর। কেউই খুশী হলেন না এতে। ক্লাইভ চাইলেন ফরাসীদের ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করতে। তিনি পাটনার দিকে এক দল

সৈন্য পাঠানোর জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন, যারা পাটনায় পৌছবার আগেই, রাস্তার মাঝখানে, ফরাসীদের খতম করে ফিরে আসবে।

নবাবের কানে এসে পৌছল এ খবর। নিজের জলজলে রাগটাকে সামলাতে না পেরে তখুনি ওয়াটসকে ডেকে বললেন –

"হয় মুচলেকা লিখে দাও যে ফরাসীদের পিছনে সৈন্য পাঠাবে না, না হয় এখুনি দূর হয়ে যাও, আমার রাজধানী থেকে।"

১৪ এপ্রিল ওয়াটস চিঠি লিখলেন ক্লাইভকে।

"চন্দননগরে আমাদের সাফল্যের আগে, রণজিৎ রায় এবং অন্যান্যদের সামনে নবাব আমাকে এই বলে শাসিয়েছিলেন যে, তিনি হয় আমাকে শূলে চড়াবেন অথবা হত্যা করবেন। আবার ঠিক গতকালও জগৎশেঠ, মণিচাঁদ, খোজা ওয়াজেদ, মীর আবদুল কাসিম, রণজিৎ রায় এবং উমিচাঁদদের সামনে ঐ একই রকম ভাবে শাসালেন। এ কথাটা আমি শুধু আপনার আর এ্যাডমিরালের অবগতির জন্যেই জানালাম। এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো রকম হৈ-চৈ হোক আমি তা চাই না। নবাবের আস্ফালনকে আমি কেয়ার করি না। তবে এই ব্যাপারে আপনি যে রকম কঠিন ব্যবস্থা নিতে চান, নিতে পারেন, আমি বাধা দেব না।"

১৮ তারিখে আরও একটা চিঠি লিখলেন ওয়াটস। ক্লাইভ তার উত্তরে লিখলেন যে, নবাবের মতি-গতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সম্ভবতঃ ফরাসীদের অর্থাৎ বুসির কাছ থেকে সাহায্য পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েই তিনি এমন আচরণ করছেন। ফরাসীদের যদি দেশ ছেড়ে চলে যেতেই বললেন, তাহলে পাটনার দিকে রওনা হল কেন ? যাই হোক, তুমি টাকা-কড়ি এবং জিনিষপত্র নিয়ে পত্রপাঠ কলকাতায় চলে এসো। যে কোন মুহূর্তে ক্ষতিকর কিছু ঘটে যেতে পারে।

২০ এপ্রিল। ক্লাইভের সেক্রেটারী ওয়ালশ ক্লাইভকে একটা চিঠিতে জানালেন, নন্দকুমারের মারফৎ আপনার পাঠানো চিঠি পড়ে নবাব গেছেন ক্ষেপে। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে বলতে গেলে তাড়িয়েই দিয়েছেন। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে বলেছেন, তোমাদের মুখের অথবা সুখের দিকে তাকিয়েই চন্দননগর দখল করার অনুমতি দিলাম। তারপর ফরাসীদের তাড়াতে বললে। তাও হল। তবুও তোমাদের আশ মিটছে না। এখন তোমরা ফরাসীদের ধনে-প্রাণে মারার জন্যে আমার উপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছো। সহ্যের একটা সীমা আছে। সে সীমা পার হয়ে যাচ্ছে। এবার দেখছি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে না নামলেই নয়।

ওয়াটসকে যেমন লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনি ক্লাইভের আর একটা চিঠি এসে পৌঁছল কাশিমবাজার ফ্যাকটরির অধ্যক্ষ মিঃ কলেটের কাছে। সেখানেও ঐ একই বক্তব্য। অল্প কয়েকজন লোক রেখে বাকী লোকজন এবং টাকা পয়সা নিয়ে জলদি চলে আসুন কলকাতায়। কুড়ি জন সেপাই আর দুজন অফিসারকে পাঠাচ্ছি, আপনাদের পাহারা দিয়ে আনবার জন্যে।

২৩ এপ্রিল। ক্লাইভ গোপনে একটা চিঠি পাঠালেন মোহনলালের কাছে। মোহনলালকে যদি কোনমতে নবাবের পক্ষ থেকে টেনে এনে নিজেদের কুক্ষিগত করা যায় অথবা নবাবকে করা যায় নরম, তারই প্রয়োজনে।

"নবাবের কার্যকলাপ, ওয়াটসের প্রতি তাঁর ব্যবহার, এবং অন্যান্য কার্য দেখিয়া আমি বড়ই ভাবিত হইতেছি। এই ধনধান্যপূর্ণ রমণীয় দেশ আমার বোধ হইতেছে যে, যুদ্ধের দারুণ স্বাদ গ্রহণ করিয়া উচ্ছন্নে যাইবে। আমি আমার প্রত্যেক পত্রে নবাবকে আমার সরলতা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তিনি যদি তাহাতেও বিশ্বাস না করেন, তবে তাঁহাকেও ইহার জন্য দায়ী হইতে হইবে। আপনার প্রচুর শক্তি এবং আপনার প্রতি নবাবের অনুগ্রহের জন্য আমি আপনাকে আমার মত লিখিলাম। সম্ভবত যদি যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হয়, তাহা হইলে তাঁহার বা আমাদের উচ্ছেদ নিবারিত হইতে পারে না।……নবাব আপনার কথা খুব শুনিয়া থাকেন। আমার অনুরোধ, আপনি তাঁহাকে এরূপ পরামর্শ দিবেন, যাহাতে তাঁহার সম্মান রক্ষিত এবং দেশের মঙ্গল সাধিত হয়। ইহাতে আপনি বিশ্বাসী কর্মচারী বলিয়া খ্যাতি এবং ইংরেজদের বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইবেন।"

ঐ ২৩ এপ্রিলেই ওয়াটস লিখলেন ক্লাইভকে—

"এক ঘণ্টার মধ্যে যাহাতে আপনি প্রস্তুত হইয়া যাত্রা করিতে পারেন, সর্বদা এইরূপ ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন। খুব গোপনভাবে বলদ গাড়ি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য ঠিক করিয়া রাখিবেন। আপনি মাল পাঠাইতেছেন এরূপ ভাবে কিছু বারুদ ও গোলা পাঠাইবেন। একজন প্রধান কর্মচারী এবং এক এক বারে ৪।৫ জন করিয়া লোক আমাদের দুর্গ রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিবেন। নবাব যদি পাঠান আক্রমণ রোধ করিবার জন্য বেশী সৈন্য লইয়া উত্তরে গমন করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সেই অবকাশে অক্লেশে নগর ও নবাবের ধনসম্পত্তি হস্তগত করিতে পারিবেন।"

ওয়াটস যখন এই চিঠিগুলো লিখছেন, তখন বিরোধীপক্ষ মোটামুটি স্থির করে রেখেছেন, সিরাজকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে বসানো হবে কাকে। তাঁর নাম ইয়ার লতিফ খাঁ।

"ইংরাজ পক্ষের ষড়যন্ত্রের সাহায্য জন্য এখন স্ক্রাফটন সাহেব আসিয়া ওয়াটসের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। অমিচাঁদ উত্তরসাধক। ২৩শে এপ্রিল তারিখে ইয়ার লুৎফা খাঁ নামক নবাবের জনৈক অশ্বসেনানায়ক ওয়াটসের সহিত গোপনে দেখা করিবার জন্য সংবাদ দেন। এই লুৎফা খাঁ দো হাজারী মনসবদার। জগৎশেঠের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি শেঠগণের নিকট কিছু কিছু বৃত্তি পাইতেন। ইহার সহিত গোপনে দেখা করিতে ওয়াটস সাহেবের সাহসে কুলাইল না। প্রতিনিধি অমিচাঁদ প্রেরিত হইলেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

মীরজাফরের দিকেই টানটা ছিল সকলের। কিন্তু মীরজাফর রাজী হননি। যে আলিবর্দীর অন্নে প্রতিপালিত হয়েছেন একদা, তারই বংশধরকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে তিনি সরাসরি অংশ নিতে রাজী হলেন না। তাঁর মনোভাব, ষড়যন্ত্রে আছি কিন্তু সিংহাসনে নেই।

"Respect for the memory of Alivardi Khan had caused Mir Jafar to refuse the overtures made to him by Jagat Seth and the later had to put up with khoda Yar Lutif Khan, a commander of 2,000 horse in the Nowab's service, to whom Jagat Seth paid a monthly allowance to protect him against all his enemies, even against the Nawab if occasion should arise."

The House of Jagatseth

ওয়াটস ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইয়ার লতিফের দিকে। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে উমিচাঁদ দেখা করলেন ইয়ার লতিফের সঙ্গে। ইয়ার লতিফ জানালেন যে, নবাবকে শীগগির পাটনার দিকে পা বাড়াতে হবে পাঠানদের আক্রমণ রুখতে। সেই কারণেই ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধিটা বজায় রেখে চলেছেন। পাঠান দমন করে মুর্শিদাবাদে ফিরলেই নেমে পড়বেন ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ে। এই হচ্ছে তাঁর মনের গোপন অভিপ্রায় অথবা প্রতিজ্ঞা। পাত্রমিত্র সভাসদেরা কেউই তাঁর উপর সন্তুষ্ট নয়। একজন উপযুক্ত নেতা পেলেই তাঁরা সিরাজের বিরুদ্ধে যোগদানের জন্যে প্রস্তুত। নবাব যখন পাটনায় থাকবেন, সেইটেই হচ্ছে তাঁর সিংহাসন দখল করবার সবচেয়ে স্বর্ণ সময়। আপনারা যদি আমাকে নবাব করেন, তাহলে রায়দুর্লভ আর জগৎশেঠদের পাবেন। ইংরেজরা এর জন্যে যা ব্যবস্থা করতে চান, করুন। আমি যে কোন প্রস্তাবেই রাজী আছি।

উমিচাঁদ সে খবর জানালেন ওয়াটসকে। মহানন্দে ওয়াটস সে খবর পৌঁছে দিলেন ক্লাইভকে। ক্লাইভ এক গোপন চিঠি লিখলেন ওয়াটসনকে। তারিখ ২৬ এপ্রিল।

"কলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে এখান থেকে এক পা নড়া সম্ভব নয়। নবাবকে আমি শেষ যে চিঠিখানা লিখি, ভীষণ রেগে গিয়ে সেটা তিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন। তিনি মীরজাফরের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধ যাত্রার জন্যে। মীরজাফরকে তিনি দশ লক্ষ টাকা দিতে রাজী হয়েছিলেন আমাদের ধ্বংস করার জন্যে। কিন্তু পরের দিন সকালে তিনি লজ্জিত হন নিজের ব্যবহারে। আমাদের প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠিয়ে একটা পোশাক উপহার দিয়েছেন। কয়েকদিন হল আমার প্রতিনিধির কাছ থেকে কোন চিঠি পাইনি। তবে জানি, মুর্শিদাবাদে চলেছে নবাবের শয়তানী এবং দুর্বহ ব্যবহারের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। এর পিছনে রয়েছেন জগৎশেঠ এবং মীরজাফর। নবাবকে সরিয়ে খুদা ইয়ার খান লতিফকে সিংহাসনে বসাতে চান তাঁরা। ইয়ার লতিফ খুব সম্ভ্রান্ত, ধনী এবং ক্ষমতাবান বংশের ছেলে। জগৎশেঠ তাঁকে দুহাতে সমর্থন জানিয়েছেন।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইয়ার লতিফের বদলে বিরোধী পক্ষের নায়ক হয়ে দাঁড়ালেন মীরজাফর। তার পিছনের প্রধান কারণটা হল মীরজাফরের প্রতি সিরাজের ঘোরতর অবিশ্বাস এবং অপমান। জগৎশেঠদের অধিকতর আস্থা।

১ মে। সিলেক্ট কমিটির মিটিং। প্রস্তাব গ্রহণ করা হল নবাবের বিরুদ্ধে, মীরজাফরের পক্ষে। নবাবের বিরুদ্ধে কমিটির তিন দফা অভিযোগ। ১। তিনি মুখে শান্তি চান। কাজে চান না। ২। যে কোনদিন তিনি সন্ধিপত্র অমান্য করতে পারেন। ৩। দেশের সমস্ত প্রধান নাগরিকেরা তাঁর বিরুদ্ধে। অতএব নতুন নবাব চাই।

মীরজাফরের প্রতি সিরাজের আচরণের একাধিক বৃত্তান্ত এদিকে-ওদিকে ছড়ানো। তার মধ্যে থেকে অল্প কয়েকটা তুলে ধরা হচ্ছে এখানে।

"Before the fall of Chandernagore we read that Mir Jafar absented himself from court and lived retired in his own house. This gave rise to suspicion in the mind of Siraj-ud-daula who, at times allowed his anger and resentment full sway. On one occasion he had gone so far as to point cannon against the house of Mir Jafar." The house of Jagatseth,

"After the defeat of the French, Siraj-ud-daula became even more suspicious of Mir Md. Jafar Khan than before, appointed Khwaja Abdul Hadi Khan as Bakshi and ordered Sayyid Mirza to take muster of the contingents of Mir. Md.

Jafar Khan and Khadim Husain Khan. The Nawab, not conetnt with doing this, sent harsh baliffs to expel the two generals." Bengal Nawabs

"প্রভুভক্ত মোহনলাল আরোগ্য লাভ করিয়া দরবারে আগমন করেন। সিরাজ তাঁহার আমির-ওমরাহগণকে বিশেষ সম্মানের সহিত মোহনলালকে অভিবাদন করিতে আদেশ করেন। গর্ব্বোন্নত সেনাপতি মীরজাফর, আলিবর্দীর ভগ্নিপতী, সিরাজের ঐ আদেশে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। পেক্রস নামক তাঁহার একজন অনুগত ব্যক্তিকে ওয়াটসের কাছে প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, ইংরেজদের যদি মত হয়, তাহা হইলে তিনি রহিম খাঁ, রায় দুর্লভ, বাহাদুর আলি খাঁ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া ঐ নবাবের পরিবর্তে অন্য যাহাকে স্থির করা যাইবে তাহাকে সিংহাসনে সংস্থাপন করিবেন। ওয়াটস এ প্রস্তাব অবগত হইয়া আহ্লাদে অধীর হইলেন। ইয়ার লতিফ অপেক্ষা মীরজাফর সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তিনি কলিকাতার পত্র লিখিলেন।" ক্লাইভ চরিত।

ক্লাইভ সেই চিঠি পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে নবাবকে লিখে বসলেন –

"আমি শান্তি আর আপনার মিত্রতা যে রকম ভালবাসি, সে রকম আর কিছুই ভালবাসি না। এই দেখুন, আমি আমার অধিকাংশ সৈন্যকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার হুকুম দিয়াছি। আশা করি আপনিও সেইরূপ আপনার সৈন্যগণকে মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিবেন। আমার উপর বিশ্বাস করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আমি আপনার কিরূপ বন্ধু।"

ঐ একই দিনে এবং আগের চিঠির কালিটা শুকোতে না শুকোতেই ক্লাইভ ওয়াটসকে লিখলেন –

"মীরজাফরের সহিত এখনই কাজে প্রবৃত্ত হও। তোমার খবর পাইলেই আমি ১২ ঘন্টার মধ্যে নওসরাইতে উপস্থিত হইব। এস্থলে আমাদের সমস্ত সৈন্য মিলিত হইবে। মেজর এখন কলিকাতায়। তিনি এক মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া কামান গোলাগুলি প্রভৃতির সহিত নৌকাযোগে নওসরাই অভিমুখে ধাবিত হইবেন। তারপর মুর্শিদাবাদ অভিমুখে গমন করিবে। মীরজাফরকে বলিবে, তিনি যেন ভয় না করেন। যুদ্ধে কখনও পিঠ দেখায় নাই, এমন পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া যাইতেছি। যে পর্যন্ত আমার একজন লোকও থাকিবে, আমি তাঁহার পার্শ্বে থাকিব।"

ইংরেজরা, বিশেষ করে ক্লাইভ, এই সময়ে সিরাজের সঙ্গে একটা হেস্ত-নেস্ত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। তার কারণ, নবাব ফরাসীদের সঙ্গে গোপনে

চিঠি-চাপাটি চালাচালি করে চলেছেন, এ খবরটা কানে পৌঁছেছিল তাদের। শুধু কানেই পৌঁছয়নি। দু'একটা চিঠি পৌঁছেও গিয়েছিল তাদের হাতে। বিলেতে হাউস অব কমন্সে স্বাক্ষী দেবার সময় ক্লাইভের উক্তি—

"Some of Suraja-dowla' letters to the French having fallen into my hand. I enclose a translation of them just to show you the necesity we were reduced to of attempting his overthrow."

একটা চিঠির নমুনা—

"These disturbers of my country, Admiral and Calonel Clive, Subat Jung, whom bad fortune attends, without any reason, are warring against Zubdalock Toojah Monsur. Renault the Governor of Chandernagore.........I hope in God these English, who are unfortunate, will be punished for the disturbances they have raised. Be confident; look on my forces as your own........."

এর পর আছে সৈন্য-সামন্তের হিসেব-নিকেশ, বোঝাপড়া। এ চিঠি চন্দননগর অধিকারের আগে লেখা। চন্দননগর অধিকারের পরে লেখা চিঠিও হাতে এসেছিল ইংরেজদের। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বুসির উড়িষ্যায় পৌঁছবার সংবাদে সিরাজের খুশী হওয়ার খবরটাই সে চিঠিতে প্রধান। উড়িষ্যার যাতে ফরাসীদের কোনরকম অসুবিধে না হয়, তার জন্যে নবাব যাদের চিঠি দিয়েছেন, সে সব নামও রয়েছে চিঠিতে।

ইংরেজ ঐতিহাসিক ম্যালকনের মতে, খোজা ওয়াজেদ এই চিঠিগুলো দেখে ফেলেছিল, পাঠানোর মুহূর্তে। খোজা ওয়াজেদের কাছ থেকে চিঠির খবর পৌঁছে যায় ওয়াটস-এর কানে।

অক্ষয়কুমার মৈত্রের মন্তব্য ভিন্ন।

"এই পত্রগুলি উপলক্ষ্য করিয়া অনেকে সিরাজদ্দৌলাকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া গিয়াছেন এবং কেহ কেহ ইহাও রটনা করিয়া গিয়াছেন যে, গুপ্তচর সাহায্যে মূল পত্রগুলিই ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু ক্লাইভ লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি ওয়াটস সাহেবের যোগে এই পত্রগুলি নকলমাত্র প্রাপ্ত হন। স্ক্রাফটন বলেন, যখন সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, সেই সময়ে তিনি এই পত্রগুলির সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই পত্রগুলি যে চক্রান্তকারীদের স্বকপোলকল্পিত নহে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। ইংরাজদিগকে স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার জন্যই যে এগুলি রচিত হয় নাই,

তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সিরাজদ্দৌলার মীরমুন্সী এই সকল পত্রের নকল বাহির করিয়া দিয়াছেন ; কিন্তু এই মীরমুন্সি যে তৎকালে উৎকোচ লোভে ইংরেজদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া সর্বপ্রযত্নে ওয়াটস সাহেবের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।"

ইতিমধ্যে মীরজাফরের মনের কথা ক্লাইভের কানে পৌঁছে গেছে ওয়াটস-এর মারফৎ। ওয়াটসকে পৌঁছে দিয়েছে খোজা পিক্রু। আপনি শান্তির পক্ষে এই ভাবটা দেখানোর জন্যে হুগলী থেকে ছাউনী উঠিয়ে কলকাতায় ফিরে যান। ক্লাইভও সঙ্গে-সঙ্গে তাই করলেন। অর্ধেক সৈন্য চন্দননগরে রেখে বাকি অর্ধেককে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়। কলকাতায় পৌঁছেই নবাবকে লিখলেন।

"আমরা তো সেনাদল উঠাইয়া আনিলাম। আপনি আর পলাশীতে ছাউনী রাখিয়াছেন কেন ?"

এই সময় মতিরাম নামে একজন গুপ্তচর কলকাতা থেকে ফিরে নবাবকে জানাল যে, ক্লাইভের অর্ধেক ফৌজ কলকাতায় এটা ঠিকই। কিন্তু বাকী অর্ধেক গোপনে জমা হয়েছে কাশিমবাজারে। সঙ্গে-সঙ্গে নবাব হুকুম দিলেন, কাশিমবাজার ঘেঁটে ফেলো। কোথায় ক'টা ইংরেজ সৈন্য লুকিয়ে আছে, টেনে বার করো তাদের।

কাশিমবাজার ঘেঁটে ফেলেও শেষ পর্যন্ত একটা সৈন্যেরও টিকির দেখা মিলল না। এতেও সন্দেহ ঘুচল না নবাবের। তিনি বুঝলেন, ইংরেজরা গোপনে প্রস্তুত হচ্ছে তাঁকে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্যে। সুতরাং তাঁকেও প্রস্তুত হতে হবে।

দুর্লভরামের অধীনে একদল সৈন্য পলাশীতে আগে থেকেই ছিল। সেখানে আরও সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। পনেরো হাজার সৈন্য দিয়ে মীরজাফরকে পাঠিয়ে দিলেন পলাশীতে। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীদের খবর দিলেন ভাগলপুরে অপেক্ষা করতে। ভাগীরথীর মুখে পুঁতে দিলেন সার সার শালের খুঁটি। যাতে ইংরেজদের জাহাজ মুর্শিদাবাদে এসে পৌছতে না পারে।

বিরোধী পক্ষের ষড়যন্ত্র বেশ এগোচ্ছিল ধীরে ধীরে। হঠাৎ বাদ সাধল উমিচাঁদ। মে-র ৫ তারিখে ক্লাইভ ওয়াটসকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, উমিচাঁদের পাওনা-গণ্ডার ব্যাপারে যেন কোন রকম কৃপণতা না করা হয়।

"....Omichand, on account of his services, should have all his losses made good by an express article in the treaty. He also proposed, that a sum, not exceeding fifty lacs of rupees,

should be granted for the reimbersment of private losses; and that ten lacs should be given to the company for the expense of the expedition and as gratuity for the army."

Memoirs of Lord Clive.

উমিচাঁদের জন্যে ৫০ লাখ। কোম্পানীর জন্যে ১০ লাখ। ক্লাইভ উমিচাঁদের হয়ে যতই ওকালতি করুন, মীরজাফর কিন্তু ওয়াটসকে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, উমিচাঁদ লোকটা ধূর্তের শিরোমণি। ওকে আদৌ বিশ্বাস করবেন না। মাত্র ক'দিন আগে পর্যন্ত ওয়াটস আর উমিচাঁদ ছিলেন হরিহর আত্মা। ইংরেজের পক্ষে এবং সিরাজের বিরুদ্ধে যত রকম ফন্দি-ফিকির আঁটা যায়, সবই করেছেন দুজনে মিলে। কিন্তু আড়াআড়ি-ছাড়াছড়ি দেখা দিল মীরজাফরের সঙ্গে মন্ত্রণার পর থেকেই। ষড়যন্ত্র হয়েছে উমিচাঁদকে এড়িয়েই। উমিচাঁদ তখনো জানেন না, ভাবী নবাব, মীরজাফর। জানেন, তাঁর মনোনীত ইয়ার লতিফই বাংলার ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতা।

১৭ মে ক্লাইভের হাতে এল ওয়াটস-এর চিঠি। চিঠির বিষয়, উমিচাঁদ। "মীরজাফর তাঁর সিদ্ধান্তে স্থির। তিনি উমিচাঁদকে একবিন্দু বিশ্বাস করতে রাজী নন। তাঁকে বিশ্বাস করলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা মাঠে মারা যাবে। গতকাল, আমার এবং পিক্রর অনুরোধ অগ্রাহ্য করে, উমিচাঁদ ছুটে গিয়েছিলেন নবাবের কাছে। নবাবকে গিয়ে জানালেন, তাঁকে খুব একটা গোপন খবর জানানোর আছে। জানাজানি হয়ে গেলে, আমার প্রাণ যাবে। নবাব শপথ করে বললেন, জানাজানি হবে না। তখন তিনি জানালেন যে, ইংরেজরা দুজন লোক পাঠিয়েছে গঞ্জামে। মঁসিয়ে বুসির সঙ্গে আলোচনা করতে। ইংরেজ এবং ফরাসীরা সন্ধি করছে। এবং বুসি আসছেন ইংরেজদের সাহায্য করতে। এই ডাহা মিথ্যে কথাটা বলে উমিচাঁদ শুধু নবাবের সুনজরই কাড়েনি, আদায় করেছে চার লাখ টাকার প্রতিশ্রুতি। নবাব পরোয়ানা দিয়েছেন বর্ধমানের রাজার নামে, তাঁকে ঐ টাকাটা দিতে। ...এই মিথ্যের ফলে নবাব নিশ্চয়ই আরো সতর্ক হবেন। এবং (পলাশী থেকে) সৈন্য সরিয়ে আনার ব্যাপারে আর রাজী হবেন না। আমাদের বারণ সত্ত্বেও উমিচাঁদ, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে, এই কাণ্ডটা ঘটাল। আমরা বাইরে এখনও বন্ধুত্বের ভাণ করে থাকি। যেহেতু সেটা দেখানো দরকার। খোজা ওয়াজেদ আপনাকে তাঁর সেলাম জানিয়েছে। এখন তাঁর উপর নবাবের কড়া নজর, তাই নিজে কিছু লিখতে পারছে না। খোজা ওয়াজেদের কাছ থেকেই উমিচাঁদের বিষয়ে যে-সব বিস্ময়কর খবর

জানতে পেরেছি, তা বলে ওঠা যাবে না। শুনলে হতবাক হয়ে যাবেন আপনি।"

এর পরের ধাপেই উমিচাঁদ তাঁর থাবা বাড়ালেন ওয়াটস-এর দিকে। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের সমস্ত খবর আমার জানা। আমাকে তিরিশ লক্ষ টাকা দিতে হবে। নইলে সব ফাঁস করে দেবো নবাবের কাছে।

"বনিকরাজ উমিচাঁদ বিলক্ষণ বুঝিতেন যে, ষড়যন্ত্রে কৃতকার্য হইলে, ইংরেজ-পক্ষের মীরজাফরের নিকট প্রভূত অর্থপ্রাপ্তি হইবে। সফল না হইলে, অন্যের মত তাঁহারও প্রাণ লইয়া টানাটানি, অধিকন্তু বিপুল অর্থনাশ। সুতরাং তিনি বলিলেন, 'কলিকাতার অন্যান্য বণিকের মত তাঁহার নষ্ট অর্থমাত্র প্রত্যর্পণ করিলে চলিবে না, নবাবের রাজকোষ হইতে যত টাকা পাওয়া যাইবে, তিনি তাহা হইতে শতকরা ৫৲ টাকা ও মণিমুক্তার চতুর্থাংশ লইবেন।' ওয়াটস সাহেব এই সমস্ত কথা ইংরেজ দরবারে জানাইয়া লিখিলেন, অমিচাঁদ সন্তুষ্ট না হইলে ভয়ের কারণ আছে।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

১৭ মে তারিখে কলকাতায় বসেছিল কাউন্সিলের মিটিং। ওয়াটসই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গুপ্ত সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলিপি। সেখানে প্রস্তাব ছিল কোম্পানী পাবে এক কোটি টাকা। কলকাতার ইংরেজ বাঙালী আর আরমেনিয়ানরা পাবে ৭০ লক্ষ টাকা। উমিচাঁদ পাবে ৩০ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া বিদ্রোহের যাঁরা প্রধান প্রধান পাণ্ডা, তাঁরা কে কি পাবেন সেটা লেখা ছিল আর এক ফর্দে।

"১৮ মে তারিখে দরবারে সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলিপি ও অমিচাঁদের প্রস্তাবের মীমাংসা হইল। ...দরবারের মহারথীগণ সিরাজদ্দৌলার অগাধ (!) অর্থের বিষয় চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন ইউরোপীয় বনিকগণকে ৫০ লক্ষ দিতে হইবে; কিন্তু কালা আদমীর বেলায় ৩০ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষতে নামিল; আরমানিদের ১০-এর স্থলে · হইল। তৎপরে নৌসেনা ও সৈন্যবিভাগের ২৫ করিয়া ৫০ লক্ষ ধরা হইল। এবং দরবারের মন্ত্রীবর্গের জন্য মীরজাফর বাহাদুরকে যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে এ প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। এখন অমিচাঁদের কথা লইয়া বিতর্ক। ...অমিচাঁদ বিপুল অর্থ না পাইলে চক্রান্তের কথা নবাবকে বলিয়া দিবে, এমন সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। অতএব অমিচাঁদকে প্রতারিত করিতে হইবে। ক্লাইভ উপায় উদ্ভাবন করিলেন। দুইখানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিতে হইল। আসলখানি সাদা কাগজে লিখিত হইল। আর লাল কাগজে অন্য একখানি সন্ধিপত্র লিখিত হইল। সেখানি জাল সন্ধিপত্র। এই কাগজে অমিচাঁদের ৩০ লক্ষ টাকা থাকিল। প্রথমখানিতে তাহার নামগন্ধও রহিল না।

সকল মহারথীই দুই কাগজে স্বাক্ষর করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। কেবল ওয়াটসন সাহেব জাল কাগজে দস্তখত করিতে অসম্মত হইলেন।"

বাঙ্গলার ইতিহাস।

যে উমিচাঁদ ইংরেজদের এতদিনের উপকারী বন্ধু, ক্লাইভের ভাষায় রাতারাতি তিনি হয়ে গেলেন, ভিলেন। ওয়াটসন জাল সন্ধিপত্রে সই করবেন না শুনেও ক্লাইভ এতটুকু বিচলিত নন। লসিংটন নামে এক সাহেবকে হুকুম দিলেন, তুমি ওয়াটসনের হয়ে সই করে দাও তো। লসিংটন সই করে দিলেন।

মহাসভায় বিচারের সময় উঠেছিল এই সই জাল করার প্রসঙ্গ। ক্লাইভ উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন, সই জাল করা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সেটা করা হয়েছিল ওয়াটসনের সম্মতি নিয়েই। তবে ওয়াটসন সম্মতি না দিলেও তিনি সই জাল করতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি—একবার কেন, প্রয়োজন হলে একশবার তিনি এরকম কাজ করতেও প্রস্তুত।

সন্ধিপত্র কলকাতা থেকে গোপনে চলে এল মুর্শিদাবাদে, ওয়াটস-এর কাছে। সঙ্গে ক্লাইভের গোপন নির্দেশ। যদি বুঝতে পার নবাবের রাজকোষে এত টাকা নেই, তাহলে কোম্পানীর এক কোটিকে কমিয়ে ৫০ লক্ষ করতে পার।

সন্ধির কাগজপত্র তো হাজির। কিন্তু সই-স্বাক্ষর করবেন যিনি সেই মীরজাফর কোথায়? তিনি তো পলাশীতে। তাহলে? চাতক পাখির মত হাঁ করে বসে থাকতে হবে নাকি তাঁর না-ফেরা পর্যন্ত? আর ইতিমধ্যে নবাব যদি ষড়যন্ত্রের খবর টের পেয়ে যান, তাহলে তো সর্বনাশ। ভয় ছিল সকলেরই মনে। কাউন্সিল, ক্লাইভ, ওয়াটস, সকলেরই দুরু দুরু বুক। আর ঠিক সেই সময়েই ক্লাইভের হাতে এসে গেল এক দারুণ সুযোগ, সিরাজের মন গলাবার।

গোবিন্দরাম নামে এক দূত এসে হাজির কলকাতায়। হাতে ড্রেক সাহেবের নামে লেখা একটা চিঠি। লিখেছেন মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া বাজীরাও। চিঠির বক্তব্য, সিরাজদ্দৌলা তোমাদের উপর অনেক অত্যাচার-অবিচার করেছে। আমরা সে জন্যে তোমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তোমরা যদি রাজী থাকো ১ লক্ষ ২০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আমরা তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি। বাংলাদেশ লুট করে যা পাব, তা থেকে তোমাদের এতাবৎ যা ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবো। বাকীটা আমাদের।

মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক আগে কখনো নিবিড় হয়নি। ফলে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে ইংরেজরা কানা। তাছাড়া আরও একটা সন্দেহ দেখা দিল ক্লাইভের মনে। চিঠিখানা জাল নয় তো? এমন কি হতে পারে না যে নবাব

সিরাজদ্দৌলাই এই চিঠিখানা পাঠিয়েছেন, ইংরেজদের মনের হাওয়ার গতি-প্রকৃতিটা বুঝে নিতে। ক্লাইভ স্থির করলেন, চিঠিখানা সরাসরি পাঠিয়ে দেবেন নবাবের কাছে। যদি নবাবেরই কারসাজি হয় তাহলেও, আর যদি বাজীরাও-এর প্রস্তাব হয় তাহলেও, নবাব বিশ্বাস করবেন ইংরেজদের সরলতায়।

তাই-ই ঘটল। চিঠিখানা পেয়ে নবাব ইংরেজদের বিশ্বাস করলেন বন্ধু বলে। মীরজাফরের কাছে নির্দেশ গেল, আর দরকার নেই, পলাশী ছেড়ে চলে এসো। মীরজাফর ফিরে এলেন মুর্শিদাবাদে।

মীরজাফর ফিরলেন বটে, কিন্তু তখুনিই তাঁর সই জুটল না সন্ধিপত্রে। নানা কারণে দেরী হয়ে গেল দু সপ্তাহ। ওয়াটস বলেছিলেন সন্ধির কাগজপত্র হাতে এলে দু ঘণ্টার মধ্যে সই-স্বাক্ষর হয়ে যাবে। দু ঘণ্টার বদলে দু সপ্তাহ? দেরী দেখে ক্লাইভ তো কলকাতায় উদ্বেগে অস্থির। কাউন্সিলের সদস্যরাও ভীত। কারুরই তখন মাথার ঠিক নেই, এমন অবস্থা। কখন কি ঘটে, তাই নিয়ে প্রত্যেকের শিরায় শিরায় টান। ইতিমধ্যে ওয়াটস আর স্ক্রাফটন-এর মধ্যে বেধেছে মনোমালিন্য। দুজনেই দুজনের নামে নালিশ জানায় ক্লাইভের কাছে। ক্লাইভ ওয়াটসকে লিখলেন, তোমার কোন ভয় নেই। কেউ তোমার সুনাম কেড়ে নেবে না, ইংরেজদের হয়ে তুমি যা করছ তার জন্যে। স্ক্রাফটনকে তুমি যা বলবে, সে তাই-ই করবে। ওয়াটস এক দিক থেকে নিশ্চিন্ত হলেন বটে, অনেক দিক থেকে হয়ে পড়লেন বিপন্ন। মীরজাফর লোকটার আসল মতলব বুঝতে পারছেন না তিনি। এখন কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া ভাব। ওয়াটস রেগে লাল হয়ে ক্লাইভকে লিখলেন—

"If we are successful they will reap the benifit, if otherwise they will continue as they were without appearing to have been concerned with us ; if you think you are strong enough I am of opinion we had better depend on ourselves, and enter into no contract or have any connection with such a set of shuffling, lying, spiritless wretches."

এ চিঠি হাতে পেয়ে ক্লাইভ ভাবলেন, উল্টোটা। নিশ্চয়ই ওয়াটস প্রতারিত হয়েছে। তিনি ৩ জুনের চিঠিতে কড়া ধমক পাঠালেন ওয়াটসনকে।

"Surely, you are deceived by those you employ, or you have been deceiving me."

পরে আরো একটা চিঠি।

"I find you have been duped throught the whole."

ওয়াটস জবাব দিলেন দুখানা চিঠিরই, প্রতিবাদ জানিয়ে। না, কেউই আমাকে প্রতারিত করেনি। আমিও প্রতারিত হইনি। আপনি খুব দ্রুত আমার বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। আমার যা কিছু বিলম্ব তার জন্যে দায়ী উমিচাঁদ।

উমিচাঁদ ছাড়াও আরও একটা কারণ ছিল এই বিলম্বের। সিনফ্রে নামের একজন ফরাসী যুবক এই সময়ে গোপনে দেখা করেছিলেন সিরাজের সঙ্গে। ল সাহেব যখন দলবল নিয়ে কাশিমবাজার ছেড়ে পাটনায় চলে যান, সিনফ্রেও চলে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য আমরা এই সিনফ্রেকেই আবার দেখতে পাব পলাশীর রণক্ষেত্রে, সত্যিকারের যোদ্ধা হিসেবে। এই সিনফ্রে, নিজের ঘাড়ে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে, সকলের চোখ এড়িয়ে সিরাজের সঙ্গে দেখা করলেন সংগোপনে। জানালেন, তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তটা পেকে উঠেছে কি রকম। আপনি এখুনি ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েদে পুরুন। শুনে সম্ভবত হেসেছিলেন সিরাজ। কারণ তখনো তাঁর ধারণা ছিল, যাঁদের বিরুদ্ধে সিনফ্রের অভিযোগ, তারা সকলেই প্রভুভক্ত।

সিনফ্রের পর আরও একাধিক সিরাজ-অনুরাগীও ঐ একই মন্ত্রণা জপ করে চলেছেন সিরাজের কানে। মীরজাফর আর তার প্রধান সঙ্গী-সাবুদদের এখুনি হত্যা করুন। সিরাজ হত্যা পর্যন্ত এগোতে ভয় পেলেন। বন্দী করার বদলে নজরবন্দী করে রাখলেন মীরজাফরকে। ফলে কাঁটা পড়ল মীরজাফরের সঙ্গে ওয়াটস-এর মুখোমুখি হওয়ার রাস্তায়।

ইতিমধ্যে উমিচাঁদ পালিয়েছেন কলকাতায়। না, তিনি পালাননি। কাউন্সিল অথবা ক্লাইভের নির্দেশ এসে পৌঁছল স্ক্রাফটনের কাছে। উমিচাঁদ লোকটা মতলববাজ, ধূর্ত, বলতে গেলে শয়তানের প্রতীক। ওকে যেমন ভাবে পার, মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে চলে এসো। স্ক্রাফটন উমিচাঁদকে বোঝালে, সন্ধিপত্রের ব্যাপার তো মিটে গেছে। আর এখানে থেকে কি করবেন? ক'দিন বাদেই তো বেধে যাবে ঘোরতর যুদ্ধ। আমরা ঘোড়ায় চেপে দৌড় মারতে পারবো বিপদের মুহূর্তে। কিন্তু আপনি? আপনার তো একে মোটাসোটা থপথপে শরীর, তার উপর বুড়ো মানুষ। পালাবেন কি করে?

উমিচাঁদ নাকি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন এসব শুনে। তাঁর নাকি বাকী ছিল আরো অনেক পরিকল্পনা। কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে প্রাণ হারানোর ভয়ে শেষ পর্যন্ত স্ক্রাফটন-এর হাতে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি। পাল্কী চেপে রওনা দিলেন কলকাতার দিকে।

কলকাতা থেকে ওয়াটস-এর কাছে এবার নির্দেশ এল, মীরজাফর যখন সন্ধিপত্রে সই করবে, তখন তোমাকে উপস্থিত থাকতে হবে।

"যাহারা পাপ-সঙ্কল্পে লিপ্ত হয়, তাহারা কাহাকেও প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে না। ইংরাজেরা স্থির করিলেন – মীরজাফর যখন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, সে সময়ে ইংরাজ প্রতিনিধি ওয়াটস সাহেবের উপস্থিত থাকা চাই। কিন্তু সিরাজের সন্দেহে পড়িয়া মীরজাফর পদচ্যুত হইয়াছিলেন, গুপ্তচরগণ সতর্ক দৃষ্টিতে তাঁহার গতিবিধির পর্যবেক্ষণ করিতেছিল, এইরূপ অবস্থায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল।

"অবশেষে ওয়াটস সাহেব একদিন অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া আস্তরণাবৃত শিবিকারোহণে অবগুণ্ঠনবতী রমণীর ন্যায় সভয়ে সসঙ্কোচে মীরজাফরের অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত হইলেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমান-গৃহের রীত্যানুসারে শিবিকা একেবারে অন্তঃপুরে নীত হইল। ওয়াটস তাঁহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া, বেগম মহলে আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সম্মুখে মীরজাফর মুসলমানের পরম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ মাথায় লইয়া, এক হাত প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণের মাথায় রাখিয়া, আর এক হাতে কলম ধরিয়া স্বাক্ষর করিলেন। "ঈশ্বর এবং পয়গম্বরের দোহাই দিয়া শাসন করিতেছি, যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ এই সন্ধিপত্রের অঙ্গীকার পালন করিতে বাধ্য থাকিলাম।

"এই গুপ্ত সন্ধিপত্র লইয়া মীরজাফরের বিশ্বাসী অনুচর উমরবেগ জমাদার ১০ই জুন কলিকাতায় উপনীত হইলেন। গুপ্ত মন্ত্রণার কথা তখন একরূপ ঢাকে-ঢোলে বাজিয়া উঠিয়াছে। আর কালবিলম্ব করিবার অবসর রহিল না, ক্লাইব যুদ্ধযাত্রার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সগর্বে সিরাজদ্দৌলাকে পত্র লিখিতে বসিলেন।"

সিরাজদ্দৌলা।

ক্লাইভের যুদ্ধযাত্রায় যোগ দেবার আগে আমরা একবার নজর দেবো সন্ধিপত্রের দিকে। দেখা যাক, মীরজাফর ইংরেজদের সাহায্য কিনলো কী কী অঙ্গীকারে।

১। নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে যে সন্ধিপত্র স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহার সমস্ত সর্ত পালন করিতে বাধ্য থাকিব।

২। দেশীয় বা ইউরোপীয় যে কেহ ইংরাজের শত্রু, সে আমারও শত্রু।

৩। স্বর্গের তুল্য এই বাঙ্গলা এবং বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে ফরাসীদিগের যে সমস্ত কুঠি ধন-সম্পত্তি আছে, সবই ইংরাজদের অধিকারে আসিবে। ফরাসীদিগকে এদেশে বাস করিতে দিব না।

৪। সিরাজদ্দৌলার কলিকাতা অধিকার ও লুণ্ঠনের সময় কোম্পানীর যে ক্ষতি হইয়াছে এবং সৈন্যদের নিমিত্ত যে ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবার জন্য ইংরাজদিগকে এক কোটি টাকা দিব।

৫। কলিকাতায় ইংরেজ অধিবাসীদের যে সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তার ক্ষতিপূরণের জন্যে ৫০ লক্ষ টাকা দিব।

৬। দেশীয়গণের ক্ষতিপূরণের জন্যে ২০ লক্ষ টাকা দিব।

৭। আরমেনিয়ানদের ক্ষতিপূরণের জন্য ৭ লক্ষ টাকা দিব। ইংরেজ এবং দেশীয়দের মধ্যে কাহাকে কত টাকা দিতে হইবে, ক্লাইভ, ওয়াটসন, ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং বিচার সাহেবগণ স্থির করিবেন।

৮। কলিকাতা যে-খাত দ্বারা বেষ্টিত, তাহার মধ্যে অনেক জমিদারের জমি রহিয়াছে। এই জমি এবং খাতের বাহিরে ৬ শত গজ জমি ইংরেজদের দান করিব।

৯। কলিকাতার দক্ষিণে কুলপী পর্য্যন্ত স্থান ইংরেজ কোম্পানীর জমিদারী হইবে। সেখানকার সমস্ত কর্মচারী কোম্পানীর অধীন হইবে। এবং কোম্পানী অন্যান্য জমিদারের মত রাজকর দিবেন।

১০। আমি যখন ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য চাহিব, তাহার ব্যয়ভার আমার।

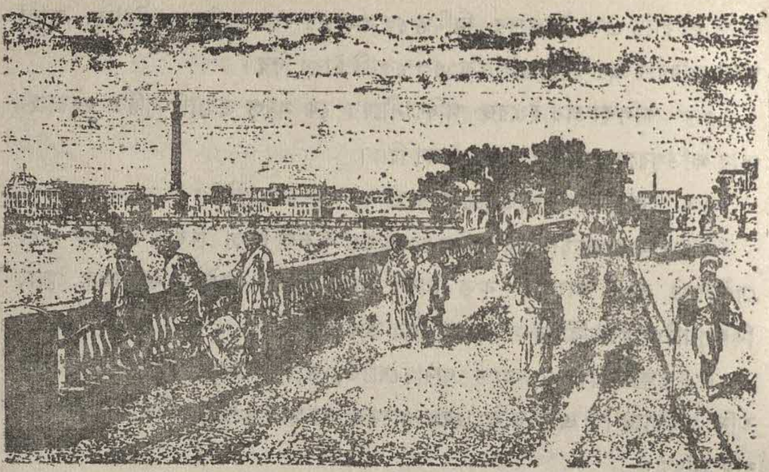
১১। হুগলীর দক্ষিণে কোন দুর্গ প্রস্তুত করিব না।

১২। আমি এই তিন প্রদেশের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেই, উল্লিখিত সমস্ত টাকা দিব।

মীরজাফরের সন্ধিপত্র এইখানেই শেষ। ইংরেজদের পক্ষ থেকেও ঐ রকম আরেক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন ক্লাইভ, ওয়াটসন, ড্রেক, ওয়াটস, কিলপ্যাট্রিক আর বিচার। সেখানে যোগ হল অতিরিক্ত একটা সর্ত। তার বয়ান—

"মীরজাফর খাঁ বাহাদুর উল্লিখিত সর্তসকল শপথপূর্বক স্বীকার করিলে নিম্নস্বাক্ষরকারী আমরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ঈশ্বর ধর্মপুস্তক শপথ করিয়া স্বীকার করিতেছি যে, আমরা আমাদের সমগ্র সৈন্যসহ তাহার বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদারী পাইবার যথাসাধ্য সাহায্য করিব। তিনি নবাব হইয়া উল্লিখিত সর্ত পালন করিলে, তাঁহার যে-কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যে-কোন সময়ে তাঁহার প্রয়োজন হইবে, প্রাণপণে সহায়তা করিব।"

এর পরেই বাংলাদেশের ভাগ্যের চাকা গড়িয়ে চলল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে, যে যুদ্ধক্ষেত্র, বলতে গেলে প্রায় বিনা রক্তপাতেই ইংরেজদের হাতে তুলে দেবে সাম্রাজ্যের সোনার মুকুট।



॥ ষড়যন্ত্রের দুই নায়ক ॥

সিরাজের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণাগৃহ ছিল জগৎশেঠের বাড়ি। তিনিই অন্যতম প্রধান নেতা, সিরাজ বিরোধী চক্রান্তের।

"The rupees of the Hindu Banker, equally with the sword of the Englise colonel contributed to the overthrow of the Mohamedan Power of Bengal."

এই উক্তি ইংরেজদের মুখের। বাঙালীর ইতিহাসেও ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি।

"অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় ধনকুবের শেঠ বংশীয়গণ প্রথমে দারিদ্রের কঠোর চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া আপনাদের নিবাসস্থান পরিত্যাগ পূর্বক বাঙ্গলারাজ্যে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের উপর সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর করুণা-দৃষ্টি নিপাতিত হয়। সেই অনুগ্রহবলে তাঁহারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র ভারতবর্ষে এক অভাবনীয় কাণ্ডের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। বাদশাহ নবাব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা জমিদার পর্যন্ত তাঁহাদের অজস্র অর্থবৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইয়া উঠিতেন। বৈদেশিক ইংরাজ-ফরাসীগণ তাঁহাদের বিনা অনুগ্রহে বাণিজ্য-কার্য পরিচালনে সক্ষম হইতেন না। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ সর্বদাই তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিতেন এবং তাঁহাদের বলে বলী হইয়াই সমস্ত জগতে মুর্শিদাবাদের গৌরব ঘোষণা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। কি বাণিজ্য, কি রাজস্ব সমস্ত বিষয়ই সেই

ধনকুবেরগণের সাহায্য ব্যতীত কদাচ সম্পন্ন হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর যাবতীয় রাজনৈতিক কার্য তাঁহাদের পরামর্শের উপর নির্ভর করিত। তাঁহাদের কথায় নবাবের নবাবী রহিয়াছে, আবার তাঁহাদের ইঙ্গিতে নবাবের নবাবী গিয়াছে। তাঁহাদের কটাক্ষ মাত্রেই বাঙ্গলার তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লব সমূহ সংঘটিত হইয়াছে। যে ভয়াবহ বিপ্লবে মুসলমান রাজত্বের অবসানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, যাহার দিগ্‌দাহকারী অগ্নিকুণ্ডে হতভাগ্য সিরাজ পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়, এবং মীরজাফর ও মীরকাশেম বিশেষরূপে দগ্ধ হইয়া, কেহ অনন্তধাম, কেহ বা ফকিরীপথ আশ্রয় করিয়া শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হন, তাহারই মূলে জগৎশেঠদিগের অমোঘ শক্তি নিহিত ছিল।" মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

ভারতের সিংহাসনে তখন সাজাহান। সেই সময়ে যোধপুরের নাগর প্রদেশ থেকে হীরানন্দ সাহু চলে আসেন পাটনায়। পাটনায় তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার বেশ জমজমাট। হীরানন্দ সেইখানেই ফেঁদে বসলেন নিজেদের জাত-ব্যবসা অর্থাৎ মহাজনগিরি।

অল্পদিনেই শহরে নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ল। প্রচুর ধনসম্পত্তি রেখে ১৭১১-য় তিনি মারা গেলেন, ৭ ছেলে আর ১ মেয়ে রেখে। বড় ছেলে মাণিকচাঁদ। ছয় ছেলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে ছড়িয়ে পড়লেন ভারতের নানা জায়গায়। সেই সময় মাণিকচাঁদ চলে এলেন ঢাকায়। মুর্শিদকুলী খাঁ তখন বাংলার দেওয়ান। মুর্শিদকুলী কেন ঢাকা থেকে চলে এলেন মুখসুদাবাদে, মুখসুদাবাদ কিভাবে রূপান্তরিত হল মুর্শিদাবাদে, পাঠক সে সব আগেই জেনেছেন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। জেনেছেন মুর্শিদকুলীর সঙ্গে মাণিকচাঁদের সঙ্গী হওয়ার সংবাদ। মাণিকচাঁদের ছেলে-পুলে ছিল না। তাই পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন নিজের ভাগনে ফতেচাঁদকে। মাণিকচাঁদের একমাত্র বোন ধনবাই। বারাণসীর বিখ্যাত শেঠ উদয়চাঁদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ধনবতীর। ফতেচাঁদ তারই ছেলে। মাণিকচাঁদ উপাধি পেয়েছিলেন শেঠ। ফতেচাঁদ পেয়েছিলেন সম্রাট ফারুকসিয়রের কাছ থেকে শেঠ, মহম্মদ শাহ-র কাছ থেকে জগৎশেঠ।

"....it the forth year of the reign of Mahammad Shah, that is, some time between the begining of November 1722 and the end of Octobcr 1723, Seth Fatch Chand received from the Emperor the title of Jagat Seth and his son Anand Chand the title of Seth....". The House of Jagatseth.

দিল্লীতে সে বছর দারুণ দুর্ভিক্ষ। ফতেচাঁদ তখন দিল্লীতে। একদিন বিনা আমন্ত্রণেই দরবারে হাজির। সম্রাট সাদরে সম্বর্ধনা জানালেন। ফতেচাঁদ

জানালেন, তিনি দিল্লীবাসীদের রক্ষা করতে চান অবর্ণনীয় দুর্দশার হাত থেকে। আপনি আদেশ জারি করে দিন, যে কেউ আসবে আমি হুণ্ডি-তে টাকা ধার দেবো। তার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই নাকি দিল্লী থেকে উবে গেল দুর্ভিক্ষ। আর তার ফলেই ফতেচাঁদের প্রতি সম্রাটের এই সম্মান জ্ঞাপন, মাথায় জগৎশেঠ উপাধির মুকুট পরিয়ে।

ইতিহাসে আমরা জগৎশেঠ পড়ে আমরা অনেক সময় ভেবে থাকি, এ বুঝি কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম। তা নয়। জগৎশেঠ হল উপাধি। এবং খুবই সম্মানের। একজন দেশীয় জমিদারের চেয়ে মুর্শিদাবাদের দরবারে জগৎ শেঠদের সম্মান অনেক বেশী। দরবারে তাঁদের স্থান নবাবের বাঁদিকে। এমন কি মহারাজা উপাধির চেয়ে জগৎশেঠ উপাধির গুরুত্ব এবং সম্মান অনেক বেশী।

"শেঠদিগের বংশ বিবরণী হইতে এরূপ জানা যায় যে, সম্রাট মহম্মদ শাহ ফতেচাঁদের প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন যে, এক সময়ে কোনো কারণে তিনি মুর্শিদকুলী খাঁ-র উপর বিরক্ত হওয়ায়, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ফতেচাঁদকে বাঙ্গলার নবাবী প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। ফতেচাঁদ নবাবী গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া বাদশাহকে অবগত করান যে, নবাব মুর্শিদকুলীর অনুগ্রহেই তাঁহারা দেশমধ্যে ধনী ও সম্মানী হইয়া উঠিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের এইরূপ উপকারী বন্ধুর পদ গ্রহণ করতে তিনি কদাচ ইচ্ছুক নহেন।...বাদশা ইহাতে ফতেচাঁদের উপর অত্যন্ত প্রীত হইয়া নবাবকে এইরূপ আজ্ঞাপত্র লিখিয়া পাঠান যে, এখন হইতে সমস্ত রাজকার্যে শেঠদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। বাদশাহ দরবার হইতে বাঙ্গলার নাজিমকে সময়ে সময়ে যে-সমস্ত খেলাত প্রদত্ত হইত, তত্তুল্য আর একটি শেঠদিগকে পাঠাইতে সম্রাট কখনও বিস্মৃত হইবেন না।" মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

সুজাউদ্দিন যখন বাংলার মসনদে, তখন ফতেচাঁদ ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা। সুজাউদ্দিনের পর সরফরাজ খাঁ। তিনি কিন্তু বাবার মত খাতির করতেন না ফতেচাঁদকে। আজ ফতেচাঁদই ছিলেন সরফরাজের বদলে কি করে আলিবর্দীকে সিংহাসনে বসানো যায়, সেই চক্রান্তরে প্রধান উৎসাহী নেতা।

বাংলার সিংহাসনে আলিবর্দী। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আটকে গেছেন কাটোয়ায়। সেই সময় সুজাউদ্দিনের জামাই, উড়িষ্যার ভূতপূর্ব শাসনকর্তা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খাঁর একজন কর্মচারী, মীর হাবিব, একদল মারাঠা সৈন্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছুটে এল মুর্শিদাবাদ লুঠ করতে।

মুর্শিদাবাদ তখন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল না। শহরের ভিতরে ঢুকে পড়া খুবই সহজ। মীর হাবিবের সৈন্যরা এক রকম বিনা বাধায় ঢুকে পড়ল শহরে। মুর্শিদাবাদের অন্যান্য বাড়ি-ঘরের সঙ্গে হানাদাররা ফতেচাঁদের বাড়িতেও লুঠ করতে ছাড়ল না। নিয়ে গেল দু কোটি আর্কট টাকা আর সেই সঙ্গে অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ পত্র। মুতাক্ষরীণে এই লুণ্ঠনের ইতিহাস রয়েছে। সেই সঙ্গে একটি বিস্ময়কর মন্তব্য—

"সেই দুই কোটী মুদ্র তাঁহাদের কাছে দুই গুচ্ছ তৃণের সমান।"

কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রিয় কবি রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী এই ইতিহাসকে গেঁথে দিয়েছেন ছন্দে।

কি নবাব কিবা রাজা, কিবা মহারাজ
কি আর্মানি, কি ফরাসী, অথবা ইংরাজ
যখন টাকার যার হয় প্রয়োজন
ঘুরিয়া উঠিত মাথা যাহারই যখন
জগৎশেঠের কাছে তিনিই যাইয়া
শ্রীমহামহিম পাঠ দিতেন লিখিয়া।
মীর হাবিবের সঙ্গে যবে বর্গীগণ
সোনার মুর্শিদাবাদ করে আক্রমণ
জগৎশেঠের গদি তখন লুটিল
চারি কোটী টাকা জোরে কাড়িয়া আনিল
হীরা মণি মুক্তা সোনা রূপা কত আর
কতই বন্ধকী মাল, কত অলঙ্কার
এসব লুটিয়ে যবে বর্গীগণ গেল
জগৎশেঠের মনে দুঃখ নাহি হল।
কহিলেন তেজস্বিনী শেঠ-রাণী বুড়ি
'চারি কোটী টাকা মোর চার-কড়া কড়ি।
এ রস সাগর তাই বলে—হায় হায়
জগৎশেঠের কাছে কুবের কোথায়।'

ফতেচাঁদ মারা গেলেন ১৭৭৪-এর ২৭ ডিসেম্বর। নিজের দুই ছেলে আনন্দচাঁদ এবং দয়াচাঁদ মারা গেছে আগেই। মৃত্যুকালে উত্তরাধিকারী রেখে গেলেন দুই নাতিকে, মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদ। মহাতাব রায়ের উপাধি জগৎশেঠ। স্বরূপচাঁদের মহারাজা।

ইংরেজদের চন্দননগর আক্রমণের অনেক আগে থেকেই, জগৎশেঠ মহাতাব-এর গদীতে শুরু হয়েছিল সিরাজের বিরুদ্ধে ফিসফাস।

১৭৫৭। ৯ এপ্রিল। ফরাসীদের সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদের মাথা-মাতব্বরদের মনোভাব জানতে ফরাসী ল সাহেব ছুটে গিয়েছিলেন জগৎশেঠের বাড়িতে।

উমিচাঁদ তখন সেখানে উপস্থিত। পাঁচ কথার মাঝখানে ল তখনই টের পেয়ে গেলেন, এঁরা সিরাজকে সরিয়ে অন্য কাউকে নবাব সাজাতে উৎসাহী। ল মহাতাব রায়কে প্রশ্ন করেছিলেন, সত্যি কিনা ব্যাপারটা। জগৎশেঠ জবাব দিয়েছিলেন, আস্তে। এসব কথা বাইরে কোথাও বলাবলি করবেন না।

ইংরেজদের চন্দননগর দখলের পর নবাব-বদলের ষড়যন্ত্রটাও দানা বেঁধে উঠতে লাগল দ্রুত।

"যাঁহারা গুপ্ত মন্ত্রণায় মিলিত হইতে লাগিলেন, তাঁহারা কেহই দেশের জন্য বা বা দশের জন্য চিন্তা করিতেন না। জৈন জগৎশেঠ, মুসলমান মীরজাফর, বৈদ্য রাজবল্লভ, কায়স্থ দুর্লভ রায়, সুদখোর উমিচাঁদ, প্রতিহিংসা তাড়িত মানিকচাঁদ, ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও শোনিত সংস্রব বা স্নেহবন্ধন ছিল না। কেবল স্বার্থরক্ষার জন্যই একে অপরের পৃষ্ঠরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। যাঁহাদের সহিত অগণিত প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ-দুখের চিরসংস্রব, তাঁহাদের মধ্যে কেবল কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজের কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ বাহাদুরের এই গুপ্ত মন্ত্রণায় যোগদান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, অর্দ্ধ-রঙ্গাধিকারিণী প্রতিভা-শালিনী রাণী ভবানী কৃষ্ণনগরাধিপতির কাপুরুষত্বের পরিচয় পাইয়া সঙ্কেতে সদুপদেশ দিবার জন্য 'শাঁখা-সিঁদুর' উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।" সিরাজদ্দৌলা।

"চক্রান্তকারী পাত্রবর্গ পূর্ব্বেই ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনার মন্ত্রণা আঁটিতে-ছিলেন। ইংরাজ পক্ষের মনোভাব অবগত হওয়ায়, কার্য শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে লাগিল। জগৎশেঠের গৃহে মন্ত্রভবনের স্থান নির্দিষ্ট হইল। গোপনে পরামর্শ চলিতে লাগিল। রাজ্যের মুখপাত্রগণের অনেকেই এক্ষণে গুপ্তমন্ত্রণায় যোগ দিয়াছিলেন। জমিদারগণের মধ্যে বাকী কর আদায়েয় জন্য উৎপীড়িত কৃষ্ণচন্দ্রের এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়ার প্রবাদ রহিয়াছে। সময় পাইয়া মাতৃস্বসা ঘেসেটী বেগমও ইহাতে উত্তেজনা আরম্ভ করিলেন। মতিঝিল লুণ্ঠনের সময়ে বেগম তাঁহার বিপুল অর্থের কিয়দংশ বিশ্বস্ত বাঁদীগণের সাহায্যে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এই অর্থবলে এক্ষণে কয়েকজন সৈনিককে মীরজাফরের সাহায্যের জন্য ক্রয়

করিলেন। এমন কি স্বয়ং মীরজাফরের নিকটেও অর্থ সাহায্য প্রেরিত হইল।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

"প্রবাদানুসারে জগৎশেঠের বাটীতে এই মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় রাজা মহেন্দ্র (দুর্লভ রায়), রাজা রাজনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস, মীরজাফর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভাতে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত না হওয়ায়, নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অপেক্ষায় সে দিবস সভাভঙ্গ হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সংবাদ পাঠাইলে তিনি স্বীয় দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহকে প্রথমে প্রেরণ করেন। কালীপ্রসাদ তাঁহারদিগের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া রাজাকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলে, রাজা তৎপরে নিজেই মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। পুনর্বার জগৎশেঠের বাটিতে মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হয়। সভাতে কেহ কেহ যবনাধিকারের পরিবর্তে হিন্দুশাসনের প্রস্তাব করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে এ বিষয়ে কোন উত্তর দেন নাই। পরে তিনি বলিলেন যে, মন্ত্রণাসভায় মীরজাফর একজন নেতা, সেখানে যবনাধিকার নিরাকৃত হওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমার মতে মীরজাফরকে সহায় করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যোগ দিয়া সিরাজকে পদচ্যুত করা যাইতে পারে। ইংরাজদিগের সহিত আমার বিশেষরূপ পরিচয় আছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারিব।...অতএব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাবই সঙ্গত। তৎপরে সকলেই একবাক্যে সেই প্রস্তাবে মত প্রদান করিলে, ক্লাইব সাহেবকে সমস্ত বিষয় অবগত করানো হয়। কিন্তু ইতিহাসে এই মন্ত্রণাসভার উল্লেখ দেখা যায় না। মন্ত্রণাসভা হউক বা না হউক, পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ সিরাজের পদচ্যুতির জন্য যে বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।" মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মুসলমান বিদ্বেষের কিছু কারণ আমরা খুঁজে পাই ইতিহাসে। তখন আলিবর্দীর আমল। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ রামজীবন। পিতামহের বড় ভাই রামচন্দ্র। পিতামহের বৈমাত্রেয় ভাই রামকৃষ্ণ। এঁরা যখন নবদ্বীপের রাজা, তখন বাকী পড়েছিল 'রাজস্বের টাকা। ২০ লক্ষ। এর মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা শোধ করেছিলেন পিতামহ রামজীবন আর পিতা রঘুরাম। কৃষ্ণচন্দ্র যখন উত্তরাধিকার পেলেন, তখন ঐ বাকী পড়ে থাকা ১০ লক্ষের দেনা চেপে বসল তাঁর ঘাড়ে। আর ঠিক ঐ সময়েই আলিবর্দী চেয়ে বসলেন আরো ১২ লক্ষ টাকা নজরানা হিসেবে। কৃষ্ণচন্দ্রের সামর্থে কুলোল না এত টাকা শোধ দেওয়া। ফলে তাঁকে বন্দী হতে হল কারাগারে। শেষ পর্যন্ত তাঁর একজন

কর্মচারী, নাম রঘুনন্দন, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে নজরানার ১২ লক্ষ টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে কারাগার থেকে ছাড়িয়ে আনলেন কৃষ্ণচন্দ্রকে। কিন্তু কিছু দিন পরে আবার তাঁকে মাথা গলাতে হল নিভৃত কারাবাসের নির্জন অন্ধকারে। কারণ রাজস্বের বাবদে ১০ লক্ষ টাকা তখনো বাকি।

সম্ভবত আলিবর্দীর প্রাসাদেই বন্দী ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। বন্দী হলেও নবাবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ভিন্ন প্রকারের। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যের সময় পুরাণের কাহিনী উর্দুতে অনুবাদ করে শোনাতেন নবাবকে। ধর্মলোচনাও হতো ফাঁকে ফাঁকে। হঠাৎ একদিন নবাব আলিবর্দীর ইচ্ছে হল, বেড়াতে যাবেন কলকাতার দিকে। কৃষ্ণচন্দ্র আবেদন জানালেন, নবাবের সঙ্গী হওয়ার। মঞ্জুর হল সে আবেদন। সৈন্য-সামন্ত, পাত্রমিত্র নিয়ে নবাব চেপে বসলেন সুসজ্জিত বজরায়। সার সার বজরা চলেছে ভাগিরথীর উপর দিয়ে পাল ভরা হাওয়ায়। পথে প্রথমেই পড়ল পলাশী। কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর এলাকায় পড়ে পলাশী। নবাবের পাশে বসে কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, ধর্মাবতার! একবার দয়া করে আমার পলাশী পরগণার দিকে তাকিয়ে দেখুন। কোথাও শুধু গভীর বন। কোথাও জল নেই। কোথাও শুধু পোড়ো জমি, অনুর্বরা। এখান থেকে রাজস্ব আদায় করা খুবই দুঃসাধ্য।

পার হয়ে গেল পলাশী। তারপর এল নবদ্বীপ। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবকে বললেন, ধর্মাবতার! আমার জমিদারীর মধ্যে নবদ্বীপই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এর ভিতরে একটাও পাকা বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন কি? সবই মেটে বাড়ি, আর চালাঘর। আমার ভাগ্য কি রকম এ থেকেই অনুমান করতে পারবেন নিশ্চয়ই।

নবদ্বীপ পেরিয়ে গেল। তারপর এল কলকাতা।

"তৎকালে কলিকাতা একখানি সামান্য গ্রাম মাত্র ছিল। ইহার উত্তর দিকে গঙ্গার ধারে কয়েকটি লোকের বসতি এবং পূর্ব ও দক্ষিণ দিক সম্পূর্ণরূপে বাদাবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। স্বীয় জমিদারীর কলিকাতার পূর্বভাগের অবস্থা কিরূপ, তাহা নবাবকে একবার দেখাইবার জন্য মহারাজ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। নবাব তাঁহার প্রার্থনা উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া কিয়দ্দূর গিয়াই দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে অরণ্য। এই সময়ে মহারাজের শিক্ষানুসারে নবাবের সঙ্গীগণ কহিতে লাগিলেন, এ স্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বিষম ভয় আছে। ইহা শুনিয়া নবাব ফিরিয়া আসিবার আদেশ দিলেন। এমন সময় মহারাজ পুনর্বার কহিলেন, ধর্মাবতার! যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূর আসিলেন, তবে কৃপা করিয়া আরও একটু চলুন। তখন সহৃদয় আলিবর্দ্দী কহিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র! আর অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। অদ্য তোমাকে পৈতৃক দায় হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম।

মহারাজও নবাবকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।"
-রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী।

কৃষ্ণকান্ত এই বিষয় নিয়ে কবিতাও লিখেছিলেন একটা।

"বিশলাখি দায় বড় সুবিষম দায়।
তার চেয়ে দায় নাহি ছিল বাঙ্গলায়।
কৃষ্ণচন্দ্র রঘুরাম ও রামজীবন
বিশলাখি দায়ে পড়ি হ'ল জ্বালাতন।
আলিবর্দ্দী কৃষ্ণচন্দ্রে দিলা পরোয়ানা
'আরো দিবে বারো লক্ষ টাকা নজরানা।'
একে একে তিনজনে নবাব সংসারে
রাখিলেন আলিবর্দ্দী বন্দী করি ঘরে।
ক্রমে নিজগুণে কৃষ্ণচন্দ্র মহাশয়
হইলেন নবাবের প্রিয় অতিশয়।
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নবাবের কাছে
বিদ্যাবুদ্ধি দেখাতেন যাহা কিছু আছে।
উর্দ্দুতে তর্জমা করি ভারত পুরানে
শাস্ত্রালাপ করিতেন নবাবের সনে।
আলিবর্দ্দী খাঁ নবাব বাঙ্গলার পতি
কলিকাতা যাইবার করিলেন মতি।
ডঙ্কা মারি বজরা করি লয়ে আসবাব
সঙ্গী গণে সঙ্গে করি চলেন নবাব।
কৃষ্ণচন্দ্রে লইলেন আপনার সনে
আপ্যায়িত হইলেন রাজা মনে মনে।
রাজা দেখালেন আসি পলাশীর কাছে
জল নাই, প্রজা নাই, বন হয়ে আছে।
দেখালেন নবদ্বীপ ভরা বাঁশ বনে
কুটির কয়েকখানি মাত্র সেইখানে।
ক্রমে হইলেন কলিকাতা উপস্থিত
ইহার দুর্দশা দেখি নবাব স্তম্ভিত।
উত্তরে গঙ্গার ধারে মাত্র কয়জন
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে শুধু বাদা বন।

নবাবের সঙ্গীগণ কন পরস্পর
ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তু এখানে বিস্তর।
আলিবর্দ্দী কৃষ্ণচন্দ্রে কহেন তখন
রাজ্যের অবস্থা তব করিনু দর্শন।
কারাগারে বন্দী আছ, দুঃখ কিবা তায়
মাফ করিলাম তব, বিশলাখি দায়।"

নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে মুক্তি দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু দু-দুবারে বন্দী জীবনের জ্বালা থেকে কৃষ্ণচন্দ্র সম্ভবত নিজের মনের কাছে মুক্তি পাননি। সে জ্বালা ছাই চাপা আগুনের মতই ধিকধিকিয়ে জ্বলছিল বুকের ভিতরে। তাই যেদিন ডাক এল মুর্শিদাবাদ থেকে, ছুটে যেতে একবিন্দু দ্বিধা করলেন না, বাংলাদেশ থেকে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটানোর ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' থেকে আমরা সেই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণের দিকে চোখ ফেরাব এবার।

"মহারাজ মহেন্দ্র এবং রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস ও মীরজাফরালি খাঁ এই সকল লোক একত্র হইয়া এক দিবস জগৎশেঠ মহাশয়ের বাটিতে গমন করিয়া জগৎশেঠের সহিত বিরলে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন মহারাজা মহেন্দ্র অগ্রে কহিলেন আমি যাহা কহি তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। আমরা এদেশে অনেক কালাবধি আছি এবং নবাব সাহেবদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া প্রাধান্যরূপে পুরুষানুক্রমে কালক্ষেপ করিতেছি এখন যিনি নবাব হইলেন ইহার নিকট মাপের লঘুতা দিন ২ হইতে লাগিল আর সকল লোকের উপর অতিশয় দৌরাত্ম্য কতরূপে নিষেধ করিলাম এবং বুঝাইলাম তাহা কদাচ শুনে না আর দৌরাত্ম্য করে অতএব ইহার উপায় কি সকলে বিবেচনা করুন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন ইহার উপায় হস্তিনাপুরে জনেক গমন করিয়া এ নবাবকে তগির করাইয়া অন্য এক নবাব না আনিলে এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন এ পরামর্শ কিছু নয় হস্তিনাপুরের বাদশাহ জবন তিনি আর একজন নবাব দিবেন সেও জবন অতএব জবন অধিকারী থাকিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না এইরূপ কথোপকথন স্থির কিছুই হয় না শেষে এই পরামর্শ হইল যাহাতে জবন দূর হয় তাহার চেষ্টা করহ ইহাতে জগৎশেঠ কহিলেন এক কার্য্য কর নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতি বড় বুদ্ধিমান তাঁহাকে আনিতে দূত পাঠাও তিনি আসিলেই যে পরামর্শ হয় তাহাই করিব। সকলে সত্য কহিয়া দূত প্রেরণ করিয়া নিজ ২ স্থানে প্রস্থান করিলেন।"

কৃষ্ণচন্দ্র তখুনি আসতেন। দিনক্ষণও স্থির হয়ে গিয়েছিল কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়লেন হঠাৎ। তখন পাঠিয়ে দিলেন দূত হিসেবে কালীপ্রসাদ সিংহকে। কালীপ্রসাদ মুর্শিদাবাদে এসে সব শুনলেন! ফিরে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রকে সবিস্তারে জানালেন।

"কিঞ্চিৎ গৌণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় উত্তম ২ মন্ত্রী লইয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে নবাবের যাবতীয় প্রধান ২ পাত্র মিত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই নবাবের দ্বারে উপনীত হইয়া সম্বাদ দিলেন। নবাব সাহেব শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন আসিতে কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নানাবিধ ভেটের দ্রব্য দিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ভেটের সামগ্রী নবাব দৃষ্টি করিয়া তুষ্ট হইয়া বসিতে আজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শারীরিক সব ভাল আছ রাজা করপুটে নিবেদন করিলেন সাহেবের প্রসাদৎ সকল মঙ্গল এবং শারীরিকও মঙ্গল এইরূপ অনেক শিষ্টাচার গেল ক্ষণেক বসিয়া রাজা নিবেদন করিলেন যদি আজ্ঞা হয় তবে বাসায় যাই অনেক ২ নিবেদন আছে পশ্চাৎ গোচর করিব নবাব অনুমতি দিলেন।

"পরে একদিবস জগৎশেঠের বাটিতে রাজা মহেন্দ্র প্রভৃতি সকলে বসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন দূত আসিয়া রাজাকে লইয়া গেলে যথাযোগ্য স্থানে সকলে বসিলেন। ক্ষণেক পরে রামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন আপনারা সকলেই বিবেচনা করুন দেশধিকারী অতিশয় দুর্বৃত্ত উত্তর ২ দৌরাত্ম্যের বৃদ্ধি হইতেছে অতএব কি করা যায় এই কথার পর মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন আমরা পুরুষানুক্রমে নবাবের চাকর যদি আমার দিকের হইতে কোন ক্ষতি নবাব সাহেবের হয় তবে অধর্ম্ম এবং অখ্যাতি অতএব আমি কোন মন্দ কর্মের মধ্যে থাকিব না তবে যে পূর্ব্বে এক আধ বাক্য কহিয়াছিলাম সে বড় উষ্মাপ্রযুক্ত এইক্ষণে বিবেচনা করিলাম এ সকল কার্য ভাল নয় এই কথার পর রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎশেঠ ও মীরজাফরালি খাঁ কহিলেন ও রাজা রামনারায়ণ কহিলেন যত্তপি আপনি এ পরামর্শ হইতে ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু দেশ রক্ষা পায় না এবং ভদ্র লোকের জাতি ও প্রাণ থাকা ভার হইল অনেক ২ রূপ কহিতে মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন আপনারা কি প্রকার করিবেন।...পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি সকলই জ্ঞাত হইয়াছেন এইক্ষণে কি কর্ত্তব্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় হাস্য করিয়া নিবেদন করিলেন মহাশয়েরা সকলেই প্রধান আপনারা আমাকে পরামর্শ দিতে যে অনুমতি করিতেছেন বড় আশ্চর্য সে যে হউক। আমার নিবেদন এই যে আমারদিগের দেশাধিকারী জবন ইহার

দৌরাত্ম্যে আপনারা ব্যস্ত হইয়া প্রতিকারোপায় চিন্তা করিতেছেন। সমভিব্যাহারি মীরজাফরালি খাঁ সাহেবও জাতিতে জবন অতএব আমার আশ্চর্য বোধ হইতেছে। এই কথার পর সকলে হাস্য করিয়া কহিলেন হঁ্যা ইনি জবন বটে কিন্তু ইহার প্রকৃতি অতি উত্তম আপনি ইহার প্রতি সন্দেহ করিবেন না। পশ্চাৎ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিবেদন করিলেন এ দেশের উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এককালীন এত হয় না। প্রথম যিনি দেশাধিকারী ইহার পরানিষ্ট চিন্তা যৎপরো-নাস্তি যেখানে শুনেন সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহা বলক্রমে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে জাতি প্রাণ নষ্ট করেন। দ্বিতীয় বরগি আসিয়া লুট করে তাহাতে মনোযোগ নাই। তৃতীয় সন্নাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে তাহাই ভাঙ্গিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ করে তাহা কেন নিবারণ করে না অশেষ প্রকারে এদেশ উৎপাত হইতেছে অতএব দেশের কর্ত্তা জবন থাকিলে কাহারো ধর্ম্ম থাকিবে না এবং জাতিও থাকিবে না অতএব ঈশ্বরের বিড়ম্বনা না হইলে এত উৎপাত হয় না।... সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পরামর্শ কহুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

"দেশের অধিকারী সর্ব্বপ্রকারে উত্তম নন এবং অন্যজাতীয় ও এতদ্দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়। জগৎশেঠ প্রভৃতি কহিলেন এমন কে তাহা বিস্তার করিয়া কহ। রাজা কহিলেন বিলাতনিবাসী জাতিতে ইংরাজ কলিকাতায় কোঠী করিয়া আছেন যদি তাঁহারা এ দেশের রাজা হন তবেই সকল মঙ্গল হইবে। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন তাঁহারদিগের কি গুণ আছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন তাঁহারদিগের গুণ এই সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিংসা করেন না অতি বড় যোদ্ধা প্রজার প্রতি যথেষ্ট দয়া এবং অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন বুদ্ধি বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবেরের তুল্য পরম ধার্ম্মিক অর্জুনের ন্যায় পরাক্রম প্রজাপালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলেই একবাক্য দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণই তাঁহারদিগের আছে অতএব তাঁহারা দেশাধিকারী হইলে সকলের নিস্তার নতুবা জবনে সকল নষ্ট করিবে।..."

'ক্ষিতীশ বংশাবলী'তে এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বিবরণ ভিন্ন রঙের।

"সভ্যগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি 'বর্তমান নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিবার প্রার্থনায় সম্রাটের সমীপে আবেদন করা যাউক' এই কথা উত্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে অন্য একজন বলিলেন, 'সরফরাজ খাঁ সাহেবের সময়াবধি যেরূপ দেখিয়া আসা যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যবন কর্তৃত্বাধীন হিন্দুজাতির নিরাপদে

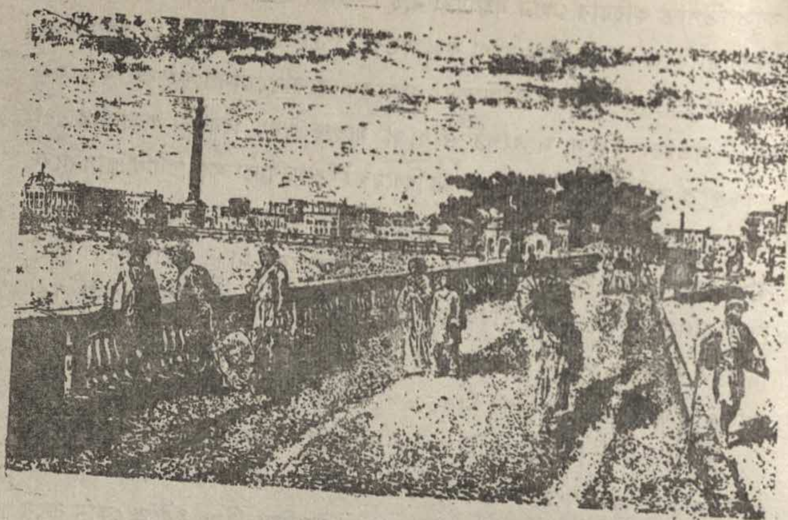
কালাতিপাত করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অথচ, যাহাতে আর যবনের অধীন হইয়া থাকিতে না হয়, ইহা মন্ত্রণা করা কর্তব্য। এই প্রস্তাবে কেহ বা অনুমোদন, কেহ বা প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কোনপক্ষেই কথা কহিলেন না। সভাভঙ্গ হইলে, জগৎশেঠ ও রাজা মহেন্দ্র ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে কহিলেন, উপস্থিত গুরুতর বিষয়ের ইতিকর্তব্যতা অবধারনার্থ আপনাকে এত আগ্রহ সহকারে আনাইলাম, কিন্তু সভাতে আপনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। আপনার অভিপ্রায় কিছুমাত্র ব্যক্ত করিলেন না। ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, 'যে সভায় মীরজাফর একজন প্রধান সভ্য, তাহাতে যবনাধিপত্য নিরাবৃত করিবার প্রস্তাব হইল দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলাম। আমার যে অভিপ্রায় তাহা আপনাদিগের নিকট এক্ষণে ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন।

"যবনাধিপত্যে হিন্দুদিগের নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিবার সম্ভাবনা নাই, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু হিন্দু জাতির রাজত্ব সংস্থাপনের কি কোন সম্ভাবনা আছে? মীরজাফরের সহায়তা ব্যতীত আমরা উপস্থিত বিপদ হইতে কোন ক্রমে মুক্ত হইতে পারি না, বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হইতেছে এবং তাঁহার নবাবী পদ প্রাপ্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা না থাকিলে তিনি যে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না ইহাও সম্পূর্ণরূপে জানা যাইতেছে। এরূপ স্থলে আমার অভিমত এই যে, যাহাতে জাফরের অভীষ্ট সিদ্ধ ও আমাদের বিপদ শান্তি হয়; এইরূপ কোন পথ অবলম্বন করাই বিধেয়।"

কৃষ্ণচন্দ্র মীরজাফর এবং ইংরেজদের পক্ষে এই সুপারিশ-এর পুরস্কারও পেয়েছিলেন পলাশীর পর। রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর কবিতায় গাঁথা আছে সেই পুরস্কারের উল্লেখ।

"তুমি পলাশীর পতি তুমি পলাশীর পতি
তাই কৃষ্ণচন্দ্র! এই তোমার সুখ্যাতি।
করি ক্লাইব সম্মান করি ক্লাইব সম্মান
পলাশীর যুদ্ধে দিলো পাঁচটি কামান।"

আসলে কিন্তু কামানের সংখ্যা ১২।



॥ পলাশী ॥

১১ জুন। কলকাতায়, মীরজাফরের সই-করা সন্ধিপত্র পৌঁছল ক্লাইভের হাতে। ১৩ জুন ক্লাইভ চিঠি লিখলেন সিরাজকে। সে চিঠিতে নবাবের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ। তিনি সন্ধির সর্ত মানেননি। ফরাসীদের সঙ্গে গোপনে টাকা-পয়সা দিয়ে যোগাযোগ করে চলেছেন। ইংরেজদের পাওনা টাকার মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ মিটিয়ে পুরো টাকার রসিদ চেয়েছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই তিনি সসৈন্যে রওনা হচ্ছেন কাশিমবাজারের দিকে। না যুদ্ধের জন্যে নয়। জগৎশেঠ, মোহনলাল, মীরজাফর ইত্যাদির উপস্থিতিতে এর একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে।

ঐ দিনই তিনি যুদ্ধযাত্রা করলেন। আর ঐ দিনই ওয়াটস পালালেন কাশিমবাজার ছেড়ে, হাওয়া-খাওয়ার ছল করে। সিরাজ তখনো ক্লাইভের চিঠি পাননি। কিন্তু তাঁর কানে খবর পৌঁছে গিয়েছিল মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধির। তিনি খবর পেয়েই বন্দী করতে চেয়েছিলেন মীরজাফরকে পারেননি। কারণ মীরজাফরের বাড়িতেও অভাব ছিল না গোলাবারুদের। বন্দী করার বদলে বরখাস্ত করলেন তাঁকে। তাঁর জায়গায় এল খাজা হাদী। মীরজাফরের উপরে সিরাজের রাগের খবরটা কানে পৌঁছতেই ওয়াটস বাতাসে টের পেলেন বিপদের গন্ধ। গভীর রাতে ঘোড়ায় চেপে অগ্রদীপ। সেখানে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে ছুটো দেশী নৌকো নিয়ে নিজে দাঁড় টেনে নবদ্বীপ। সেখানে

পৌঁছে দেখতে পেলেন তাঁর জন্যে নৌকো এবং আর কিছু সৈন্য মজুদ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তখন। পরের দিন বিকেল তিনটের সময় কালনা। সেখানে গিয়ে দেখা পেলেন ক্লাইভের।

ওয়াটস-এর পালানোর খবরটা কানে আসতেই সিরাজ বুঝলেন ষড়যন্ত্রটা পেকেছে বেশ বড় আকারেই। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য। নিজেকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করার আগে তিনি একটা চিঠি, ইংরেজদের কাছে তাঁর শেষ চিঠি, লিখলেন ওয়াটসনকে। তারিখ `৪ জুন।

সে চিঠিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সন্ধিভঙ্গের। ইংরেজরাই সন্ধির সর্ত ভেঙে চলেছে। ওয়াটস যে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়েছে, এটাও এক ধরনের প্রতারণা। ইংরেজরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, এই আশঙ্কা তাঁর ছিল বলেই এতদিন তিনি পলাশীতে মোতায়েন রেখেছিলেন সৈন্য-সামন্ত। তবে একটাই তাঁর শান্তি। পয়গম্বরকে সাক্ষী রেখে যে ধর্মপ্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা তিনি নিজে ভাঙেননি। যারা ভাঙছে, তাদের এই মহাপাপের শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

এই সঙ্গে আরও একটা চিঠি লিখলেন ভাগলপুরে ফরাসী ল সাহেবের নামে। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এগিয়ে আসুন পলাশীতে।

এর পর ঘুরে তাকালেন মীরজাফরের দিকে।

নিজের প্রিয় অনুচর মির্জা ওমর বেগকে লেখা মীরজাফরের একটা চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি ঐ সময়কার ঘটনাবলী। ওয়াটস-এর পালানোর খবর পেয়েই সিরাজের সৈন্য-সামন্তরা ছুটে গিয়েছিল তাঁকে আক্রমণ করতে। দিনরাত তাঁর বাড়ির সামনে সশস্ত্র পাহারা। জুনের ১৩ আর ১৪ এই দুদিন ধরে চলেছিল এই ধরনের হাঙ্গামা। ১৫ জুন নবাবের জ্ঞানোদয় হল। তিনি সেদিন নিজেই ছুটে এলেন মীরজাফরের কাছে।

"He came to me himself. On Thursday eve (evening of June 15) the Huglly letter arrived that they were marched. I was to be with him. On three conditions I consented to it. One that I would not enter inte his service ; 2ndly I would not visit him, lastly, I would not take Post in the army."

এর ঘটনারই আরও বিস্তৃত রূপ–

"অবশেষে আত্মাভিমান তুচ্ছ করিয়া, স্বয়ং সিরাজদ্দৌলা ২৫শে জুন শিবিকা-রোহণে মীরজাফরের বাটিতে উপনীত হইলেন। এবার মীরজাফরকে বাহির হইতে হইল। নবাব তাঁহাকে অধোবদনে সলজ্জ-নয়নে স্নেহভাজন কুটুম্বের মুখের

সকরুণ ভৎর্সনাবাক্য শ্রবণ করিতে হইল এবং সিরাজদ্দৌলা যখন ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া, ঈশ্বরের নামে, মহম্মদের নামে, মুসলমান গৌরবের নামে, আলিবর্দ্দীর বংশমর্যাদার দোহাই দিয়া, মীরজাফরকে ফিরিঙ্গীর স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, তখন সকল কথাই স্বীকার করিতে হইল। তখন আবার কোরাণ আসিল, আবার মুসলমানের পরম পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ মাথায় লইয়া অন্নদাতা মুসলমান নরপতির নিকট মুসলমান সেনাপতি জানু পাতিয়া শপথ করিলেন—'ঈশ্বরের নামে, পয়গম্বরের নামে, ধর্ম্মশপথ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি, যাবজ্জীবন মুসলমানের সিংহাসন রক্ষা করিব, প্রাণ থাকিতে বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গীর সহায়তা করিব না।' " সিরাজদ্দৌলা।

রিয়াজ-উস-সালাতীন-এর বিবরণে জানতে পারি, মীরমদন ইত্যাদি কয়েকজন নাকি পরামর্শ দিয়েছিল মীরজাফরকে হত্যা করার। সিরাজ সে কথায় কান দেননি। নিজের দিদিমার সাহায্য নিয়ে মীরজাফরের সঙ্গে পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করলেন তিনি।

১৩ জুন ইংরেজ সৈন্যরা পৌঁছেছিল চন্দননগরে। হুগলীর নতুন ফৌজদার এগিয়ে এসেছিলেন আক্রমণ করার ভয় দেখাতে। ক্লাইভের হুমকীতে সঙ্গে সঙ্গে চুপ।

১৬ জুন নবদ্বীপ থেকে ৬ ক্রোশ উত্তরে পাটুলী। সেখান থেকে ৬ ক্রোশ দূরে কাটোয়া। কাটোয়ার উত্তরে অজয়ের পাড়ে কাঁসাই-এ ছিল একটা দুর্গ। আগে থেকেই নাকি কথাবার্তা পাকা করা ছিল যে, ইংরেজরা আক্রমণ করতে একে দুর্গের অধিনায়ক আত্মসমর্পণ করবেন খানিকটা যুদ্ধের অভিনয় দেখিয়ে। তাই ঘটল। ক্লাইভের কল্যাণে মাত্র দুদিন আগে কর্নেল থেকে মেজর-হওয়া আয়ার কূট ২০০ গোরা আর ৫০০ সেপাই আর একটা কামান নিয়ে কাটোয়ায় হাজির। তখন রাত হয়ে গেছে। ইংরেজরা দেখলে শহর মরুভূমির মত ফাঁকা। সকাল হতেই যুদ্ধ। নদীর এপার থেকে নামমাত্র গোলা-গুলি ছোঁড়া হতে না হতেই যুদ্ধ শেষ। ইংরেজ সৈন্যরা ওপারে গিয়ে দখল করে নিলে দুর্গ।

কাটোয়া দখলের তারিখটা নিয়েও গণ্ডগোল। কোথাও ১৭ জুন। কোথাও ১৯। আয়ার কূট যাত্রা করেছিলেন ১৭ তারিখে। পরের দিনই দখল হয় দুর্গ। ১৯ জুন বৃষ্টি নেমেছিল প্রবল। ইংরেজ সৈন্যরা আশ্রয় নিয়েছিল শহরের কুঁড়ে ঘরগুলোয়। কাটোয়া থেকে প্রচুর খাদ্য শস্য হাতে এসে গেল ইংরেজদের। চালের পরিমাণ এত যে ১০ হাজার সেপাই এক বছর ধরে খেতে পারে।

ক্লাইভ কালনায়। মন উদ্বেগে অস্থির। বুক দুরু দুরু। চালে কোথ ভুল হচ্ছে না তো? মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো? ইংরেজ সমূলে ধ্বংস হবে না তো এইখানে? মীরজাফরের সঙ্গে কথা ছিল কালনায় এসে মিলবার। অথচ দেখা নেই তাঁর। শেষ চিঠি পেয়েছেন সেই ১৬ জুন। তাতে জানিয়েছেন, নবাবের সঙ্গে এই যে ভাব-সাব, এটা বাইরের মুখোশ। আসলে তিনি ইংরেজদের কাছে যেমনটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তেমনটিই করবেন। কিন্তু তারপর আর কোন খবর নেই। তাতেই ক্লাইভের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ।

ক্লাইভ সিক্রেট কমিটির কাছে চিঠি লিখেছিলেন ১৯ জুন। তার ছত্রে ছত্রে মনের ভিতরকার এই অস্থিরতা।

"কাটোয়াতে যে-বাহিনী পাঠিয়েছিলাম, তারা কাটোয়ার শহর আর দুর্গ দুই-ই দখল করে নিয়েছে। দুটোই বেশ শক্ত। সমস্যা দেখা দিয়েছে মীরজাফরকে নিয়ে। তাঁর কাছ থেকে কোন খবর পাচ্ছি না।

"মীরজাফর বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে ব্যর্থ হবে আমাদের এই অভিযান। একজন ব্রাহ্মণকে গোপনে দূত করে পাঠাচ্ছি তাঁর কাছে। যাতে তাঁকে টেনে আনা যায় আমাদের মধ্যে, তারই একটা শেষ চেষ্টা এটা। জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের মিলবার জায়গাটা হবে পলাশী। তিনি যদি ঠিক সময়ে সেইখানে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ না দেন, অথবা তাঁর সততা সম্বন্ধে অন্য কোন যথার্থ প্রমাণ না দেন, তাহলে আমি নদী পার হবো না। আমি এমন সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে চাইছি, যাতে আমাদের পক্ষে কোন রকম ক্ষতি না ঘটে। আর যতক্ষণ সৈন্যরা অক্ষত থাকবে, ততক্ষণ, আমরা বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত। এটা যদি সফল না হয়, পরেরটা হবে। তারা বলছে, ওখানে (কাটোয়ায়) প্রচুর পরিমাণে চাল রয়েছে। আমরা যদি তার থেকে ৮ কি ১০ হাজার মন চাল নিই, সামনের গোটা বর্ষাকালটা নিশ্চিন্তে চালিয়ে যেতে পারবো। তাতে বিপন্ন হবেন নবাব। তাঁর ফলে তাঁকে স্বীকার করতে আমাদের সর্ত। অন্যদিকে পেয়ে যাব প্রচুর সময়, বীরভূমের রাজা, মারাঠা অথবা দিল্লীর গাজিউদ্দীনের (প্রধানমন্ত্রী) কাছ থেকে সাহায্য জোগাড় করার। আমার অনুরোধ, মীরজাফরের কাছ থেকে সাহায্য না পেলে আমি কি করবো বা কি আমার করা উচিত সে সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানাবেন খোলাখুলি ভাবে, কোন দ্বিধা না রেখে।"

ক্লাইভ বিচলিত। তাঁর এই সময়কার অন্য এক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে একালের ঐতিহাসিক লিখছেন—

"The obscurity of this letters reflects not only Clive's defective grammer but his anxiety of mind."

২০ জুন। সোমবার। ক্লাইভের হাতে এসে পৌঁছল মীরজাফরের চিঠি। একটা নয়, দু-দুটো। একটা ক্লাইভকে লেখা। আরেকটা উমরবেগকে। উমরবেগ তখন থাকেন ক্লাইভের শিবিরেই। ক্লাইভের চিঠিতে ছিল, যুদ্ধের সময় তিনি কোন দিকে থাকবেন, তার নির্দেশ। উমরবেগের চিঠিতে ছিল নবাবের সৈন্য সংখ্যার হিসেব।

ক্লাইভের মন থেকে মীরজাফরের বিষয়ে সন্দেহটা ঘুচল বটে, কিন্তু অন্য একটা ভাবনা চেপে বসল মাথায়। আমাদের একেবারেই অশ্বারোহী সৈন্য নেই। উপায়? চিঠি লিখলেন বর্দ্ধমানের মহারাজাকে।

'আপনার অশ্বসেনা যদি এক সহস্রেরও অধিক না থাকে, তথাপি তাহা লইয়াই আপনি আমাদিগের সহিত মিলিত হউন।'

চিঠি লিখেও মনের আশঙ্কা দূর হল না। প্রতি মুহূর্তে কি হয় কি হয় ভাব।

যদি হারি, যদি না জিতি, এই চিন্তার আগুনে পুড়ছেন তিনি পলে পলে।

২১ জুন। মঙ্গলবার। হঠাৎ ডেকে বসলেন সামরিক সভার অধিবেশন। ইতিহাস বলে এটাই নাকি তাঁর জীবনে প্রথম ও শেষ সামরিক সভা। সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা নিয়ে নানা মত। ম্যালকমের হিসেবে ১৬। স্পিয়ারের লেখা পড়লে মনে হয়, সংখ্যা হল ৯। অক্ষয় মৈত্রের হিসেবে দাঁড়ায় ২০। বাঙ্গলার ইতিহাসেও ঐ এক সংখ্যা।

মন্ত্রণাসভার চিরাচরিত নিয়ম-কানুন না মেনে সভায় প্রথম বক্তা হিসেবে উঠে দাঁড়ালেন স্বয়ং ক্লাইভ। প্রশ্ন করলেন—

"Whether in our present situation, without assistance and on our own bottom, it would be prudent to attack the Nabob or whether we should wait till joined by some country power?"

ঐতিহাসিক অর্মে এখানে ক্লাইভের সমালোচক। সমর-সভার রীতি হল কনিষ্ঠদের মতামত নিতে হবে আগে। ক্লাইভ তা করেন নি। তিনি নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন অন্যদের উপর।

সভায় যখন মতামত চাওয়া হল, দেখা গেল গরিষ্ঠ সংখ্যকের মত যুদ্ধের বিরুদ্ধে। বিলম্বের পক্ষে। অন্যদিকে যুদ্ধের পক্ষে সর্ব কনিষ্ঠ মেজর আয়ার কূট। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে জানালেন—

"আপনারা বড়ই ভুল করিতেছেন। সেনাদলের এখনও বিশ্বাস আছে যে তাহারা জয়লাভ করিবে। শত্রুর সম্মুখে আসিয়া থতমত খাইয়া বসিয়া পড়িলে তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িবে। কিছুতেই আর উত্তেজিত করা যাইবে না। মসীয় ল অবসর পাইলেই নবাব শিবিরে মিলিত হইবেন। তখন নবাবের বাহুবল বাড়িবে। মন্ত্রণাও উৎসাহ লাভ করিবে। তাহারা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া কলিকাতা পলায়নের পথ অবরুদ্ধ করিবে। আপনারা এখন যাহা দেখিতে পাইতেছেন না, এমন কত নতুন বিপদে পড়িয়া, বিনাযুদ্ধেই হয় ত পরাজিত হইবেন। আসুন, এখনই অগ্রসর হই, নচেৎ এখনই পলায়ন করি। যেখানে আছি এখানে বসিয়া থাকা অসম্ভব।"

আয়ার কূটকে সমর্থন জানালেন ক্যাপ্তেন গ্রান্ট এবং আরও পাঁচজন সদস্য। মহাসভায় সাক্ষ্যদানের সময় ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছিলেন—

"কেবল মেজর কূট আর ক্যাপ্তেন গ্রান্ট ছাড়া আর সকলেই মত দিয়েছিলেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তাঁদের কথা শুনলে কোম্পানীর সর্বনাশ হতো। আমি সেই জন্যে তা মানি নি।"

মন্ত্রণাসভা শেষ হল যুদ্ধের বিরুদ্ধে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন নিয়ে। তারপরেই অকস্মাৎ বদলে গেল ক্লাইভের সিদ্ধান্ত। অর্মের বিবরণ থেকে জানা যায়, সমর-সভা থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি বনবিথীর ভিতরে ধ্যানের মত ভঙ্গীতে বসে রইলেন ক্লাইভ। এক ঘন্টা পরে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, যুদ্ধ না করাটাই মূর্খামি। তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন নিজের শিবিরে। এবং সৈন্যদের আদেশ দিলেন, রাত পোয়ালেই গঙ্গা পার হতে হবে।

ক্লাইভের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর স্ক্রাফটন লিখে গেছেন অন্য কথা। ২২ জুন বিকেল ৪টের সময় মীরজাফরের কাছ থেকে চিঠি এসে গেল। সেই চিঠি পড়েই মত বদলে ছিলেন ক্লাইভ। আর মীরজাফরকে উত্তরটাও পাঠিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

মীরজাফর লিখেছিলেন—

"নবাব পৌঁছে গেছেন কাশিমবাজার থেকে ৬ মাইল দক্ষিণে মনকরায়। ঐখানেই গড়খাত খুঁড়ে যুদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করবেন। ইংরেজরা যেন সেই সময়ে হঠাৎ আক্রমণ করেন নবাবকে।"

ক্লাইভের উত্তরে ছিল—

"আর দেরী না করে আমি পলাশীর দিকে এগোব। পরের দিন এগোব ছ মাইল দূরের দাউদপুরের দিকে। মীরজাফর যদি তখন তাঁদের সঙ্গে যোগ না দেন, তাহলে তিনি সন্ধি করবেন নবাবের সঙ্গে।"

ক্লাইভ যে ঠিক কোন সময়ে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন, তা নিয়ে নানা মত। কারো মতে ২২ জুন সকালে। কারো মতে ২২ জুন বিকেলে, মীরজাফরের চিঠি পাওয়ার দু ঘণ্টা পরে। স্পিয়ার লিখেছেন—

"Two hours after receiving the message he crossed the rivar and made his way in pouring rain to Plassy grove."

ম্যালকম লিখেছেন, পরের দিন সকালে সূর্যোদয়ের পর যুদ্ধযাত্রা শুরু। পলাশীতে পৌঁচেছিলেন ২৩ জুন সকালে।

অর্মের বিবরণে, ২২ জুন সকাল।

অথচ ক্লাইভ নিজে জানিয়েছেন, সময়টা ছিল ২২ জুন বিকেল ৫ টা।

"এদিকে মীরজাফরের সহিত পুনর্মিলনের উদ্যোগের পরেই সিরাজুদ্দৌলা সংবাদ পাইলেন, ইংরাজ-সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে। অবিলম্বে ক্লাইভের শেষ পত্রও আসিয়া পঁহুছিল। সৈন্য সমবেত করিবার জন্য দলপতিগণের উপর আদেশ হইল।

"কলিকাতা আক্রমণের মত এ যুদ্ধে লুণ্ঠনের কোনো আশা নাই, উপরন্তু গৃহবিবাদ বর্তমান। সৈন্যগণ এ অবস্থায় প্রাপ্য বেতন না পাইলে যুদ্ধযাত্রা করিতে অসম্মত হইল। তিনদিন ধরিয়া এই গোলযোগ চলিল। নবাবকে প্রচুর অর্থদান করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে বাধ্য হইতে হইল। অতঃপর প্রধান প্রধান সেনাপতিগণের অধীনে বিভক্ত হইয়া, নবাব-বাহিনী পলাশী-প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একবার মনকরায় যুদ্ধসজ্জা করা সিরাজের অভিপ্রায় হইয়াছিল, পরে পলাশী যাত্রাই স্থির হয়।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

২২ জুন। রাত্রি তখন ১ টা। প্রবল ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ক্লাইভের সৈন্যরা পৌঁছল পলাশীর আমবাগানে। ঐ আমবাগানের নাম তখন লক্ষবাগ।

মুর্শিদাবাদ থেকে ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে পলাশীর প্রান্তর। পশ্চিমে ভাগিরথী। প্রান্তরের গায়ে পলাশী নামের গ্রাম। তার থেকে প্রান্তরের নাম পলাশী। গ্রামের নামটা হয়েছে পলাশ গাছ থেকে। অসংখ্য পলাশ গাছ ছিল এক সময়ে।

প্রান্তর জুড়ে আমবাগান। দেড় হাজার বিঘে জায়গা বুক-সমান মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। আমবাগানটা তারই ভিতরে। এক লক্ষ হবে গাছের সংখ্যা। তার থেকেই বাগানের নাম লক্ষবাগ, লক্কাবাগ, লাখবাগ। বাগানের মাটির দেয়ালের পাশে খাল।

"আম্রকুঞ্জের পশ্চিমোত্তরে শতহস্ত দূরে নবাবের একটি ইষ্টকনির্মিত মৃগয়াগৃহ নির্মিত ছিল। সিরাজুদ্দৌলা মনকরা হইতে অগ্রসর হইয়া, দাদপুরের দক্ষিণে

রাজা দুর্লভরামের পূর্বনির্দিষ্ট প্রান্তরে সেনাসন্নিবেশ করিয়াছিলেন। নবাব শিবিরের দক্ষিণে একটি মৃৎপ্রাকার এবং আরও দক্ষিণে এক পরিখা নির্মিত ছিল। শিবিরের সম্মুখে আম্রকানন ও পরিখার মধ্যস্থলে মীরমদন ও মোহনলালের অধীনে সৈন্যদল স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে সন্নিহিত পুষ্করিণীর পাড়ে ফরাসী সিনফ্রের সামান্য গোলন্দাজদল ও ৪টি কামান। বামে পরিখার পরপার হইতে প্রায় পলাশী গ্রাম পর্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দুর্লভরাম, ইয়ারলুৎফ ও মীরজাফরের সৈন্যদল অবস্থিত ছিল।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

সিরাজের সৈন্য সংখ্যা নিয়েও ইতিহাসে ইতিহাসে মতভেদ। ক্লাইভের হিসেব – ৩৫ হাজার পদাতিক, ১৫ হাজার অশ্বারোহী, ৪০টি কামান। কারো কারো হিসেবে সৈন্য সংখ্যা আরো বেশী।

ক্লাইভ উঠেছিলেন পলাশীর ঐ মৃগয়া-গৃহে। সঙ্গে ৫০০ সৈন্য আর দুটো কামান নিয়ে। ঐটেই ছিল নিজের হেড-কোয়ার্টার। যার ছাদের উপর থেকে তিনি সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রটাকে দেখতে পেতেন। আর তখনই যুদ্ধকৌশলটা বানিয়ে নিতেন মনে মনে।

"১১৭০ হিজরী, ৫ই শওয়াল বৃহস্পতিবার (২৩শে জুন) প্রাতে অগণিত নবাব-বাহিনী ইংরেজগণের নয়নপথে পতিত হইল। বিপুল চক্রব্যূহ, রক্তাস্তরণ শোভিত রণহস্তী, সুসজ্জিত অশ্বসেনা, বালারুণ কিরণে উজ্জলতর উন্মুক্ত তরবার, ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র, ও গগনভেদী পতাকারাজী ক্ষুদ্র ইংরেজদলের হৃৎকম্প উপস্থিত করিয়াছিল। মৃগয়াগৃহের উর্দ্ধদেশ হইতে নবাব-সৈন্য পরিদর্শন করিয়া, অসমসাহসিক দলপতিরও অন্তরাত্মা কম্পিত হইয়াছিল। মনে হইল, মীরজাফর প্রতিকূল আচরণ করিলে, একজনও সংবাদ দিতে ফিরিবে না। পাত্রমিত্রগণের সাহায্যের আশ্বাসেই ইংরেজপক্ষ সাহসে ভর করিয়া, সেই ভীষণ দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে সক্ষম হইলেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

নবাবী সৈন্য সম্পর্কে স্ক্রাফটনের বর্ণনাও এমনি বর্ণাঢ্য।

"What with the number of elephants, all covered with scarlet embroidery, their horse with their drawn swords glitering in the sun, their heavy cannon drawn by the vast trains of oxen, and their standards flylng, they made a most pompous and formidable sight."

যুদ্ধ শুরু হল সকাল ৮ টায়। কিন্তু প্রথম কামান দাগলো কারা? দাগলো সিরাজের পক্ষের সৈন্যরা, কিন্তু কে?

কেউ লিখছেন, 'প্রাতে ৮টার সময় সরোবর তীর হইতে ফরাসিগণই প্রথম

কামান দাগিল।' কেউ লিখছেন, 'বেলা আট ঘটিকার সময়ে মীরমদন সরোবর তীরে কামানে অগ্নিসংযোগ করিলেন।'

যাই হোক, যার কামান থেকেই প্রথম গোলা ছুটুক, সেটা ফল দিয়েছিল হাতে হাতে। প্রথম গোলাতেই নাকি হতের সংখ্যা এক। আহতও একজন। প্রথম দফায় আধ ঘণ্টার ঘন ঘন কামান বর্ষণে ইংরেজদের সৈন্য ক্ষয়ের সংখ্যা দাঁড়াল মিনিটে একজন। ১০ জন গোরা। ২০ জন দিশী সেপাই। ভয়ে কেঁপে উঠলেন ক্লাইভ। এইভাবে যদি মৃত্যুর হিড়িক পড়ে যায়, তাহলে লড়বে কে? ক্লাইভ বুদ্ধিমানের মত গুটিয়ে নিলেন নিজের সৈন্যদল। চার-চারটে কামান নিয়ে আত্মগোপন করলেন আমবাগানের আড়ালে।

স্ক্রাফটনের স্বীকারোক্তি—

"We, soon found such a shower of balls pouring upon us from their fifty pieces of cannons. ...that we retired under cover of the bank."

ইংরেজরা পিছু হঠছে দেখে নবাবী সেনাদের মহা উল্লাস, তারা এগিয়ে এল পায়ে পায়ে। নবাবের তোপমঞ্চ ছিল ৪ হাত উঁচু। মীরমদন সেখান থেকে কামান দাগতে লাগলেন। কিন্তু তাতে কাজের কাজ হল না কিছুই। কারণ ক্লাইভের সৈন্যরা তখন গাছের আড়ালে, বাঁধের নীচে। কামানের গোলা লাগছে গাছের ডালে। লক্ষবাগের আমগাছগুলোই ভেঙে তছনছ হতে লাগল কেবল।

অবশ্য ইংরেজরাও বসে রইল না চুপ করে। আমবাগানের মাটির পাঁচিলে গর্ত কেটে, তার মুখে কামানের নল বসিয়ে, তারাও ছুঁড়তে লাগল তোপ। তাতে খানিকটা আটকানো গেল নবাব-সৈন্যের এগিয়ে আসাটা। এইভাবে না-কারো হার, না-কারো জিত হয়ে যুদ্ধ চলল বেলা এগারোটা পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে ক্লাইভ তলব করেছেন উমরবেগকে। কোনও কোনও ইতিহাসে উমরবেগের জায়গায় রয়েছে আমীনচাঁদ। মুতাক্ষরীণেও আমিনচাঁদ অর্থাৎ উমিচাঁদ। কিন্তু উমিচাঁদ নয়, এই সময় ক্লাইভের কাছাকাছি ছিলেন উমরবেগ। ক্লাইভের মন জ্বলছে রাগে। জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা কি? তোমাদেরকে বিশ্বাস করে তো বড় বাজে কাজ করে ফেলেছি দেখছি। কথা ছিল সামান্য যুদ্ধের অভিনয় করলেই কাজ হাসিল হবে। সিরাজের সৈন্যরা নিষ্কর্মা হয়ে থাকবে। এখন তো দেখছি সবই বিপরীত।

"সাবেদজঙ্গমে (ক্লাইব) আমীনচাঁদকে বাদগুমান হো কর, গোসা ফরমায়া,

আওর কহা কে এসাহি ওয়াদা যা কে থাকিস লড়াইমে বদয়ায় দিলি হাসিল হো যায় গা, আওর শাহী ফৌজভি সিরাজুদ্দৌলাসে মনহেরেফ হেয়; ওয়া সব তেরি বাতে বর্খেলাফ পায়ি জাতি হেঁয় ?" মুতাক্ষরীণ।

তার উত্তর এল, যারা যুদ্ধ করছে তারা মীরমদন আর মোহনলালের সৈন্য। সৈন্যদলের মধ্যে তারাই শুধু প্রভুভক্ত। তাদের কোনমতে হারাতে পারলেই বাকী সেনানায়করা কেউই হাতে অস্ত্র নেবেন না।

যুদ্ধ করে চলেছেন মীরমদন। মীরজাফর, ইয়ারলতিফ, রায়-দুর্লভ দাঁড়িয়ে আছেন, যেন পটে আঁকা ছবি। কি করছেন তাঁরা। মুতাক্ষরীণের ভাষায়—'ওহা খড়ে তামাসা দেখ রহে থে।'

তাঁরা 'বৃক্ষ হবো স্তব্ধ' দাঁড়িয়ে আছেন দেখেও, ভয় ঘোচেনি ক্লাইভের মনের। কি জানি কোন মুহূর্তে এগিয়ে এসে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরবেন তাদের। তাই মাঝে মাঝে সেদিক পানেও ছুটে চলল গোলা-গুলি। যাতে কেউ এগোতে সাহস না পায়।

১১টার সময় ক্লাইভ বসলেন পরামর্শে। ঠিক হল দিনের বেলাটা এই ভাবে গোলা চালিয়ে আত্মরক্ষা করা যাক্। রাত্রে আমরা আক্রমণ করব নবাবকে।

১১টার পর হঠাৎ নামল বৃষ্টি, মুষলধারে। আধঘন্টা পরে বৃষ্টি যখন থামল, তখন দেখা গেল মীরমদনের অনেকখানি বারুদ ভিজে গেছে, ঠিকমত আচ্ছাদন বা যত্নের অভাবে। বৃষ্টি থামবার পর মীরমদন ভাবলেন, তাহলে নিশ্চয়ই ইংরেজরও এই একই অবস্থা। তিনি হাজার খানেক সৈন্য নিয়ে তেড়ে গেলেন ইংরেজদের দিকে। তাঁর ভুল হয়েছিল হিসেবে। ইংরেজদের বারুদের গাড়িটা ছিল ঢাকা দেওয়া। ফলে কামান দাগতে তাদের ভয় নেই। তারা কামান দাগতে লাগল আড়াল থেকে। আর ঠিক সেই সময়েই একটা গোলা এসে লাগল মীরমদনের উরুতে। মীরমদনের সঙ্গে নিহত হলেন আরও কয়েকজন বড় যোদ্ধা।

মীরমদনকে সকলে ধরাধরি করে নিয়ে এল সিরাজের সামনে। মোহনলাল নিলেন যুদ্ধের নেতৃত্ব। মীরমদন মৃত্যুর মুহূর্তে নবাবকে জানিয়ে গেলেন অল্প কয়েকটা কথা।

শত্রুসৈন্যরা আমবাগানে লুকিয়ে। তবুও নবাবের প্রধান সেনাপতিরা কেউ যুদ্ধ করছেন না। ছবির মত দাঁড়িয়ে আছেন কেবল।

মীরমদন মারা গেলেন। সিরাজের মাথায় ভেঙে পড়ল দুর্ভাবনার আকাশ।

এখন ভরসা করা যায় কার উপর ? মীরজাফরের সাহায্য ছাড়া জিতবে। কি করে ? এইসব ভেবে তিনি ডেকে পাঠালেন মীরজাফরকে।

"মীরজাফর অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, অনেক কালহরণ করিয়া, অবশেষে প্রিয় পুত্র মীরণ এবং পাত্রমিত্রদিগের সহিত দলবদ্ধ হইয়া সতর্ক-পদবিক্ষেপে সিরাজের পট-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মীরজাফর ভাবিয়াছিলেন, সিরাজদ্দৌলা হয়ত তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু পটমণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র সিরাজ তাঁহার সম্মুখে রাজ-মুকুট রাখিয়া দিয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, 'যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তুমি ভিন্ন রাজ-মুকুট রক্ষা করে, এমন আর কেহ নাই। মাতামহ জীবিত নাই। তুমিই এখন তাঁহার স্থান পূর্ণ কর। মীরজাফর ! আলিবর্দীর পুণ্যনাম স্মরণ করিয়া আমার মানসম্ভ্রম এবং জীবন রক্ষায় সহায়তা কর।' মীরজাফর সসম্ভ্রমে যথারীতি রাজ-মুকুটকে কুর্নিশ করিয়া, বুকের উপর হাত রাখিয়া, বিশ্বস্তভাবে বলিতে লাগিলেন—'অবশ্যই শত্রু জয় করিব। কিন্তু আজ দিবা-অবসান-প্রায় হইয়াছে, সিপাহীরা প্রভাত হইতে রণশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ; আজ সেনাদল শিবিরে প্রত্যাগমন করুক। প্রভাতে আবার যুদ্ধ করিলেই হইবে।' সিরাজ বলিলেন, 'নিশারণে ইংরেজসেনা শিবির আক্রমণ করিলেই যে সর্বনাশ হইবে ?' মীরজাফর সগর্বে বলিয়া উঠিলেন—'আমরা রহিয়াছি কেন ?' সিরাজের মতিভ্রম হইল।" সিরাজদ্দৌলা।

মীরজাফরের শেষ কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠলেন মোহনলাল। একি কথা ! আর খানিকটা সময় লড়াই চালালে ইংরেজরা কুপোকাৎ হবে, এমন সময় কিনা শিবিরে ফিরে যেতে বলা হচ্ছে সৈন্যদের ? না ফিরবনা। মোহনলালের তেজস্বীতাকেই সবচেয়ে ভয় মীরজাফরের। মোহনলাল বেঁচে গেলেই মীরজাফরের সব ছলা-কলা শেষ। কিন্তু মোহনলালের বীরত্বের চেয়ে মীরজাফরের ছলনাকেই সেই মুহূর্তে বেশী মূল্য দিলেন উদ্‌ভ্রান্ত সিরাজ। মোহনলালের ভিতরটা জ্বলতে লাগল ক্রোধে। তবু নবাবের আদেশ শিরোধার্য করে তাঁরা ধীরে ধীরে ফিরে চললেন শিবিরের দিকে। মীরজাফর খুঁজে পেলেন তাকিয়ে-থাকা চরম মুহূর্তটির। তখুনি লিখে পাঠালেন ক্লাইভকে—'মীরমদন মারা গেছে। আর লুকিয়ে থাকার দরকার নেই। ইচ্ছা থাকলে এখুনি না হলে রাত ৩টেয় শিবির আক্রমণ করুন। কার্যসিদ্ধি ঘটবে।' মোহনলাল তার দলবল নিয়ে শিবিরে ফিরছে দেখতে পেয়ে ইংরেজ সেনারা বেরিয়ে এল আমবাগান থেকে।

ক্লাইভ তখন কোথায় ? তিনি মৃগয়াগৃহে। কি করছেন। কেউ বলেন নিজের নোংরা হয়ে যাওয়া বেশ-বাস পাল্টাছিলেন, যুদ্ধের পালা একটু ঢিলে-ঢালা হয়েছে

দেখে। কেউ বলেন, ঘুমোচ্ছিলেন। অর্মে সাহেব এই ঘুমের কথা জানিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করেছেন, আহা! একটু ঘুমিয়ে পড়া এমন কিছু দোষের নয়। কদিনে কতটুকুই বা ঘুমোবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি! এতে তাঁর 'কারেজ' কিংবা 'কনডাক্‌ট' কোনটার উপরেই কালি পড়ার কথা নয়।

ঘুমোচ্ছিলেন ক্লাইভ। হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে গেল বাইরের গোলমালে। কি ব্যাপার? জানতে পারলেন, মেজর কিলপ্যাট্রিক কারো মতামত বা নির্দেশ না নিয়ে, নিজেই ঝুঁকি নিয়ে তাড়া করেছেন ফরাসী সৈন্যদের। কথাটা শুনেই তো ক্লাইভ রেগে একদম অগ্নিশর্মা। কিলপ্যাট্রিককে বন্দী করতে হুকুম দেন আর কি! কিন্তু যখন দেখলেন, এ-ভাবে তাড়া করায় কাজ হয়েছে তখন আরো সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তিনিও যোগ দিলেন যুদ্ধে। আবার যুদ্ধ জমে উঠেছে দেখে মোহনলাল ছুটে এলেন শিবির থেকে। ফরাসীরাও তখন প্রাণপণ লড়ছে। কিন্তু ভয়ে পালাতে লাগল অন্য পক্ষের সৈন্যরা। আবার তাদের পালাতে দেখে মোহনলালের পক্ষের সৈন্যরাও পালাতে লাগলন প্রাণভয়ে। ঠিক এই সময়ে রায়দুর্লভ এসে সিরাজকে কানে কানে পরামর্শ দিলেন, আপনি এই ফাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যান রাজধানীতে। সিরাজ দেখলেন, সত্যিই বিপদ। এত বিপুল তাঁর সৈন্যবাহিনী। কিন্তু যুদ্ধের সময় লড়ছে মাত্র কয়েকজন। বাকী হয় নিশ্চুপ, নয় পালিয়ে যাচ্ছে। এখানে দাঁড়িয়ে মার খাওয়ার চেয়ে রাজধানীতে ফিরে গিয়ে নতুন করে সব কিছু ভেবে ঠিক করাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

"সিরাজদ্দৌলানে যব লস্করকা, ইয়া হাল দেখা, নেয়ায়েৎ খৌক্‌মন হো খয়্যস তালা আঁদুসে, কেঁওকে বহুত কম্‌লোঁগকে আপনা দোস্ত জনতা থা…কৈ ঘড়িভড় রোজ বাকী রহথা কে খোদাভি ভাগ নিকলা।" মুতাক্ষরীণ।

সিরাজ পালালেন রাজধানীমুখো। কি ভাবে? অর্মে লিখেছেন, উটের পিঠে চেপে। মেকলে সেটাকে বানিয়েছেন, দ্রুতগামী উট। ক্রাফটন ঐতিহাসিক নন, প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি লিখেছেন, হাতীর পিঠে চেপেই পালিয়েছিলেন সিরাজ।

পালিয়েছিলেন কখন? ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মত, ২৩ জুন, বেলা ২টার সময়। কিন্তু তা নয়। পালিয়েছিলেন অপরাহ্ণ ৫টায়। আর মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে পৌঁচেছিলেন পরের দিন শুক্রবার ভোরে।

"৬ মাহ সওয়াল জুমাকো দো তিন ঘড়ি দিন চড়ে মনসুরগঞ্জ আ পহুঁছা," মুতাক্ষরীণ।

সিরাজের পালানোর পরও যুদ্ধ চলল কিছুক্ষণ।

"এই সময়ে মীরজাফর খাঁর সৈন্যদল বাগানের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সরিয়া যাইতেছে দেখা গেল। তাহাদের সঙ্কেত নির্দ্দেশ বুঝিতে না পারায়, সে দিকেও একদল ইংরেজ-সৈন্য পাঠাইয়া একটি কামান সংযোগে অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইল। কলিকাতা হইতে পলায়িতগণের অন্যতম বীর গ্রাণ্ট মহাত্মা এ দলের অধিনায়ক মনোনীত হইলেন। ইতোমধ্যে ইংরেজ সৈন্য ক্লাইভের আজ্ঞায় সরোবর সমীপে অগ্রসর হইয়া, তাহারা উচ্চ পাহাড় হইতে নবাব-শিবিরের দিকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। নবাবের অনেক সৈন্য এখন পরিখা পার হইয়া আসিয়াছিল, এবং কয়েকটি কামান ফিরাইয়া অগ্নিসংযোগের উদ্যম হইতেছিল। ইংরেজদের আগ্নেয়াস্ত্রে নবাব পক্ষের কামান-শকটের বলীবর্দ্ধগুলিরই পশুজন্ম-যাতনার অবসান হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে, সিনফ্রের কামান ও নবাব সৈন্যের গোলা-গুলি বর্ষণের বিরাম ছিল না। সময়ে সময়ে অশ্বারোহী সৈন্যদল কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আক্রমণের ভয় দেখাইল। কিন্তু ইংরেজের অগ্নিবর্ষণে তাহারা নিরস্ত হইল। তথাপি সমস্ত যুদ্ধে ইংরেজপক্ষের যে ক্ষতি হইয়াছিল, এই সময়ের মধ্যেই তাহার সমান ক্ষতি হইল। অবশেষে মীরজাফর খাঁর সৈন্যদল বাম দিকে সরিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা অন্য সৈন্যদের সহিত যোগ না দেওয়ায়, তাহারা কে ক্লাইভ বুঝিতে পারিলেন। তখন সিনফ্রের অধিকৃত পরিখা আক্রমণের কল্পনায় ইংরেজ সৈন্যদল তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু এ বিক্রম দেখাইবার আর প্রয়োজন রহিল না। সকল সৈন্যের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া সিনফ্রেও এখন পথ দেখিতেছিলেন। পাঁচটার সময় সমগ্র ব্রিটিশ বাহিনী মহাড়ম্বরে নবাবের জনশূন্য পটমণ্ডপে উপস্থিত হইল। এখানে তাম্বু, কামান, গোলাগুলি ও নানাদিকে বিশ্রস্ত দ্রব্যসম্ভার ভিন্ন আর তাহাদের বাধা দিবার কেহ ছিল না। ইংরেজ সৈন্যের অবিসংবাদী জয় হইল।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

যুদ্ধক্ষেত্রে যখন এই রকম দৃশ্য, তখন নেপথ্যে ঘটে চলেছিল অন্য এক ঘটনা। সিরাজদ্দৌলাকে সাহায্য করার জন্যে পাটনা থেকে যাত্রা করেছিল একদল ফরাসী সৈন্য, ল সাহেবের নেতৃত্বে। পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজমহল পর্যন্ত। আর মাত্র তিনঘণ্টা সময় পেলে পৌঁছে যেতেন পলাশীতে। আর মাত্র তিনঘণ্টা যদি পলাশীর যুদ্ধ চলতো, হয়তো ভারতবর্ষের ইতিহাস হয়ে যেতো অন্যরকম।

"Had he immediately proceeded twenty-miles further, he would the next day have met and saved Suraj-ad-dowla and an order of events, very different from those which we have to relate, would in all probability, saved." Orme.

যুদ্ধ শেষ। সিরাজ পলাতক। নবাব শিবির শূন্য। সেই সময়ে ক্লাইভের হাতে এল মীরজাফরের চিঠি। ক্লাইভ উত্তরে জানালেন, কাল সকালে দেখা হবে দাদপুরে। ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে রটিয়ে দেওয়া হল, দাদপুরে গেলে মিলবে পুরস্কার। ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্যরা ছুটল দাদপুরের দিকে।

পরের দিন সকাল হতেই উমরবেগ আর স্ক্রাফটন ছুটলেন মীরজাফরকে ইংরেজ-শিবিরে আনতে। মীরজাফর চললেন পুত্র মীরন আর সহচরদের সঙ্গে নিয়ে। মনে খানিকটা আশঙ্কা, খানিকটা আশা। যুদ্ধের সময় সরাসরি যোগ দিইনি। তার জন্যে ক্লাইভ আবার উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবে নাতো!

ইংরেজ শিবিরের কাছাকাছি পৌঁছে হাতীর পিঠ থেকে নামতে না নামতেই উপস্থিত সৈন্যরা এমনভাবে অস্ত্র উঁচু করে ধরল যে মীরজাফর আঁৎকে উঠলেন ভয়ে। পালাতে পারলে তখন যেন বাঁচেন তিনি। পিছু হাঁটতে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন ক্লাইভ। তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলে।

শিবিরে বসে দুজনের আলোচনা চলল কিছুক্ষণ। কেন তিনি যুদ্ধের সময় দেখা করেন নি, মীরজাফরের মুখ থেকে সে-সব কৈফিয়ৎ শোনার পর ক্লাইভ বললেন, আপনি আর কালক্ষয় না করে এখুনি রওনা দিন মুর্শিদাবাদের দিকে। নবাব যেন না পালাতে পারেন। আর নবাবের রাজকোষ যেন লুটপাট না হয়।

"The Colonel advised him (Meer jafor) to proceed immediately to the city and not to suffer Suraja Dowla to escape." Orme.

মীরজাফর পা বাড়ালেন মুর্শিদাবাদের দিকে।

পলাশীর আমবাগানে তখন পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে কোম্পানীর নিশান। সেই দৃশ্য গাঁথা হয়ে আছে লোক গাথায়—

কি হলরে জান,
পলাশীর ময়দানে নবাব হারালো পরাণ।
মীরজাফরের দাগাবাজী নবাব ধরতে পাল্ল মনে
সৈন্য সমেত মারা গেল পলাশী ময়দানে।
ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে মাটি
চাঁদোয়া টানায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটি।

পলাশীর যুদ্ধ-কে নিয়ে অনেক কাব্য, অনেক অশ্রুপাত। ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্ত গেল বলে হাহাকার। কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে

পলাশীর তাৎপর্য অত বৃহৎ নয়। এমন কি অনেকে এটাকে যুদ্ধ বলতেই গররাজী।

"....surely the mose miserable skirmish ever to be called a decisive battle." Woodruff.

"Plassey was decisive for the British in India and for Clive. But it was not notable as a battle–" Spear.

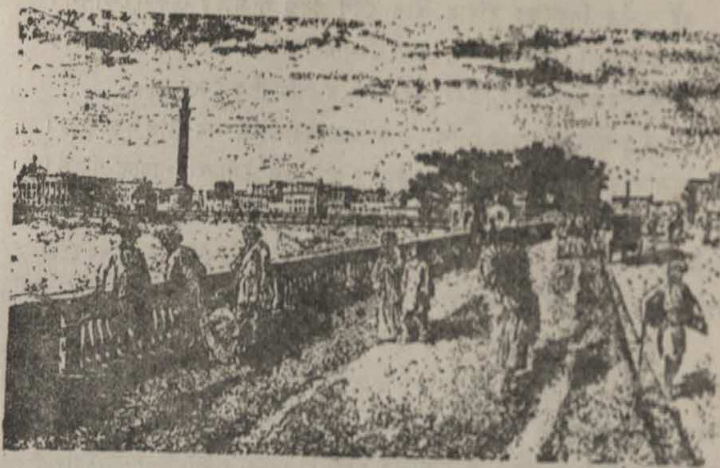
"The battle of plassey will ever be regarded as a great historical event, yet, when due regard has been paid to all the factors that contributed to the success of the English arms, it will cenceded that the victory of June 23rd, 1957, adds nothing to the splendid reputation of lord Clive," Ferminger.

এমনকি হলওয়েল, ব্ল্যাক-হোল হত্যাকাণ্ড নামক রূপকথার জনক হিসেবে যিনি বিখ্যাত আর একদা ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর হিসেবে প্রসিদ্ধ, তিনিও পলাশীর যুদ্ধকে যুদ্ধের সম্মান দিতে নারাজ।

"The means by which it was obtained should rather be forgot...."

কিন্তু বাংলা-কাব্যে তার জয়-জয়কার।

"পলাশীর যুদ্ধ"– আজি সহস্র জিহ্বায়
ঘোষিতেছে জনরব প্রভঞ্জন-গতি ;
"পলাশীর যুদ্ধ"– আমি মর্মরে পাতায়।
স্বণিতেছে সমীরণ, গায় ভাগিরথী।
"পলাশীর যুদ্ধ"– শত সহস্র নয়ন
চিত্রিতেছে অশ্রুজলে সহস্র ধারায় ;
"পলাশীর যুদ্ধ"– কত প্রফুল্ল বদন
হাসিতেছে মনসুখে ; লিখিছে খাতায়
"পলাশীর যুদ্ধ"– ওই বসিয়া অম্বরে
ভারত-অদৃষ্ট-গ্রন্থে অমর অক্ষরে।"



॥ সিরাজের মৃত্যু ॥

রাজধানীতে ফিরে এলেন পরাজিত এবং ভাগ্যাহত সিরাজ। আরও একবার উঠে পড়ে লাগলেন সৈন্য সংগ্রহের জন্যে। ডেকে পাঠালেন নিজের পাত্রমিত্রদের। তোমরা এসো। আমাকে উদ্বুদ্ধ কর। পরামর্শ দাও। বেয়াদব বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর আর ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমার কি করা উচিত এখন।

বসল মন্ত্রণাসভা। অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মোহনলালও। অধিকাংশ আমির-ওমরাহ মত দিলেন, আত্মসমর্পণের পক্ষে। নবাব আর মোহনলাল কান দিলেন না সে কথায়। এর চেয়ে জঘন্যতম কাজ আর আছে নাকি?

অন্যপক্ষ মত জানালে, পালিয়ে যান দাক্ষিণাত্যের দিকে। ফরাসীদের কাছে আশ্রয় নিন। গোপনে সংগ্রহ করুন সৈন্য। তখন আবার নামা যাবে লড়ায়ে।

সিরাজ হাজির হলেন নিজের শ্বশুর ইরিচ খাঁ-র কাছে। আপনি আমার পিতার মত। আপনার পায়ের নীচে শিরস্ত্রাণ রেখে আমি নতজানু হচ্ছি। আপনি আমার পাশে দাঁড়ান। আসুন, আমরা সৈন্য সংগ্রহ করি।

ইরিচ খাঁ ইতিমধ্যে বুঝে গেছেন রাজধানীর হালচাল। সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ করা এখন বাতুলতা। তার চেয়ে জরুরী কাজ হল, পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচানো। জামাইয়ের কাতরোক্তিতে কান দিলেন না তিনি। গোছাতে লাগলেন নিজের ধনরত্ন। এবং সরে পড়লেন মুর্শিদাবাদ থেকে।

এই সময়ে সিরাজের মাথায় এসে গেল সৈন্য সংগ্রহের একটা কৌশল। তিনি হুকুম জারী করে দিলেন, খুলে দিলাম আমার রাজকোষ। প্রত্যেক সৈনিক আগাম বেতন পাবে তিনমাসের। এসে যোগ দিক সৈন্যদলে।

উন্মুক্ত ধনাগারের সামনে লোকারণ্য। নবাবের হুকুমে দান চলল মুক্ত হস্তে। জীবনে যারা মুখ দেখেনি তলোয়ারের, তারাও ছুটে এল সৈনিক পরিচয় নিয়ে। সকলেই প্রতিজ্ঞা করলে, আবার নামবে শেষ লড়ায়ে। কিন্তু টাকা পয়সা পাওয়ার পর কাউকেই খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও। সিরাজের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল। তিনি বুঝলেন, মুর্শিদাবাদে থাকা মানেই মৃত্যু।

"সায়াহ্নে আর রত্নদীপালোকে রাজধানী উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল না ; রাজ-বৈতানিকদের সুললিত যন্ত্র-সঙ্গিত আর বায়ুভরে দূর-দূরান্তরে মোগলের গৌরব-গীতি বিঘোষিত করিল না, পার্শ্বচরগণ আর নবাব সিরাজদ্দৌলার আজ্ঞা পালনের অপেক্ষায় করযোড়ে কক্ষদ্বারে সম্মিলিত হইল না। রাজপুরী জনসমাগমরহিত শ্মশান-সৈকতের ন্যায় হায়! হায়! করিতে লাগিল। সেই শ্মশানভূমি বিকম্পিত করিয়া অদূরে মীরজাফরের বিজয়োন্মত্ত আগ্নেয়াস্ত্র ভীম কলরবে গর্জন করিয়া উঠিল। সিরাজদ্দৌলা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন, মোগল রাজ্যাভিনয়ের শেষ চিত্রপট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। জনহীন পাষাণ-প্রাসাদ যেন চিরবুভুক্ষিতের ন্যায় তাঁহাকেই গ্রাস করিতে আসিতেছে। তখন মাতামহের মমতানুলিপ্ত হীরাঝিলের বিচিত্র রাজপ্রাসাদ এবং বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার বলিদর্পিত মোগলরাজসিংহাসন পশ্চাতে রাখিয়া, নবাব সিরাজদ্দৌলা পথের ফকিরের ন্যায় রাজধানী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। একজনমাত্র পুরাতন প্রতিহারী এবং চিরসহচরী লুৎফউন্নিসা বেগম ছায়ার ন্যায় পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিতে লাগিল।" সিরাজদ্দৌলা।

নিজের পালানোর আগে অন্তঃপুরের লোকজনদের পাঠিয়ে দিলেন ঢাকা ডুলিতে। পঞ্চাশটা হাতীর পিঠে বোঝাই হল ধনরত্ন। নিজে বেরুলেন দীন-হীন বেশে। ঐতিহাসিক আইভস্-এর মতে, ফকিরের ছদ্মবেশে। সঙ্গে ছিল লুৎফান্নেসা ও শিশুকন্যা ওম্মৎজহুরা, আর এক বিশ্বস্ত খোজা প্রহরী। আর ছিল একটা পেটিকা, যার মধ্যে মূল্যবান কিছু হীরে জহরত। কারো মতে সময়টা ছিল তিনটে। কারো মতে রাত এগারটা। যাবেন রাজমহল। কিন্তু সোজা রাস্তায় গেলেন না। ধরলেন অন্য এক ঘুর-পথ। অনুমান করে নিয়েছেন, শত্রুরা অনুসরণ করবে তাঁকে। তাই চেনা সড়ক ছেড়ে বাঁকা পথে। ভগবানগোলায় স্থলপথ ছেড়ে ধরলেন জলপথ।

যদুনাথ সরকার সংকলিত "বাংলার নবাব"-এ করম আলি-র মুজাফ্ফর নামা-য় অন্য রকমের ছবি।

"At midnight getting into a 'rath', with his wife Lutf-un-nisa Begam and his three years daughter, and one eunuch, he set out for Bhagwon Gola to take boat there. Owing to the darkness of the night, the trouble and the excess of mud, the 'rath' of the Begam became separated from his. So he reached Bhagwan Gola alone and there getting into a boat called Bhaolia with the eunuch...."

সিরাজের নৌকো ছুটে চলেছে মহানন্দার উপর দিয়ে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক, যেমন অর্মে বা মালেসন, মনে করেন যে নবাব নৌকোয় চেপে-ছিলেন মনসুরগঞ্জ রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি কোনো ঘাট থেকে। আগে থেকেই নৌকো হাজির করা ছিল সেখানে। মুতাক্ষরীণের খেদ, নবাব জলপথে না গিয়ে, ভাল করতেন স্থলপথে গেলে। অর্থ বা পুরস্কারের লোভে লোক জুটে যেত অনেক। এমন কি একটা ছোট-খাটো সৈন্যদলও গড়ে উঠতে পারতো রাস্তাতেই। তাতে ধরা পড়ার ভয়টা ছিল কম।

২৫ জুন। সকাল আটটা। মীরজাফরের লেখা একটা চিরকুট এসে পৌঁছল ক্লাইভের কাছে।

"তিনি (নবাব) পালিয়েছেন রাত ১১টা নাগাদ। আমি খবর পেলাম ১২টায়। লোক পাঠিয়েছি পিছনে ধাওয়া করার জন্যে। খোদাতাল্লার আশীর্বাদে তিনি নিশ্চয়ই ধরা পড়বেন।"

২৬ তারিখে আরো একটা চিরকুট।

"আমার সৈন্যদলের একটা অংশকে পাঠিয়েছি নবাব সিরাজদ্দৌলার সন্ধানে, যিনি এখন ভাগ্যহত। খোদাতাল্লার সাহায্যে সৈন্যরা তাঁকে বন্দী করে ধরে আনবে শীঘ্রই। আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।"

ক্লাইভ নিশ্চিন্ত হননি। তাই মীরজাফরের কাছে পাঠিয়েছিলেন বেশ কিছু সাহসী সৈন্য সঙ্গে দিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত দুই অনুচরকে। ওয়াটস এবং ওয়ালস যখন ২৬ জুনের দুপুর তিনটেয় হীরাঝিলে এসে পৌঁছল, মীরজাফর তখন দিবানিদ্রায় মগ্ন। অভ্যর্থনা জানাল মীরন আর উমরবেগ। মুর্শিদাবাদে তাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতার বিবরণ তারা লিখে জানিয়েছিল ক্লাইভকে, ঐ দিনই। হোসেন কুলি খাঁর বাগান থেকে।

"দুপুর তিনটের আগে আমরা হীরাঝিলে পৌঁছতে পারলুম না। মীরজাফর তখন ঘুমন্ত। তাঁর পুত্র মীরন আর উমরবেগ অভ্যর্থনা জানাল আমাদের। খবর পেলাম সিরাজ পালিয়েছেন আগের দিন রাত ১২টার সময়। তার আগে প্রাসাদের সমস্ত রমণীদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। সকাল ১০টার সময়, ৫০টা হাতীর পিঠে যাবতীয় ধনসম্পত্তি, সোনাদানা, হীরেজহরত বোঝাই করে। তিনি যে কোন্ দিক দিয়ে পালিয়েছেন তা জানা যায়নি। তবে প্রত্যেক রাজ্যের রাজার কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে তাঁকে আটকানোর জন্যে। পাঠানো হয়েছে সৈন্য-সামন্তও। নবাব মীরজাফর এবং তাঁর পাত্র-মিত্রদের বিশ্বাস নবাব ধরা পড়বেন অচিরেই। মোহনলাল এবং নবাবের কোষাধ্যক্ষ ধরা পড়েছেন। তবে তাদের বিচার এখনো শুরু হয়নি।

"নবাব মীরজাফর জেগে উঠেই আমায় অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু সেই সময় পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে আলোচনায় এমন উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন যে আমাদের সঙ্গে আর বেশী কিছু আলোচনা হ'ল না। আমরা রওনা দিলাম জগৎশেঠের বাড়ির দিকে। তিনি বললেন, নবাবকে ধরা শক্ত। তাঁর (পাটনার) নায়েব রামনারায়ণের রয়েছে ১০ থেকে ১৫ হাজার অশ্বারোহী। নবাব সেখানে গিয়ে পৌঁছালে এই সাহায্য তো পাবেই। উচিত হল মীরজাফর আর কোম্পানীর উভয় সৈন্যদলের এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়া। এর পর মীরজাফর এসে যোগ দিলেন সভায়। সঙ্গে মানিকচাঁদ, রায়দুর্লভ আর শেঠজীর ভাই। আমরা বললাম, যত রকম উপায় আছে, তার সবটাকেই নবাব সিরাজকে বন্দী করার ব্যাপারে কাজে লাগানোর জন্যে।..."

মীরজাফরের চেয়ে ইংরেজদের মাথা ব্যথাটাই যেন বেশী। মীরজাফর এমন ঘোরতর সংকটেও দিবানিদ্রা দিতে পারেন। কিন্তু ক্লাইভ এবং তাঁর দূতদ্বয়ের চোখে ঘুম নেই।

শুরু হয়ে গেল তল্লাসী। রাস্তায় ধরা পড়ল সিরাজের জেনানা-মহলের নারীরা। আর সেই পঞ্চাশটা হাতী। কারারুদ্ধ করা হল সিরাজের ভাই মিরজা মেহেদী আলিকে। মোহনলাল পা বাড়িয়ে ছিলেন ভগবানগোলার দিকে, সিরাজের সঙ্গে মিলবার জন্যে। তাঁকেও ধরে ফেলা হল মাঝ-পথে। কারারুদ্ধ হলেন তিনিও। তাঁর জীবনের দায়-দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল রায়দুর্লভের হাতে। আর রায়দুর্লভ তাঁর হাতে তুলে দিলেন বিষের পাত্র। মোহনলাল মারা গেলেন বিষের জ্বালায় নীল হতে হতে।

রাজধানী শত্রুহীন। তবুও ক্লাইভের মুর্শিদাবাদে পা বাড়াতে ভয়। তার

কারণ, কি করে যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল এমন একটা আশঙ্কা যে, ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে পা দিলেই হত্যা করা হবে তাঁকে।

২৭ জুন। বেলা একটার সময় ক্লাইভের হাতে এসে পৌছল ওয়াটস এবং ওয়ালস-এর চিঠি।

"Rungeet Ray is despatched to us by Jaggatseat to desire that you will not come into town this afternoon for trechery is intended you. A consultation was held last night between Meerun, Ray-Dulup and Cossin Hussin Khan about cutting you off at your visit to the Nabob. You may return on pretence of illness if you are on the road, but it will be necessary to write of it. Jaggatseat will then visit you tomorrow morning. He begs you will not mention a syllable of this intelligence as you value his life."

দুদিন পরে, ২৯ জুন ক্লাইভ ঢুকলেন মনসুরগঞ্জে। সঙ্গে দুশো গোরা সৈন্য আর ৫০০ দেশী সেন্য। রাজপথের দুধারে জনারণ্য। তাদের দেখে মনে মনে ভয় পেয়েছিলেন ক্লাইভ। পার্লামেন্টে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় স্বীকারও করেছিলেন নিজের মুখে।

"সেদিন যত লোক রাজপথ-পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিল, তাহারা ইংরাজ-নিধনে কৃতসংকল্প হইলে, কেবল লাঠি-সোটা এবং লোষ্ট্রনিক্ষেপেই তৎকার্য সাধন করিতে পারিত।"

সেইদিনই ক্লাইভ কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে মীরজাফরকে অভিবাদন জানালেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব বলে। দরবার কক্ষে উপস্থিত ছিলেন নতুন নবাবের পাত্র-মিত্ররা।

"২৯শে প্রাতে ক্লাইভ মুরাদবাগে উত্তীর্ণ হইবার পরেই মীরন তাঁহাকে প্রাসাদে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। মীরজাফর খাঁ পাত্র-মিত্রগণ ও প্রধান সামন্তবর্গসহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রাসাদের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কক্ষে দরবার বসিল। উত্তর-পার্শ্বে সুসজ্জিত মসনদ স্থাপিত হইয়াছিল। মীরজাফর খাঁ স্বয়ং মসনদে উপবেশন করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, ক্লাইভ অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্বক মসনদে বসাইয়া দিয়া ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে স্বয়ং সর্বপ্রথমে স্বর্ণমুদ্রা নজর প্রদান ও বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার সুবাদার সম্বোধনে অভিবাদন করিলেন। অতঃপর অন্য সকলের নজর অভিবাদনাদি চলিতে লাগিল। ক্লাইভ দোভাষীর দ্বারা সভাগত সমস্ত লোকজনকে জানাইলেন—

"দেশের ও তাঁহাদের সৌভাগ্যবলে সিরাজদ্দৌলার মত অত্যাচারী সুবেদারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তাঁহারা এমন উৎকৃষ্ট একজন নবাব পাইলেন। অতঃপর সকলেই নূতন নবাবের নিকট নজর দ্বারা বশ্যতা ও মনস্তৃপ্তি জানাইলেন। নিরপেক্ষ এবং সিরাজের পক্ষপাতী যে দুই একজন ছিলেন, তাঁহারাও ভয়-মৈত্রতায় নব-নবাবের অনুকূল হইলেন। রাজা দুর্লভরামকে প্রধানমন্ত্রীত্বে অভিষিক্ত করিয়া মীরজাফর খাঁ সিংহাসনে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

পরের দিন সকাল হতেই শুরু হল টাকা-পয়সা বা পাওনা-গণ্ডার হিসেব। ক্লাইভ বললেন, এবার সন্ধির সর্ত মত টাকা পয়সা মেটাও। এর কদিন আগে ক্লাইভের দুই অনুচর ওয়াটস এবং ওয়ালস প্রথম প্রস্তাব পেশ করেছিলেন দুর্লভ-রামের কাছে। দুর্লভরাম জানিয়েছিলেন, প্রতিশ্রুত দুকোটি কুড়ি লক্ষ টাকা রাজকোষে নেই। দূতেরা বললে, তাহলে জগৎশেঠদের কাছ থেকে ধার করুন। দুর্লভরামের উত্তর ছিল, কোটি পরিমাণ ঋণ দেবার মত ক্ষমতা তাঁদের নেই। একশ লক্ষে এক কোটি হয়।

ক্লাইভ আবার তুললেন সেই টাকার প্রসঙ্গ, মীরজাফরের কাছে। মীরজাফর জানালেন, রাজকোষে অত টাকা নেই। ক্লাইভ জানালেন, তাহলে শেঠদের কাছে চলুন। সেখানেই মীমাংসা হবে।

জগৎশেঠদের বাড়ির দিকে রওনা হলেন ক্লাইভ মীরজাফর দুর্লভরাম ওয়াটস ওয়ালস ইত্যাদিরা। এবং ছিলেন আরও একজন। তাঁর নাম উমিচাঁদ। যখন সন্ধি-অনুযায়ী টাকা পয়সার হিসেব নিকেশ চলেছে, তখন উমিচাঁদ কোথায়? এ নিয়ে দুরকম মতামত। কেউ বলেন তিনি ছিলেন ঐ মন্ত্রণাঘরেই, সকলের সঙ্গে। ক্লাইভ তাঁর নিজের জবানবন্দীতে বলেছিলেন, উমিচাঁদ ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। অন্যদের অন্যমত। 'হাউস অব জগৎশেঠ'-এর লেখক জানিয়েছেন ভিন্ন কথা।

"Clive and Mirjafar had been accompanied to the house of the Seths by Walls, Scrafton, Miran and Rai Durlabh Ram. Omichand, too, was with them but was not invited to a seat on the Carpet where the conference took Place. So he had taken his seat in the outer part of the hall and thought of the riches that would soon be his."

জগৎশেঠের বাড়িতে চলেছে হিসেব-নিকেশ। দুর্লভরাম প্রথমে জানিয়েছিলেন রাজকোষে দেওয়ার মত টাকা নেই। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, পাওনা টাকার অর্ধেকটা, নগদ আর মণিমুক্তো মিলিয়ে, ইংরেজদের দেওয়া হবে এখুনি। বাকীটা

দেওয়া হবে ধীরে ধীরে, তিন বছরে। আর সে টাকার উপরে বসবে শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন। মীরজাফর-পক্ষ তাতেই রাজী।

এবার এল উমিচাঁদের পালা।

ক্লাইভ ইসারা করলেন স্ক্রাফটনকে, তুমি গিয়ে উমিচাঁদের কাছে যা বলার বল। জানিয়ে যাও, তিনি পাবেন না কিছুই। কেননা এ সন্ধিপত্রটা জাল। স্ক্রাফটন উমিচাঁদকে গিয়ে জানালেন। শুনেই মাটিতে আছড়ে পড়লেন তিনি। জ্ঞান হারানোর মত অবস্থা। ভৃত্যের দল ছুটে এসে পালকী করে পাঠিয়ে দিল বাড়িতে। তারপর থেকে উন্মাদ অবস্থা। সব সময়েই বিড় বিড় করতে লাগলেন, লাল কাগজ, লাল কাগজ।

ক্লাইভ দেখা করতে গেলেন উমিচাঁদের বাড়িতে। পরামর্শ দিলেন, যান। তীর্থ করে আসুন। সব সেরে যাবে। শান্তি পাবেন। অর্মের ইতিহাস পড়লে জানা যায়, তিনি তীর্থে গিয়েছিলেন, ক্লাইভের পরামর্শ অনুযায়ী, মালদহের কাছে কোন এক জায়গায়। যখন ফিরলেন, তখন একেবারে ক্ষিপ্তাবস্থা। এর পর থেকে নাকি 'ভীমরতি' দেখা দিচ্ছিল ক্রমশ। ভুল-বকা তো আছেই। তার সঙ্গে দেখা দিয়েছে পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর। মণি-মুক্তোর অলঙ্কার পরতে লাগলেন গা-বোঝাই করে। এই ভাবে দেড় বছর কাটানোর পর তাঁর মৃত্যু হয়।

অন্য ইতিহাসের বিবরণ অন্য। তীর্থ পর্যটন সেরে বাড়ি ফেরার পর তাঁর মনের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা বদলে গিয়েছিল অনেকটা। তিনি উইল লিখেছিলেন একটা, নিজের হাতেই। তাতে দাতব্য করে গিয়েছিলেন অনেক কিছুই। ১৭৫৮-এ যখন মারা গেলেন নিঃসন্তান উমিচাঁদ, শ্যালক হুজুরীমল হলেন সম্পত্তির রক্ষক। উইল অনুযায়ী তিনি বিলেতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কোম্পানীর কর্তাদের মারফৎ। টাকা পেয়েছিল লণ্ডনের মডলিন হাসপাতাল, ফাউণ্ডলিং হাসপাতাল নামে অনাথ এবং পরিত্যক্ত শিশুদের এক আশ্রম।

কোনও কোনও ইতিহাস বলে, প্রতারিত করার পরও ক্লাইভ উমিচাঁদকে সম্পূর্ণ ভোলেন নি। ১৭৫৭-র আগস্টে বিলেতে পাঠানো চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন, উমিচাঁদকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়াটা ঠিক নয়। প্রয়োজনে আবার কাজে লাগতে পারে।

পার্লামেন্টের বিচারের সময় ক্লাইভের উপর অভিযোগ চাপানো হল, উমিচাঁদের সঙ্গে প্রতারণার। কাগজে ছাপা হল কার্টুন। উমিচাঁদের আত্মা খুঁজে বেড়াচ্ছে ক্লাইভকে।

ক্লাইভ উত্তর দিলেন দ্বিধাহীন কণ্ঠে –

যা করেছি, বেশ করেছি। ঐ রকম অবস্থায় পড়লে একবার কেন, হাজার বার ঐ কাজ করতে আমি প্রস্তুত। উমিচাঁদ যে কী চিজ সেতো আর আপনারা জানেন না।

ক্লাইভের কোন কোন জীবনীকার মনে করেন, যেমন মালেসন, উমিচাঁদের প্রতি এই প্রতারণা ক্লাইভের জীবনের একমাত্র কলঙ্ক। তাঁর সাম্প্রতিক জীবনীকার পারসিভাল স্পিয়ার তা মনে করেন না। তাঁর মতে ক্লাইভ এমন কিছু করেননি যা তখন ভারতীয় আবহাওয়ায় ভিন্নতর কিছু। বরং এসব তাঁর এদেশের জলহাওয়া থেকেই শেখা।

"First it should be noted that public ill-faith was endemic in India of the day. Broken treaties and unfulfilled promises were the rule rather than the expection, perhaps because most treaties were made under some sort of duress........We cannot castigate Clive specially for an act of a kind whice was going on all round him and taken a matter of course. We are bound to note that in carrying deception into treaty-making he was damaging the British reputation, already remarked upon in Indian circles, for public good faith. He was also doing it in a brutal way what Indian did much more subtly."

উমিচাঁদকে ছেড়ে আমরা আবার ফিরে তাকাবো পলাতক সিরাজের দিকে। যাঁর কাছে এখন রাজ্য মিথ্যা, রাজধানী মিথ্যা, সিংহাসন মিথ্যা। এখন তিনি চান শুধু বাঁচতে। অতি সাধারণ একজন প্রজার মত, দীন দরিদ্ররূপে। যদি সময় এবং সুযোগ আসে কোনদিন, তখন আবার নামবেন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

মহানন্দা এবং কালিন্দীর উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে তাঁর নৌকো। হঠাৎ রাজমহলের এপারে বড়াল নামের গ্রামের কাছে এসে থেমে গেল নৌকোর গতি। সামনেই নজিরপুরের মোহানা। এটা পার হলেই বড়গঙ্গা। তখন তো রাজমহল চোখের কাছে। তাহলে থামল কেন নৌকো? মাঝিরা জানালে, সামনে চড়া। নৌকো চলাচলের মতও জল নেই।

কথাটা সত্যি। আষাঢ়ের প্রথম দিকেও নজিরপুরের মোহানায় তখন নৌকো চলতে পারতো না। প্রবল বর্ষা না-নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো।

সিরাজ তখনো অনুমান করতে পারেন নি যে, এই চড়াই তাঁর জীবনে ডেকে

আনবে সমূহ সর্বনাশ। তিনি ভাবলেন, তাঁর পরাজয় অথবা পলায়নের খবর রাজধানী থেকে এত দূরে পৌছয়নি এখনো। সুতরাং এখানে তিনি অনায়াসে নামতে পারেন ডাঙায়। ডাঙায় নামার প্রয়োজনটাও জরুরী। ক্ষুধায় অস্থির তাঁরা সকলেই। কাছাকাছি কোথাও যদি সামান্য কিছু অন্নজল মেলে, তার চেষ্টা করা যাক।

নৌকোর মাঝিরা চলে গেল অন্য কোনো পথের সন্ধানে, যেখান দিয়ে পৌছতে পারা যাবে বড় গঙ্গায়। সিরাজ হাঁটতে হাঁটতে এগোলেন জনবসতির সন্ধানে।

কাছেই ছিল একটা মসজিদ। দানশা নামে এক মুসলমান সাধুর আশ্রম। অন্যমতে, সমাধি মন্দির। কারণ দানশা তখন জীবিত ছিলেন না। তিনি সিরাজের জন্মেরও আগের লোক। ছিলেন মুরশিদাবাদের নবাব বংশের গুরু। তাঁর পৌত্রেরা সিরাজের সমসাময়িক।

অন্য দিকে, অন্য একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, দানশা তখনও জীবিত। এবং দানশা নিজেই সিরাজকে তুলে দিয়েছিল মীরকাশিম ও মীরদাউদের সৈন্যদলের হাতে।

সিরাজ ছিলেন ছদ্মবেশে। দানশা তাঁকে চিনলেন কি করে?

মুতাক্ষরীণ-এর অনুবাদক গোলাম মুস্তাফা জানিয়েছেন, তিনি নাকি মুর্শিদাবাদের মানুষের মুখে শুনেছেন যে, সিরাজের পাদুকা দেখেই তাঁর মনে দেখা দেয় সন্দেহ। তারপর তিনি মাঝিদের সঙ্গে গোপনে কথা বলে জানতে পারেন সিরাজের পলায়নের ইতিহাস। আর তখুনি তাঁর মত সাধুর মনেও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে প্রতিহিংসার প্রেরণা।

এই দানশা সাধু বা ফকিরকে ঘিরে ইতিহাসে অনেক কিংবদন্তী। কারো মতে, কোনও এক সময় সিরাজ নাকি অপমান এবং অত্যাচার করেছিলেন তাঁর উপর। আবার ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে, কেটে দিয়েছিলেন নাক কান। দানশা তাই অপেক্ষায় ছিলেন প্রতিশোধের। তাই দুর্দিনে নবাবকে হাতের কাছে পেয়ে তাঁর সাধু-হৃদয়ে এতটুকু উদারতা ফুটল না।

নবাবের খবর পৌছে দিলেন কাছাকাছি অপেক্ষমাণ মীরকাশিমের সৈন্যদলকে। এ নিয়েও অনেক উল্টোপাল্টা মতামত।

বিভারিজ-এর মতে, এটা নিছক গালগল্প।

হান্টার সাহেবের মতে, দানশা সিরাজকে ধরিয়ে দিয়ে মীরজাফরের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন জায়গীর। পরে সুভামার বা সুবামার নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তিনি।

তারিখ-ই-মনসুরীর লেখক জানান যে, সিরাজ একবার এক দরবেশের দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অপমান ভুলতে না পেরে, সেই দরবেশই ধরিয়ে দিয়েছিলেন নবাবকে।

'দি ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ইষ্ট'-এর লেখক ই. এইচ. নোলান সাহেব লিখে গেছেন অন্য কথা। অত্যাচারিত এক হিন্দুই, মুসলমান ফকির নয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে নবাবকে তুলে দিয়েছিল শত্রুপক্ষের হাতে।

অক্ষয়কুমার মৈত্রের মতামত—

"আমাদের নিকট ইহার কোন সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া বোধ হয় না। সিরাজ যেরূপ মুসললান ধর্মানুরাগী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে দানশার ন্যায় একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধুর নাসাকর্ণচ্ছেদ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা দানশার সমাধি মন্দিরের ফলকলিপির সাহায্যে এবং তাঁহার বংশধরদের নিকট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি যে, দানশা আদৌ সে সময়ে জীবিত ছিলেন না।" সিরাজদ্দৌলা।

সংবাদদাতা যিনিই হোন, সিরাজ, সপরিবারে, বন্দী হলেন মীরকাশিমের হাতে। মীরজাফরের ভাই মীর দাউদ খাঁ তখন রাজমহলের ফৌজদার। সিরাজের সন্ধানে পাঠানো মীরকাশিম আর তাঁর সৈন্যদল তখন রাজমহলে। খবর পেয়েই নদীর এপারে ছুটে এলেন মীরকাশিম।

ভাগ্যহীন নবাব আছড়ে পড়লেন মীরকাশিমের পায়ে। তিনি চান প্রাণ-ভিক্ষা। চান বাংলা দেশের মাটিতে কোনও এক অজ্ঞাত জায়গায় বাকী জীবনটা গোপনে কাটাতে। আর সেই বাঁচার জন্যে যৎকিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি। মীরকাশিম কানে তুললেন না কোন আবেদনই। এমন করুণ ক্রন্দনেও আলোড়িত হলনা তাঁর বীর হৃদয়।

"এক্ষণে কেহই তাঁহার অনুনয়-বিনয়ে কর্ণপাত করিলেন না। লুৎফুন্নেসা বেগম মীরকাসেমের হস্তগত হইলেন। মীরকাসেম ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বহুমূল্য অলঙ্কার ও মুক্তাদির বাক্স হস্তগত করিলেন। দেখাদেখি মীরদাউদ ও অপর সকলেই অন্যান্য রমণীগণের ও সিরাজুদ্দৌলার সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইল। গোলাম হোসেন বলেন, মীরকাসেমের হস্তে যে জহরতের বাক্স পড়ে, লক্ষ ভিন্ন তাহার মূল্য নির্ণীত হয় না। উত্তর কালে ইহা মীরকাসেমের অর্থবলের প্রধান কারণ।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

"সপ্তাহ পূর্বে যিনি ঐ সকল ব্যক্তির সঙ্গে আলাপও করিতেন না, এক্ষণে তিনি অতি দীন বাক্যে তাহাদের নিকট বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু

তাহারা তদীয় বিনয়-শ্রবণে বধির হইয়া তাঁহার সমস্ত স্বর্ণ ও রত্ন লুঠিয়া হইল।" বিদ্যাসাগর।

মীরদাউদ তখুনি খবরটা পাঠিয়ে দিলেন মুর্শিদাবাদে। মীরজাফর তখন হীরাঝিলে বসে। পাশে ক্লাইভ। পরামর্শ চলছিল দুজনের মধ্যে। সেই সময়েই এসে পৌছল এই সুসমাচার। মীরজাফর একদল সৈন্যসহ পুত্র মীরনকে পাঠিয়ে দিলেন রাজমহলের দিকে, সিরাজকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে আনার জন্যে। ক্লাইভ সেই দিনই চিঠি লিখলেন কলকাতার কমিটিকে—

"I have received a note from the Nabob informing me that Surajah Dowlat is taken and that he has despatched his son to secure him. I congratulate you on this happy news."

তারিখটা ছিল ৩০ জুন।

বন্দী সিরাজকে আনা হচ্ছে রাজধানীতে। দীনহীন তাঁর পোশাক। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেছেন, প্রায়-নগ্ন অবস্থা। চোর-ডাকাতের মত তাঁর হাত-পা বাঁধা। সাধারণ কয়েদীর চেয়ে এক তিলও বেশী সম্মান দেওয়া হয়নি তাঁকে। প্রহরীদের হাতে পথেই অত্যাচারিত হয়েছেন তিনি। পথের মাঝখানে এই দুর্দশার ছবি চোখে পড়েছিল কিছু সৈন্যের। তাদের বিবেক ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল এই নৃশংস আচরণের বিরুদ্ধে। তারা দলপতির কাছে ছুটে গিয়েছিল আদেশের জন্যে। হুকুম দিন, এখুনি ছিনিয়ে আনি নবাবকে ঐ সব অমানুষ প্রহরীদের কবল থেকে। দলপতির অনুমতি মেলেনি।

৩ জুলাই। ১৭৫৭। রবিবার। তখন মধ্যরাত। সেই সময়ে ঘুমন্ত মীরজাফরের সামনে হাজির করা হল বন্দী সিরাজকে। ইতিহাসে তার পরবর্তী দৃশ্য—

"It was a touching scene. Meer Jaffor owed his own fortune, his honours, his Position as a great noble of Bengal to the favour of Alivardy Khan, the grandfather of the wretched boy who now brought like a Common felon before him". Maleson.

"....flung himself on the ground in convulsions of fear and with tears and loud cries implored the mercy". Mecaley.

"He crowled in the dust at the New Nabob's feet, weeping and praying for mercy". Macferlen.

"....they brought him, about midnight as a common felon, into the presence of Meer Jaffor, in the very palace which a

few days before been the seat of his own residence and despotic authority. It is said that Jaffer seemed to moved with Compassion..... Seraja Doula prostrated himself and with excessive tremor and tears implored for the life alone": Orme.

বিচলিত মীরজাফর সহ্য করতে পারলেন না এই মর্মান্তিক দৃশ্য। তিনি আদেশ দিলেন, ধৃত নবাবকে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে।

পরের দিন মন্ত্রণাসভা। মীরজাফর অভিমত জানতে চাইলেন তাঁর পাত্র-মিত্রদের কাছ থেকে। কি করা উচিত নবাবকে নিয়ে। একদল চাইলেন, সিরাজকে হত্যা না করে আজীবন কারারুদ্ধ করে রাখা উচিত। আরেক দল, মীরনের নেতৃত্বে, পরামর্শ দিলে, হত্যাই নিরাপদ। মীরজাফর হত্যা চাননি। চেয়েছিলেন আজীবন কারাবাস। এবং সেটাও রাজকীয় সম্মানসহ। 'a humane and even luxurions captivity'.

মন্ত্রণাসভায় কোন স্থির সিদ্ধান্ত হল না। নবাবকে আপাততঃ বন্দী রাখারই নির্দেশ দিলেন মীরজাফর। সেই সঙ্গে আরও একটা আদেশ দিলেন রাজকর্মচারীদের। এই বন্দীর উপর যেন কোনও রকম দৈহিক নির্যাতন না হয়। এবং বন্দীর রক্ষণা-বেক্ষণের ভার তুলে দিলেন পুত্র মীরনের হাতে।

ওয়াটস তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখে গেছেন –

"....he commited that Prince to the custody of his son, recommending to him earnstly in Public....at all events to preserve his life".

জাফরগঞ্জের এক 'অন্ধতমসাচ্ছন্ন নিম্নতল নিভৃত কক্ষে' গোপনে কারারুদ্ধ করে রাখা হল সিরাজকে। মীরনের হাতে তাঁর প্রাণরক্ষার দায়িত্ব। আর মীরন তখন ব্যস্ত, যে-কোন একজন হত্যাকারীর সন্ধানে।

১৭ বছরের ছেলে মীরন ইতিহাসের এক বিচিত্র চরিত্র। তার সাজ-পোষাক, চালচলন, কথাবার্তা সব কিছুই মেয়েলী ধরনের। মুতাক্ষরীণের ভাষায় –

"Meeran dressed like a woman and more over spoke like a woman."

আবার সেই মীরনই নরহত্যায় অসম্ভব পটু। ইতিহাসে তার সম্পর্কে যে তিনটি বিশেষণ সবচেয়ে বেশীবার উচ্চারিত, তা হ'ল 'ferocious, brutal, murderous.' নরহত্যার ব্যাপারে তার নাকি জুড়ি মেলে না মুর্শিদাবাদে। এ বিষয়ে তার জন্মগত প্রতিভা। মীরন যত সহজে হত্যাকারী পেয়ে যাবে ভেবেছিল, তা হল না।

"সিরাজদ্দৌলার নামে ইতিহাসে যত কলঙ্ক স্থানলাভ করিয়াছে, মুরশিদাবাদের লোকে ততদূর জানিত না। তাহারা জানিত, সিরাজদ্দৌলা দেশের রাজা, ফিরিঙ্গীর শত্রু, আলিবর্দীর স্নেহপুত্তলী, সুকুমারকান্তি তরুণ যুবক, যৌবনোন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল, প্রবল প্রতাপান্বিত সুবাদার, সুতরাং তাঁহার বর্তমান দুর্দশা দেখিয়া, লোকে তাঁহার দোষের কথা ভুলিয়া গিয়া, ভাগ্যবিবর্তনের কথা লইয়াই হাহাকার করিতেছিল। এরূপ অবস্থায় সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান মাত্রেই যে তাঁহাকে বধ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।" সিরাজদ্দৌলা।

"When the people beheld him in, this situation, they forgot his vices and recollected only the hardship of his present fortune comparing it with splendour they had seen him surrounded with from his infancy till now. ....He (Miran) ordered Serajadowla to be confined and put to death, but no person of rank would undertake the murder." Scott.

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এল একজন। নাম, মহম্মদী বেগ। ছেলেবেলা থেকে নবাব পরিবারের স্নেহছায়ায় মানুষ। আলীবর্দীর এবং সিরাজের অর্থে প্রতিপালিত। বেগম আলিবর্দী এক অনাথ মুসলমান বালিকাকে মানুষ করেছিলেন নিজের মেয়ের মত করে। সেই মেয়ের সঙ্গেই মহম্মদীর বিয়ে দিয়েছিলেন ভালবেসে, ধনরত্নের প্রচুর উপঢৌকনসহ। সেই মহম্মদী বেগ, সমস্ত অতীত স্মৃতি ভুলে গিয়ে, অন্নদাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা যে পাপ সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, হাতে তুলে নিল উন্মুক্ত খরসান।

"উন্মুক্ত খরসান হস্তে দুর্দান্ত মহম্মদী বেগ কারাকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সিরাজদ্দৌলা উন্মত্তবৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সকল আশা বিলীন হইয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া এক অব্যক্ত আকুল আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সিরাজ আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন— "কে? মহম্মদী বেগ? তুমি! তুমি! তুমিই কি অবশেষে আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ? কেন? কেন? কেন? ইহারা কি আমাকে বহু বিস্তৃত জন্মভূমির নিভৃত নিকেতনে যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিল না?" পরক্ষণেই সিরাজদ্দৌলার তেজস্বী হৃদয়ের আত্মগরিমা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি মহম্মদী বেগের নিকট আর কাতরোক্তি করিলেন না। তাহার মুখের ভীষণ সংকল্পের পাপ-কথায় কর্ণপাত করিলেন না। নিজেই বলিয়া উঠিলেন—

"না, না, আমি বাঁচিতে পারি না। তাহা কদাচ হইতে পারে না। আর

কোন অপরাধে না হউক, হোসেনকুলি! তোমাকে যে নিহত করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্যই এ জীবনের অবসান হউক।"

পরে মহম্মদী বেগের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—

"আইস—রহ, রহ, জল দাও, একবার অন্তিমের দেবতার নিকট এ জীবনের শেষ কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া লই।

"সিরাজদ্দৌলা নিরুদ্বেগে জীবনের শেষ কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারিলেন না। দুরাত্মা মহম্মদী বেগ ভগবানের পবিত্র নামের পুণ্য প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া, সিরাজদ্দৌলার অন্তিম প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতেই, প্রচণ্ড বেগে তাঁহার স্কন্ধে খড়্গাঘাত করিল। নিদারুণ প্রহার যাতনায় মর্মপীড়িত হইয়া সিরাজদ্দৌলা রুধিরাক্ত কলেবরে কক্ষমধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। মহম্মদী বেগ উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার উপর উপর্য্যুপরি খড়্গাঘাত করিতে লাগিল।

"আর না, আর না, আর না হোসেনকুলি! তোমার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

"মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। সিরাজদ্দৌলার অমর আত্মা পাপপূর্ণ পৃথিবীর ক্ষুদ্র কারাকক্ষ অতিক্রম করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিল।" সিরাজদ্দৌলা।

করম আলির মুজাফ্‌ফর নামা থেকে আমরা জানতে পারি আর এক ভিন্ন তথ্য। একা মহম্মদী বেগ হত্যা করতে পারেনি সিরাজকে।

"When he after giving twenty wounds could not finish the work, he sent a Mughal from among his comrades, who with one blow of his dagger ended the life of Siraj."

সিরাজের মৃত্যুদিন নিয়েও ইতিহাসে দুরকমের মত। কেউ মনে করেন তারিখটা ৩ জুলাই। অর্থাৎ যেদিন তাঁকে মুর্শিদাবাদে আনা হয় বন্দী করে, সেই দিনই। অন্য মতে, পরের দিন। পরের দিনই মৃত্যু হওয়াটা সঙ্গত। কারণ বন্দী নবাবকে মুর্শিদাবাদে হাজির করা হল যখন, তখন তো মধ্যরাত। মধ্যরাতেই কি মীরজাফর তাঁর পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে মন্ত্রণায় বসেছিলেন? নিশ্চয়ই না। নিশ্চয়ই পরের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁকে। তা ছাড়া মীরনের হত্যাকারী খুঁজে বেড়ানোর জন্যেও তো সময়ের প্রয়োজন অনেকখানি।

"Seerajah Dowlat is no more." এই শুভসংবাদ জানিয়ে ক্লাইভ কলকাতার সিলেক্ট কমিটির কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার তারিখটা ছিল ৪ জুলাই।

সিরাজের মৃত্যুর সময় ক্লাইভ ছিলেন কোথায়? এ নিয়েও নানা মত। কেউ বলেন তিনি তখন ছিলেন ঐ জাফরগঞ্জেরই প্রাসাদে, কক্ষান্তরে। কেউ বলেন, না। তিনি নবাবের মৃত্যুসংবাদ শুনেছিলেন মীরজাফরের মুখ থেকে। ৩০ জুলাই এই ক্লাইভই সত্য ঘটনার গায়ে হেঁয়ালীর চাদর চাপিয়ে এক চিঠি লিখেছিলেন দিল্লীশ্বর আলমগীর বাদশার কাছে–

"....he (Seraj) was Killed by his servants who followed him to demand their pay".

হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী দৃশ্যগুলো আরো মর্মান্তিক। সিরাজের মৃত্যু সংবাদ রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ল যখন, ঘরে ঘরে হাহাকার। মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল সিরাজ জননী আমিনা বেগমের কানেও। তিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন রাজপথের দিকে। রাজপথে তখন বিদ্রোহীদের শোভাযাত্রা, সিরাজের খণ্ড-বিখণ্ড মৃতদেহটাকে একটা হাতীর পিঠে চাপিয়ে।

"অনন্তর মীরনের আজ্ঞাবহরা নবাবের মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিল এবং অযত্ন ও অবজ্ঞাপূর্বক হস্তিপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিয়া জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া, কবর দিবার নিমিত্ত লইয়া চলিল। ঐ সময়ে সকলে লক্ষ্য করিয়াছিল, কোন কারণ বশতঃ পথের মধ্যে মাহুতের থামিবার আবশ্যক হওয়াতে, আঠারমাস পূর্বে সিরাজদ্দৌলা যে স্থানে হুসেন কুলী খাঁর প্রাণ বধ করিয়াছিলেন, ঐ হস্তী ঠিক সেই স্থানে দণ্ডায়মান হয়। এবং যে ভূভাগে, বিনা অপরাধে তিনি হুসেনের শোনিতপাত করিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানেই তাঁহার খণ্ডিত কলেবর হইতে কতিপয় রুধির বিন্দু নিপতিত হয়।" বিদ্যাসাগর।

"সিরাজের খণ্ড-বিখণ্ডিত দেহ হস্তি পৃষ্ঠে মুর্শিদাবাদের প্রতি রাজপথে ভ্রমণ করাইয়া তাঁহার মাতার রাজভবনের দ্বারে আনীত হয়। স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় সিরাজের মাতা এই মহাবিপ্লবের কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি চারিদিকে গোলযোগ শুনিয়া, কারণানুসন্ধানে সমস্ত জানিতে পারিলেন। তখন তিনি আপনার অবস্থা বিস্মৃত হইয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচনপূর্ব্বক দ্রুতপদে রাজপথে উপস্থিত হইলেন। যাঁহার সকল সময় সূর্যের আলোক দেখা ঘটিয়া উঠিত না, পুত্রের শোচনীয় পরিণাম শ্রবণে, তিনি রাজপথে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর হস্তিপৃষ্ঠ হইতে মৃতদেহ নামাইয়া, পুনঃ পুনঃ চুম্বনপূর্বক, তাহার উপর বক্ষ-বিস্তার করিয়া শায়িত হইয়া পড়িলেন। এবং অনবরত নিজ বক্ষে ও মুখে আঘাত করিতে লাগিলেন।" মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

পাশের বাড়ির এক ওমরাহ এই সময় ছুটে এলেন তাঁর লোকজন নিয়ে।

তাঁরাই ধরাধরি করে আমিনা বেগমকে নিয়ে গেলেন অন্তঃপুরে। এরপর মীরনের অনুচরেরা কি করেছিল? সিরাজের মৃতদেহকে কবর দিয়েছিল কি? না। তারা নাকি বাজারের চকের মধ্যে হাতির পিঠ থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল সিরাজের কাটা-ছেঁড়া মাংসপিণ্ডগুলো। কেউ এগিয়ে আসেনি সেই শবখণ্ডের উপর একটা কিছু আবরণ চাপিয়ে দিতে। এসেছিলেন শুধু একজন। তিনিও একজন ওমরাহ। নাম, মীর্জা জৈন-উল-আবেদীন। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে, কফিন এনে মৃতদেহটাকে তিনিই তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন খোশবাগের কবরখানায়। কবর দিয়েছিলেন প্রিয়তম দাদুর সমাধির পাশে।

"আলীবর্দী খাঁ প্রথমে এই খোসবাগের সৃষ্টি করেন। প্রথমে তাঁহার জননী খোসবাগে সমাহিতা হইয়াছিলেন। আলিবর্দী ভাণ্ডারদহ ও নবাবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের আয় হইতে এই সমাধিভবনের ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক ৩৫০ টাকা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সিরাজের মৃত্যুর পর লুৎফ উন্নেসার প্রতি খোসবাগের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়।

"কিছুকাল ঢাকা বাসের পর লুৎফ উন্নেসা ইংরাজদিগের যত্নে মুর্শিদাবাদে পুনরানীতা হইয়া নবাব আলিবর্দী ও সিরাজের সমাধি খোসবাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। উক্ত তত্ত্বাবধানের জন্য মাসিক ৩৫০ টাকা নির্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন তিনি ১০০ টাকা বৃত্তি পাইতেন।...সেই সময়ে তাঁহার শোচনীয় অবস্থায় কথা স্মরণ করিলে পাষাণেরও হৃদয় বিগলিত হয়। তাঁহার প্রিয়তম স্বামী এক্ষণে ধরণীগর্ভে শায়িত, অন্যান্য আত্মীয় স্বজনও একে একে অনন্তপথে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি এই বিশাল বিশ্বে একাকিনী। একটি মাত্র বালিকা অবলম্বন। এইরূপ অবস্থায় তিনি প্রতিদিন স্বামীর সমাধিপূজা করিতে আসিতেন। রৌপ্য ও স্বর্ণময় পুষ্পখচিত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রদ্বারা সে-সমাধি আচ্ছাদিত ছিল। তিনি তথায় প্রতি নিয়ত দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেন। এবং উদ্যানের সুগন্ধী কুসুম সকল চয়ন করিয়া অশ্রুজলসিক্ত সেই কুসুমরাশি প্রিয় পতির সমাধির উপর নিক্ষেপ করিতেন। সেই সময়ে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে তিনি ভূতলশায়িনী হইয়া পড়িতেন এবং অশেষ প্রকার করুণাদ্দীপক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শোকভার লাঘব করিতে চেষ্টা পাইতেন। এইরূপে স্বামীর সমাধি-পূজা করিতে করিতে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে, লুৎফ উন্নেসা স্বামীর চরণে মনোনিবেশ করিয়া, তাঁহারই পদতলে চিরদিনের জন্য সমাহিত হইলেন।" মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

স্বামীর মৃত্যুর পর ৩৩ বছর বেঁচে ছিলেন এই দুর্ভাগা রমণী। ১৭৯০-এর

নভেম্বরে মৃত্যু। সিরাজের মৃত্যুর পর মীরন, লুৎফার কাছে পেশ করেছিল বিয়ের প্রস্তাব। লুৎফা তাকে উত্তর দিয়েছিল অপূর্ব।

"যে চিরকাল হাতির পিঠে চেপে এসেছে, সে কখনো গাধার পিঠে চাপতে পারে ?"

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর কবিতায় সিরাজের মৃত্যুকালীন ঘটনার বিবরণ—

"মহম্মদী বেগ যবে হয়ে আগুয়ান
হরণ করিয়াছিল সিরাজের প্রাণ
তখন কে কোথা গেল পরিজন তাঁর
বুক ফেটে যায় যদি শুন একবার।
'আমিনা' সিরাজ মাতা পরম রূপসী
'ঘেসেটি' বেগম সেই সিরাজের মাসী
মীরণের আজ্ঞা লয়ে দুরন্ত বখর
ডুবাইল দুইজনে পদ্মার ভিতর।
সিরাজের যত সব বেগম আছিল
এক এক ওমরার গৃহিণী হইল।
'লুৎফ উন্নিসার' মত না ছিল রূপসী
চিরদিন সিরাজের প্রেয়সী মহিষী।
"কার ঘরে গিয়া ঘর করিলে এখন
সিরাজ মহিষি! রবে তুষ্ট তব মন ?"
মীরণ যখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল
সিরাজ মহিষী এই কথাটি বলিল
"করি পৃষ্ঠে চিরদিন বিরাজ যাঁহার
গর্দভের পৃষ্ঠে রুচি হয় কি তাঁহার ?"
তিনি ও তাঁহার শিশু কন্যা কষ্ট সয়ে
রহিলেন ইংরাজের বৃত্তিভোগী হয়ে।"

সিরাজের মৃত্যুদিন তবু অনুমান করা যায়। কিন্তু মৃত্যুর সময় ? তার সঠিক উল্লেখ নেই কোনখানে। কৃষ্ণকান্তের এক কবিতায় শুধু উল্লেখ রয়েছে বৃহস্পতিবার বারবেলা।

"প্রসিদ্ধ পলাশী ধাম প্রসিদ্ধ পলাশী ধাম
ধরাধামে কে না তার নাহি জানে নাম।

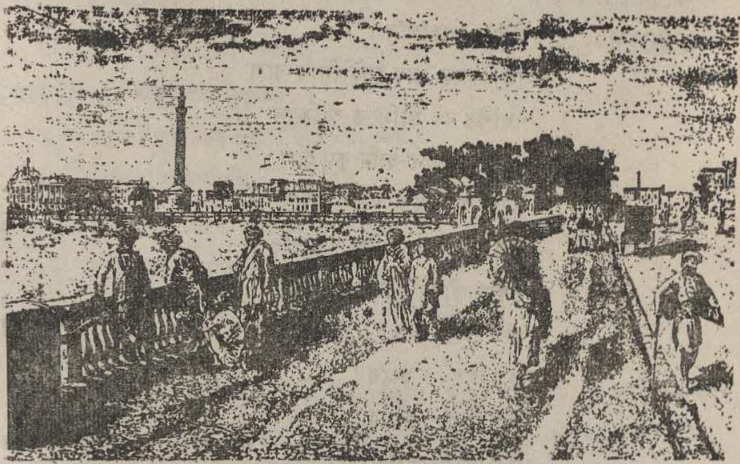
সিরাজের যত গর্ব সিরাজের যত গর্ব
করিলা ইংরাজ-রাজ আজি তাহা খর্ব।
জয় ইংরাজের জয়, জয় ইংরাজের জয়
ক্লাইভের নাম আজ ভারতে অক্ষয়।
হিন্দু অবলার জাতি হিন্দু অবলার জাতি
অত্যাচার হতে আজ পাইলা নিষ্কৃতি।
তুমি পলাশীর পতি তুমি পলাশীর পতি
তাই কৃষ্ণচন্দ্র! এই তোমার সুখ্যাতি।
করি ক্লাইভ সম্মান করি ক্লাইভ সম্মান
পলাশীর যুদ্ধে দিলো পাঁচটি কামান।
বৃহস্পতি বার-বেলা বৃহস্পতি বার-বেলা
ফুরাইল সিরাজের যত লীলা খেলা।"

সিরাজের শেষ। তার কিছুদিন পরেই শেষ হলেন সিরাজ জননী এবং ঘসেটি বেগম। মীরনের নির্দেশে তাঁদের ডুবিয়ে মারা হল পদ্মার জলে। মীরনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তাঁরা। বজ্রাঘাতে মৃত্যু হবে তোর। তাই হয়েছিল।

পলাশীর যুদ্ধের কোনও নায়কই শেষ পর্যন্ত সুস্থ জীবনের অধিকারী হতে পারলেন না। ইতিহাসের এ এক অপূর্ব কৌতুক। উমিচাঁদ হলেন উন্মাদ। ক্লাইভ করলেন আত্মহত্যা। ওয়াটসন মারা গেলেন কলেরায়। পলাশীর মাত্র দুমাস পরে। স্ক্রাফটন মরলেন জাহাজডুবি হয়ে। ওয়াটস কলকাতা থেকে পালিয়ে গেলেন বিলেতে। নন্দকুমারের হল ফাঁসী।

দুর্লভরাম মীরজাফরের ষড়যন্ত্র আর মীরনের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায়, কোনমতে ইংরেজদের দয়ায় দিন কাটাতে লাগলেন কলকাতায়। মীরজাফরের মৃত্যু হল কুষ্ঠব্যাধিতে ভুগে, সকলের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে। মীরন মরল বজ্রাঘাতে।

সিরাজের হত্যার পর ইতিহাসে শুরু হল অন্য এক পর্বান্তর।



॥ ক্লাইভের কলকাতা ॥

১৭৫৭। ৬ জুলাই।

ভাগিরথীর বুকে ঢেউয়ের নাচ। ঢেউয়ের উপরে নৌকোর নাচ। একটা-আধটা, দুটো-দশটা নৌকো নয়। শয়ে শয়ে। ইতিহাস বলে, দুশো। নদীতে নৌকোর ঝাঁক। আর তারই সঙ্গে ডাঙাতেও চলেছে সৈন্য-সামন্তের ঝাঁক, ফ্ল্যাগ উড়িয়ে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে, নৌকোগুলো পাহারা দিতে দিতে। কি আছে নৌকোয়? নৌকোয় আছে লুটের মাল। মুর্শিদাবাদের লুটের মাল নৌকো বোঝাই হয়ে চলেছে কলকাতায়।

পথের দুধারে জনতা। তার মধ্যে রয়েছে চুঁচড়ো-চন্দননগরের ডাচ আর ফরাসীরা। তাদের চোখে ভেসে ওঠে এক বছর আগেকার একটা দৃশ্য। কলকাতা লুট করে নবাব সিরাজদ্দৌলা এমনি করেই বুক ফুলিয়ে, বাজনা বাজিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের দিকে। ইতিহাসের চাকা এখন উল্টো দিকে ঘুরছে।

মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় এসে পৌছলেন ক্লাইভ। টাকার নৌকো কলকাতার ঘাটে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তুমুল উৎসব। কলকাতাকে যেন আর চেনা যায় না। হাসিতে-খুশীতে ডগোমগো হয়ে উঠল ইংরেজরা। পিপে পিপে মদ গিলতে লাগল এক একজন সৈন্য। তারপর মাটির উপরে লুটোপুটি।

কী বিদেশী কী স্বদেশী সকলের মুখেই তখন ক্লাইভের জয়-জয়কার। হাতে মদের পেয়ালা। মুখে উন্মাদ জয়োল্লাস।

"জিনিয়াছে সবে যেই সিংহ বলে
পলাশীর রণ হাসিতে হাসিতে
গাও জয় তার-ধ্বনি কুতূহলে
উঠুক আকাশে ভূতল হইতে!
ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল আরবার
সুদীর্ঘ জীবন হউক তাহার!
পান করো সুখে! গাও তিনবার;
হিপ্ হিপ্,—হুররে!
হিপ্ হিপ্—হুররে!
হিপ্ হিপ্,—হুররে!"

আমোদে-প্রমোদে, মরা-কলকাতায় আবার ভরা প্রাণের জোয়ার। এত আনন্দ-উৎসবের মধ্যেও ক্লাইভের মন কিন্তু পড়ে আছে মুর্শিদাবাদে। ইংরেজদের পাওনা-গণ্ডার টাকাটা মিটিয়ে দিতে মীরজাফর অযথা দেরী করবে নাকি? কলকাতায় বসেই ঘন ঘন তাগাদা পাঠাচ্ছেন মুর্শিদাবাদে, আমাদের টাকাটা কই? সিংহাসনে বসে মীরজাফরের মাথায় হাত। ভেবেছিলাম রাজকোষে বুঝি অফুরন্ত ধনরত্ন। কিন্তু ঘাঁটতে গিয়ে টের পেলেন, কলসীর তলায় মস্ত বড় ফুটো। কবে কবে জল গলে গলে এখন শুধু তলানিটাই সার।

"মুর্শিদকুলী খাঁর সযত্নসঞ্চিত রাজভাণ্ডারের অধিকাংশ সুজা খাঁর বিলাসীতায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। আলীবর্দী খাঁর সিংহাসন অধিকারের সময়ে বাদশাহী পেষকস্ ও দিল্লী দরবারের উপহার-উপচারে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। বর্গীর হাঙ্গামায় দেশ উৎপন্ন না হইলে, সুদক্ষ আলিবর্দীর সুশাসনে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় হইয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। তিন বর্ষ মাত্র মারাট্টা হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া তিনি যাহা কিছু রাখিয়া যান, সিরাজুদ্দৌলার তাহাই প্রথম সম্বল; পরে ঘসেটি বেগমের অর্থ হস্তগত হয়। চপলমতি সিরাজ তাঁহার সামান্য রাজ্যকালের আরম্ভ হইতে প্রকাণ্ড সৈন্যদলের যুদ্ধযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার অযথা বিলাসিতা ছিল; শেষ দিনে কল্পতরু হইয়াও যথেষ্ট অর্থের অপচয় করিয়া যান। প্রভূত অর্থপ্রাপ্তি হইবে ভাবিয়াই, মীরজাফর ইংরেজ ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিদিগকে প্রকাশ্যে ও গোপনে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজকোষের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়া

মীরজাফর যেরূপ হতবুদ্ধি হইলেন, ইংরেজপক্ষও সেই পরিমাণে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হইয়াছিলেন।" —বাঙ্গলার ইতিহাস।

রাজকোষে তখন কী পরিমাণ ঐশ্বর্য তার একটা হিসেব দিয়েছিলেন মুতাক্ষরীণ-এর অনুবাদক মুস্তাফা।

১। রৌপ্য মুদ্রা এক কোটী ছিয়াত্তর লক্ষ।

২। স্বর্ণমুদ্রা বত্রিশ লক্ষ।

৩। সোনার পাত দু' সিন্দুক।

৪। মণিমুক্তোর অলঙ্কার চার সিন্দুক।

৫। হীরে জহরৎ ছোট মাপের সিন্দুকের দু' সিন্দুক।

মুস্তাফার বক্তব্য—

"পরবর্ষে কর্ণেল ক্লাইবের দোভাষী স্বরূপ আমি তাঁহার নিকটে কার্য করিয়াছিলাম; সেক্রেটারী ওয়ালসের মুখে শুনিয়াছি, তিনি, ওয়াটস, লুসিংটন, দেওয়ান রামচাঁদ ও মুন্সী নবকৃষ্ণ, ইহারাই ধনাগারে গিয়াছিলেন। ওয়ালসের নিকটেই উক্তরূপ অর্থের কথা শুনিয়াছি। এটি বাহিরের ধনাগার। পুরমধ্যে যে গুপ্ত ধনাগার ছিল, ইংরেজপক্ষ তাহার কিছুই সন্ধান পান নাই। বেগম মহলের এই কোষাগারে আট কোটী টাকা ছিল, বাঙ্গালীরা সাহেবদিগকে ইহার বাষ্পমাত্র জানিতে দেয় নাই। মীরজাফর ও উমরবেগ রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণকে এই অর্থের অংশ দিয়া তাহাদের মুখবন্ধ করিয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন, ইহারা ক্লাইবের অংশই কুক্ষিগত করেন।"

"বাঙ্গলার ইতিহাস এর"-লেখক মুস্তাফার সব কথার সঙ্গে একমত নন। তাঁর কাছে গুপ্ত রাজকোষের কাহিনীটি অলীক কিন্তু তা সত্বেও দেওয়ান রামচাঁদ বা মুন্সী নবকৃষ্ণের গোপন অর্থপ্রাপ্তির সংবাদটি সম্বন্ধে তিনি একমত।

"রাজা রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ যে এই বিপ্লবের অবকাশে প্রচুর অর্থলাভ করেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। রামচাঁদ কোম্পানীর মুন্সি বা দেওয়ান স্বরূপে মাসে ৬১ টাকা বেতন পাইতেন। মুস্তাফা লিখিয়াছেন, তিনি মৃত্যুকালে নগদ ও কাগজে ৭২ লক্ষ টাকা, মণিমুক্তার ২০ লক্ষ, ১৮ লক্ষ টাকার জমিদারী, চারশত কলসী, তন্মধ্যে ৮০টি স্বর্ণনির্মিত ও অন্যগুলি রৌপ্যের মোট সওয়াকোটী টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। দশবর্ষ মাত্র পরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। রাজা নবকৃষ্ণ ঐ ৬০ টাকা বেতনের কার্য করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন; শোভাবাজারের বিখ্যাত বংশের প্রধান ভূসম্পত্তিও বংশ প্রতিষ্ঠাতার উপার্জিত অর্থে।"

এবার তাকানো যাক, ইংরেজপক্ষের হর্তাকর্তাদের প্রাপ্তিযোগের দিকে। ১৭৭২ এ কমন্‌স সভার কমিটির দেওয়া হিসেবটা হল এই রকম—

১। গভর্ণর ড্রেক— ২৮০০০০

২। কর্ণেল ক্লাইভ— মেম্বার হিসেবে ২৮০০০০

সেনাপতি হিসেবে ২০০০০০

বিশিষ্ট দান হিসেবে ১৬০০০০০

৩। ওয়াটস— মেম্বার হিসেবে ২৪০০০০

বিশিষ্ট দান হিসেবে ৮০০০০০

৪। মেজর কিলপ্যাট্রিক— ২৪০০০০

অতিরিক্ত— ৩০০০০০

৫। ম্যানিংহাম— ২৪০০০০

৬। বিচার— ২৪০০০০

৭। কাউন্সিলের ৬জন সভ্য— ৬০০১০০

৮। ওয়ালস— ৫০ ০০০

৯। ক্লাফটন— ২০০০০০

১০। লুসিংটন— ৫০০০।

উপরের হিসেবটা অবশ্য সব ইতিহাসে এক রকম নয়। নানা বইয়ে নানান রকমফের।

এই বিপুল অর্থ প্রাপ্তির ১৫ বছর পরে পার্লামেন্টে সাক্ষী দেবার সময় ক্লাইভ জানিয়ে দিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে অর্থ-আত্মসাৎ-এর অভিযোগটা মিথ্যে।

"মীরজাফরের নিকট এইরূপ অর্থগ্রহণ অন্যায় কার্য বলিয়া মনে করি না। ইহাতে প্রভু কোম্পানীর কোন ক্ষতি হয় নাই। আমরা কিছুমাত্র না পাইলেও কোম্পানীর লাভ ছিল না। আমি স্বয়ং বাণিজ্যাদি ব্যাপারে অর্থসঞ্চয়ের উদ্যোগ না করিয়া চিরদিন যুদ্ধকার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম; কোম্পানীর স্বত্ব ও সম্মান রক্ষাই জীবনের ব্রত ছিল। তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের অনেকেই আমাকে অর্থোপহার দানে উদ্যত ছিলেন, গ্রহণ করিলে আমি এক্ষণে কোটীশ্বর হইতে পারিতাম।...মুর্শিদাবাদ-কোষাগারে প্রবেশ করিয়া চতুর্দিকে যে রাশি রাশি স্বর্ণরৌপ্য ও মণিমুক্তা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইলে, আমি এই সামান্য পরিমাণ অর্থগ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, ইহা আমারই বিশেষ আশ্চর্য বোধ হয়।"

পলাশী যুদ্ধের উত্তেজনা-পর্ব থিতিয়ে এলে, ক্লাইভ মন দিলেন কলকাতার

দিকে। প্রথমেই বদলে গেল নাম। সিরাজদ্দৌলার হাতে পড়ে হয়েছিল আলিপুর। আবার হয়ে গেল কলকাতা। অসুখ-বিসুখ, কালাজ্বর তখন যেন এঁটে আছে কলকাতার গায়ে। আর তারই পরিণামে মড়ক।

আইভস সাহেব হলেন ওয়াটসনের নৌবহরের "কেন্ট" নামে জাহাজের চিকিৎসক। কলকাতার এই সময়কার অসুখ-বিসুখের তথ্য জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন—

১৭৫৭-র ফেব্রুয়ারী থেকে আগস্ট এই সাত মাসের মধ্যে ১১৫০ জন ইংরেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল চিকিৎসার জন্যে। অসুখগুলো হল, স্কার্ভি, পিত্তশূল, পিত্তজ্বর। এর মধ্যে মারা যায় ৫২ জন। আগস্ট থেকে নভেম্বর এই চার মাসের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা ৭১৭। এদের মধ্যে মারা যায় ১০১ জন। আর একশো একের মধ্যে প্রধানতম একজন হলেন ওয়াটসন। সেন্ট জন গীর্জার প্রাঙ্গণে সমাধি দেওয়া হয় তাঁকে।

ওয়াটসনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ক্লাইভ শোক জানিয়েছিলেন এই বলে—"ওয়াটসন আর ইহলোকে নাই, আমরা তাঁহার এই শোচনীয় অকাল-মৃত্যুতে সকলেই ব্যথিত ও সন্তপ্ত হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ প্রকৃতির লোক অতি দুর্লভ। কোম্পানীর কার্যসাধনে, তিনি জীবন-ব্যাপী চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। হায় ভাগ্য! পলাশীর সঙ্কটময় যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, শেষে কিনা তিনি এইরূপে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন? তাঁহার বীরকীর্তি, তাঁহার গৌরবময় বিজয়কাহিনীর পূর্ণ ফল উপভোগ করিতে পারিলেন না। এই প্রকার মৃত্যুই আমাদিগের মনে মনুষ্যের নশ্বর জীবনের স্মৃতি পরিস্ফুট করিয়া দেয়।"

কলকাতার মরা শরীরে রক্তের স্রোত ফিরিয়ে আনতে হবে আবার। কিন্তু কি ভাবে? ক্লাইভ স্থির করলেন তিনটে উপায়। পঞ্চাশ হাজারের মত কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে মুসলমান আক্রমণের ভয়ে। তাদের ফিরিয়ে আনবে। ফিরিয়ে আনতে হবে পলাতক তাঁতীদের। নতুন লোকেরাও যাতে কলকাতায় এসে বসবাসের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সিরাজের আক্রমণের সময় যাঁরা কলকাতা ছেড়ে পালায়নি, অথবা সাহায্য করেনি নবাবকে, তাদের জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে ক্ষতিপূরণের। আর বন-জঙ্গল বেশ কিছুটা সাফ করতে হবে কেটে-ছেঁটে। জঙ্গলের ফলেই শহরের মাটি এমন স্যাতসেঁতে। তার ফলেই পাক্কা ফিভারের এমন ছড়াছড়ি। রোদ লাগাতে হবে কলকাতার ভিজে গায়ে। ক'দিন বাদেই ঢোল-সহরতে কলকাতার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল কোম্পানীর হুকুম।

"সহরের মধ্যেও আশে পাশে বড় গাছগুলি কাটাইয়া, কলিকাতাকে রৌদ্র ও বায়ুপূর্ণ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, আমাদের অধিকারের মধ্যে যাহারা বসবাস করিতেছে, তাহারা নিজ ব্যয়ে স্ব স্ব দখলী জমির, বাগানের ও পতিত-ভূমির জঙ্গল কাটাইয়া লইবে। কমলালেবু ও অন্যান্য ফলের গাছগুলি কেবল তাহারা কাটিতে পারিবে না। যাহারা নিজ ব্যয়ে জঙ্গল কাটাইবে, তাহারা কর্তিত বৃক্ষাদির স্বত্বাধিকারী হইবে। কোম্পানী এসব বৃক্ষ সম্বন্ধে কোনরূপ দাবী দাওয়া করিবেন না।"

ক্ষতিপূরণের জন্যে তৈরী হল কমিশন। ১৪ জন সদস্য। গোবিন্দরাম মিত্র, শোভারাম বসাক, রতন সরকার, নয়নচাঁদ মল্লিক, নীলমণি মিত্র, দুর্গারাম দত্ত, মহম্মদ সাদেক, রঘুনাথ মিত্র, আলিজান ভাই, শুকদেব মল্লিক, দয়ারাম বসু, হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, রামসন্তোষ, আইনুদ্দীন। ক্ষতিপূরণের টাকা বিলির ভার পড়ে দুজন লোকের উপর। গোবিন্দরাম মিত্র আর শোভারাম বসাক। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণকে কেন্দ্র করে এক কেচ্ছার নাটক ঘটে গেল কলকাতার রঙ্গমঞ্চে। ক্ষতিপূরণের টাকাগুলো যাতে নিজেরাই আত্মসাৎ করতে পারেন, তার জন্যে এক বিচিত্র বিবরণ তৈরী করলেন কর্মকর্তারা। এর মধ্যে ইংরেজদের কোন হাত ছিল না। সবটাই বাঙ্গালী বাবুদের কীর্তি।

এবার দেখা যাক, ক্ষতিপূরণ বাবদ কে কত টাকা চেয়েছিলেন আর পেয়েছিলেন।

১। গোবিন্দরাম আর রঘুনাথ মিত্র চেয়েছিলেন ৪১২৬৮০।/০। পেয়েছিলেন ৩৭৬৮০।/০।

২। শোভারাম বসাক, ৪৪১২৭৮॥/০। পেয়েছিলেন ৬৬২৭৮॥/০।

৩। আলিজান ভাই ৩৪৪৫৭। পেয়েছিলেন ১৭৪৫৭।

৪। রতন সরকার ১৮০৩২২৶০। পেয়েছিলেন ৪০৩২২৶০।

৫। শুকদেব মল্লিক ৫০৯৪২॥০। পেয়েছিলেন ১০৯৪২॥০।

৬। নয়নচাঁদ মল্লিক ৪৩৯২২। পেয়েছিলেন ৫৯২২।

৭। দয়ারাম বসু ৫১৩৫। পেয়েছিলেন ১১৫৩৸৶০।

৮। নীলমণি মিত্র ২৮১১৩। পেয়েছিলেন ১০১১৩৸৶০।

৯। হরেকৃষ্ণ ঠাকুর ১৩৭৮৮৶০। পেয়েছিলেন ৩৭৮৮৶০।

১০। দুর্গারাম দত্ত ৬৪৭। পেয়েছিলেন ১০০।

১১। রামসন্তোষ ৬৪১০। পেয়েছিলেন ৯১০।

১২। মহম্মদ সাদেক ২৭১৬। পেয়েছিলেন ১ টাকা মাত্র।

১৩। আইনুদ্দিনই একমাত্র যিনি কিছু চাননি।

ক্ষতিপূরণের চাহিদার অঙ্ক দেখে কোম্পানীর গোড়াতেই সন্দেহ হয়েছিল, এসব হিসেব বানানো! ধরা যাক গোবিন্দরাম মিত্রের কথা। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময় কোম্পানীর সিপাইরাই পাহারা দিয়েছিল তাঁর ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পত্তি। তাহলে এত টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী আসে কেন? এই সন্দেহ থেকেই কোম্পানী কেটে ছোট করে দিয়েছিলেন দাবীর বহর। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন দুজন। প্রথমজন শোভারাম বসাক। চিরকালই তিনি 'মারী তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার' মেজাজের মানুষ। হিসেবের গণ্ডগোল, জাল সই এই সব ফন্দি-ফিকির এঁটে কোম্পানীর টাকা দুবেলা আলো-বাতাসের মত গিলতেন তিনি। ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক্ষেত্রেও সবচেয়ে বেশী টাকাটা জুটেছিল তাঁরই বরাতে। দ্বিতীয়জন হলেন মহম্মদ সাদেক। তদন্ত করে যখন দেখা গেল, ভদ্রলোকের কানাকড়িও ক্ষতি হয়নি, তখন নিতান্ত সম্মান রক্ষের জন্যেই একটা টাকা দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। সবচেয়ে কম টাকাটা জুটল তাঁর বরাতে।

ক্ষতিপূরণ কেচ্ছার কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। আরো আছে। কমিশনের কর্তারা শুধু নিজেদের ক্ষতিপূরণ চেয়েই থেমে থাকেননি। আরেক দফা লম্বা ফর্দ পেশ করেছিলেন, নিজেদের আত্মীয় অথবা আশ্রিতজনদের ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব-সহ। এই তালিকার দিকে এক প্রস্থ নজর বুলোলেই পাঠকের চোখে অনেক রহস্য জেগে যাবেন আপনা-আপনিই।

১। চৈতন দাস। তিনি কে? রতন সরকারের আশ্রিত। ক্ষতি হয়েছে কত টাকা? ১৭০২ টাকা। কোম্পানী সেটাকে কেটে করে দিলে মাত্র ৩০২।

২। দুর্লভ লক্ষ্মী, কানতনরী আর চরণ বসাক। এরা হলেন শোভারাম বসাকের আশ্রিত। চেয়েছিলেন ৮২৩৩৷৶০। পেলেন ১২৩৩৷৶০।

৩। কুড়রাম বিশ্বাস। গোবিন্দরাম মিত্রের কুলী সর্দার। ৫৯৮৩৷০। পেলেন ১৯৮৩৷০।

৪। গণেশ বোস। কমিটির একজন কেরাণী। ১৫১৭/০। পেলেন ৩১৭/০।

৫। রামদেব মিত্র। ইনি নাকি গোবিন্দরামের সম্পর্কের আত্মীয়। যদিও মারা গেছেন দশ বছর আগে, ১৯৪৭-এ। দাবী ৭৩১৩৷০। পেলেন ১৩১৩৷০।

৬। শুকদেব মিত্র। মারা গেছেন চার বছর আগে। ২৩৮০৷০। পেলেন ৩৮০।

৭। রতন, ললিতা, মতিবেওয়া। এঁরা কারা ? এঁরা গোবিন্দরাম মিত্রের গণিকা। এঁদেরও ক্ষতি হয়েছে। কত? রতনের ৩১৫২৷৷০। পেলেন ১৫২৷৷০। ললিতার ২৪১৯৷৵০। পেলেন ৪১৯৷৵০। মতিবেওয়ার ৩৫৭৭৸০। পেলেন ৫৭৭৸০।

৮। রাজারাম পালিত। শোভারাম বসাকের আশ্রিত। ৪২১৫৸০। পেলেন ১০১৫৸৵।

৯। দুর্গারাম, বিন্দু, গঙ্গা। গোবিন্দরামের অনুগৃহীত ব্যক্তি। ৩০৯১। পেয়েছিলেন ৫১৯।

১০। দুর্গারাম শর্মা। গোবিন্দরামের অনুগৃহীত। ৫৩২৸৶০। পেয়েছিলেন ১৩২৸৶০।

১১। নীলমণি চন্দ্র। গোবিন্দরামের অনুগৃহীত। ৭১০৷৵। পেয়েছিলেন ১৬০৷০।

১২। হরিরাম ঘোষ। গোবিন্দরামের অনুগৃহীত। ৩৯০৷৷০ পেয়েছিলেন ৯০৷৷০।

১৩। রামচরণ সরকার। কমিটির কেরাণী। ৬৪৬। পেয়েছিলেন ৯৬।

১৪। লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ। গোবিন্দরামের অনুগৃহীত। ৩১৮৷৷৵০। পেয়েছিলেন ৯৬।

১৫। নয়নদাস ধোপা। রতন সরকারের অনুগৃহীত। ১৬৬৭৷/১। পেয়েছিলেন ৪৬৭৷/০।

১৬। গঙ্গাদত্ত পাত্র। শোভারামের আশ্রিত। ২৫১৵০। পেয়েছিলেন ৫১৩৵০।

১৭। বৃন্দাবন ও ফুলচাঁদ। রতু সরকারের আশ্রিত। ১২৯৫৷০। পেয়েছিলেন ২৮৯৫৷০।

১৮। গোপীরাম বসাক। শোভারামের আশ্রিত। ৪০৫৬৷৵০। পেয়েছিলেন ১০৫৬৷৵০।

১৯। রানাকিশোর চক্রবর্তী। গোবিন্দরামের আশ্রিত। ১৪২১। পেয়েছিলেন ৪২১।

২০। রাধাকান্ত রায়। নীলমণি মিত্রের লোক। ৮৭৬৸০। পেয়েছিলেন ১৭৬৸০।

২১। রামশঙ্কর সরকার। রামসন্তোষের আশ্রিত। ১১৪০৷০ পেয়েছিলেন ২৪০৷০।

২২। ব্রজকিশোর শিরোমণি। নীলমণি মিত্রের আশ্রিত। ২১৯৮।০। পেয়েছিলেন ৬৯৮।০।

কলকাতায় আবার তাঁতীদের ফিরিয়ে আনার জন্যে কোম্পানীর কাছে নির্দেশ এল বিলেতের কোর্ট অব ডাইরেকটরদের কাছ থেকে। তারিখ ১৭৫৮-র ৩ মার্চ।

"কোম্পানীর গোমস্তাগণ তন্তুবায়দিগকে ইতিপূর্বে যে-ভাবে দাদানির টাকা দিয়া আসিয়াছে—আমাদের মতে তাহাই সমীচিন। উপস্থিত সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। যাহাতে তন্তুবায়গণ বর্তমান অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করে, তজ্জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের পার্শ্ববাহিনী নদীর দুই কূলে, কলিকাতা সহরের মধ্যে এবং আমরা কলিকাতার পার্শ্ববর্তী যে আটত্রিশখানি গ্রামের দখলীস্বত্ব পাইয়াছি, তাহার মধ্যে তন্তুবায়গণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কাশীজোড়া, শান্তিপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে চেষ্টা করিয়া ইহাদের কলিকাতায় আনানো উচিত।"

কলিকাতার তাঁতীদের এতখানি খাতির করার পিছনে আসল কারণটা হল, ব্যবসা। ইউরোপ-এশিয়ার হাটে-বাজারে-বন্দরে বাংলাদেশের আড়ং আর মসলিন কাপড় বেচে কোম্পানী মুনাফা লুটেছে প্রচুর। সুতরাং এমন সোনার সুযোগকে কি হাতছাড়া করতে চায় কেউ? ইতিহাস বলে, কার্পাসের বস্ত্রই ছিল ইংরেজদের ভাগ্যলক্ষ্মী।

পলাশীর পর, ইংরেজদের ডাকে সাড়া দিয়ে আবার যে লোকজন কলকাতায় ফিরতে লাগল তার প্রমাণ একটি আবেদন পত্র বা দরখাস্ত। আবেদনকারীরা হলেন কলকাতার কয়েকজন ব্যবসায়ী। এঁদের মধ্যে দুজন হলেন গঙ্গারাম ঠাকুর আর নকুড় সরকার। ছিল চাল-ডালের ব্যবসা। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের আগে এঁরা কোম্পানীকে বেচে ছিলেন বেশ কয়েক বস্তা চাল ও অন্যান্য জিনিষপত্র। ইতিমধ্যে সিরাজ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কলকাতার দিকে আসছেন—খবর পেয়ে পালিয়েছিলেন কলকাতা ছেড়ে। ফিরে আসেন পলাশীর যুদ্ধের পর। কারণ কোম্পানীর কার্যসভার বিবরণীতে এঁদের প্রসঙ্গ উঠেছে। ১৭৫৭-র ১৭ নভেম্বর। এঁরা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন কাউন্সিলের সেক্রেটারীর নামে।

"অনারেবল রজার ড্রেক সাহেব মহোদয় ও তদধীনস্থ কৌন্সিল বরাবরেষু,

কলিকাতার ব্যবসায়ী গঙ্গারাম ঠাকুর ও নকুড় সরকারের বিনীত দরখাস্ত এই—আমরা অতি সম্মানের সহিত জানাইতেছি, গত জুন মাসে (১৭৫৬) নবাব

যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে কোম্পানীর ব্যবহারের জন্য আমরা চাউল ও অনেকগুলি বস্তা বক্সীখানায় পাঠাইয়াছিলাম। আমরা আশা করি চাউল ও বস্তা প্রভৃতির মূল্যদানে আদেশ দিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। আমরা কলিকাতার জমীদার সাহেবের মুখে শুনিলাম, অন্যান্য ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণ তাহাদের প্রাপ্য চুকাইয়া পাইয়াছে। আমাদের দরখাস্ত করিতে বিলম্ব হইয়াছে— কারণ নবাবের আক্রমণ সময়ে আমরা কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়া যাই ও সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছি। আমরা প্রথমত সেক্রেটারী সাহেবের নিকট এই পাওনা টাকার জন্য দরখাস্ত করি। কিন্তু তিনি আমাদের জানাইয়াছেন —পূর্বোক্ত দোকানদারগণের প্রাপ্য চুকাইয়া দিবার পর আপনারা আদেশ করিয়াছেন, আর কাহাকেও প্রাপ্য টাকা দেওয়া হইবে না। আমরা যেদিন কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছি, তাহার দুই একদিন পূর্বে আপনাদের এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। আমরা গরীব লোক—অর্থাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। এজন্য প্রার্থনা, আমাদের প্রাপ্য টাকাগুলি প্রদান করিবার হুকুমদানে বাধিত করিতে আজ্ঞা হয়। এ দানের কথা আমরা চিরদিন স্মরণে রাখিব।”

ক্লাইভের নজর শুধু শহরের লোক বাড়ানোর দিকেই ছিল না। ছিল রাস্তাঘাট, বসত বাটি, সৈন্যদলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ইংরেজ সমাজের শিষ্ট আচার-আচরণের দিকেও। আগে কোম্পানীর মাদ্রাজী, তেলেঙ্গীরাই ছিল বেশী। তাদের বলা হতো ‘লাল পল্টন’। পোশাকে-পরিচ্ছদে তারা ছিল গোরা সৈন্যদের সমান। ক্লাইভ হুকুম দিলেন, এতে চলবে না। আরো সৈন্য চাই। পশ্চিমা ভোজপুরীদের কোমরে বেল্ট এঁটে, পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে দাও। পাগড়ী পরিয়ে দাও মাথায়।

“জঙ্গী-জোয়ান এক সহস্র দেশী লোককে কোম্পানীর সিপাহী দলে গ্রহণ করার আদেশ পাওয়ার পর, এক হাজার ভোজপুরী সিপাহী সংগ্রহ করা হইয়াছে।… লর্ড ক্লাইভের দলে আগে তেলেঙ্গী বা মান্দ্রাজী দেশী সিপাহীর ভাগই বেশী ছিল। তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে পশ্চিম প্রদেশীয় প্রসিদ্ধ ভোজপুরীদের সেনাদলে গ্রহণ করা হয়। সম্ভবতঃ ইহাই কোম্পানীর আমলের প্রথম হিন্দুস্থানী সিপাহী রেজিমেন্ট।”

—কলিকাতা সেকালের ও একালের।

সৈন্যবাহিনীর সুখ-সুবিধের দিকে যেমন নজর, তেমনি নজর তাদের স্বাস্থ্যর দিকেও। ক্লাইভ হুকুম ঘোষণা করলেন একদিন—

“বাজে খরচ কমাইবার উদ্দেশ্যে, আমি সেনাদের জন্য ভাতা ও অন্যান্য উপরি ব্যয় বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিয়াছি। তাহারা কলিকাতা দুর্গে

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথায় বাস করিবে। ইহাই আমার সঙ্কল্প। কিন্তু বর্ত্তমানে কলিকাতার অবস্থা অতি অস্বাস্থ্যকর। এই সঙ্কট সময়ে সেনাগণকে কলিকাতায় রাখিলে তাহাদের অনেকেই 'পাক্কাজ্বরে' মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সেনাগণের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমি আপাততঃ তাহাদের কলিকাতা-বাস রহিত করিলাম। আমি আশা করি, আমার এই ব্যবস্থায় কোম্পানীর সেনাগণের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে।"

শুধু সৈন্যবাহিনীর লেখকজনই নয়, কলকাতার গণ্যমান্য ইংরেজরাও তখন থাকতেন শহর থেকে দূরে। কলকাতার জল-হাওয়া তখন বিষাক্ত। শহরের পথ-ঘাট শ্রীহীন। অসুখ-বিসুখ প্রতিদিনের সঙ্গী। সেই কারণেই শহরের ধারে-কাছে থাকার ইচ্ছে নেই কারো।

ক্লাইভ থাকতেন দমদমে। অবশ্য কলকাতাতেও তাঁর বাড়ী ছিল একটা। আর তাঁরই স্মৃতিতে সেখানকার রাস্তার নাম ক্লাইভ স্ট্রীট।

"আজকাল যে-বাটিতে রয়াল এক্সচেঞ্জ বর্তমান, লর্ড ক্লাইভ প্রথমে সেই বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস, এই বাটীতে বাস করেন। লর্ড কার্জন এই বাড়িটি প্রস্তর ফলক দ্বারা চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন।

ফ্রান্সিসের আলিপুরেও একটি বাগানবাড়ী ছিল। এই বাগানবাড়ীর বর্ণনাকালে ফ্রান্সিস বার্ককে (প্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমণ্ড বার্কের পুত্র) লিখিয়াছিলেন —"আলিপুরে আমার একটি বসত বাটী আছে। সমগ্র বঙ্গদেশে সেরূপ সুন্দর বাড়ী আর নাই। আমি দেড়শত চাকর নিযুক্ত করিয়াছি। ঘোড়া গাড়ি সবই আছে। কিন্তু আমার কেমন একটা স্বভাবদোষ যে, আলিপুর হইতে কলিকাতায় গিয়া 'হরণ' নামক ট্যাভার্ণে ক্লারেট-মদ্য দুই চারি গ্লাস না খাইলে আমার মাথার ঠিক থাকে না।"

"সম্ভবত ক্লাইভ স্ট্রীটের এই বাড়ীতে ফ্রান্সিস খুব কমই থাকিতেন। সেকালের কৌন্সিলের মেম্বর হইতে গভর্ণরেরা পর্যন্ত দুইটি করিয়া বাড়ী রাখিতেন। বাগানবাড়ী সমূহ তাঁহাদের অতি প্রিয় ছিল। তাহার প্রমাণ হেষ্টিংসের হেষ্টিংস হাউস ও লর্ড ক্লাইভের দমদমার বাগানবাটী।"

—কলিকাতা সেকালের ও একালের।

ক্লাইভের কলকাতার বাড়ি সম্পর্কে আরো তথ্য হল—

"ক্লাইভ স্ট্রীট এখন যেমন, তখন তেমনটি ছিল না। তখন ছিল শান্ত; বৃক্ষচ্ছায়ায় প্রকৃতির কোলে এই পথটি তখন ছিল মনহরণকারী। ক্লাইভের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলে সদাগরদের গগনচুম্বী ইমারৎ গজিয়ে উঠলো।

এখন যেখানে Chartered Bank, পূর্বে সেই জমির নাম ছিল New China Bazar এবং বর্তমানের Royal Exchange Place পথটির নাম ছিল New China Bazar Street, এই পথে এখন যেখানে Chamber of Commerce, সেই গৃহটির অধিকারী ছিলেন লর্ড ক্লাইভ। জেনে রাখতে হবে, পথটি পূর্ব্বে ছিল ইংরেজদের একটি 'Residential District.' কিন্তু বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স জন্মকালে ছিল Bonded Ware house-নামক পথে। এখনকার চেম্বারের ঠিক বিপরীতে।...Royal Institute ot British Architects নামক বিলাতী শিল্প প্রতিষ্ঠানের পূর্বতন সভাপতি Goodhart Rendal গৃহটির (Clive Building) ডিজাইন তৈয়ারী করেছিলেন।" কলকাতার পথ ঘাট।

ক্লাইভের কলকাতার বাড়িতে উড়তো কোম্পানীর পতাকা। তার প্রমাণ আছে সেকালের ছড়ায়। ক্লাইভ ছেলের বাবা হয়েছিলেন এই কলকাতাতেই। আর সেই ছেলেকে মানুষ করার জন্যে দাই উপহার দিয়েছিলেন নবাব মীরজাফর। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাইভ যখন বেড়াতে যেতেন দমদমে, গিয়ে থেকে যেতেন কিছুদিন, দাই ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে গান গাইতো—

দেখো মেরি জান কোম্পানী নিশান।
বিবি গৈয়ে দমদমা উড়ি হৈ নিশান,
বড়া সাহেব ছোট সাহেব, বঙ্কা কাপ্তেন
দেখো মেরি জান, লিয়া হৈ নিশান।

ক্লাইভ যেমন দমদমেই খুশী, স্যার উইলিম জোন্স তেমনি গার্ডেনরীচে। স্যার ইলাইজা ইম্পে থাকেন কাশীপুরে। হেষ্টিংস আলিপুরে। বারওয়েল খিদিরপুরে। যদিও পলাশীর দশ বছর পরের কথাচিত্র, তবু ১৭৬৭-তে লেখা মিসেস কিণ্ডার্সলীর একটি রচনা এই সময়ের কলকাতাকে চিনে নিতে সাহায্য করবে আমাদের।

"কলিকাতা সহরটি আয়তনে বড় হইলে কি হয়, ইহার মধ্যে যে সমস্ত বাড়ি ঘর নির্মিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা না থাকায় ইহার সাধারণ দৃশ্য চোখের পক্ষে বড়ই অতৃপ্তিকর। চারিদিকে যেন একটা বিশৃঙ্খল ভাব। কোথাও বড় বাটি, কোথাও চালাঘর। রাস্তাঘাটের বিশৃঙ্খলাও সেইরূপ। বাড়িগুলো কোথাও যেন আকাশের গাত্র স্পর্শ করিতে যাইতেছে। আবার কোথাও বা একেবারে নীচে নামিয়া গিয়াছে। যে যেখানে সুবিধামত জায়গা-জমী জোগাড় করিয়াছে, সেইখানেই নিজের পছন্দমত বাড়ী-ঘর তৈয়ারি করিয়াছে।

"বাজারের নিকটবর্তী স্থানগুলি যেন একটু জমকালো। যেখানে কোনরূপ

মালপত্র বিক্রয় হইত বা তদুপযোগী 'বৈঠক' বা দোকান থাকিত, সেই স্থানটাই যেন একটু গুলজার। এই সকল বাজারের দোকানদারগণ সবই এদেশের লোক।

"ইংরাজেরা খুব কমই এই সব বাজারে যাইত। তাঁহাদের হাট-বাজার যাহা কিছু হইত, সবই তাঁহাদের বেনিয়ান ও চাকরদিগের মারফৎ হইত।

"সহরের একটি নির্দিষ্ট অংশে আর্মিনীয়াণ ও পর্তুগীজরা বসবাস করে। উভয় জাতিরই স্বতন্ত্র গির্জা আছে। পর্তুগীজরা রোমীয়-ধর্মের নিয়মানুসারে শোভাযাত্রা ও নানাবিধ উৎসব করে। এই সমস্ত উৎসবের অনুষ্ঠান তাহাদের নির্দিষ্ট পল্লীমধ্যেই হইয়া থাকে। পর্তুগীজদের সহিত আমাদের এইটুকু সম্বন্ধ যে, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা আমাদের বাড়ীতে দাসীরূপে নিযুক্ত হয়, পুরুষেরা কেরানীর কাজ অথবা পাচকের কার্য করে।

"মাদ্রাজে নিম্নশ্রেণী দেশীয়দের জন্য যেমন একটি স্বতন্ত্র বাসপল্লী নির্দিষ্ট আছে —কলিকাতায় সেরূপ নাই। কলিকাতায় অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক সহরের ইংরাজ-পল্লীর নানাস্থানে বাস করিতেছে। ইহাদের বাড়ীঘরগুলির দেওয়াল মাটির, ও তাহার উপরে খড়ের ছাউনি। এই সকল খড়ের চালা এত ক্ষুদ্র যে, একজন লোক সিধা হইয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহারা সন্ধ্যার পূর্বে যখন আহারাদি প্রস্তুত করিবার জন্য উনানে আগুন দেয়, তখন কুটীরগুলির পার্শ্বস্থ রাজপথ সমূহ ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই সময়ে দেশীয় পল্লীর রাজপথে পরিভ্রমণ করা অতি কষ্টকর ব্যাপার হইয়া পড়ে।

"পলাশী যুদ্ধের পর ইংরাজগণ প্রকারান্তরে দেশনায়ক হওয়াতে, তাহাদের অধিকৃত বাঙ্গলার রাজধানী কলিকাতা সহরের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া, ইংরাজদের এই সুরক্ষিত সহরে বাস করিতেছে। সাহেবী-কোয়ার্টারে বাড়ী পাওয়াই দুর্ঘট। বিলাতের মত চিত্রিত কাগজে গৃহের দেয়াল মুড়িবার ব্যবস্থা কলিকাতায় নাই। এখানে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও উই প্রভৃতির জন্য এ সমস্ত কাগজমোড়া দেয়াল বেশী দিন যায় না। সমস্ত গৃহের দেয়ালগুলি চূণকাম করা। বালির উপরে চূণের পলস্তা দিয়া, গৃহের অভ্যন্তরস্থ দেয়ালগুলি নির্মিত হয়। ঘরের মেঝেও এইরূপভাবে চূণ সুরকীর মিশ্রণে পেটা। ইহাতে বাড়ীগুলি দেখিতে মন্দ হয় না।

"গৃহসজ্জার মধ্যে চেয়ার, টেবিল ও আলমারী, প্রভৃতির সংখ্যা বড় কম। এদেশে এ সকল জিনিস প্রস্তুত হয় না। ক্যাবিনেটের অর্থাৎ কাঠ-কাঠরার কোনও দোকান কলিকাতায় নাই। ঘরের মেঝেগুলির উপর ম্যাটিং করা হয়। ঘরের জানালাগুলি বেত্র নির্মিত। দুই চারিজন অবস্থাপন্ন লোকের

আবাসগৃহে, গৃহ ভিত্তি বিলম্বিত দুই একখানি দর্পণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল দর্পণ ইউরোপ হইতে আনীত। এক একটি বাড়ীর মধ্যে কামরার সংখ্যা কম। কিন্তু কামরাগুলি খুব দীর্ঘ ও প্রশস্ত। "টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রভৃতি বড়ই দুষ্প্রাপ্য। যাঁহারা একটু অবস্থাপন্ন, তাঁহারা ইউরোপ হইতে কলিকাতায় আগত জাহাজের ক্যাপ্টেনদের নিকট জিনিষপত্রাদি খরিদ করিয়া থাকেন। কেহ বা চীনদেশ ও বোম্বাই সহর হইতে গৃহসজ্জার উপযুক্ত কাষ্ঠ নির্মিত উপাদানগুলি সংগ্রহ করেন। এ দেশের মিস্ত্রীরা যাহা কিছু আসবাব নির্মাণ করে, তাহা অতি কদর্য। কলিকাতাবাসী ইংরাজদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা ও ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাঁহারা এইরূপ চেয়ার আলমারী পূর্ণ গৃহসজ্জা করিয়া থাকেন।"

সৈন্যদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবতে গিয়েই ক্লাইভ বুঝলেন, পুরনো দুর্গে আর চলবে না। নতুন করে গড়তে হবে আর একটা। কোথায় গড়া হবে? প্রথমে ঠিক ছিল ভাগীরথীর গায়েই। পরে সরে এল ভিতর দিকে, গোবিন্দপুরে। গোবিন্দপুর তখন জমজমাট। প্রচুর সম্ভ্রান্তলোকের বসবাস।

১৭৫৮। বছরের গোড়া থেকেই শুরু হয়ে গেল দুর্গের কাজ। ১০ জানুয়ারী ক্লাইভ কোর্ট-কে জানাচ্ছেন।

"যে সকল বাঙ্গালী ও এদেশীয় লোক গোবিন্দপুর গ্রামে বাস করিত, নূতন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের জন্য, আমরা তাহাদিগকে স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছি। যাহাদের পাকা বাড়ী আছে, তাহাদের বাটী সমূহের দরদস্তর ঠিক ন্যায্যভাবেই হইয়াছে। তাহারা মূল্যের জন্য প্রার্থনা করিলেই তখনি মূল্য দেওয়া হইবে। যাহাদের চালা ঘর আছে—তাহাদিগকে স্থানান্তরে চালা উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য খরচ দেওয়া হইবে। যাহাদের খরীদা জমী ছিল তাহাদিগকে সহরের অন্যস্থানে তাহাদের ইচ্ছামত এজমালী-জমী দেওয়া হইয়াছে। যে সমস্ত লোকের চালাঘর উঠাইয়া লইয়া যাইবার খরচা বেশী ও এতজ্জন্য বিশেষ অসুবিধা ও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে নিকটবর্তী স্থানে জমী দেওয়া হইল।"

গোবিন্দপুর কোম্পানীর দখলে যাওয়ার ফলে সেখানকার অধিবাসীরা ছড়িয়ে পড়ল নানা দিকে। বেশীর ভাগ চলে এল শোভাবাজার, সুতানুটি, তালতলা অঞ্চলে।

"গোবিন্দপুরে দুর্গনির্মাণ উপলক্ষে, এ স্থানের আদিম অধিবাসীদের অনেকেই গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতে হয়। নবাব মীরজাফরের নিকট হইতে

ইংরাজেরা Restitution Money বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহার উদ্বৃত্তাংশ গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের দেওয়া হয়। অনেকে সহরের আশে পাশে এওয়াজি-জমী পাইয়া গোবিন্দপুরের ভদ্রাসন ত্যাগ করেন। এই সময়ে তালতলা, কুমারটুলী, শোভাবাজার প্রভৃতি স্থান লোকে পূর্ণ হইয়া উঠে। আগে অবস্থাপন্ন বাঙালী, এই সব স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ক্লাইবের মুন্সী, মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর এওয়াজিরূপে সুতানুটি অঞ্চলে ও শোভাবাজারে অনেক জমী পান।...

তখন কলিকাতার সুতানুটি অঞ্চলে রায় রাঁয়া মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর বাটী নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র, রাজা গুরুদাস সুতানুটির মধ্যে চড়কডাঙ্গায় বাস করিতেন। বর্তমানকালের নূতন বাজারের নিকটস্থ স্থানটি আজও চড়কডাঙ্গা বলিয়া পরিচিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বর্তমান বিডন-বাগানের অধিকৃত স্থানেই রাজা গুরুদাসের আবাসস্থান ছিল। বিডন স্ট্রীট পোষ্টাপিসের পাশ দিয়া যে-রাস্তাটি মানিকতলা স্ট্রীটে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তাহা এখনও 'গুরুদাসের স্ট্রীট' বলিয়া উল্লিখিত। আন্দুল রাজবংশের আদিপুরুষ দেওয়ান রামচরণ, গবর্ণর ভ্যান্সিটার্টের বেনিয়ান ছিলেন। দেওয়ান রামচরণ পাথুরিয়াঘাটায় বাস করিতেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পাইকপাড়া রাজবংশের আদিপুরুষ। এই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ যোড়াসাঁকোতে বাস করিতেন। কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, হেষ্টিংসের বেনিয়ান কান্তবাবুর যোড়াসাঁকোতে আবাসগৃহ ছিল। মিঃ হুইলারের দেওয়ান, দর্পনারায়ণ ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটায় থাকিতেন। হেষ্টিংস ও বারওয়েলের পারসী-মুন্সী সদরউদ্দীন মেছুয়াবাজারে থাকিতেন। মদনমোহন দত্ত নিমতলায় থাকিতেন। বনমালী সরকার, পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান ছিলেন। কুমারটুলীর মধ্যে বনমালী সরকারের প্রাসাদতুল্য আবাসস্থান আজও বর্তমান আছে।...

"কাশীনাথবাবু বড়বাজারে থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন ধর্মভীরু বৈষ্ণচরণ শেঠ, নিঃস্বার্থদাতা গৌরী সেন বড়বাজারের অধিবাসী ছিলেন।... ভূকৈলাস রাজবংশের আদি পুরুষ, গভর্ণর ভেরিলিষ্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। ইনিও গোবিন্দপুর হইতে বাস উঠাইয়া খিদিরপুরে প্রাসাদতুল্য গড়বন্দী রাজবাটী নির্মাণ করিয়া 'ভূকৈলাস' নাম প্রদান করেন।" —কলিকাতা সেকালের ও একালের।

১৭৭৩-এ শেষ হল নতুন দুর্গের প্রথম পর্বের কাজ। খরচ এখনকার মত ২০ লক্ষ স্টার্লিং। তবে কাজটা খুব নির্বিঘ্নে ঘটেনি। ঘরে-বাইরে নানান রকম বাধা-

বিপত্তির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। দুর্গ গড়ার এঞ্জিনীয়ার ছিলেন ক্যাপ্টেন ব্রোহিয়ার। একদিন ধরা পড়লেন তহবিল তছরূপের দায়ে। নিজের বাড়িতে নজরবন্দী। শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন তছরূপের টাকাটা, যার পরিমাণ ৭৬ হাজার, তিনি শোধ করে দেবেন। কিন্তু এইভাবে ভালমানুষীর ভান করে কিছুদিন কাটিয়ে, হঠাৎ একদিন কলকাতা ছেড়ে পাড়ি দিলেন সিংহলের দিকে। সেখানে গিয়ে যোগ দিলেন এক ডাচ কোম্পানীতে।

এ হল ঘরের বিপদ। বাইরের বিপত্তি হল, একদল দেশীয় বেনিয়ানও ঝোপ বুঝে কোপ বসিয়েছিল কোম্পানীর টাকার উপর। ইট-কাঠ-কুলি সব দিক দিয়েই হিসেবের কারচুপি। অবশ্য ধরে জেলেও পোরা হয়েছিল সেই সব বদ বেনিয়ানদের। কিস্তীবন্দীতে সরকারী টাকা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেওয়ার পর তবে খালাস। এই সব কাণ্ড কারখানা দেখে ক্লাইভ তো এক সময় ভেবেই পড়েছিলেন, দুর্গটা বুঝি আর হল না।

এরপর আসা যাক 'রাইটার' প্রসঙ্গে।

এই সময়ে কোম্পানীর চাকরীতে গ্রেড ছিল চারটে। প্রথমে রাইটার। তারপর, ফ্যাকটর। তারপর জুনিয়র মার্চেন্ট। তারপর সিনিয়র মার্চেন্ট। সবাইকে চাকরীতে ঢুকতে হতো প্রথমে ঐ 'রাইটার' হিসেবেই। আবেদনপত্রে লিখতে হতো....desirous of surving your Honours as a Writer in India....."

ক্লাইভের সময়ে এই সব 'রাইটার'দের মাইনে ছিল বছরে ৫ পাউণ্ড। সিনিয়র মার্চেন্টদের বছরে ৪০ পাউণ্ড। পরে অবশ্য বেড়েছিল এ মাইনে। এই 'রাইটার'দের নিয়ে কী কলকাতার কাউন্সিল আর কী বিলেতের ডিরেকটর সভা, সব জায়গাতেই চিন্তা-ভাবনার শেষ নেই। ১৭৫৪-য় বিলেত থেকে কলকাতার গভর্ণরকে লেখা কোর্ট অব ডাইরেকটরদের একটা চিঠির বয়ান ছিল এই রকম—

"আমাদের নির্ধারিত আদেশ এই, আপনি রাইটারদের বুঝাইয়া দিবেন, যতদিন তাঁহারা রাইটাররূপে সামান্য বেতনে কার্য করিবেন, ততদিন কেহ পালকী বা গাড়ি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। করিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইবে।"

এ-রকম কড়া চিঠির পিছনে কারণ ছিল অবশ্যই। কারণটা হল অমিতব্যয়িতা। রোজগারের চেয়ে খরচ বেশী। কাজের চেয়ে বেশী নজর আমোদ-ফুর্তির দিকে। মাইনে বলতে তো নামমাত্র। তাহলে দুহাতে উড়োবার টাকাটা আসে কোথা

থেকে? বাজারে ধার করে। ধার শোধ হয় কিসে? কোম্পানীর নামে খাতায় খরচ লিখিয়ে।

পলাশী যুদ্ধের পর অবশ্য অনেকটা সুযোগ-সুবিধে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের। তারা পালকী চড়বার অনুমতি পেল বটে, তবে সেটা শুধুমাত্র শীতকালে আর বর্ষাকালে।

ক্লাইভের পর গভর্ণর ভেরিলিস্টের আমলেও কড়া নজর রাখা হয়েছিল তাদের আচার-আচরণের উপর। ১৭৬৭। উচ্ছৃঙ্খল, অমিতব্যয়ী, বেপরোয়া রাইটারদের বাগে আনবার জন্যে ডাকা হয়েছিল একটা তদারকী সভা। তাতেই তৈরী হয়েছিল নীচের চারটে অনুশাসন!

১। অবিবাহিত রাইটাররা একজন রঁাধুনী আর দুজন চাকরের বেশী আর কিছু রাখতে পারবে না। ২। গভর্ণরের বিনা অনুমতিতে কেউ ঘোড়া ব্যবহার করতে পারবে না। ৩। দুজন বা তিনজনে মিলে বাগানবাড়ী বানাবে, সেটাও নিষেধ। ৪। এমন কোন পোশাক-পরিচ্ছদ পরা চলবে না—যাতে বিলাসিতার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পলাশী যুদ্ধের আগে গোটা শহরটার রক্ষক হিসেবে ছিলেন একজন নগর কোটাল। শহরের মানুষকে চোর-ডাকাতের হাত থেকে বাঁচানোটাই তাঁর প্রধান কাজ। তাঁর সঙ্গে থাকতো বর্কন্দী, পাইকম্যান, বা সড়কিধারী আরো কয়েকজন পাহারাদার। ক্লাইভের আমলে উঠে গেল এই কোতোয়ালী ব্যবস্থা। তার বদলে চালু হল চৌকির বন্দোবস্ত। ১৭৫৮ থেকে এই চৌকির শুরু। ঐ বছরের ৩ মার্চ-এ বিলেতের কোর্ট অব ডাইরেকটরদের কাছ থেকে হুকুমনামা এসেছিল এই রকম—

"সহর কোতোয়ালের পদ ইতিপূর্বেই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে কলিকাতার চারিদিকে চৌকী দিবার জন্য নিম্নলিখিত বন্দোবস্ত করা হইল। আমাদের মেজর সাহেব সহরের নানা স্থানে চৌকী দিবার জন্য গোরা পুলিশের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। রাত্রি দশটা হইতে প্রভাত পাঁচটা পর্যন্ত। সহরের চারিদিকে গোরা পাহারার বন্দোবস্ত হইবে। এইরূপ ভাবে কোন কোন এলাকার চৌকী দিবার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। তাহার ব্যবস্থা আপনারাই করিয়া দিবেন নদীতীর ও সহরের মধ্যে প্রবেশদ্বারগুলিতে যেন কঠোর চৌকী রাখিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। যাহাতে গুপ্তচর প্রভৃতি শহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।"

এবার তাকানো যাক বিচার-আচার আইন-আদালতের দিকে। ক্লাইভের

আমলেই প্রথম তৈরী হল দেওয়ানী আদালত। পাঁচজন ইংরেজ বিচারক এই আদালতের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ২০ টাকার উপর যে সব দেনা-পাওনা নিয়ে লাঠালাঠি কাটাকাটি সেই সব মামলাই এই আদালতের বিচারের বিষয়। পাঁচজন বিচারকের মধ্যে একজন জজ সাহেব। তিনি নির্বাচিত হতেন প্রতি বছরে নতুন করে। তখনকার ফৌজদারী বিচারের ধরণটা ছিল অদ্ভুত। অপরাধীদের শাস্তি, বেত্রাঘাত। যার চলতি নাম 'চাবুক-লাগানো'। আর বেত মারা হত প্রত্যেক শুক্রবারে, সপ্তাহের একদিনে। অপরাধের গুরুত্ব বুঝে বেতের মারের সংখ্যা। কখনো একশ, কখনও পঞ্চাশ। ১৯৫৮ সালেই সিলেকট কমিটির কার্যবিবরণী থেকে যে খবর জানা যায় তার মধ্যে রয়েছে—

১। "জমীদার সাহেব প্রমুখ বিচারকগণ, আসরফ খাঁ ও মানিক দাসের অপরাধের বিচার করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে প্রতি শুক্রবারে ১০১ ঘা বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা এ দণ্ড কার্যে পরিণত করিবার আদেশ প্রদান করিতেছি।"

২। "ইদু সেখ বলিয়া একজন মুসলমান লস্কর, তাঁহার স্ত্রী পাঁচীকে হত্যা করার অপরাধে প্রতি শুক্রবারে এই ভাবে একশত ঘা চাবুক খাইতে আদিস্ট হইয়াছিল।"

পরে তৈরী হল, অপরাধের দ্বিতীয় শাস্তি, তোপে ওড়ানো।

"হত্যা প্রভৃতি চরম অপরাধে, আগে চাবুকের আঘাতে অপরাধীর প্রাণদণ্ড করা হইত। কিন্তু এরূপ আঘাত জেলের মধ্যে করা হয় বলিয়া বাহিরের দুষ্ট-লোকের মনে তাহাতে ভয়ের উদ্রেক হয় না। স্থতরাং চাবুক আঘাতে মৃত্যু-সংঘটন ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইল। এইবার হইতে কোম্পানীর জমীদারীর মধ্যে চরম অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। বোর্ডের এই আদেশ প্রচারের কয়েকদিন পরে হত্যাপরাধে অপরাধী নয়ান ছুতারকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়।" —কলিকাতা সেকালের ও একালের।

যে-সময়ের কথা তখনও কোম্পানীর কাজ-কারবারে, কেনা-বেচায়, মাইনে দেওয়ায়, রয়ে গেছে কড়ির চল। কুলীদের কড়ি গুনে গুনে মাইনে মেটাতে গিয়ে ভারী অস্থবিধে। তাই ঠিক করা হল, কড়ির বদলে তামার কি রূপোর আনি চালু করার কথা।

"এই সময়ে বহরমপুরে ইংরাজদের একটি ছোট-খাট কেল্লা নির্মিত হইতেছিল। ইঞ্জিনিয়ার ব্রোহিয়ার সাহেব কুলী মজুরদিগের হিসাবাদি প্রদান সম্বন্ধে কলিকাতা কৌন্সলের অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবকে লেখেন—"কারিগর ও

ও কুলীদিগকে কড়ি দ্বারা পারিশ্রমিক দিতে গেলে, বড়ই অসুবিধা হইয়া পড়ে। কড়ির পরিবর্তে তাম্র কিম্বা রৌপ্য-নির্মিত 'আনির' প্রচলন হইলে, বড়ই কাজের সুবিধা হয়। কোম্পানীর দুই জন 'সরফ' এখানে আসিয়া কড়ি ও আনির আদান-প্রদান কার্যের ভার লইবেন, এইরূপ ব্যবস্থাই সুবিধাকর। এই সরফেরা, কড়ির জন্য কোনরূপ বাট্টার দাবী করিতে পারিবেন না। কারণ এরূপ বাট্টা লইলে গরীব শ্রমজীবিগণের ক্ষতি হইবে ও তাহারা কার্যে আসিবে না।"

এ তথ্য ১৭৫৭-র ১৩ অক্টোবরের কাউন্সিলের কার্যবিবরণী থেকে। এরই তিন বছর পরে কলকাতা টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা করার হুকুম এসে গেল নবাব মীরজাফরের কাছ থেকে।

"কলিকাতায় আপনারা টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা এই টাঁকশালে নির্মাণ হইবে। টাকাগুলি মুরশীদাবাদের নবাব সরকারের প্রচলিত আসরফি ও টাকার মত ওজন ও গঠন হইবে। তাহাতে কলিকাতার নাম মুদ্রিত থাকিবে। বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে এই সকল মুদ্রা অবাধে প্রচলিত হইবে। মুরশীদাবাদে নবাবের রাজকোষেও কলিকাতার টাঁকশালের টাকা গৃহীত হইবে। এই টাকার জন্য কেহ কোন রূপ বাট্টা বা কমিশন দাবী করিতে পারিবেন না।"

একে একে সবই হল। বাকী রইল কেবল দেওয়ানী আদালত। ক্লাইভের আমলেই শুরু হল সেটা। পাঁচজন ইংরেজ বিচারক এই আদালতের হর্তা-কর্তা বিধাতা। ২০ টাকার উপরে যে-সব দেনা-পাওনা নিয়ে লাঠালাঠি-কাটাকাটি, সে-সবেরই বিচার হবে এইখানে। পাঁচজন বিচারকের মধ্যে একজন থাকবেন জজ। তিনি নির্বাচিত হবেন বছরে-বছরে। কলকাতার গভর্ণর সাহেবের হাতে ক্ষমতা এই সব বিচারক নির্বাচনের।

ক্লাইভ কী শুধু কলকাতাকে নিয়েই ব্যস্ত? না। এরই ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজনীতি নিয়েও। সেখানেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা। কলকাতার বাড়-বাড়ন্ত গড়ে ওঠার সঙ্গে সেসব ঘটনার আপাতদৃষ্টিতে হয়তো কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু অন্তঃস্রোতের মত একটা সম্বন্ধ রয়ে গেছে ভিতরে ভিতরে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজনীতির সঙ্গে কলকাতার বাঁচা-মরার ইতিহাসও গোপন সুতোয় গাঁথা। এবার আমরা কিছুক্ষণের জন্যে সেই ইতিহাসের দিকে ঘুরে তাকাবো।

পলাশীর যুদ্ধ শেষ হবার পর ক্লাইভ যখন জানতে পারলেন, ফরাসী ল সাহেব

এক ঝাঁক সৈন্য নিয়ে পাটনা থেকে রওনা হয়েছেন সিরাজদ্দৌলাকে সাহায্য করতে, তখুনি মীরজাফরকে বললেন, এখুনি সৈন্য পাঠান ল'কে পাকড়াতে। মীরজাফর পড়লেন বিপদে। প্রথমত মীরজাফরের ভয় রাজা রামনারায়ণকে। পাটনার ডেপুটি গভর্নর। অজস্র টাকা, অগাধ ক্ষমতা তাঁর হাতে। ল যদি এখন রামনারায়ণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কচু-কাটা করে তাঁর সৈন্যদের? দ্বিতীয় সমস্যা, সৈন্য নিয়ে। একে তো রাজকোষ ফাঁকা বলে ছাঁটাই করেছেন একগাদা সৈন্য। তার উপরে, যে-সব সৈন্য আছে, তারা মাইনে পায়নি। মীরজাফর তাই কানে শুনেও বোবা সেজে রইলেন ক্লাইভের প্রস্তাবে। ক্লাইভ কিন্তু সহজে ভোলার পাত্র নয়। তিনি তখুনি মেজর আয়ারকুটকে ডেকে বললেন, পাটনায় গিয়ে শায়েস্তা করে এসো, ফরাসী সৈন্যদের।

আয়ারকুট বিস্তর সৈন্য আর গোটা দুয়েক বড়ো বড়ো কামান নিয়ে পাটনার দিকে শুরু করে দিলেন হাঁটা। কিন্তু পদে পদে ঘটতে লাগল বিপদ। অনেক কষ্টে যদি বা শেষ পর্যন্ত পাটনায় পৌছলেন, যাকে ধরতে আসা তিনি তখন নাগালের বাইরে। ল পালিয়েছেন ছাপরায়। মীরজাফরের অনুচররা আয়ারকুটের কানে মন্ত্র পড়ে বলল, এর পিছনে রয়েছে রামনারায়ণের হাত। ঐ হিন্দুটাই যত নষ্টের গোড়া। আয়ারকুট সে-সব জানালেন ক্লাইভকে। ক্লাইভ লিখে পাঠালেন, রামনারায়ণকে হঠাও। কিন্তু সে চিঠি হাতে পৌছবার আগেই আয়ারকুট চলে গেছেন ছাপরায়। ছাপরায় গিয়ে শুনলেন, ল পালিয়েছেন কাশীতে। অগত্যা আবার তাঁকে ফিরে আসতে হল পাটনায়। রামনারায়ণ এবারে খুব আদর-আপ্যায়ন, খাতির-যত্ন শুরু করে দিলেন আয়ারকুটকে। মীরজাফরের অনুচরেরা তখনও আয়ারকুটকে বুঝিয়ে চলেছে, রামনারায়ণ বিশ্বাসঘাতক। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশের সিংহাসন দখল করার মতলবে আছে।

এদিকে রামনারায়ণের সঙ্গে আয়ারকুটের মন কষাকষির সংবাদ পেয়ে মীরজাফর আর মীরনের মাথায় হাত। যদি রামনারায়ণের অঢেল ধনদৌলত গ্রাস করে বসে লোকটা? মীরজাফর এবং মীরন চান, ইংরেজ নয়, যদি রামনারায়ণকে শায়েস্তা করতে হয়, করবেন তাঁরাই। তাহলে রাজত্ব আর ধনদৌলত, জুটবে দুটোই।

মীরজাফর আয়ারকুটকে খবর পাঠালেন, মীর আমিন তোমাকে রামনারায়ণ সম্বন্ধে যা বুঝিয়েছে, সব বাজে কথা। ও লোকটা তোমার মাথায় কাঁঠাল রেখে মাতব্বর সাজতে চায়।

আয়ারকুট ফিরে এলেন মুর্শিদাবাদে। ক্লাইভ পাড়ি দিলেন কলকাতায়। যাবার সময় বুঝে গেলেন, দুর্লভরায়কে নিয়ে ষড়যন্ত্র চলেছে।

ক্লাইভের কাছে মীরজাফরের চেয়ে দুর্লভরামই তখন সবচেয়ে প্রিয়। কারণ, দুর্লভরামের হাতেই রাজকোষ। তদুপরি মুখ্যমন্ত্রী। তাকে দিরে বিক্ষুব্ধ হিন্দুদের একটা চক্র গড়ে উঠছে। মীরজাফর এবং মীরনের আচার-ব্যবহারে তাঁরা অসন্তুষ্ট। মীরনের মাতব্বরী পছন্দ নয় তাঁদের। কথায় কথায় মীরজাফরের হুকুম, টাকা দাও, টাকা দাও, এটাও তাঁদের কানে অসহ্য।

দুর্লভরাম ছাড়া আরও একজনের দিকে মীরজাফরের আর মীরনের শ্যেন দৃষ্টি, সেটাও বুঝে গেলেন ক্লাইভ। সে হল মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারাম। ক্লাইভ কলকাতায় চলে যেতেই মীরজাফরের পক্ষ থেকে তলব পাঠানো হল, এখুনি এসে দেখা কর। দুর্লভরামের সঙ্গে রাজারামের অনেক দিনের বন্ধুত্ব। কিন্তু পাছে কোন সন্দেহ জাগে, তাই তিনিও লোক-দেখানো-ভাবে পাঠিয়ে দিলেন একটা চিঠি। মুর্শিদাবাদে এসে দেখা কর।

রাজারাম নিজে এলেন না। পাঠালেন দুজন প্রতিনিধি। ছেলে মথুর আর ছোটভাই নারায়ণকে। মুর্শিদাবাদে পা দিতে-না-দিতেই বন্দী করা হল তাঁদের।

কলকাতায় ফেরা মাত্রই ক্লাইভের কাছে মাদ্রাজ থেকে ঘন ঘন তাগিদ আসছে সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফিরে এসো মাদ্রাজে। কলকাতাতো উদ্ধার করা হয়ে গেছে। সুতরাং আর থাকার দরকার নেই। দক্ষিণ দেশে আমরা ফরাসীদের হাতে মার খাচ্ছি। কাউন্ট লালী ভারতবর্ষে এসেছেন ফরাসীদের হর্তা-কর্তা হয়ে। এই সময় তোমাকে খুব দরকার। ক্লাইভ কিন্তু মনে মনে ঠিক করে নিয়েছেন, কলকাতা আর এই বাংলাদেশ ছেড়ে একপাও নড়বেন না কোথাও। কেন?

"It was not the prospect of further military glory of Bengal which restrained Clive; it was rather the great Political prizes on which he had now set his eyes. The conquering general had metamorphozed into a calculating statesman. ....the political field in Bengal offered wider scope and greater rewards than military; political success might also have greater consequences in Britain... .Clive's object was to control Bengal and Bihar through the medium of the nawab and his Officers."

Spear.

ক্লাইভ রয়ে গেলেন কলকাতায়। মাদ্রাজের গভর্নর পিগট সাহেবকে

লিখলেন, টাকা লাগলে জানাবেন। কলকাতার তহবিল থেকে পাঠানো হবে। তবে আমি যেতে পারছি না।

ক্লাইভের বদলে মাদ্রাজ পাড়ি দিলেন মেজর আয়ারকুট। সঙ্গে সেই সব সৈন্য, যারা মাদ্রাজ থেকে এসেছিল কলকাতা উদ্ধারে। ওয়াটসন মারা গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে যে-সব সৈন্য এসেছিল, তারাও জাহাজে চেপে বসল এ্যাডমিরাল পোকক-এর নেতৃত্বে।

এই সময়েই ক্লাইভের হাতে এসে পৌঁছল রাজারামের চিঠি। ক্লাইভের প্রতি রাজারামের নিবেদন—

দেখুন, নবাব মীরজাফর আমাকে মিথ্যে সন্দেহ করছেন। তাঁকে মেনে চলতে আমার তো কোনরকম আপত্তি নেই। তাহলে আমার ভাই আর ছেলেকে জেলখানায় পুরলেন কেন? নবাবের রাজ্যে যদি আমার আশ্রয় না জোটে, মেদিনীপুরের পাহাড়-পর্বতে বনে জঙ্গলে তো জুটবেই। আমি সেইখান থেকে আমার বিদ্রোহ চালিয়ে যাব। তবে নবাব যদি আমার সম্পর্কে তাঁর মন্দ-ধারণাটা বদলান, আমি একলক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী আছি।

ক্লাইভ জবাবে লিখলেন—

আমি চন্দননগরে যাচ্ছি। তুমি সেখানে এসে দেখা কর। আর সেই সঙ্গে মীরজাফরকে জানালেন, রাজারামের সঙ্গে বিরোধটা নিন মিটিয়ে।

মীরজাফর চিঠি পেয়ে হতভম্ব। ক্লাইভকে কত রকমে বুঝিয়েছিলেন, রাজারাম লোকটা হল ইংরেজদের শত্রু। নবাব সিরাজদ্দৌলা তো ওরই মধ্যস্থতায় ষড়যন্ত্র আঁটছিলেন ফরাসীদের সঙ্গে। পলাশীর যুদ্ধের পরও ফরাসী সৈন্যদের গোপনে বাইরে পাচার করে দিয়েছে লোকটা মেদিনীপুর দিয়ে।

মীরজাফর ভেবেছিলেন তাঁর এই ফুসলানিতে কাজ হবে। আর ক্লাইভ নিশ্চয়ই তাঁদের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাবেন না কোনদিন। এই সব ভেবেই রাজারামের বদলে খোজা হাদী নামে নতুন একজন ফৌজদার ঠিক করে মেদিনীপুরের দিকে ইতিমধ্যে পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। আর সেই নতুন ফৌজদারকে নির্দেশ দেওয়া ছিল, রাজারামের যাবতীয় ধনদৌলত দখল করে নেওয়ার।

সব ব্যাপারেই ক্লাইভের মাতব্বরী দেখে মীরজাফর ফোঁস-ফোঁস করতে লাগলেন ভিতরে। বাইরে গদ-গদ শিষ্টাচার। তিনি ক্লাইভকে উত্তরে লিখলেন—

বেশতো, রাজারাম এক লাখ টাকা সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদে চলে আসুক। যদি দেখি লোকটার মতিগতি বদলেছে, ওকেই আবার ফৌজদার করে দেবো। তবে কি, খোজা হাদীর কাছে আমার আর লজ্জার শেষ রইল না।

ক্লাইভের কাছে মীরজাফরের এতখানি নত হওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু হতে হল বিপদে পড়ে। বিপদটা পূর্ণিয়াকে নিয়ে। পূর্ণিয়ার শাসন কর্তা শওকতজঙ্গ যে সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান, তা আমরা জেনেছি। শওকতজঙ্গের শূন্যস্থানে সিরাজ পূর্ণিয়ার শাসক করে দিয়েছিলেন মোহনলালকে। মোহনলাল মন্ত্রী হিসেবে সব সময়ই থাকতেন মুর্শিদাবাদে। পূর্ণিয়ার রাজত্ব চালাতেন তাঁর ছেলে আর দেওয়ান অচল সিংহ। পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজের আর মোহনলালের মৃত্যু, এই সব দেখে অচল সিংহ ভাবলেন, আমিও এই ফাঁকে মোহনলালের ছেলেটাকে সরিয়ে, হাজীর আলীকে নতুন শাসনকর্তা খাড়া করে, পিছন থেকে নিজের সর্বেসর্বা হয়ে যাই। সত্যি সত্যিই তাই হল। মুর্শিদাবাদে খবর এসে পৌছল, হাজীর আলী হয়েছে পূর্ণিয়ার দেওয়ান। মোহনলালের ছেলে বন্দী।

মীরজাফর বুঝে গেছেন, চারিদিকের এই বিশৃঙ্খলা সামলাতে গেলে ক্লাইভ আর তাঁর সৈন্যদলের সাহায্য চাইই। ক্লাইভ চটলে, সিংহাসন থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়তে বেশী দেরী হবে না তাঁর। মীরজাফর যুদ্ধযাত্রার জন্যে তৈরি হলেন পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ ঠাণ্ডা করতে। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি পাঠালেন ক্লাইভকে, সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে এসে আমাকে সাহায্য করুন।

যুদ্ধযাত্রার হুকুম দিলেন নবাব। অথচ একি কাণ্ড। সৈন্যদের মধ্যে সাড়াশব্দ নেই, উত্তেজনা নেই, সাজগোজ নেই কেন? সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকে উত্তর এল, আমাদের মাইনে বাকী। মাইনে মিটলেই সাজতে বসবো। মীরজাফর বুঝলেন, অথবা তাঁকে বোঝান হল, এসব দুর্লভরামের চক্রান্ত।

"সর্বত্র এইরূপ হিন্দু-অভ্যুত্থান লক্ষ্য করিয়া মীরজাফর দুর্লভরামের প্রতি অধিকতর সন্দিহান হইলেন; মন্ত্রীবরের সর্বনাশসাধনই এক্ষণে তাঁহার প্রধান সঙ্কল্প হইল। অনুগত বন্ধু খাদেম হোসেন খাঁর অধীনে ছয় সহস্র সৈন্য পূর্ণিয়া যাত্রা করিবার আদেশ পাইল, কিন্তু কয়েকজন সেনানীর চক্রান্তে বাকী বেতন পরিষ্কার না হইলে সৈন্যদল যাত্রা করিতে অস্বীকার করিল। নগরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। রাজা দুর্লভরাম নিজ সৈন্যদল সমবেত করিলেন এবং দরবারে আগমন করিলেন না। ইতিমধ্যে ক্লাইভ ছাপড়া হইতে রেসিডেন্টের প্রেরিত এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের সংবাদ মীরজাফর খাঁকে অবগত করিলেন।

ইহাতে নির্দেশ ছিল, "ইংরেজ পক্ষের গুপ্তচর আলিবর্দী-বেগমের নিকট হইতে রামনারায়ণের নিকট প্রেরিত পত্র ধৃত করিয়াছেন, অযোধ্যার নবাবকে রামনারায়ণের সহিত যোগে মীরজাফরকে বিতাড়িত করিবার অনুরোধ করা হইয়াছে।" সংবাদ সত্য হউক বা না হউক, মীরজাফর চতুর্দ্দিকে বিপজ্জাল ঘনীভূত দেখিলেন। দুর্লভরাম সিরাজের পতনের পরেও আলিবর্দী-বেগমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সময়ে তাঁহার প্রাসাদে গমনাগমন করিতেন; তাঁহাকেই এই চক্রান্তের মূল বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জমিল। ক্লাইব উক্ত সংবাদে বিরাট সংঘটন হইতে পারে চিন্তা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাশিমবাজারের ইংরেজ সৈন্যগণের প্রতি আদেশ দিলেন, নবাব অনুরোধ করিলে তাহারা যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হয়। তিনি স্বয়ং প্রয়োজন হইলেই সদলে যাত্রা করিবেন, ইহাও লিখিয়া পাঠাইলেন। ইহাতেই যথেষ্ট ফল হইল। ওয়াটসের মধ্যস্থতায় দুর্লভরাম ও মীরজাফরের অন্তঃত মৌখিক পুনর্মিলন সাধন হইল। সৈন্যদলের বাকী বেতন কিয়দংশ পরিশোধ করিয়া ৭ই নভেম্বর মীরজাফর সসৈন্যে বিহার-যাত্রায় বহির্গত হইলেন। অসুখের ভান করিয়া দুর্লভরাম নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই; স্বীয় সৈন্যদলকেও নগর হইতে যাত্রা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। মীরজাফর নগরের বহির্দেশে পটমণ্ডপে সমস্ত সৈন্যের আগমন জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্লাইবকে সসৈন্য যোগ দিতে অনুরোধ করা হইল। অংশপ্রাপ্ত পুরস্কারের প্রচুর অর্থে ইংরেজ-সৈন্যদল তখন অমিতাচারে পীড়িত, অনেকে পঞ্চত্বও প্রাপ্ত হইয়াছিল। এজন্য ব্যবস্থা করিয়া যাত্রা করিতে ক্লাইবের কিছুকাল বিলম্ব হইয়াছিল।" বাংলার ইতিহাস।

মুর্শিদাবাদ ছেড়ে মীরজাফর যেই পা বাড়িয়েছেন বাইরে, মীরন অমনি তার বিষদাঁত আর কুলোপানা চক্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিজের গর্ত থেকে। শহরে রটিয়ে দিলে, সর্বনাশ! রাজা রামনারায়ণ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে এক হয়ে এগিয়ে আসছেন বাংলাদেশ দখল করতে আর মন্ত্রী দুর্লভরামের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁরা ঠিক করেছেন বাংলার সিংহাসনে বসাবেন সিরাজের ছোট ভাই মীর্জা মেহেদীকে।

মীরন শুধু গুজব রটিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। সেই দিন রাত্রেই গুণ্ডা লাগিয়ে হত্যা করলেন মীর্জা মেহেদীকে। হত্যার পদ্ধতিটাও চমৎকার। দুটো তক্তার মাঝখানে রেখে পিষে-পিষে মারা। পরের দিন সকাল থেকে মুর্শিদাবাদের মানুষ ক্রমশ তেতে উঠতে লাগল বিক্ষোভে। বাতাসে খবর ছড়িয়ে পড়ল হত্যা করা হয়েছে বেগম আলিবর্দীকেও। আর তাঁর দুই মেয়ে ঘসেটি এবং

আমিনাও বাদ যায়নি। বেগম আলিবর্দীকে শ্রদ্ধা করতো মুর্শিদাবাদের সব মানুষই। সেখানে হিন্দু মুসলমানের ভেদ নেই। অবশ্য বেগম আলিবর্দীদের তখনো হত্যা করা হয়নি। হত্যার জন্যে নৌকোয় করে লোক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ঢাকায়। মুর্শিদাবাদ জুড়ে ঘরে ঘরে আগুনের হল্‌কা, ক্ষোভের, ক্রোধের। রাজপথে চাপা উত্তেজনা। যে-কোন মুহূর্তে মীরনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটতে পারে এমনি একটা আশংকাজনক অবস্থা। কাশিমবাজার থেকে এক ঝাঁক পল্টন নিয়ে ছুটে এলেন ক্রাফটন। আর প্রায় কাকাকাছি সময়ের মধ্যে রাজারামকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাইভও সসৈন্যে এসে পৌছলেন মুর্শিদাবাদে। মীরনের কাছে ক্লাইভও এক নম্বরের শত্রু। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতন সাহস নেই তার। সুতরাং ক্লাইভ আসছেন শুনেই মীরন একেবারে আলাদা মানুষ। তখুনি রাজারামের ভাই আর ছেলেকে মুক্ত করে দিলেন জেল থেকে। ক্লাইভের সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন যেন, তাঁর মতন নিরীহ গোবেচারা ভাল মানুষ পৃথিবীতে জুটো মিলবে না কোনদিন। মীরনের অভিনয়টা ক্লাইভ মনে মনে বুঝে গেলেন ঠিকই। তাই মীরন যখন দুর্লভরামের নামে তাঁর কাছে অভিযোগ করে, কানেও তোলেন না। বরং বেশী করে মেলামেশা করেন দুর্লভরামের সঙ্গেই। আর দুর্লভরামের কাছ থেকেই খবর জোগাড় করলেন রামনারায়ণ সম্পর্কে। বুঝলেন রামনারায়ণকে এখন চটানো উচিত নয়। তা ছাড়া রামনারায়ণের মতন ক্ষমতাবানকে জিইয়ে রাখতে পারলে মীরজাফরকে নিজের মুঠোয় চেপে রাখাটা হবে সহজ।

সৈন্য সামন্ত নিয়ে ক্লাইভ পা বাড়ালেন মীরজাফরের সঙ্গে যোগ দিতে। ডাক দিলেন দুর্লভরামকেও, সঙ্গে যাওয়ার জন্যে। দুর্লভরাম বললেন, এখন রাজকাজের বড় বেশী চাপ। রাজধানী ছেড়ে বেরোবার উপায় নেই।

রাজমহল পৌছে ক্লাইভ ধরলেন মীরজাফরকে। এখন মীরজাফরের গলায় অন্য সুর। ক্লাইভকে বললেন –

বলেছিলুম বটে পূর্ণিয়ায় যাবো। কিন্তু যাবো না। পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ আমি একাই মোকাবিলা করতে পারব। চলুন আমরা রওনা দিই পাটনার দিকে। শায়েস্তা করি রাজা রামনারায়ণকে। বড় বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে দেওয়ানের।

ক্লাইভ কোপ মারলেন ঝোপ বুঝে। বেশ তো, যাবো। কিন্তু তার আগে আমাদের সঙ্গে চুক্তির দ্বিতীয় দফার টাকাটা মিটিয়ে দিন। প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা পাই আমরা। টাকাটা পেলে ফৌজ আনাবো কলকাতা থেকে। আপনি এখুনি টাকা নিয়ে দুর্লভরামকে চলে আসতে বলুন এখানে।

সাপের ছুঁচো গেলার মতন অবস্থা তখন মীরজাফরের। বাধ্য হয়ে বলতেই হল, তাই হবে। দুর্লভরামের কাছে খবর ছুটল তখুনি। ক্লাইভও আরেকটা চিঠি লিখে দিলেন, আপনার কোন ভয় নেই। আমি জামিন রইলাম আপনার ভালো মন্দের।

ক্লাইভের কারসাজিতে মীরজাফর বনাম দুর্লভরামের মনকষাকষিটা মিটল আপাততঃ। মুর্শিদাবাদে তিনি লিখে পাঠালেন, রাজকোষ থেকে যেন নগদ সাড়ে বারো লক্ষ টাকা এখুনি দেওয়া হয় ইংরেজদের। বাকী রইল সাড়ে দশ লক্ষ। তার জন্যে বরাত দিলেন বর্ধমান, নদীয়া আর হুগলীর তিন ফৌজদারকে। এরপর যুদ্ধযাত্রা। পূর্ণিয়া জয়। পাটনায় মীরজাফর এবং রামনারায়ণের সৌজন্যময় সাক্ষাৎকার। দরবার ডেকে পাটনার নতুন দেওয়ানের পদ দেওয়া হল মীরনকে। মীরনের অবর্তমানে রামনারায়ণই আসল শাসক। এর জন্যে সাত লক্ষ টাকা উৎকোচ আদায় করলেন মীরজাফর, রামনারায়ণের কাছ থেকে।

যুদ্ধ নেই, রক্তপাত নেই, একটা বন্দুককেও গর্জন করতে হল না। সব মিটমাট হয়ে গেল ম্যাজিকের মত। এই প্রসঙ্গে অর্মের বর্ণনাটি বড় মজার।

"Thus ended this political campaign, in which an army of 50,000 men had marched 300 miles out of their own province and continued four months in the field, without firing a musket, but produced the full accomplishment of all that Clive intended."

এবার ঘরে ফেরার পালা। ফেরার আগে মীরজাফর শিন্নি দিয়ে এলেন বিহার শরিফে পীরের দরগায়। দুর্লভরাম পিণ্ডদান করে এলেন গয়ায় গিয়ে। আর ক্লাইভ কী করলেন ?

"এই সময়ে ক্লাইভ ইংরেজপক্ষের আর একটি সুবিধা করিয়া লন। ইংরেজগণ সোরার ব্যবসায়ে প্রভূত লাভ করিতেন। পাটনার অন্য পার্শ্বে ছাপড়া প্রভৃতি জেলাই বঙ্গের সোরা প্রস্তুত করিবার প্রধান স্থান। সোরার বাণিজ্যে রাজকোষে অনেক আয় হইত। কোম্পানীর জন্য এই ব্যবসায় একনিষ্ঠ করিয়া লইয়া ক্লাইভ রাজকোষে যত অধিক মাশুল জমা আছে, তাহাই দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এই বাবদ অন্য যাহা উপরি লাভ হইত, ইংরেজগণের নিকট হইতে তাহার প্রত্যাশা নাই, এজন্য মীরজাফর খাঁ ইতস্ততঃ করিয়াও ইংরেজপক্ষকে অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না বলিয়া প্রস্তাবে মত দিলেন।" বাঙ্গলার ইতিহাস।

ক্লাইভের লাভ কি শুধু এইটুকুই ? আরো আছে। প্রথমত সৈন্যসামন্তদের

জন্যে যা-কিছু খরচ তার সবটাই আদায় করলেন মীরজাফরের ঘাড় ভেঙে। আর ফেরার সময়, হাজার খানেক যণ্ডামার্কা ভোজপুরিকে ভর্তি করে নিলেন নিজের লাল পল্টনে। কূটনীতির সমস্ত খেলায় নির্বিঘ্নে, নিরাপদে জয় লাভ করে ক্লাইভ এবার পা বাড়াবেন মুর্শিদাবাদের দিকে। মীরজাফরের অত তাড়া নেই। ময়ূরপঙ্খী বজরায় পারিষদবর্গের সঙ্গে ধীরে সুস্থে, হেসে-খেলে, বনে-বাদাড়ে শিকার করতে করতে, নাচওয়ালীদের নাচ দেখতে দেখতে এগোতে লাগলেন মুর্শিদাবাদের দিকে।

ইতিমধ্যে মীরনের কানে খবর এসে গেল দুর্লভরামকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাইভ সসৈন্যে রওনা দিয়েছেন মুর্শিদাবাদের দিকে। মীরন সঙ্গে সঙ্গে রটিয়ে দিলে ক্লাইভ আসছে তাঁকে বন্দী করতে। হৈ-চৈ পড়ে গেল রাজধানীতে। সবাই ভেবে নিলে নিশ্চয়ই একটা যুদ্ধ-দাঙ্গা শুরু হবে এইবার। বন্ধ হয়ে গেল দোকান-পাট, হাট-বাজার। ভয় পেয়ে গেলেন শেঠেরাও। তারাও কারবার বন্ধ রেখে খিল এঁটে দিলেন দরজায়।

মুর্শিদাবাদে পৌঁছে ক্লাইভের কানে এসব খবর আসতেই, তিনি তো রেগে লাল। তখুনি খবর পাঠালেন মীরজাফরের কাছে। পত্রপাঠ চলে এসে মীরনের এই সব মাতব্বরির বিহিত করুন। নইলে চলে যাবো এদেশ ছেড়ে দক্ষিণে।

ওদিকে স্ক্রাফটন ছুটলেন মতিঝিলে, মীরনকে বাগে আনতে।

মীরন ইতিমধ্যে বুঝে গেছে নিজের ভুল। অগত্যা ক্লাইভের কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে।

এই সময়েই কলকাতায় আর এক কাণ্ড। লণ্ডন থেকে এক জাহাজ এসে হাজির ফোর্ট উইলিয়মের ঘাটে। জাহাজের নাম হারডউইক। জাহাজে এসেছে কোম্পানীর ডিরেকটরদের ডেসপ্যাচ। রোজাক ড্রেক-এর গভর্ণর-গিরি শেষ। এখন থেকে আর কোনও একজন লোক গভর্ণর হবে না। দশজন সদস্যকে নিয়ে তৈরি হবে কাউন্সিল। আর সেই কাউন্সিলের চারজন সিনিয়র সদস্য পালা করে তিনমাসের জন্যে গভর্ণর হবেন।

ডেসপ্যাচে ক্লাইভের নাম গন্ধ নেই। রাগে, দুঃখে, অভিমানে চোখ-মুখ জবাফুলের মতন লাল। ইংরেজরা দেখলে মহাবিপদ। ওদিকে কাউন্ট লালীর হাতে দাক্ষিণে মার খাচ্ছে ইংরেজ। এদিকে ডাচরা ওৎ পেতে আছে, সুযোগ পেলেই কামান দাগবে। এই রকম ভয়াবহ অবস্থায় ক্লাইভ যদি না থাকে, সমূহ সর্বনাশ। কাউন্সিলের সদস্যরা সবাই মিলে ক্লাইভকে ধরলেন, রাগ করে

দূরে সরে যাবেন না। আমরা বলছি, আপনিই কলকাতার গভর্ণর। ক্লাইভ এতদিন ছিলেন মুকুটহীন গভর্ণর। এবার সত্যি সত্যিই গভর্ণর হয়ে গেলেন কলকাতার।

বছরের শেষ দিকে লণ্ডন থেকে এল আর এক ডেসপ্যাচ। তাতে কোম্পানীও লিখে পাঠিয়েছেন, হ্যাঁ, ক্লাইভই গভর্ণর। কোম্পানীর এই মত-বদলানো কোনরকম খামখেয়ালীপনা নয়। আসলে আগের ডেসপ্যাচের সময়ও কোম্পানী পলাশীর যুদ্ধের খবর পায়নি। খবর পেয়েই ক্লাইভের জন্যে এই সম্মান।

ক্লাইভের দূত ওয়াটস এসে হাজির হলেন মীরজাফরের কাছে। ক্লাইভ এখন কলকাতার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাঁর এই পদগৌরব প্রাপ্তি উপলক্ষে তিনি আপনাকে কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছেন, একটু আমোদ-উৎসব করবেন বলে। মীরজাফর তখুনি রাজী। ঢাকা থেকে বজরা আনার হুকুম চলে গেল তখুনি।

এর ক'দিন আগে ঘটে গেছে আর এক ঘটনা। ক্লাইভ কলকাতায় চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মীরন ধরেছে নিজ মূর্তি। আবার সেই দুর্লভরামের সর্বনাশ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে সে। দুর্লভরামও বুঝে গেছেন, মীরন তাঁকে শেষ করবার জন্যে ব্যগ্র। দুর্লভরাম নিজের আংটির মধ্যে ভরে রেখেছেন বিষ। মীরনের হাতে লাঞ্ছিত হবার সম্ভাবনা দেখলে প্রাণ দেবেন বিষ খেয়ে। এই ফাঁকে নবাব মীরজাফরের কাছে আবেদন জানালেন, আমাকে এখানকার বসবাস উঠিয়ে কলকাতায় চলে যাওয়ার অনুমতি দিন। নবাব অনুমতি দিলেন। কিন্তু মীরন গররাজি। মীরন বললে, সেপাইশাস্ত্রিদের বকেয়া মাইনের কড়া-গণ্ডা মিটিয়ে না দিলে এক পাও নড়তে দেবো না এখান থেকে।

তারপরই ক্লাইভের নিমন্ত্রণ রাখতে মীরজাফর যেই পা বাড়িয়েছেন কলকাতার দিকে, মীরনের ইশারা পেয়ে এক ঝাঁক সেপাই এসে ঘেরাও করলে দুর্লভরামের বাড়ি। মাইনে মেটাও, মাইনে মেটাও রব সবার মুখে। মুর্শিদাবাদের মানুষ ভয়ে থরহরি। হবে বুঝি একটা রক্তারক্তি কাণ্ড। খবর ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। ছুটে এলেন ওয়াটস। মীরজাফরকে পাকড়াও করে তখুনি আদায় করে নিলেন দুর্লভরামের কলকাতা যাওয়ার অনুমতি। একা দুর্লভরামকে নিয়ে তখুনি পাড়ী দিলেন ওয়াটস কলকাতার দিকে। তাঁর পরিবারবর্গ রয়ে গেল মুর্শিদাবাদেই। স্ক্রাফটন রইলেন তাঁদের পাহারাদার হিসেবে।

মীরজাফরের বজরা পৌঁছল হুগলীতে। কলকাতা থেকে ক্লাইভ আর গণ্যমান্য ইংরেজরা ছুটে এলেন সেইখানে, নবাবকে সসম্মানে কলকাতায় নিয়ে

যেতে। মীরজাফর কলকাতায় পৌঁছলে, ইংরেজ পাড়ায় শুরু হয়ে গেল তুমুল উৎসব, খানা-পিনা, নাচগান, আলো-বাজি।

"একবার নবাব মীরজাফর, কলিকাতার কোম্পানী বাহাদুরের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহার জন্য যে সমস্ত খরচপত্র হইয়াছিল, ক্লাইভের সাক্ষরিত তাহার একটি বিস্তৃত হিসাব আছে। সে হিসাবটি আদ্যোপান্ত তুলিতে গেলে আমাদের স্থানে কুলাইবে না। খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি ছাড়া আরও কয়েকটি বাব বাবতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সে বাবগুলি এই—১৫ জোড়া পিতলের দেওয়ালগিরি ২২॥০ টাকা। কোর্ট হাউস বাড়িতে মদ্য খরচ—৭৬৯ টাকা। নবাবের জন্য একটি কাফ্রি-ক্রীতদাস খরিদ বাবত ৫০০ টাকা। সওগাদবাহী ভৃত্যদিগের পুরস্কার ৩১০ টাকা। ১৫ বাকস গোলাপজল ৩৯৭ টাকা। নবাবের প্রাসাদে ব্যবহারের জন্য ৭০ মণ মোমবাতি ৩৪৩ টাকা। ৬০ পাউণ্ড মসলীপট্টন চুরুট ৫০০ টাকা। দুই মণ ভিনিগার ৮০ টাকা। ৫ মণ কাফি—৩৩২ টাকা।"

কলিকাতা সেকালের ও একালের।

ক্লাইভ এবার বেশ নিশ্চিন্ত। প্রায় সবই পেয়েছেন। কেবল একটা জিনিস ছাড়া। সেটা জায়গীর। বাদশার মেহেরবাণীতে ছ-হাজারী মনসবদার ওমরাহ হয়েছেন তিনি। হিসেব মতন জায়গীর পাওয়ার কথা। অথচ পাননি। কথাটা তুলেছিলেন শেঠেদের কানে।

১৭৫৯। ৩১ জানুয়ারী। ক্লাইভের চিঠি শেঠদের কাছে।

"I always understood, that when you had procured me the Sunnod for a 6.000 Munsuf and 5.000 Horse, with the title of Zubdit-al-Muk-Nazier-ad-Doula, that the Nabab would have favored me with a Jaguire, equal to the rank I received by my Sunnod; but to this day I have not heard a word from him concerning it. As there is a strong friendships subsisting between you and me I beg leave to give you the trouble to apply to the Nabob concerning this Affair and that I may have a Jaguire equal to my Rank."

শেঠরা উত্তরে জানালেন—

নবাবকে আগে আমরা অনেকবার এ বিষয়ে বলেছি। তিনি জানিয়েছিলেন, বাংলা মুলুকে জায়গীর দিতে পারবেন না। আর উড়িষ্যা তো গরীব দেশ। বিহারে দিতে পারেন। আপনি কী রাজী হবেন এতে? যদি হন, জানাবেন।

আমরা ক'দিনের জন্যেই একটা তীর্থদর্শনে বেরোচ্ছি সপরিবারে। সপ্তাহ ছয়েক পরে ফিরবো।

ক্লাইভ আর মাথা ঘামাননি এ নিয়ে। কিন্তু তাঁর পাওনা জায়গীর জুটে যাওয়ার মতন ঘটনা ঘটে গেল হঠাৎ।

দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের বড় ছেলে শাহাজাদা আলী গোহর উজির গাজিউদ্দীনের সঙ্গে ঝগড়া করে রাজধানী থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিল অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার কাছে। সেখান থেকে বেশ কিছু সৈন্য সামন্ত জোগাড় করে পাটনায়। টনক নড়ল মীরজাফরের। নিজের সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করার মতন ক্ষমতা নেই তাঁর। অগত্যা শরণ নিতে হল ক্লাইভের। ক্লাইভ ছুটলেন পাটনায়। সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করতে হলনা তাঁকে। শাহজাদার ভাড়া করা সৈন্যরা, যারা রামনারায়ণের সঙ্গে লড়ায়ে মেতেছিল, ক্লাইভ আসছেন খবর পেয়েই রণে ভঙ্গ দিয়ে যে-যেদিকে পারল দৌড়। অসহায় শাহজাদা ক্লাইভের কাছে চিঠি লিখলেন আশ্রয় চেয়ে। ক্লাইভ তার জবাবে লিখলেন, আশ্রয়-টাশ্রয় হবে না। পাঁচশো আশরফি উপহার পাঠালুম। এই নিয়ে মানে-মানে বিহার ছেড়ে সরে পড়। এরপর ক্লাইভ রামনারায়ণকে পাটনায় আবার আগের মতন শক্ত সিংহাসনে বসিয়ে, বিদ্রোহী জমিদারদের শায়েস্তা করে পা বাড়ালেন মুর্শিদাবাদের দিকে।

ইতিমধ্যেই ওয়ারেন হেষ্টিংস, স্ক্রাফটনের বদলে মুর্শিদাবাদে যিনি এখন নতুন রেসিডেন্ট, ক্লাইভকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন, নবাব মীরজাফর আপনার এই দ্বিতীয়বারের পাটনা অভিযানের জন্য কৃতজ্ঞ। আর তারই ঋণ শোধের জন্যে এবারে আপনাকে জায়গীর দিতে ব্যস্ত।

মুর্শিদাবাদে ফেরার আগেই হাতে পৌঁছল শেঠদের চিঠি। তাতেও লেখা, নবাব এবার রাজী হয়েছেন আমাদের প্রস্তাবে। এবং আপনাকে, আমাদের প্রস্তাবমত, বাংলা মুলুকের ভিতরেই জায়গীর দেওয়া হচ্ছে।

"Shortly afterwords Clive came to Murshidabad, He was met, two miles north of the City, by the Nawab, Jagat Seth and other officers of the Court. After some conversation between the Nawab and Clive Nawab retired and Jagat Seth presented Clive, from the Nawab, with a silken bag containing the tittle deeds of his Jaghir." The House of the Jagat Seth.

মনের আনন্দে ক্লাইভ ফিরে এলেন কলকাতায়। তিনি এখন কলকাতার

আশপাশের পঞ্চান্নখানা গ্রামের জমিদার। ক্লাইভ একই সঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারী আবার কোম্পানীর জমিদার? একি কাণ্ড! এই নিয়ে শুরু হয়ে গেল বাদ-বিসম্বাদ, কোম্পানীর সঙ্গে। মামলা-মোকদ্দমার দিকে গড়াতে যাচ্ছিল ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত রফা হল, ক্লাইভ যতদিন বেঁচে থাকবেন, এই জায়গীরের খাজনা হিসেবে কোম্পানীর কাছ থেকে পাবেন বছরে তিরিশ হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় তিন লক্ষ টাকার মতন। তাঁর মৃত্যুর পর, জায়গীর হয়ে যাবে কোম্পানীর।

এতদিনে ক্লাইভ যেন ক্লান্ত। এতদিনে মনে পড়েছে স্বদেশকে। দেশে ফেরার জন্যে ব্যাকুলতা জেগেছে মনে। সবাইকে জানিয়ে দিলেন, দেশে ফিরবেন এবার। কিন্তু তাতেও ঘটে গেল দেরী। সামনে এসে দাঁড়াল শুকনো বিপদ। তবে ডাঙ্গায় নয়, জলে।

"কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে না করিতে পুনরায় এক অভাবনীয় নূতন আতঙ্ক উপনীত হইল। সংবাদ আসিল, যবদ্বীপ হইতে ওলন্দাজগণের যুদ্ধ-জাহাজ ও সৈন্যদল বঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। বঙ্গে ইংরেজদের অদ্বিতীয় প্রভুত্ব অন্যান্য ইউরোপীয়গণের ঈর্ষা আকর্ষণ করিয়াছিল। সম্প্রতি সোরার ব্যবসায় স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া এবং নানাপ্রকারে অন্যান্য বিদেশীয়গণের বাণিজ্যে ব্যাঘাত জমাইয়া ইংরেজপক্ষ সকলকেই বিশেষ উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছেন। ফরাসীরা বাংলা হইতে উৎখাত হইয়াছিল। বাণিজ্য প্রতিহত হইলে ওলন্দাজকেও অবিলম্বে প্রস্থান করিতে হইবে, ওলন্দাজপক্ষের ইহাও অজ্ঞাত ছিল না। নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার আকর্ষণ কিরূপ বলবান, ওলন্দাজ-বণিক দেশে অবস্থান করিয়া বিশেষ অবগত ছিলেন। ওলন্দাজগণের বঙ্গে যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণের স্বপক্ষে এই সমস্ত কারণ বর্তমান থাকিলেও, ইংরেজ পক্ষের সন্দেহ হইল, তাহারা নবাবের আমন্ত্রণে এই রণসজ্জায় আগমন করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ওলন্দাজগণকে এইরূপ ব্যবহার করিতে আহ্বান না করিলেও, তাহাদের দলবল আসিলে ইংরেজ প্রতাপ কিয়ৎপরিমাণে সংযত থাকে, নবাবের ইহা অভিপ্রেত ছিল। কেহ বা নির্দেশ করিয়াছেন, ইতিপূর্বে নবাবের ইঙ্গিত পাইয়াই ওলন্দাজগণ উক্তরূপ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি ক্লাইবের কৃত উপকার ও সদ্ব্যবহারে তৃপ্ত হইয়া, মীরজাফর পূর্ব অভিসন্ধি ত্যাগ করেন।"

বাঙ্গলার ইতিহাস।

এই সব হাঙ্গামা ঘটার বেশ কিছু আগে, ক্লাইভ মীরজাফরকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলেন একটা অর্ডার। তাতে লেখা, গঙ্গার উপর দিয়ে যত

বিদেশী জাহাজ আসা-যাওয়া করবে, তাদের সার্চ করার ক্ষমতা থাকবে ইংরেজদের। ফলে হল কি, ডাচদের জাহাজ যেমন এসেছিল তেমনি আবার ফিরে গেল কোনরকমেই বাণিজ্যের সুরাহা করতে না পেরে। ইংরেজরাও যেতে দিল চুপচাপ, কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা না বাধিয়ে। তার কারণ ছিল, এই সময় ওলন্দাজদের সঙ্গে কলকাতায় যুদ্ধ বাধালে সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়বে তার প্রতিক্রিয়া। তাই তারা নিজেরা কিছু না করে নবাবকে দিয়ে হুকুম জারী করিয়ে দিলে, সৈন্যসামন্ত বোঝাই জাহাজ নিয়ে নদীমুখে মাথা গলানো বারণ। চুঁচড়োর ওলন্দাজ গভর্ণর ক্ষমা চেয়ে জানালেন, আমাদের জাহাজ উল্টো বাতাসের মুখে পড়ে এখানে এসে গেছে। আমাদের অন্য কোন মতলব নেই।

ক্লাইভের ঘ্রাণশক্তি তীব্র। তিনি আঁচ পেলেন, সামনেই সমস্যা। ওলন্দাজরা এত সহজে পিছু হঠার পাত্র নয়। নিশ্চয়ই কোনও রকম ষড়যন্ত্র এঁটে চলেছে গোপনে, ইংরেজদের একাধিপত্যে চিড় ধরাতে। ক্লাইভ গোপনে প্রস্তুত করে রাখলেন নিজেদের পাল্টা আক্রমণের আয়োজন। গঙ্গার ওপারে থানা বা টানা দুর্গটাকে ভরিয়ে ফেলা হল সৈন্য-সামন্তে, গোলা-বারুদে। সেনাপতি হলেন ক্যাপ্টেন নক্স। গঙ্গার এপারে খিদিরপুর ডকের কাছে ছিল একটা মাটির বুরুজ, নাম চারনক্স ব্যাটারী। সেটাকে মেরামত করে সেখানেও ভরে রাখা হল গোলা গুলি, সৈন্যসামন্ত। ইতিমধ্যে কর্নেল ফোর্ড ফিরে এসেছেন কলকাতায়, ফরাসীদের ঠেঙ্গিয়ে মসলিপত্তম জয় করে। ক্লাইভ তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন চন্দননগরে, গেরোটির বাগানের কাছে।

এই করতে করতে অক্টোবর। ক্লাইভ দেশে চলে যাবেন শুনে মীরজাফর ছুটে এসেছেন কলকাতায়, শেষ মোলাকাত করতে। সঙ্গে জগৎশেঠ। কলকাতায় আবার সেই আগের মতন ধুমধাম, নবাবকে আপ্যায়ন করতে। আপ্যায়নটা হয়েও ছিল ভাল রকম। একা নবাবের জন্যে কোম্পানীর খরচ হয়েছিল ৭৯ হাজার ৫৪২ টাকা ৪ আনা ৬ পাই। আর জগৎশেঠের জন্যে ১৭ হাজার ৩৭৪ টাকা ১ আনা ৬ পাই।

আর এই আমোদ উৎসবের মাঝখানেই, মীরজাফর কলকাতায় থাকতে থাকতেই, ঘটে গেল এক অনর্থ। অর্থাৎ যুদ্ধ। ভাগীরথীর মুখে এই সময় এসে হাজির হল সাতটা যুদ্ধজাহাজ, ওলন্দাজদের। যুদ্ধে নেতৃত্ব দিলেন কর্নেল ফোর্ড। যুদ্ধ হল মাত্র দুঘণ্টা। ওলন্দাজদের সাতটা রণতরীই দখলে এসে গেল ইংরেজদের।

এবার ক্লাইভ ঝাড়া-হাত পা। বাক্স-প্যাঁটরা গোছাতে লাগলেন, দেশে

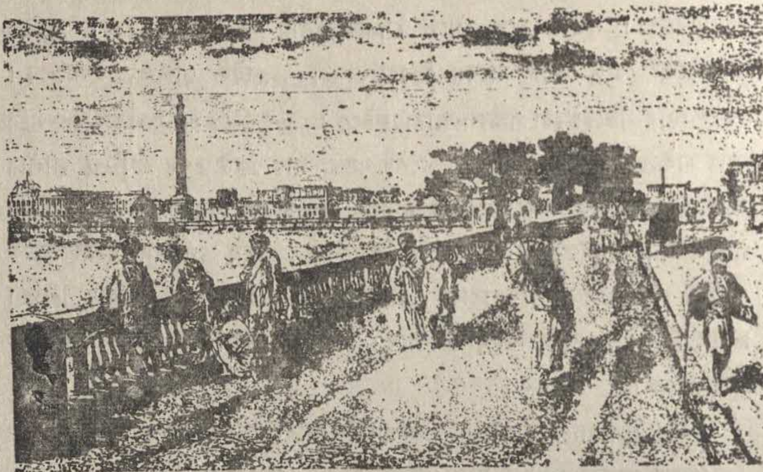
ফেরার জন্যে। তবে যাওয়ার সময়েও তাঁর অনেক কাজ। অনেক দায়-দায়িত্ব, ভাবনা-চিন্তা। তিনি চলে গেলে সেনাবাহিনীর সর্বেসর্বা হবে কে? ক্লাইভ চান নিজেই বেছে দিয়ে যাবেন উত্তরাধিকারী। ক্লাইভ চাইলেন, ফোর্ডকে। কোম্পানীর ডিরেক্টররা পাঠাল আয়ারকুটকে। এই নিয়ে মন কষাকষি শুরু হয়ে গেল ক্লাইভের সঙ্গে কোম্পানীর। শেষ পর্যন্ত, আয়ারকুট তখন কাউন্ট লালীর সঙ্গে দক্ষিণে যুদ্ধে ব্যস্ত বলে, মনোনয়ন দেওয়া হল অন্য একজনকে। তিনি মেজর জন ক্যাইলোড। ক্যাইলোড কলকাতায় এসে পৌছনো মাত্রই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল মুর্শিদাবাদে; মীরজাফরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। ক্লাইভ নিজেই রওনা দিলেন মুর্শিদাবাদে। তারপর শেষ বিদায় নিলেন নবাবের কাছ থেকে।

সমস্যা ছিল আরো একটা। কোম্পানীর ভাবী গভর্ণর নিয়ে।

পুরনো লোকজন সবাই চলে গেছেন দেশে। পুরনোদের মধ্যে আছেন মাত্র একজনই। তিনি হলওয়েল। সেই অন্ধকূপ হত্যা নামের রূপকথাটি যাঁর লেখা। ক্লাইভের তাঁকেও পছন্দ নয়। শেষ পর্যন্ত ক্লাইভের পরামর্শমত নাম ঠিক হল, হেনরি ভ্যানসিটার্ট। মাদ্রাজের সিভিল সার্ভিসের লোক। কিন্তু নানান কাজের চাপে কলকাতায় পৌছতে দেরী হবে তাঁর। তাই সেই হলওয়েলকেই গভর্ণর করা হল ক'মাসের জন্যে।

১৭৬০। ফেব্রুয়ারী ২৬। চাঁদপাল ঘাট।

ক্লাইভের সঙ্গে ফোর্ড। জাহাজ, রয়্যাল জর্জ, দাঁড়িয়ে আছে দূরে, ক্লাইভকে তাঁর স্বদেশে পৌঁছে দেবে বলে। ক্লাইভ পানসীতে চেপে বসলেন।



॥ কলকাতার আদি বাসিন্দে ॥

কলকাতার আদি বাসিন্দের কারো কারো সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। সকলের সঙ্গে হয়নি। শেঠ, বসাকরাই কলকাতার আদিতম বাসিন্দে। এই শেঠ বংশের আদি পুরুষ হলেন মুকুন্দরাম শেঠ। তাঁর সম্পর্কে বিশদ কিছু জানার উপায় নেই।

জন্ম সপ্তগ্রামেয় শ্রেষ্ঠী বংশে। বসতবাটি হলদিপুরে। হলদিপুর বা হলুদপুর নাম হয়েছিল শেঠরা হলুদ দিয়ে সুতো মাজতো বলে। লোকে বলত, শেঠরা ক্রোড়পতি। কুঠি ছিল, রেশম আর তুলোর সুতো তৈরির। আবার সেই সুতো থেকে কাপড় বোনার। তা ছাড়াও ব্যবসা ছিল মোগল দরবারে কাপড়-চোপড় সরবরাহের। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ থেকে কিনে আনতেন দামী কারুকার্যময় বস্ত্র। যেমন মসলিন, অব্রবান, তাঞ্জেব, বাফতা, ডোরিয়া, চারখাসা, জামদানি, নানান রঙের কসিদা মলমল এই সব। তাঁর কুঠি শুধু হলদিপুরেই ছিল না। ছিল রাজমহলে, মুর্শিদাবাদে, কাশীমবাজারে, ঢাকায়, হুগলীতে, শান্তিপুরে, কাশীজোড়ায়, বালেশ্বরে।

সেকালে বেতাই চণ্ডী পুজোর সময় বাঁটরায় বসত বিরাট এক মেলা। সেই মেলায় এসে হাজির হত দেশ-বিদেশের বণিক। এদেশের সেরা জিনিসের উপর তাদের নজরটা চিরকালই লোভী। ছোটখাট চালাঘর বানিয়ে থাকতো তারা মেলার ক'দিন আর কেনাকাটি করে বেড়াত। ঐ মেলার সেরা দোকান

মুকুন্দরামের। সপ্তগ্রাম থেকে নৌকো বোঝাই করে আনতেন জিনিসপত্র। মেলার দোকানে। দেখতে দেখতে একটা স্থায়ী বাজার গড়ে উঠেছিল বাঁটরায়। তারপর ক্রমে ক্রমে মজে শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেল সরস্বতী নদী। তখন বিদেশী বণিকরা ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে সপ্তগ্রামে যেতো বটে, কিন্তু আগের মত জমজমাট ব্যবসা আর জমল না। তখন শেঠদের চোখ পড়ল কলকাতার দিকে। সেখানেই যত জাহাজ, যত বিদেশী বণিক। তাহলে পা বাড়ানো যাক কলকাতার দিকে।

"প্রাচীন কলিকাতা অঞ্চলে বৈদেশিক বণিকবর্গের সতত সমাগম দেখিয়া ১৫৩৭ খৃঃ অঃ মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠী তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺গোবিন্দ রায়জীউকে লইয়া অগ্নিঋষি গোত্রজ কালিদাস বসাকের সহিত কালীক্ষেতে আসিয়া প্রথম বসতি করেন। ঐ স্থানটি কালীদেবীর পীঠস্থানের এক মাইল উত্তর পশ্চিমে আদি গঙ্গার সংযোগস্থলে, গঙ্গার পূর্বকুলে অবস্থিত ছিল। তথায় তাঁহার কুলদেবতা গোবিন্দ জীউকে স্থাপন করেন। গোবিন্দ জীউর নামানুসারে তথাকার নাম গোবিন্দপুর হয়। পূর্বে ঐ স্থানকে কালীক্ষেত বলিত। কালক্রমে উহা কলিকাতা নামে রূপান্তরিত হয়।

ঐ স্থানে ধনী শেঠ-বসাকগণ বসবাস করিতেন বলিয়া কবিকঙ্কন চণ্ডী কাব্যে ধনস্ত গ্রাম নামে বর্ণিত আছে। ঐ স্থানটি নাবাল ছিল। বৎসর বৎসর লবণ হ্রদের (গঙ্গার) জল আসিয়া ভাসিয়া যাইত। জল নামিয়া গেলে, ধীবরেরা মৎস ধরিয়া শুষ্ক করিত, তাহাতে তথাকার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু হইয়া মহামারী হইত। কালক্রমে ঐ স্থানটি ধাপধারা গোবিন্দপুর নামে খ্যাত হয়। ইহার দক্ষিণ সীমান্ত খাতটি 'গোবিন্দপুর খাত' (বুড়িগঙ্গা) নামে প্রসিদ্ধ ছিল।"

কলিকাতাস্থ তন্তু-বণিক জাতির ইতিহাস।

মুকুন্দরামের ছেলে, লালমোহন। ইংরেজদের লেখা গোড়ার দিকের ইতিহাসের বইয়ে ইনি লালমোহন বসাক নামে পরিচিত। বাবার সঙ্গে ইনিও হলুদপুর ছেড়ে চলে আসেন গোবিন্দপুরে। এঁর সম্পর্কে অনেক প্রবাদ চালু ছিল একসময়। ইনিই নাকি প্রথম কাটিয়েছিলেন লাল দিঘী। এঁরই নাম থেকে দিঘীর ঐ নাম। এখন যেখানে জেনারেল পোষ্ট অফিস, তারই কাছাকাছি জায়গায় ছিল মুকুন্দরামের বিরাট কাছারী বাড়ি। ১১০ বিঘে জমির উপর। ভিতরে ফল-ফুলের চমৎকার বাগান। এক সময় ঐ বাগানের নাম হয়ে যায়, শেঠ-বাগান। এই লালমোহনের উদ্যোগেই লালদিঘীর কাছাকাছি যে বাজার বসানো হয়, সেও ঐ লালমোহনের নামে হয়ে যায় লালবাজার।

শেঠ-বাগানের দক্ষিণে তখন চাষ হতো। চাল হতো খুব সুন্দর। সেই চাল শেঠদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর ভোগে লাগতো বলে, নাম হয়ে যায়, গোবিন্দ ভোগ।

লালমোহনের ছেলে গিরিধারী। গিরিধারীর ব্যবসা ছিল প্রধানত বরানগরে। বরানগরে তখন বাপ্তা কাপড়ের বিরাট ব্যবসা। গিরিধারী তাঁতীদের দাদন দিয়ে সেই বাপ্তা বোনাত।

গিরিধারীর দুই ছেলে। ব্রজরাম আর সাগররাম। ইনি সংসার ছেড়ে দিয়ে চৌরঙ্গীর জঙ্গলে থাকতেন, অবধূত চৌরঙ্গীনাথের শিষ্য হয়ে, চৌরঙ্গীনাথের মৃত্যুর পর তাঁর শিবলিঙ্গটাকে তিনি তুলে আনেন বির্জিতলাও পুকুরের পশ্চিম পাড়ে। চৌরঙ্গীনাথের শিষ্য বলে ব্রজনাথের নাম থেকেই পুকুরের নাম বির্জিতলা। ব্রজরামের মৃত্যুর পর ঐ শিবের নাম হয়ে যায় ব্রজেশ্বর। কেউ কেউ লিখেছেন, ১৯২৭-এ তখনকার বিখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব ঐ মন্দির ভেঙে শিবলিঙ্গটিকে নিয়ে চলে আসেন বাবুঘাটে। তার ফলে হিন্দু সমাজে নাকি উথলে উঠেছিল বিরাট বিক্ষোভ। তাই দেখে তখনকার ছোটলাট আবার সেটাকে ফিরিয়ে আনেন আগের জায়গায়।

গিরিধারীর ছোট ছেলে সাগররাম। দাদার মতন নন। বাপ-ঠাকুর্দার মতন ব্যবসায়ী। তখন হাটখোলায় প্রত্যেক শনিবারে বসত হাট। সুতানুটির হাট। সেখানেই বিদেশী বণিকদের সঙ্গে তাঁর ছিল বেচাকেনার ব্যবসা।

“বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ওলন্দাজগণ খিদিরপুর হইতে শাকরেলের খাল গভীর করিয়া দেন। তদবধি উহা কাটিগঙ্গা নামে অভিহিত হয়। যাঁহারা কাটিগঙ্গা বাহিয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেন, ওলন্দাজেরা তাঁহাদের নিকট মাশুল (টোল) আদায় করিতেন। যে স্থান এক্ষণে ‘ব্যাঙ্কশাল ঘাট’ নামে প্রসিদ্ধ, পূর্বে তথায় ওলন্দাজদিগের কুঠী ছিল। ১৬৩২ খৃঃ অঃ সাগররাম বঙ্গের নানান স্থান হইতে বহু সুদক্ষ তন্তুবায়দিগকে আনয়ন করিয়া গোবিন্দপুরে (বর্তমান গড়ের মাঠে অকটর্লনী মনুমেন্টের নিকট) বস্ত্রবয়নের ও সূত্র নির্মাণের এক সুবৃহৎ কার্যালয় স্থাপিত করেন। তথায় প্রত্যহ প্রায় আড়াই হাজার তন্তুবায় সদাসর্বদা কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সপ্তগ্রাম ধ্বংস হইলে, তথাকার তন্তুবায়গণ ও বরানগরের তন্তুবায়গণ উঠিয়া আসিয়া প্রথমে প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশে বসতি করেন এবং শেঠ-বসাকদিগের নিকট সূতা দাদন লইয়া বস্ত্র বয়ন করেন ও সূতার লুটি প্রস্তুতাদি কর্ম করিতে থাকেন। তাহাতে সে স্থানটি সূতালুটি নামে আখ্যাত হয়। ১৬৬০ খৃঃ অঃ মধ্যে তথায় বহু তন্তুবায়ের বাস হয়। চাঁদপাল

ঘাটের নিকট বহু তন্তুবায়ের বাস ছিল। তথাকার প্রতিবাসী চাঁদপাল নামক জনৈক সমৃদ্ধিশালী তন্তুবায়ের নামানুসারে চাঁদপাল ঘাট হয়, যাহা অদ্যাপি বর্তমান। তখন গঙ্গা হইতে একটি খাল বাহির হইয়া বেলেঘাটা দিয়া, বর্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ট্যাঙ্ক হইয়া চাঁদপাল ঘাটে পতিত হইত।"

কলিকাতাস্থ তন্তু-বণিক জাতির ইতিহাস।

সাগররামের দুই ছেলে। নন্দরাম আর সুন্দররাম। নন্দরাম নিঃসন্তান। সুন্দররামের এক ছেলে। জগন্নাথ। শ্রীরামপুরে আসতো ডাচ আর ফরাসী বণিকদের জাহাজ। সুন্দররাম ছিলেন তাদের বেনিয়ান। বেচাকেনার সমস্ত দায় তাঁরই কাঁধে। একবার তামার পাতে লেখা ডাচ কোম্পানীর বেশ কিছু কাগজ কিনেছিলেন তিনি। ব্যবসায় লোকসান হচ্ছে দেখে সে কোম্পানী পালিয়ে গেল। সুন্দররাম ভাসতে লাগলেন অগাধ জলে। পরে ফরাসী বণিকের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে আবার সামলে তুললেন নিজেকে।

জগন্নাথ শেঠের চার ছেলে। বড় ত্রিলোচন। ছোট রাজাধর। মেজ এবং সেজ ছেলে কামদেব আর নারায়ণ নিঃসন্তান। রাজাধরের কাপড় তৈরির কারখানা ছিল কামারহাটীতে।

ত্রিলোচনের ছোট ছেলে অনন্তরাম। অনন্তরামের চার ছেলে। কাশীনাথ, গোপীনাথ, বংশীধর, লম্বোদর। কাশীনাথের দুই ছেলে। কিরণচন্দ্র আর গোবর্দ্ধন। এই গোবর্দ্ধনের চার ছেলের মধ্যে দুজনের কথা আমরা আগে জেনেছি। জনার্দন আর বারানসী। এঁরা দুজন এবং জনার্দনের বড় ছেলে বৈষ্ণবচরণ প্রাচীন কলকাতার নাম-ডাক-ওয়ালা মানুষ। প্রাচীন কলকাতার যে-কোন ইতিহাসে ছড়ানো রয়েছে এঁদের স্মৃতিকথা।

বৈষ্ণবচরণ সম্বন্ধে 'কলিকাতাস্থ তন্তু-বণিক জাতির ইতিহাস' থেকে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এখানে।

"বৈষ্ণবদাস যেমন ধনকুবের ছিলেন, তেমনি ধর্মেও যুধিষ্ঠির। কথিত আছে যে, তাঁহার মাতাঠাকুরাণী, জনৈক রাজমাতার জলসংক্রান্তি ব্রত উপলক্ষ্যে ১০৮টি দিঘী পুণ্যধাম বারানসী ও পুরুষোত্তম (জগন্নাথ) ক্ষেত্র হইতে কলিকাতার মধ্যবর্তী প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খনন করতঃ এবং তদপকূলে ১০৮টি ব্রাহ্মণ পরিবারের বসতি স্থাপন করাইয়া মাতাঠাকুরাণীর জলসংক্রান্তি ব্রত উদ্‌যাপন করান। পুরীধামের চন্দনপুকুর, বালটিকারীতে শেঠ দিঘী, কালীঘাটের দিঘী উহার মধ্যে অন্যতম। তৎকালীন প্রথানুযায়ী বড়বাজারে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের বসতি স্থাপন করেন। নীলমনি ঠাকুরকে জোড়াসাঁকোয় কয়েককাঠা জমি

বাসার্থে দান করেন। রামদুলাল মিশ্রকে জোড়াবাগানে ৫ কাঠা জমি দান করেন। রামরতন ঠাকুরকে ধোবা পুকুরে (রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটে) ১ বিঘা ৪।।০ কাঠা জমি দান করেন। বর্তমান কাশীপুরে শ্রীশ্রী৺সর্বমঙ্গলা ঠাকুরাণীকে ২ বিঘা জমি দান করেন মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগর উপলক্ষে গজ দান করিয়া গজদানি উপাধি লাভ করেন। তাঁহার বহু ভূসম্পত্তি ছিল। জোড়াবাগানে পাশাপাশি দুইটি বাগান তাঁহার ছিল, দেশরক্ষার্থে ঐ বাগানে ইংরাজদিগের কামান বসান (Battery) ছিল। ঐ বাগানের পূর্বদিকস্থ রাস্তার নাম অদ্যাপি বৈষ্ণবচরণ শেঠ ষ্ট্রীট নামে অভিহিত এবং তদসংলগ্ন গলি দুটিও তাঁহার নামে অদ্যাপি খ্যাত। টালায় (বর্তমান কাশীপুরে) ৫১ বিঘা ৮ কাঠা জমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিক্রয় করেন। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীজোড়া নিবাসী দামোদর দাসবর্মার পূর্বপুরুষ কাশীনাথ বর্মার নামানুসারে টালার কিয়দংশ কাশীপুর নামে অভিহিত হয়। ঐস্থানে ইংরাজদিগের সূতার গুদাম ছিল। পরে উহা দুর্গে পরিণত হয়। এক্ষণে তথায় কাশীপুর গান এ্যাণ্ড সেল ফ্যাক্টরী অবস্থিত। তাঁহার সততার বহু উল্লেখ আছে। এক সময়ে তিনি বর্দ্ধমানের তাম্বুলি-বণিক গোবর্দ্ধন রক্ষিতের নিকট হইতে দশ হাজার মণ চিনি আমদানি করেন। কদমতলা ঘাটে (ট্যাকসালের নিকট) মাল আসিলে, তিনি কর্মচারীগণের প্ররোচনায়, উহা নমুনাযায়ী নহে জানিয়া মূল্যের কিঞ্চিৎ হ্রাস করিতে গোবর্দ্ধনকে অনুরোধ করেন। অসাধু উপায়ে কলঙ্ক গ্রহণ না করিয়া তিনি সমুদয় চিনি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দেন। কিয়ৎ পরিমাণে কার্য সাধিত হইলে বৈষ্ণব দাস গোবর্দ্ধনের মনোভাব জানিয়া অবশিষ্ট চিনি লইয়া সম্পূর্ণ মূল্য দিতে চাহেন। রক্ষিত মহাশয় শেঠ মহাশয়ের এরূপ সততা দেখিয়া কেবলমাত্র অবশিষ্ট মালের দাম লইয়া বিবাদ মিটাইয়া লয়েন। একদা তিনি তাঁহার অংশীদার গৌরী সেনের নামে কিয়ৎ পরিমাণ দস্তা ক্রয় করেন। দস্তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য পাওয়া যায়। ইহা তাঁহার অংশীর সৌভাগ্যে ঘটিয়াছে ভাবিয়া উহার লভ্যাংশ সমস্তই তাঁহাকে দেন। তাহাতে গৌরী সেন ধনবান হইয়া ঋণগ্রস্ত বা দাদনের টাকা প্রত্যর্পণ করিতে অপারক অথবা সদনুষ্ঠানের জন্য কলহাদি করিয়া যাহারা অর্থদণ্ডে কারাবাস ভোগ করিতেন, তিনি ঐ দৈবোপার্জ্জিত অর্থ হইতে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন। তাহাতেই 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদটি প্রচলিত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমিন চাঁদ নামক জনৈক শিখ বণিক বঙ্গদেশে আসিয়া তদানীন্তন প্রথিত-যশা বৈষ্ণবচরণ ও তস্য ভ্রাতা মানিকচাঁদ মহোদয়ের

নিকট কার্যে নিযুক্ত হন। ইনি বাঙ্গলার ইতিহাসে উমিচাঁদ নামে পরিচিত। স্বীয় কর্মদক্ষতার গুণে ইতি অচিরেই শেঠ-গণের কারবারের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া উঠেন। এবং প্রভূত ধনোপার্জন করেন।…বর্গীর অত্যাচারের জন্য ১৭৪২ খৃঃ অঃ বৈষ্ণব দাস প্রমুখ শেঠ-বসাক বণিকবর্গের উদ্যোগে ও ব্যয়ে সুতানুটির উত্তরাংশ হইতে গোবিন্দপুরের দক্ষিণাংশ পর্যন্ত মাহ্‌র্াট্টা খাদ নামে এক পরিখা খনিত হয়। এ সময়ে সমাজ বন্ধন দৃঢ় ছিল। বৈষ্ণবচরণের সমাজ-বন্ধন বাটিতে সমাজের গুণাগুণ বিচার হইত। তখন সমাজে পাঁচজন দলপতি ছিলেন, যথা—বৈষ্ণবচরণ শেঠ, চৈতন্যচরণ শেঠ, গৌরীসুন্দর শেঠ, রাধাকৃষ্ণ বসাক, বৃন্দাবন চন্দ্র বসাক। সমাজ-বন্ধন বাটীতে যে সভা-সমিতি হইত, তাহা 'সতেক' নামে বিদিত ছিল। বৈষ্ণবচরণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত একচেটে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ঐশ্বর্যবান হন। হরিপাল, ধনেখালি, গৌরীপুর, বাঁটরা, ২৪পরগণা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার বস্ত্র বয়নের কার্যালয় ছিল। সময়ে সময়ে তিনি কোম্পানীকে বহু অর্থ কর্জ দিয়া তাঁহাদিগের যথেষ্ট উপকার করিতেন। তিনি পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে বহু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি করিয়াছিলেন। তাহার মূল্য তেত্রিশ লক্ষ টাকা আর্কট ও মনিস্থরতি ধার্য হইয়াছিল। সেকালে সঞ্চিত অর্থাদি ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিত। পরিশেষে ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকসান যাইলে, তিনি বহু সম্পত্তি উমিচাঁদের নামে বেনামা করিয়াছিলেন। ইহার ভ্রাতা মানিকচাঁদের মৃত্যুতে বৰ্দ্ধমানের বুড়ী রাণীর নিকট অর্থ সংক্রান্তে তিনি কিছু বিব্রত হইয়াছিলেন। কাশীজোড়া, বৰ্দ্ধমান, প্রভৃতি স্থানীয় রাজন্যবর্গের সহিত তাহার বন্ধুত্ব। স্বীয় পত্নী তনুমণি এবং তাঁহার দুইপুত্র-নিমাই চরণ ও গৌরচরণকে রাখিয়া ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি বৈকুণ্ঠধাম গমন করেন। তনুমণি শেঠাণী তাঁহার স্বামীর আত্মার তৃপ্তির জন্য কোতরঙ্গে দ্বাদশ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবনে তিনি তাঁহার সৎকীর্তি ও দান-শীতলার জন্য প্রসিদ্ধ।"

কলকাতার প্রাচীন বাসিন্দেদের মধ্যে আরেকজন স্বনামধন্য হলেন হরি ঘোষ। আজও তিনি বেঁচে আছেন 'হরি ঘোষের গোয়াল' নামের প্রবাদ বাক্যটির ভিতরে। গোয়াল শুনে মনে হতে পারে সত্যিই তাঁর গোয়াল ছিল বুঝি বিরাট। তা নয়। ছিল রান্নাঘর। অথবা ভোজনালয়। দিনরাত রাবণের চিতার মত উনোন জ্বলে চলেছে সেখানে। আর দেউড়ির দরজা সব সময়েই খোলা। যে যেখান থেকে আসুক, পৌঁছলেই তার জন্যে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত। যতক্ষণ খুশী থাকো, খাও, না বলার কেউ নেই। এই হরিঘোষের পূর্বপুরুষ

মনোহর ঘোষ-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। মনোহরের ছেলে রামসন্তোষ। তাঁর ছেলে বলরাম।

"ফ্রেঞ্চ-গভর্ণর ডুপ্লের দেওয়ান – বলরাম ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহরি ঘোষ। এই হরি ঘোষ পরে, মুঙ্গেরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। হরি ঘোষ কোম্পানীর অধীনে দেওয়ানী করিয়া অনেক টাকা উপায় করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রচুর সম্পত্তির অধিকাংশ তিনি দান-ধ্যানে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। অনেক বেকার কর্মহীন গোত্রহীন জ্ঞাতি-গোত্র ও আত্মীয়বর্গ তাঁহার কলিকাতার আবাস-বাটীতে আশ্রয় লইয়া, তাহা কোলাহল-সঙ্কুল করিয়া তুলিত। অনাহুত ও রবাহুতগণেরও নিত্য অন্নপ্রাপ্তির বিঘ্ন ঘটিত না। এই জন্যই আজও কোন বাটীতে বেশী লোক থাকিলে লোকে বলে – 'এটা যেন হরি ঘোষের আড্ডা'। হরি ঘোষ অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সারল্যের সুযোগ পাইয়া এক অন্তরঙ্গ মিত্র তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া তাঁহার যথাসর্বস্ব গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ অবস্থাটা তাঁহার বড়ই কষ্টে কাটিয়াছিল। সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি মনের দুঃখে কাশীবাসী হন।"

কলিকাতা সেকালের ও একালের।

"আদিসুরের দ্বারা কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আনীত কায়স্থ মকরন্দ ঘোষ হইতে এই ঘোষ বংশের উদ্ভব।…শ্রীহরি ঘোষ বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং ইংরাজীতেও সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।…১৮০৬ সালে কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, হরলাল ও রসিকলাল নামক চারি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।"

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়।

এবার মল্লিকবংশের কথা। রাজারাম মল্লিকের কীর্তি ও কাহিনী আমরা আগেই শুনেছি। তাঁর ছেলে দুজন। দর্পনারায়ণ ও সন্তোষ। দর্পনারায়ণের চেয়ে সন্তোষ মল্লিক বিখ্যাত। কেননা কলকাতার একটা বাজারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর খ্যাতি। ১৭১১-র কাছাকাছি সময়ে কলকাতার বাজার ছিল চারটে। ১। বাজার কলিকাতা। ২। সন্তোষ বাজার। ৩। মণ্ডীবাজার। ৪। লালবাজার। ঐ সন্তোষ বাজারের জনক হলেন সন্তোষ মল্লিক। দর্পনায়ারণের ছেলে নয়নচাঁদ। আবার অন্য একটা আদরের নামও ছিল, কমলনয়ান। ডাকাতির ভয়ে নিজের অট্টালিকার চার পাশে তিনি তুলেছিলেন বিরাট দেওয়াল। লোকে বলতো 'কমলনয়ানের বেড়।' তখনকার একটা ছড়ায় এই দেয়ালের ইঙ্গিত রয়েছে।

কায়েত মরে খেয়ালে
বেনে মরে দেয়ালে
জোলা মরে তাঁতে
কাঙালী বাঙালী মরে
মাছে আর ভাতে।

এবার চোখ ছড়াবো পুরনো কলকাতার আরও একটা ছড়ার দিকে। পলাশী যুদ্ধের আগে যে-সব বাঙালী বা ব্যবসায়ীরা ধনদৌলতে শ্রেষ্ঠ, এই সব ছড়ার মধ্যে তাদেরই জয়ধ্বনি।

১। বনমালী সরকারের বাড়ি
গোবিন্দরামের ছড়ি
আমিরচাঁদের দাড়ি
হুজুরিমল্লের কড়ি।

২। নন্দরামের ছড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি
হুজুরিমল্লের কড়ি।

৩। গোবিন্দরামের ছড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি
নকুড়ধরের কড়ি
মথুরসেনের বাড়ি।

বনমালী সরকারের বাবার নাম আত্মরাম সরকার। আদি নিবাস ভদ্রেশ্বরে। ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের দেওয়ান। সেখান থেকে চলে আসেন কুমোরটুলিতে। বনমালী ছাড়া আত্মারামের ছিল আরো দুই ছেলে। রাধাকৃষ্ণ আর হরেকৃষ্ণ। বনমালী ছিলেন পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান। পরে কিছুকাল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডেপুটি ট্রেডার। তা ছাড়া ছিল নিজের ব্যবসা। সেই টাকাতেই বাবুগিরি। বনমালী সরকারের কুমোরটুলির বাড়ি ছিল তখনকার কলকাতার একটা দ্রষ্টব্য বিষয়। কেউ কলকাতায় এসে বনমালী সরকারের বাড়ি না দেখে ফিরতো না। ছুটে আসতেন রাজা-মহারাজাও।

আমিরচাঁদ আর উমিচাঁদ একই মানুষ। তাঁর কথা আর নতুন করে বলার দরকার নেই। হুজুরীমল তাঁরই নিকট আত্মীয়। প্রচুর পয়সা-কড়িওয়ালা মানুষ। বৈঠকখানা বাজারের সামনে ছিল তাঁর বাগানবাড়ি। তার ভিতরে

কাটিয়েছিলেন বিরাট পুকুর। তার থেকেই রাস্তাটির নাম হয়েছিল, হুজরী মল ট্যাঙ্ক লেন। বসতবাটি বড়বাজারে।

নকুড়ধর অথবা নকুধর কলকাতার আর একজন ডাকসাইটে বড়লোক। আসল নাম, লক্ষ্মীকান্ত ধর। পোস্তার রাজবংশের আদিপুরুষ।

"ইনি জব চার্ণকের সহিত হুগলী হইতে সুতানুটিতে আইসেন। তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রাম। তিনি তৎকালে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি ছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্বে তিনি ক্লাইবকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন এবং প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নয় লক্ষ টাকা কর্জ দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন যখনই কোম্পানীর অর্থের প্রয়োজন হইত, তিনি সাহায্য করিতেন। অন্যান্য বিষয়েও তিনি কোম্পানীর বন্ধু ছিলেন। লক্ষ্মীকান্তই শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণকে প্রথম ক্লাইবের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। এবং তাহাতেই তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। কথিত আছে, নবকৃষ্ণ পোস্তার রাজবাটীতে কখন জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন না। লক্ষ্মীকান্তের কোন পুত্র সন্তান ছিল না, একমাত্র কন্যা পার্বতী দাসীকে রাখিয়া তিনি মারা যান।"

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়।

এরপর মথুর সেন। পুরো নাম মথুরামোহন সেন। বাবা, জয়মনি সেন। পেশায় পোদ্দার। জাতিতে সুবর্ণবণিক। মথুর সেন গড়েছিলেন ব্যাঙ্ক। লোকে তাই বলতো 'ব্যাংকার মথুর সেন'।

"তিনি ডাভটন (Doveton) নামে এক জেনারেলের খাজাঞ্চি ছিলেন। যশোর জেলায় তাঁর সাতটা নীলের কুঠি ছিল। গ্রাম বর্মাযুদ্ধের সময় (১৮২৪-২৬) তিনি গভর্ণমেন্টকে ১৬ লক্ষ টাকা ধার দেন। তিনি নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ৩ লক্ষ টাকা খরচ করে ১৪ বিঘে জমির উপর চার ফটকওয়ালা এক বিরাট প্রাসাদ তৈরী করেন লাটভবনের অনুকরণে। সেই জন্য ইংরেজ গভর্ণমেন্ট তাঁর উপর চটে যান ও হুকুম দেন একটা গেট সর্বদা বন্ধ রাখতে। তাঁর বাড়ির সীমানা ছিল উত্তরে গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, দক্ষিণে নিমতলা ঘাট স্ট্রীট, পূর্বে গৌর লাহা স্ট্রীট ও পশ্চিমে মথুর সেন গার্ডেন লেন। এই বাড়ি পরে যদুলাল মল্লিকের বংশধরদের সম্পত্তি হয়।...এই বাড়িতে 'ডাফ কলেজ' বা 'ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন' ১৮৪৪-এর মার্চ থেকে ১৮৫৭-র মার্চ পর্যন্ত মোট ১৩ বছর ছিল। পশ্চিমপাশে নিজস্ব বাড়ি তৈরি হলে কলেজ সেখানে উঠে যায়। ডাফ কলেজ উঠে গেলে মথুর সেনের বাড়িতে (৬৮ নম্বর নিমতলা ঘাট স্ট্রীট) কলিকাতা নর্মাল স্কুল ও তার আনুষঙ্গিক কলিকাতা মডেল স্কুল ৮৩

নম্বর আপার চিৎপুর রোড থেকে (যেখানে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল পড়েছিলেন) উঠে আসে ও ১৯০১ সাল পর্যন্ত থাকে।...বনমালি সরকারের বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু মথুর সেনের বাড়ি হীনদশায় এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর বাড়ির কাছেই একটি ঠাকুরবাড়ি ও ফুলের বাগান মথুর সেন তৈরি করেছিলেন। প্রথমটি এখনো আছে, দ্বিতীয়টি নেই, যদিও তার নামটি এখনো বেঁচে আছে— মথুর সেন গার্ডেন লেন। এই গলির ৮ নম্বর বাড়িতে মথুর সেনের বংশধর ও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু ও সাহিত্যিক প্রিয়নাথ সেন বাস করতেন। এখনো সেই বাড়ির উপর লেখা আছে 'প্রিয়নাথ ভবন'।"

রাধারমণ মিত্র।

প্রিয়নাথ সেন-এর মৃত্যু-উপলক্ষে সুরেশ সমাজপতি লিখেছিলেন—

"৮নং মথুর সেনের গার্ডেন লেনে বাংলা সাহিত্যের একটি তীর্থ ছিল। বাংলায় সে তীর্থের কথা সকলে জানিত না।

একদা রবীন্দ্রনাথ সে তীর্থের নিত্য যাত্রী ছিলেন। স্বনামধন্য মথুর সেন মহাশয়ের বংশে একজন সাহিত্য সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি প্রিয়নাথ সেন।"

মথুর সেনের চার ছেলে। মেজ ছেলে রূপনারায়ণ করতেন ব্যবসা-বাণিজ্যের তদারকি। মৃত্যু হয় অল্প বয়সে। রূপনারায়ণের বড় ছেলে শ্যামাচরণ। বালক বয়সে পিতৃহীন শ্যামাচরণ নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে কেরাণীর চাকরী নেন পুলিশ কমিশনারের আপিসে। তাঁর বড় ছেলে বলাইচাঁদ। কলকাতার নামজাদা ডাক্তার।

এরপর আমরা শুনবো সেই বিখ্যাত পুরুষের কথামৃত, পলাশী যুদ্ধের আগে বাঙালী পাড়ায় যিনি ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি। অর্থাৎ গোবিন্দরাম মিত্রের জীবনচরিত।

হলওয়েল তখন কলকাতার জমিদার। আর তাঁর যিনি সহকারী বা ডেপুটি তিনি গোবিন্দরাম মিত্র। ব্লাক-জমিদার, কালা জমিদার কিংবা নায়েব। ১৭২০ সাল সেটা। ১৭২০ থেকে ১৭৫৬। একটানা ৩৬ বছর ধরে এই পদে টিকে ছিলেন তিনি, দোর্দণ্ডপ্রতাপে। ইংরেজদের কাছে তখনও এদেশের মাটি মানুষ সবই নতুন। সুতরাং নতুন রাস্তায় হাঁটতে গেলে পদে পদে দেশীয় নায়েব বেনিয়ানরাই তাঁদের অন্ধের যষ্ঠি। হলওয়েল হাঁটেন, তাঁর হাতের ছড়ি গোবিন্দরাম। এবং গোবিন্দরাম যে সত্যিই 'ছড়ি', সেকালের একটি বহুপ্রচলিত ছড়ায় তার সাক্ষ্য আছে। 'গোবিন্দরামের ছড়ি' নামক ছড়া কিংবা প্রবাদবাক্যটি অকারণে তৈরি হয়নি। শহরশুদ্ধ লোক

ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতো তাঁর দাপটে। বাঘে-বলদে জল খায় এক ঘাটে। ইংরেজ অধিকৃত কলকাতার তিনিই যেন অধিনায়ক।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বেতন পান তো মোটে ৩০ টাকা। শেষের দিকে বেড়েছিল মোটে ২০ টাকা। তা, এই অল্প টাকায় তিনি অমন ডাকসাইটে ধনী-মানী হয়ে উঠলেন কি করে? চাকরিটাই বা কিসের? শাসন করা নয়, খাজনা আদায়। তাহলে, এত দাপ-দাপটটা আসে কোথা থেকে?

যে সময়ের কথা তখন মোগল ফৌজদার অধীনে যে-সমস্ত জমিদার, তাদের জন্যে থাকতে দুটো করে আদালত। একটা ছিল খাজনা আদায়-তহশিলের কাছারি। আরেকটা দেওয়ানি ফৌজদারি কাছারি। প্রথমটায় বিচার হতো খাজনা-পত্র বাকি পড়লে বা না দিলে। দ্বিতীয়টায় বিচার হতো চুরি-ডাকাতি খুন-জখম জাতীয় অপরাধের। এর জন্যে প্রত্যেক জমিদারের হাতে আলাদা এক ধরণের পুলিশ থাকতো, যার নাম, 'জমিদার পুলিশ'। তখন বিচার হতো মুসলমান আইন মেনে। ইংরেজদের বিপদ হয়েছিল কি, তারা ভাল করে মুসলমানি আইন জানতো না। তার উপরে ঘন ঘন বদল হতো জমিদারের পদ। সেই জন্যেই বিচার-ব্যাপারে ইংরেজরা ঐ সময়ে সব দায়-দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল গোবিন্দ রায়ের হাতে। বাগবাজারে তিনি গড়েছেন একটা মন্দির। নাম নবরত্ন মন্দির। সাহেবরা বলে ব্লাক-প্যাগোডা। বিরাট উঁচু। অক্টোরলনী মনুমেণ্ট নাকি তার গলার কাছে পৌঁছতে পারে না। ১৭৩৩-এর ঝড়ে সেটা ভূমিস্মাৎ হয়ে যায়।

বেশ মহাসুখেই দিন কাটছিল গোবিন্দরামের। হঠাৎ শুরু হল ভূতের কিল! হলওয়েল উঠলেন ক্ষেপে। গোবিন্দরাম চোর, জোচ্চোর!

'a fraud than which I know not a greater.'

সেকি কথা? এতদিন এক সঙ্গে সুখে-সোহাগে দুজনে ঘর-করলে – আজ বলছ অসতী। হলওয়েল টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন – আমি যা বলছি সব সত্যি। গোবিন্দরামকে হিসেব দাখিল করতে বলা হোক্। দেখবে হিসেবের ফাঁকী ফাঁস হয়ে যাবে।

সন্দেহটা অনেক আগে থেকেই ছিল। ১৭৪৮ সালের কথা। তখনই কেমন যেন খটমট ঠেকেছিল গোবিন্দরামের চালচলন দেখে। এত বাবুয়ানীর পয়সা জোটে কোত্থেকে। মাইনে তো মা গঙ্গা। কোর্ট অব ডাইরেক্টরদের মনে হয়েছিল 'the administration of the Black Zaminder had been more beneficial to himself than to them'............কিন্তু মনের সন্দেহ

তাঁরা মুখে প্রকাশ করেননি। হলওয়েল কড়া ধাতের মানুষ। তিনি দীর্ঘদিনের চেষ্টায় পরিশ্রমে তৈরি করলেন এক দীর্ঘ অভিযোগনামা। তাতে তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করেছেন যে, গোবিন্দরাম যে টাকা আত্মসাৎ করেছে—তার পরিমাণ দেড় লক্ষ টাকার এক পয়সা কম নয়। হলওয়েল তলব করলেন গোবিন্দরামকে। হিসেব দাখিল কর।

গোবিন্দরামের ভয়ও নেই, ভ্রূক্ষেপও নেই। ভ্রূকুটি করে শুধু বললেন—আপনি কে মশাই হিসেব দেখার? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমাদের দুজনেরই মনিব। প্রেসিডেণ্টের অনুমতি ছাড়া আমি আপনাকে কাগজপত্র কিছুই দেখাতে পারব না।

হলওয়েল কাউন্সিলকে জানালেন, যতক্ষণ না কোম্পানীর পাওনা টাকা কড়ায়-ক্রান্তিতে মিটিয়ে দিচ্ছে ততদিন যেন গোবিন্দরামকে নজরবন্দী করে রাখা হয় এবং তাঁর পুত্র রঘু মিত্র 'Should be obliged to give security for his appearance'.

হলওয়েলের হাঁক ডাকে গগন ফাটে। কিন্তু কাউন্সিলের চোখ যেন ফোটে না। ফুটলেও কেমন যেন আধফোটা। হলওয়েলের মতন টগবগ-করা ফুটন্ত রাগ কারোর চোখে নেই। সম্ভবত এই কারণে যে কাউন্সিলের অনেকেই গোবিন্দ-রামের বন্ধু-বান্ধব। হয়তো অনেকেই তাঁর বাড়ীতে দুর্গোৎসবের নেমন্তন্ন খেয়েছে। হয়তো কেউবা তাঁর কাছ থেকে ফার্সিও শিখে থাকবে। তার চেয়েও বড় কথা গোবিন্দরাম আজকের লোক নয়। 'the first native in the early British settlement in Calcutta.' সুতরাং তাঁর একটা সম্মান আছে তো?

'First' কিনা তার সঠিক প্রমাণ নেই। তবে একেবারে গোড়ার দিকের বাসিন্দে ঠিকই। গোবিন্দরামের বাবার নাম রত্নেশ্বর মিত্র। ঠাকুর্দা হংসেশ্বর মিত্র। আদি নিবাস ব্যারাকপুরের কাছে। ১৬৮৬ কিংবা ৮৭ সালে তাঁরা গোবিন্দপুরে বসবাস করতে শুরু করেন। চার্নক তখন ইংরেজ ফ্যাক্টরীর গভর্ণর। গোবিন্দরামকে দেখে চার্নকের ভারী ভাল লেগে গেল। বাঃ, বেশ ছেলেটি তো। আর্বী-ফার্সী, বাংলা-সংস্কৃত ভাল মতনই জানে। ইংরেজী জানে—না জানার মতনই। তাতে কি হয়েছে। চার্নক গোবিন্দরামকে চাকরী দিয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই গোবিন্দরাম প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন চার্নকের। চাকরীতেও উন্নতি ঘটল। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উন্নতির উপর তলায় উঠতে গেলে যে সব গুণ থাকা দরকার সবই ছিল গোবিন্দরামের। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অক্লান্ত অধ্যবসায় দুটোই। কলকাতায় যখন ফোর্ট উইলিয়ম অর্থাৎ

কেল্লা তৈরির কাজ শুরু হল, সেই সময় গোবিন্দরাম কুমারটুলিতে চলে এলেন গোবিন্দপুর ছেড়ে। তারপর থেকে তো এই নায়েবীগিরি।

গোবিন্দরাম যে চার্ণকের সময় মানুষ, এটা তাঁর জীবনীকার বলতেও, ঐতিহাসিক ভাবে মিথ্যে। গোবিন্দরামের কোন বিস্তৃত এবং বিশ্বস্ত জীবনী নেই। যা আছে, তা কোন ঐতিহাসিকের লেখা নয়। লেখক-'এ মেম্বার অফ দি ফ্যামিলি'। বইয়ের নাম – 'এ্যান এ্যাকাউন্ট অব দি লাইফ অব গোবিন্দরাম মিটার – নায়েব জমিদার ইন মিঃ হকওয়েস ডেস, এ্যাণ্ড অফ হিজ ডিসেন্টডেন্টস ইন ক্যালকাটা এ্যাণ্ড বেনারস।' ৯৯ পাতার বই। তার মধ্যে মাত্র ৭ পাতা গোবিন্দরামের জন্যে। এ ছাড়া রয়েছে অন্য ক-পাতার সংক্ষিপ্ত জীবনী, লোকনাথ ঘোষের, 'ইণ্ডিয়ান চীফ্‌স, রাজাস, এ্যাণ্ড জমিন্দারস'। প্রথম বইয়ের কোথাও লেখা নেই কত সালে গোবিন্দরামের জন্ম। শুধু আছে –

"In about 1686-87 or 1093 B. E. gobindaram Mitter was broght to the favourable notice of Mr. Job Charnock". কত বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। ৮০ বছর। মৃত্যুর বছরটা ছিল ১৭৬৬। বাংলায় ১১৭৩। উল্টোদিক থেকে হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে তাঁর জন্ম সাল ১৬৮৬। এটা যদি সত্যি হিসেব হয় তাহলে তিনি কি মাতৃগর্ভ থেকে মাটিতে পা দিয়েই বা-কর হয়েছিলেন চার্ণকের কাছে?

এদিকে ১৭৭২-৭৩ সালেও যে তিনি বেঁচে ছিলেন, তারও প্রমান আছে ইতিহাসে। পুরনো দলিলে রয়েছে, ঐ সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের সহায়তায় গোবিন্দরাম নুনের ব্যবসা ফেঁদেছেন ক্যাপ্তেন নিকলস ওয়েলারের সঙ্গে।

কাউন্সিলের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন নিশ্চয়ই যাঁরা হলওয়েলের পক্ষে। তাঁদের বক্তব্য হল – নজরবন্দী না-হয় না করা হল, হিসেব চাইতে দোষ কি? গোবিন্দরামকে ডেকে পাঠান হল কাউন্সিলের দরবারে। কাউন্সিল বললে – কই, পুরনো হিসেব-নিকাশের নথিপত্র বার কর। গোবিন্দরাম ভয়হীন, ভ্রূক্ষেপহীন। বললেন – ইওর একসেলেন্সী, ১৭৩৩ সালের মহা ঝড়ের কথা মনে আছে? কাউন্সিলের সদস্যরা মনে করে দেখলেন, হ্যাঁ সত্যিই ঐ সময়ে একটা মহা ঝড় হয়েছিল বটে।

কাউন্সিল – ঝড় হয়েছিল ঠিকই। তার সঙ্গে হিসেবের কী সম্পর্ক?

গোবিন্দরাম – ১৭৩৪ সালের আগে পর্যন্ত যা কিছু নথি-পত্র, দলিল দস্তাবেজ সব উড়ে গেছে ঐ ঝড়ে।

কাউন্সিল – তাহলে ১৭৩৪ থেকেই হিসেব দেখাও।

গোবিন্দরাম—দেখাতে পারি। তবে বেশীর ভাগ নথিপত্রই উইয়ে খেয়েছে। (devoured by white ants.)

সব শুনে কাউন্সিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রেসিডেন্ট গোবিন্দরামকে হাতকড়া দিয়ে জেলে পুরলেন না। হাত বাড়ালেন না তাঁর বিষয়সম্পত্তি ক্রোক করতে। কেবল হাতে বাড়িয়ে দিলেন হলওয়েলের তৈরি অভিযোগনামার কাগজটি।

অভিযোগ একাধিক।

কোম্পানীর কাগজপত্র সবই ছিল তাঁর এক্তিয়ারে। সেই সুযোগে হিসেবে গোঁজামিল দিয়ে তিনি প্রচুর টাকা নিজের পকেটে পুরেছেন। তখনকার নিয়মমত হাট-বাজার বিলি ব্যবস্থা করার প্রথা ছিল প্রকাশ্যভাবে, প্রায় নিলামের মতন দর-দাম হাঁকিয়ে। কিন্তু গোবিন্দরাম সেটা করতেন নিজের বৈঠকখানা ঘরে। ভাল ভাল হাট-বাজার নিজেই কিনে নিয়েছেন বেনামীতে। তার উপর মোটা মুনাফা চাপিয়ে অন্য লোককে দিয়েছেন তার বন্দোবস্ত। নিজের বাড়ীর চাকর-বাকর পাইক-বরকন্দাজ পুষেছেন কোম্পানীর টাকায়। অধীনস্থ প্রজারা তাদের ঝগড়া-ঝাঁটি মিটিয়ে দেওয়ার আর্জি নিয়ে এলে তাঁর নীতি ছিল—'ফেল কড়ি, মাখ তেল'। খাল বিল বন জঙ্গল সংস্কার, কিংবা রাস্তাঘাট বা সাঁকো-পুল তৈরির জন্যে কোম্পানীর বরাদ্দ টাকাও নিজের ট্যাঁকে গুঁজতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি। বেনামীতে তিনি নিজের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন—কোম্পানীর চাকরীতে বহাল থাকা সত্ত্বেও।

সাতদিন গেল না। গোবিন্দরাম তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগনামার জবাব এনে হাজির। ইংরেজীতে লেখা। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকের টীকা কিংবা টিপ্পনী: ইংরেজ ক্যাপ্টেনরাই কেউ ঐ চিঠি ইংরেজীতে লিখে দিয়ে থাকবে।

দু-দফা জবাব।

১। তাঁর নিজের যেসব Firms আছে—তা 'invariably received the written sanction of his European superior,' এবং 'every Rajas and Zaminders, Dewan was invariably indulged with some firms for his own profit.' সুতরাং গোবিন্দরাম হয়ে তিনি এমন কিছু জগৎ-ছাড়া কাজ করেননি।

২। "যাহারা পূর্বে আমার মত ডেপুটিগিরি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই আমার মত স্বত্বাদি ভোগ করিয়াছেন। আমার মত পদস্থ কর্মচারীর পদগৌরব ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যেরূপ চাকর-বাকর জাঁক-জমক ও অন্যান্য

পোশাকের প্রয়োজন – আমার সামান্য বেতন হইতে তাহা কখনই নির্বাহ হওয়া সম্ভবপর নহে।”

হলওয়েলের এত চীৎকার-চেঁচামিচি আবেদন, তবু কাউন্সিলে কাকস্য পরিবেদনা। তাঁদের বোধ হয় সেই পুরনো যুক্তি। চার্নকের সময়কার লোক। তার উপর ক্ষমতাবান। কী লাভ চটিয়ে।

সত্যিই মিঃ হলওয়েল, তোমার এমন তেলে-বেগুনে চটে যাওয়া একেবারেই উচিত হয়নি। মিথ্যে কথা কে না বলে? জাল-জোচ্চুরী কে না করে। ‘অধিক ধনী হওনের’ এইটেই তো পাকা সড়ক। সে রাস্তায় শুধু গোবিন্দরাম একাই হাঁটেননি, তোমরাও হাঁটছো; হেঁটেছ। এবং হাঁটবে বলেই তো জাহাজ ভর্তি বেকার ইংরেজ-তনয়রা কলকতার ঘাটে এসে নামে – “Two monsoon is the age of a man” জেনেও। তোমাদের ‘রাইটার’ ‘ফ্যাক্টর’রা কী এমন নশোপঞ্চাশ মাইনে পায় বল তো? অথচ কলকাতার হাওয়া দুদিন গায়ে লাগতে না লাগতেই তাদের বাবুগিরী ফুলঝুরির মতন ফুটতে থাকে কি করে? হিকির মতন দেনদার লোক। তারও তো ৩৩টা চাকর না হলে চলে না। তোমাদের সারভেন্টদের আয়েসের নেশা এমন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছল যে, তার ফলে ক্লাইভকে নালিশ জানাতে হল কোম্পানীর ডাইরেক্টারদের কাছে। বিলেত থেকে নিষেধনামা এল –

‘if our servants will have such superfluities, let them pay for them.’ মিঃ ডেনী নামক এক ভদ্রলোক পাবলিক অ্যাকাউন্টের টাকা ভেঙে কি কিনেছিল? ‘a chaise of pair’ এগারশ টাকা দিয়ে। এমন হাজারটা নমুনা আছে। তারপর ‘ইন্টারলোপিং’। ‘ইন্টারলোপিং’ মানে যদি হয় কোম্পানীর অজ্ঞাতসারে গোপন ব্যবসা, তাহলে সেটা কারা চালাতো বাংলা দেশের জলে-স্থলে! উইলিয়ম হেজেস তখন হুগলীতে কোম্পানীর এজেন্ট। তাঁর কাছে প্রতিদিন আসে অভিযোগ, আবেদন, দেশীয় বণিক, বেনিয়ান গোমস্তাদের কাছ থেকে।

‘they have been forced to Mr. অমুক ware-house-keeper, each of them a bribe,’ – which your petitioner complain to you, desiring justice.’

সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা জয় করে ফিরে গেছেন মুর্শিদাবাদে। সিরাজের জয়ে মীরজাফর ক্ষুণ্ণ। ইংরেজরা শংকিত। সিরাজের ভয়ে কলকাতা ঝেঁটিয়ে ইংরেজরা পালিয়েছিল ফলতায়। ছিল কেবল সেনাবাহিনীর লোক। আবার

একে একে ফিরতে লাগল। এবং ইতিমধ্যে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার।

মীরজাফর হবে নতুন নবাব। তাঁর সঙ্গে গোপনে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করা হল। এই ভাবে তখন ক্রমশ পটভূমি তৈরী হচ্ছে পলাশীর যুদ্ধের।

মীরজাফর গোপনে যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করল ইংরেজদের সঙ্গে ঈশ্বর ও পয়গম্বরের নামে শপথ করে তার বহু সর্তের মধ্যে কয়েকটি ছিল এইরকম।

সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা অধিকার ও লুণ্ঠনের জন্য কোম্পানীর যে ক্ষতি হইয়াছে এবং সৈন্যের নিমিত্ত যে ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে, তাহার পূরণ জন্য আমি ইংরাজগণকে এক কোটী টাকা দিব।

কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসিগণের যে সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিতেছি।

দেশীয়গণের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ জন্য ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে।

মীরজাফর গদীতে বসতেই দেশীয়রা তাদের দাবি জানালে, সিরাজের কলকাতা আক্রমণে আমাদের যা নষ্ট ও লুণ্ঠিত হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। দাবিদারদের মধ্যে গোবিন্দরামও একজন। ইংরেজরা প্রথমে এ দাবি কানেই তুললে না। তারা বললে—গোবিন্দরাম ক্ষতিপূরণ চায় কি করে? যুদ্ধের সময় তো কোম্পানীর ফৌজ পাহারা দিয়েছে তার বাড়িঘর সম্পত্তি। কিন্তু চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত মানতে হল। তৈরি হল 'নেটীভ কমিশন' ১৩ জন সদস্যকে নিয়ে। তার মধ্যেও গোবিন্দরাম একজন। বাকী ১২ জন হলেন শোভারাম বসাক, আলিজান ভাই, রতন সরকার, শুকদেব মল্লিক, নয়নচাঁদ মল্লিক, দয়ারাম বসু, নীলমণি মিত্র, হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, দুর্গারাম দত্ত, রাম সন্তোষ, মহম্মদ সাদেক ও আইনুদ্দীন।

গোবিন্দরামের নিজের দাবি ছিল ৪১২৬৮০।৴০। ইংরেজরা জানতো এসব মনগড়া হিসেব। ঝোপ বুঝে কোপ মারার মতলব। অবিশ্বাসের খাঁড়া দিয়ে তারা এই সব দাবির টাকার লেজা মুড়ো কোপাতে লাগল। কেটে-কুপিয়েও যা জুটল তাই-ই বা মন্দ কি। অন্যের কথা বাদ, শুধু গোবিন্দরামের পাওনা টাকারই গাওনা গাওয়া যাক।

কুড়রাম বিশ্বাস। ইনি কে? না গোবিন্দরামের কুলী সর্দার। পেলেন ১৯৮৩।০। রামদেব মিত্র। ইনি গোবিন্দরামের সম্পর্কীয় ব্যক্তি। সে কি, ইনি তো চার বছর আগে মারা গেছেন? তাতে কি হয়েছে। তার আত্মীয়বর্গ তো আছে। পেলেন ১৩১৩৷।০। শুকদেব মিত্র। ইনিও আত্মীয় এবং কলিকাতা

লুণ্ঠনের চার বছর আগে মৃত। তবুও পেলেন ৩৮০।০। গঙ্গ, ইনি গোবিন্দরামের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি। তবে দাও ৫১৯, টাকা। দুর্গারাম শর্মা। ইনিও ঐ। দাও ১৩২৮৶০। নীলমণি চন্দ্র। ঐ। দাও ১৬৭।০। হরিরাম ঘোষ। ঐ। দাও ৯০॥০। লক্ষ্মীকান্ত দোষ। দাও ৯০॥০। রামকিশোর চক্রবর্তী—ইনি আবার কে? আজ্ঞে, ইনি গোবিন্দরামের আশ্রিত। আশ্রিত যদি তার আবার লুণ্ঠিত হবার কি ছিল। কি ছিল কে জানে। ৪২১৲ টাকা দিয়ে দাও। হ্যাঁ মশাই, এঁরা আবার কারা? এই যে দেখছি তালিকায় তিনটি রমণীর নাম লেখা রয়েছে। রতন, ললিতা আর মতিবেওয়া। এঁদেরও তো দেখছি হাজার হাজার টাকার দাবি। এঁরা কারা? আজ্ঞে, এ নারী হলেন গোবিন্দরামের রক্ষিতা।

সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময় গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ি-ঘর, বাগান-বাড়ি পাহারা দিয়েছিল কে তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ মনে করেন, ইংরেজ সৈন্য। কেউ নবাবী সৈন্য। নবাবী সৈন্য হওয়াটাই বেশী স্বাভাবিক। ইংরেজ সৈন্যরা যখন প্রাণভয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত, তখন পরের ঘরের দরজায় গিয়ে পাহারা দেবে, এটা অবিশ্বাস্য। নবাবী সৈন্য পাহারা বসিয়েছিল উমিচাঁদের বাড়িতে। সম্ভবত উমিচাঁদকে ধরেই নিজের বাড়িকে রক্ষা করেছিলেন গোবিন্দরাম; নবাবী ফৌজ বসিয়ে।

উমিচাঁদের বাগানের পাশেই ছিল গোবিন্দরামের নন্দন বাগান। এখন সেই জায়গায় সাহিত্য পরিষদের বাড়ি। নন্দন বাগানের মধ্যে ছিল রঙমহল, অর্থাৎ তিনতলা বাড়ি। চীনে পোর্সেলিনের ইট দিয়ে গাঁথা। বাগানে রয়েছে দিঘী। তার ভিতরে জলটুঙি ঘর। বাগানের মধ্যে আরও দেখবার জিনিষ হল সাজানো-গোছানো চমৎকার একটা বৈঠকখানা, আর কৃত্রিম পর্বত। রঙমহলে জমে বাঈজীর নাচ। আর কুমোরটুলির প্রকাণ্ড অট্টালিকায় জমে পূজো-পার্বণ। হতো দুর্গাপূজো। সেখানে প্রতিমার গায়ে মাখানো হতো না রঙ। তার বদলে সোনার পাত, রূপোর পাত। সারা বাংলাদেশ থেকে ছুটে আসতেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা, বিদেয় নিতে। নৈবেদ্য-র প্রধান থালাটাই শুধু সাজানো হতো ৩০ থেকে ৫০ মন চাল নিয়ে। পূজোর পর মিষ্টি বিলানো হতো দুশো মণের মতন।

সেকালের তরজা গানের খোদাই হয়ে রয়েছে গোবিন্দরামের স্মৃতি।

কালো দেশের কালো মানুষ কালো জমিদার
গোবিন্দরাম মিত্র আনে জুড়ি গাড়ির বাহার।

গোবিন্দরামদের যুগ শেষ হল। ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল অন্য যুগ। কলকাতার বনেদী পাড়ায়, জন্ম নিতে লাগল নতুন এক সম্প্রদায়, ইতিহাস যাকে নাম দিয়েছে 'বাবু'। আঠারো শতকের শেষ ভাগের আগেও 'বাবু' শব্দটা ছিল মর্যাদাসূচক। কিন্তু তখনও তার বহুল প্রচলন ঘটেনি। ঘটেছিল আঠারো শতকের শেষ পর্ব থেকে। হুতোমের ভাষায়—

"কোম্পানীর বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিয়কের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিয়কের দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল, সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড়মানুষ হয়ে পড়েন।"

পলাশী-যুদ্ধের পরের কলকাতায় বাঙ্গলার বা বাঙ্গালীর পতন-অভ্যুদয়ের ইতিহাসে নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন এই বাবু-সমাজ। সে ইতিহাস আলোচিত হবে পরবর্তী খণ্ডে।

পৃষ্ঠা ৯॥ ভারতবর্ষ সোনার দেশ।

"হিন্দুস্তান প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় বলে মনে হয়। সোনা-রূপো পৃথিবীর অন্যান্য সব জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে এসে পৌঁছয় এবং হিন্দুস্তানের গুপ্ত গহ্বরে অন্তর্ধান হয়ে যায়। আমেরিকা থেকে সে সোজা বাইরে বেরিয়ে এসে ইয়োরোপের নানা রাষ্ট্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তারই একটা অংশ নানা পথ ঘুরে শেষে তুরস্কে এসে জমা হয়, তুরস্কের পণ্যের বিনিময়ে। আরও একটা অংশ স্মির্ণা ঘুরে পারস্যে যায়, সেখানকার রেশমের বিনিময়ে। তুরস্ক কফি চালান দিতে পারে না, কারণ ইয়েমেনের কাছ থেকে সে নিজেই কফি আমদানি করে। হিন্দুস্তানের খাদ্যদ্রব্য তুরস্ক, ইয়েমেন ও পারস্য প্রত্যেকেরই দরকার সুতরাং এই সব দেশ থেকে বেশ খানিকটা পরিমাণ সোনারূপো লোহিত সাগরের বন্দরে, পারস্য সাগরের শীর্ষে বসরায় এবং বন্দর আব্বাসিতে গিয়ে জমা হয়, হিন্দুস্তানাভিমুখে যাত্রা করার জন্য। প্রত্যেক বছর যথাকালে এই তিনটি বন্দরে হিন্দুস্তানের জাহাজ এসে ভিড় করে নানান রকমের বাণিজ্যের পণ্য নিয়ে এবং সেই সব সোনা বোঝাই করে নিয়ে আবার হিন্দুস্তানে ফিরে যায়।...এইভাবে সারা দুনিয়ার সোনা রূপোর একটা মোটা অংশ বাণিজ্যের দৌলতে হিন্দুস্তানে এসে জমা হয় এবং একবার জমা হলে আর ফিরে যেত না কোথাও, একেবারে মজুতদারের গুহায় আত্মগোপন করত।"

বাদশাহী আমল॥ ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ের॥ বিনয় ঘোষ।

পৃষ্ঠা ৯॥ কল্পতরু।

"ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম শিল্প ভারতবর্ষের নাম জগদ্বিখ্যাত করিলেও তাহার ভৌগোলিক পরিচয় সুদূর পাশ্চাত্য দেশে সকলের নিকট সুপরিচিত করিতে পারে নাই, যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সীমানিবদ্ধ যত সেই বিষয়ে কল্পনার প্রাবল্য তত অধিক হইয়া পড়ে।...অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশে ভারতবর্ষ অলৌকিক রত্নভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।...এইরূপে সভ্যতা বিকাশের প্রথম প্রভাত হইতেই পাশ্চাত্য মানব-সমাজ ভারতবর্ষের অলৌকিক

ঐশ্বর্যের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া, কল্পনাবলে তাহাকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করিয়াছিল।”

ফিরিঙ্গি বণিক ॥ অক্ষয়কুমার মৈত্র।

পৃষ্ঠা ১৭ ॥ হার্মাদ দস্যু।

“বাংলাদেশের সুবেদার হয়ে এসে শায়েস্তা খাঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিলেন। কাজটি হল, বাংলাদেশকে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা।…বাংলার সীমান্তে আরাকান রাজ্যে বা মগদের দেশে পর্তুগীজ ও অন্যান্য ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। গোয়া, সিংহল, কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি দেশ থেকে পালিয়ে এসে তারা এখানে আশ্রয় নিত। এমন কোনো অপকর্ম ছিল না যা তারা করতে পারত না। তারা নামেই খ্রীষ্টান ছিল, কিন্তু তাদের মতন জঘন্য পিশাচ প্রভৃতি লোক সচরাচর দেখা যেত না। খুন জখম, ধর্ষণ, লুঠতরাজ ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। আরাকানের রাজা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের স্বার্থে। মোগলদের ভয়ে সব সময় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ আশঙ্কা করে এই ফিরিঙ্গি দস্যুদের তিনি নিজের দেশে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই পর্তুগীজ দস্যুরা মগদের প্রশ্রয় ও উস্কানি পেয়ে রীতিমত যথেচ্ছাচার করতে আরম্ভ করল। বাংলার উপকূল অঞ্চলে জলপথে তারা লুঠতরাজ, অত্যাচার করে বেড়াতে লাগল।…হাট-বাজারের দিন গ্রামের মধ্যে ঢুকে গ্রামের লোকদের তারা ক্রীতদাস করার জন্য বন্দী করে নিয়ে যেত, উৎসব-পার্বণের দিনও তারা এইভাবে গ্রামাঞ্চলে হানা দিত। অনেক সময় গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত। নিম্নবঙ্গের কত শত গ্রাম এইভাবে যে তারা লুণ্ঠন করেছে এবং অত্যাচারে জনশূন্য করেছে, তার হিসেব নেই।”

বাদশাহী আমল ॥ ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ের ॥ বিনয় ঘোষ।

পৃষ্ঠা ৪৬ ॥ হুগলীতে পর্তুগীজ।

“বাংলাদেশে নানা রকমের মিষ্টান্নও তৈরি হয়। মিষ্টান্নের বৈচিত্র্যের জন্যে বাংলাদেশ বিখ্যাত। বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে পর্তুগীজরা বসতি গড়ে তুলেছে, নানা রকমের মিষ্টান্নের প্রচলন সেই সব অঞ্চলেই খুব বেশী দেখা যায়। তার একটা কারণ হল, পর্তুগীজরা খুব ভাল মিষ্টান্ন তৈরি করতে পারে, খুব

সুদক্ষ ময়রা তারা। শুধু তাই নয়, মিষ্টান্নের ব্যবসা তাদের অন্যতম ব্যবসা। এছাড়া লেবু, আম, আনারস প্রভৃতি ফলেরও ব্যবসা করে তারা।"

বাদশাহী আমল ॥ ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ের ॥ বিনয় ঘোষ।

পৃষ্ঠা ৫২ ॥ হুগলী বালেশ্বরের কুঠী।

১। "তাঁহারা (বিলেতের কর্তারা) যখন বুঝিলেন দিনেমাররা গঙ্গা প্রদেশে বাণিজ্য দ্বারা যথেষ্ট ফল পাইতেছে, তখন তাঁহাদের মনে বঙ্গদেশে ফ্যাক্টরী বা বাণিজ্যাগার খুলিবার ব্যবস্থা অতি প্রবল হইয়া উঠিল। এই ভাবিয়া তাঁহারা বিবিধ বাণিজ্যদ্রব্যপূর্ণ 'লিয়নেস' নামক একখানি জাহাজ ভারতে প্রেরণ করিলেন।

২২শে আগষ্ট তারিখে (১৬৫০) 'লিয়নেস' মাদ্রাজে আসিয়া নোঙ্গর করে। মাদ্রাজ ফ্যাক্টরীর কর্তারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, নবাগত জাহাজগুলিকে সরাসরি বঙ্গদেশের মধ্যে হুগলীতে না পাঠাইয়া প্রথমে বালেশ্বরে নোঙ্গর করান হউক, জাহাজ বালেশ্বরেই থাকিবে, কেবল কয়েকজন ফ্যাক্টর হুগলী পর্যন্ত গিয়া; তথাকার সুবিধা-অসুবিধা বুঝিয়া, যথাবিহিত কর্তব্য করিবেন।...ব্রুক হ্যাভেন নামক একজন দক্ষ ইংরাজের অধীনতায়, কয়েকজন ফ্যাক্টর 'লিয়নেস' জাহাজকে লইয়া বঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সোরা, চিনি, রেশম, এই তিনটি তখনকার কালে বঙ্গদেশের প্রধান লাভকর বাণিজ্যদ্রব্য। কাপ্টেন ব্রুক হ্যাভেন বালেশ্বরে অধীনস্থ কর্মচারীদের এই কয়টি দ্রব্যের ব্যবসায়ের উন্নতি ও প্রচলন সম্বন্ধে বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করেন এবং তাহাদিগকে সময়োপযোগী নানাবিধ উপদেশ দিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।

এই উপদেশানুবর্তী হইয়া, ব্রিজম্যান ও ষ্টিফেন্স নামক দুইজন ফ্যাক্টর ১৬৫৫ খৃঃ অব্দে হুগলীতে বাণিজ্য কুঠী স্থাপনের জন্য যাত্রা করেন।...ইংরাজ স্থাপিত হুগলীর প্রথম বাণিজ্যাগার নানাকারণে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সকল দিকেই ঘোর বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ। বেগতিক দেখিয়া মাদ্রাজের কর্তারা বাঙ্গলা হইতে দপ্তর তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বিধাতার লিপিবশে, এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে ঘোরতর রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হইল। ইংল্যাণ্ড তখন সাধারণ-তন্ত্র-বিধায়ক ক্রমওয়েলের শাসনাধীন।...কোম্পানীর বিলাতের কর্তারা সুযোগ বুঝিয়া ক্রমওয়েলের নিকট তাঁহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধীয়

চ্যার্টারটি নতুন করিয়া লইলেন।...নানা স্থানের ফ্যাক্টরেরা বেনামী বাণিজ্য, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দ্বারা কোম্পানীর যথেষ্ট অর্থ ক্ষতি করিতেছিল। বিলাতের কর্তারা এতৎ প্রতিকারার্থে এক বিধান করিয়া পাঠাইলেন।— কোম্পানীর কোন কর্মচারিই বেনামে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জন করিতে পারিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীদের অর্থলোলুপতা দূর করিবার জন্য বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল, এই বর্ধিত হারে বেতন গ্রহণের পূর্বে তাঁহাদিগকে এক সিকিউরিটি বণ্ড বা জামিননামায় স্বাক্ষর করিতে হইবে। তাঁহারা কোম্পানীর ভারতীয় কুঠীতে যেদিন যে কাজ করিবেন তাহার রোজনামচা বা ডায়ারি করিয়া তাহার নকল বিলাতের কর্তাদের গোচরার্থে পাঠাইবেন। কোম্পানীর ভারতীয় বাণিজ্য কুঠী সমূহের ফ্যাক্টরগণ সুরাটকুঠীর অধীনস্থ থাকিবেন। বাণ্টাম, মাদ্রাজ, পারস্য ও বঙ্গদেশে চারিটি বাণিজ্য-এজেন্সী স্থাপিত হইবে। ইহা ব্যতীত বঙ্গদেশ, কাশিমবাজার, এবং পাটনা প্রভৃতি স্থানে 'সব-এজেন্সী' স্থাপিত হইবে। শেষোক্ত কয়টি স্থানের কুঠী হুগলীর কর্তাদের অধীনে থাকিবে।

এই নূতন বিধানের বলে, ১৬৫৮ খৃঃ অব্দের ২৭ শে ফেব্রুয়ারির ডেসপ্যাচ বা আদেশপত্র মতে জর্জ গটন সাহেব হুগলীর প্রধান 'এজেন্ট' নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার একশত পাউণ্ড, বা আধুনিক হিসাবে পনর শত টাকা বাৎসরিক বেতন ধার্য হয়। তাঁহার অধীনে চারিজন 'ফ্যাক্টর' রহিলেন। হপকিনস বালেশ্বরের প্রধান এজেণ্ট হইলেন। এই সময়ে কেন্‌ও কাশিমবাজারের প্রধান ফ্যাক্টর বা অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। চেম্বারলেন পাটনার নবস্থাপিত কুঠীর কর্তৃত্ব লাভ করেন। আর কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক কাশিমবাজার কুঠীর চতুর্থ সহকারীরূপে নিযুক্ত হন।"

কলিকাতা সেকালের ও একালের ॥ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা ৫৬ ॥ জব চার্নক।

"চার্নকরা ছিলেন ল্যাংকাশায়ারের একটি পরিবার। কথিত আছে যে তাঁরা ঐ কাউন্টির লেল্যাণ্ড হাণ্ড্রেড এলাকায় যেখানে বসবাস করতেন তারই স্থানীয় নাম গ্রহণ করেছিলেন। চার্নক রিচার্ড, হিথ চার্নক ও চার্নক গোগার্ড নামে তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতেন।...কলকাতার যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর পিতা রিচার্ড চার্নক লণ্ডনের নাগরিক ছিলেন। তিনি ছিলেন ল্যাংকাশায়ারের

চার্নকদের বংশধর।...জব চার্নক সম্ভবত জন্মেছিলেন ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে।...সম্ভবত তিনি তাঁর ভাইয়েরই (ষ্টিফেন চার্নক) মতো কেম্ব্রিজের এমান্থয়েল কলেজে লেখাপড়া শেখেন। কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি সে যুগের যথেষ্ট উপযোগী শিক্ষাই লাভ করেছিলেন। তাঁর চিঠিপত্র দেখলেই বোঝা যায় তাঁর শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত ছিল।...

জব চার্নক ১৬৫৫ কিংবা ১৬৫৬ তে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। কিন্তু এমন কোনো নথিপত্রের প্রমাণ নেই যার জোরে বলা যায় যে লণ্ডন কোম্পানীর কাজেই তাঁকে এদেশে পাঠানো হয়েছিল।...কমিটির কোর্টের বিবরণীতে জব চার্নকের আবেদনপত্রের কোনো উল্লেখ নেই। আসলে জব চার্নক কোম্পানীর একমাত্র প্রতিনিধি যিনি কোনো চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না করেই চাকরিতে ঢোকেন এবং ১৬৮০ পর্যন্ত বাংলাদেশে কাজ করতে থাকেন। ইংল্যাণ্ড থেকে যাঁরা ভারতে আসেন সেইসব নৌযাত্রীদের ১৬৫৫, ১৬৫৬ ও ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কোনো তালিকাতেই জব চার্নকের নাম পাওয়া যায় না। এতে প্রমাণ হয় যে তিনি হয় একজন বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী অথবা 'কমিটি'-র বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর নাম আমরা প্রথম পাই কোর্টবুকের নামের তালিকায়। ১৬৫৭ (৫৮)-র ১২-১৩ জানুয়ারি তারিখে তাঁর নামের উল্লেখ রয়েছে কাশিমবাজার কাউন্সিলের একজন কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে: 'জব চার্নক, চতুর্থ (বেতন) ২০ পাউণ্ড'।... এমন কোনো তথ্য নেই যাতে প্রমাণ করা যায় যে জব চার্নক কাশিমবাজারে কাজ করেছিলেন ১৬৫৭ বা ১৬৫৮ তে।...হুগলিতে অল্পকাল থাকার পর চার্নক পাটনা রওনা হন এবং পথে রাজমহলে পৌঁছান ১৬৫৮ (৫৯)-এর ৩১ জানুয়ারি।... পাটনায় ইংরেজ ফ্যাক্টরী গণ্ডক নদীর বাঁ তীরে, শহর থেকে পনের মাইল উত্তরে লালগঞ্জের কাছে 'সিঙ্গি'-তে (সিংঘিয়া) অবস্থিত ছিল। চার্নক ১৬৫৯-এর ফেব্রুয়ারিতে পাটনা পৌঁছান এবং পরবর্তী বিশবছর সেখানেই থেকে কোম্পানীকে সোরা চালান দেবার কাজে নিযুক্ত থাকেন। চেম্বারলেন ছিলেন পাটনায় ইংরেজ ফ্যাক্টরীর প্রথম অধ্যক্ষ। তার পরে আসেন আয়ান কেন্। চার্নককে ক্রমানুসারে পঞ্চম স্থানাধিকারীরূপে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত করা হয়।...

১৬৭৯-র ১২ জুলাই মাদ্রাজ কাউন্সিল এডওয়ার্ড লিটনটনের (পরে স্যার) জায়গায় চার্নককে বাংলায় রেশম ব্যবসার কেন্দ্র কাশিমবাজারে অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করেন। ...পাটনার কোম্পানীর যাবতীয় কাজ শেষ করে চার্নক ১৬৮১-র ১৮ জানুয়ারি কাশিমবাজার ফ্যাক্টরীর কার্যভার গ্রহণ করেন।...

হুগলীতে চার্নককে প্রথমে দ্বিতীয় পদাধিকার দেওয়া হয়, পরে ম্যাথিয়াস ভিনসেন্টের জায়গায় তিনি অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৬৮৬-র ১৬ বা ১৭ এপ্রিল চার্নক বাংলায় কোম্পানীর এজেন্ট হন। উইলিয়াম হেজেস (পরে স্যার) ও জন বেয়ার্ড (বড়)-কে অতিক্রম করে তাঁকে এই পদ দেওয়া হয়।"

জব চার্নক ॥ পি. থনকপ্পন নায়ার।

পৃষ্ঠা ৫৯ ॥ গ্রামের নাম সুতানুটি।

১। "সাতাইশ মাইল নদীপথ অতিক্রম করিবার পর, চার্নক সুতানুটিতে উপস্থিত হন। তিনি বুঝিলেন, মোগলেরা যদি তাঁহাদের স্থলপথেও আক্রমণ করেন, তাহা হইলে এই জঙ্গলময় স্থানে আশ্রয় লইলেই তাঁহারা অনেকটা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন।

তখন কলিকাতা ও সুতানুটি গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। সুতানুটিতে তখন এমন একটা সুবিধাকর স্থানে নদীর বাঁক ছিল—যেখানে জাহাজাদি বিনা অসুবিধায় নোঙ্গর করা যায়। এই স্থান হইতে গঙ্গার মোহানাও তত অধিক দূরবর্তী নয়। নদীর জল এত গভীর যে, বড় বড় জাহাজ অনায়াসে এই স্থানে আসিতে পারে। কাজেই এই বনজঙ্গলময় সুতানুটিই চার্নকের বড়ই পছন্দ হইল।

কিন্তু এই সুতানুটির অবস্থা তখন অতি ভয়ানক। ইহার চারিদিকে ভীষণ বনজঙ্গল। নদীর তীরভূমি হইতে এই স্থানটি একটু সমুন্নত ছিল বলিয়া এখানে জাহাজ প্রভৃতি নোঙ্গর করার এত অসুবিধা ছিল বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাৎভাগে গভীর বন ও কাদাভূমি থাকায়, ইহা মানবের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। এই সকল বাদাভূমি জ্বরের জন্মস্থান। বাদার জলে অসংখ্য কুম্ভীর। ভাগিরথীর একটি শাখা, এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহা সেকালের আদিগঙ্গা। জোয়ারের জল এই আদিগঙ্গার ভিতর দিয়া আসিয়া, পার্শ্বস্থ বাদাভূমি জলপূর্ণ করিত।

জব চার্নক এই ভীষণ অবস্থাময় সুতানুটিতে নঙ্গর করিয়া বুঝিতে পারিলেন—এই স্থানই আত্মরক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই স্থানে আড্ডা স্থাপন করিলে নদীপথ তাঁহাদের আয়ত্তে থাকিবে। গভীর বাদার অসংখ্য খাল-বিলের জন্য পশ্চাৎ দিক দিয়া মোগলসৈন্য আক্রমণ করিতে পারিবে না। প্রকৃতির অস্বাস্থ্যকর ক্রোড়ে রোগবশে দুই-দশজন মরিতে পারে বটে, কিন্তু মোগলদের কামানের মুখে দলে দলে বিনাশ এস্থলে সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

কলিকাতা সেকালের ও একালের ॥ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা ৬৩ ॥ বৈঠকখানার অশ্বত্থ গাছ।

"চার্নক ঠিক কোনখানে এবং ঠিক কোন গাছের নীচে বসবেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানান মতভেদ। এই বিষয়ে সবচেয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা:

১। জব চার্নক একটা গাছের নীচে বসতেন। শুধু বসতেন না, ইয়ার-বক্সি ও মক্কেলদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন, কেনাবেচার কথাও বলতেন, আবার হুঁকো টানতেন। সেটা কোন গাছ? জব চার্নককে আশ্রয় দিলে যদি সম্মান বৃদ্ধি হয়, তাহলে এই সম্মান দাবী করে তিনটি প্রকাণ্ড গাছ। একটি অশ্বত্থ, একটি বট, আর একটি নিম। সব ইংরেজ লেখকই গোড়ার দিকে অশ্বত্থ গাছটাকেই ভোট দিয়েছিলেন। সে গাছটা ছিল সার্কুলার রোড আর বৌবাজার স্ট্রীটের মোড়ের পূর্বদিকে শেয়ালদা ষ্টেশন হাতার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। ঐ গাছটাকে কেটে ফেলা হয় এক মতে ১৭৯০-এ, অন্যমতে ১৮২০-তে। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলতেন, এই গাছটার জন্যেই বৌবাজার স্ট্রীটের আগে নাম ছিল বৈঠকখানা স্ট্রীট। আর ঐ বিরাট অশ্বত্থ গাছটাই জব চার্নকের বৈঠকখানা-রূপে ব্যবহার হোতো। এ কথাটা যে একেবারে গাঁজাখুরি সেকথা পরবর্তী কালের ইংরেজরা বুঝেছিলেন এবং এই গাছের দাবী ছেড়ে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় মত হচ্ছে উত্তর কলকাতার চিৎপুর রোডের ধারে যে প্রকাণ্ড এক বটগাছ ছিল — যা থেকে ঐ সমস্ত অঞ্চলটার নাম হয়েছে বটতলা, সেই গাছটার নীচে জব চার্নক বসতেন। কারণ তিনি সুতানুটির কাছে নেমেছিলেন, সুতানুটিতে ছিলেন, আর সেই গাছটা গঙ্গার ঘাট থেকে বেশী দূর নয়। কিন্তু ওই মতের সমর্থকের সংখ্যা খুব কম।

আজকাল বেশির ভাগ ঐতিহাসিকের মত হচ্ছে, জব চার্নক একটি প্রকাণ্ড নিমগাছের তলায় বসতেন — যে নিমগাছটা থেকে নিমতলা ও নিমতলা ঘাটের নাম হয়েছে। Chuttanuttee Diary and Consultation-এ আছে:

"1690 August 24th. This day, at Shankhrail ordered Captain Brooke to come up with his vesselt to Chuttanutee — the Captain steeved for 'the great tree' which was the see-mark and landed near by."

এই 'great tree'-ই হচ্ছে ঐতিহাসিকদের মতে সেই নিমগাছ। এই গাছটা ১৮৭৯-৮০ সালে আগুন লেগে পুড়ে যায়। নিমতলার আনন্দময়ী কালীর মন্দিরের কাছেই এই নিমগাছটা ছিল। তারই কিছু উত্তরে জব চার্নক জাহাজ থেকে নেমেছিলেন।

কলকাতার টুকিটাকি ॥ রাধারমণ মিত্র।

২। "……to the east of the main channel of commerce, almost clandestinely existed a passage near whose commencement stood the tree. Passing almost into a legend and losing much of its reality because of it's supposed hooka-smoking association with the founder of British Calcutta."

Calcutta in Urban History ॥ Pracid Sinha.

পৃষ্ঠা ৬৪ ॥ চার্নকের হিন্দু স্ত্রী।

চার্নকের বিয়ের স্থান এবং পাত্রী নিয়েও অনেক মতভেদ এবং প্রশ্ন।

১। "তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কিংবদন্তী হচ্ছে, স্বামীর চিতা থেকে জোর করে উদ্ধার করা তাঁর সুন্দরী হিন্দু যুবতী স্ত্রী সম্বন্ধে। কয়েক বছর পরদেশী স্বামীর ঘর করে কয়েকটি কন্যারত্ন স্বামীকে উপহার দিয়ে তিনি যখন ওপরে চলে গেলেন তখন শোকার্ত স্বামী তাঁর দেহকে কলকাতায় কবর দেন ও সেই কবরের ওপর এক সমাধি মন্দির তৈরি করিয়ে দেন। আর প্রতি বছর তাঁর মৃত্যু-তিথিতে তাঁর কবরের ওপর একটি করে মোরগ জবাই করতেন। এই গল্পটি প্রথম প্রচার করেন ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন তাঁর A New Account of the East India নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। কর্ণেল ইউল এই গল্পকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন: ঐ সময়ে পাটনা থেকে কিংবা ভারতের অন্য কোথাও থেকে একজন ইউরোপীয়ের পক্ষে সতী হতে যাচ্ছে এমন একজন হিন্দু বিধবাকে তার স্বামীর চিতা থেকে জোর করে হরণ করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া একজন হিন্দু রমণীকে কবর দেওয়াই বা হয় কী করে। এবং তার শ্রাদ্ধের দিনে তার কবরে হিন্দুদের চোখে যা অতি অপবিত্র এমন এক পাখিকে বলি দেওয়াটা কোন্ দেশীয় হিন্দু প্রথা।"

…আর একটা কথা, চার্নক হিন্দু রমণীকে চিতা থেকে উদ্ধার করলেন কোন জায়গায়? কেউ বলেন পাটনায়। কেউ বলেন কাশিমবাজারে, আবার কেউ কেউ বলেন ব্যারাকপুরে – কারণ তাঁরা বলেন চার্নক ব্যারাকপুরে থাকতেন, আর তার থেকেই ব্যারাকপুরের নাম 'চানক' হয়েছে। এই সব পণ্ডিতদের জানা নেই যে ব্যারাকপুর নামটা মাত্র ১৭৭২ সালে হয়েছে। আর চানক নাম জব চার্নকের বহু পূর্ব থেকে চলে আসছে। চার্নক কোনদিন ব্যারাকপুরে থাকেন নি। বর্ধমান জেলাতেও 'চানক' নামে এক গ্রাম আছে। হিন্দু স্কুলের

বিখ্যাত হেড মাষ্টার রায় রসময় মিত্র বাহাদুরের বাড়ি এই গ্রামে। সেখানেও কি চার্নক বাস করেছিলেন ?"

কলিকাতার টুকিটাকি ॥ রাধারমণ মিত্র।

২। "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নথিপত্রে একবার মাত্র চার্নকের স্ত্রীর কথা উল্লিখিত আছে। তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এখন পর্যন্ত যা পাওয়া যায়, তাতে দেশীয় মহিলাটির কোন প্রসঙ্গ নেই। তিনিই বোধহয় একমাত্র ইংরেজ যাঁর নামের সঙ্গে কোনো কলঙ্ক কাহিনী জড়িত নেই।...যেহেতু চার্নকের স্ত্রীর সরকারী চিঠিপত্র, তাঁর উইল বা তাঁর কন্যাদের খ্রীষ্টীয় নামকরণের তালিকায় পাওয়া যায় না, সুতরাং ধরে নেওয়া হয় মহিলা নিশ্চয়ই এদেশীয় ছিলেন। উইলে চার্নকের স্ত্রীর নাম না থাকার কারণ সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়, কারণ ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই মহিলার মৃত্যু হয়েছিল। ...চার্নকের স্ত্রী যে ইংল্যাণ্ডের ও কলকাতার ইংরেজ সমাজে সসম্মানে গৃহীতা ছিলেন সেকথা মেনে নেবার পক্ষে কিছুটা যুক্তি আছে। কারণ তাঁর কন্যাদের নামে কোনো কলঙ্ক-রেখা ছিল না এবং তাঁরা কোম্পানিতে কর্মরত সম্ভ্রান্ত ইংরেজ স্বামী পেয়েছিল।...

বেঙ্গল ফ্যাকটরি স্থাপনের সময় প্রথম কয়েক দশক কোম্পানির প্রতিনিধিরা তাঁদের স্ত্রীদের ভারতে আনতে পারতেন না। কারণ, এখানে ঘর-সংসার পাতার উপযোগী বাসস্থানের অসুবিধা এবং তখনকার দিনে একটানা ছ'মাস সমুদ্র পাড়ি দেবার ধকল সইতে ইংরেজ মহিলাদের অক্ষমতা। কলকাতা স্থাপিত হওয়ার আগে সেই কারণে বাংলায় খুব অল্পসংখ্যক ইংরেজ মহিলাই থাকবেন।...যেহেতু ১৬৬৬ থেকে ১৬৭৮-এর মধ্যে এমন কোনো ইংরেজ মহিলার নাম পাইনি যিনি চার্নকের স্ত্রীরূপে এসে থাকতে পারেন—সেই হেতু আমাদের মেনে নিতে হয় যে চার্নক নিশ্চয়ই এদেশীয় কোনো মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন।...

এখন দেখা যাক চার্নকের দেশীয় স্ত্রী সম্বন্ধে উইলিয়াম হেজেসের কী বক্তব্য! ১৬৮২-র ২৫ অক্টোবর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত হেজেস ঢাকায় ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর ডায়রিতে (১ ডিসেম্বর ১৬৮২) লেখেন :

"আজ সকালে হুগলি ও কাশিমবাজারের শাসনকর্তা বুলচাঁদ একজন হিন্দু বড়লোককে আমার কাছে পাঠান। তিনি আমাকে বলেন যে চার্নক সাহেব এমন লজ্জা-জনক কাজ করেছেন যাতে ব্রিটিশ জাতের মুখে চুণকালি পড়েছে। চার্নক সাহেব গত ১৯ বছর ধরে তাঁরই স্বজাতি এক হিন্দু রমণীকে রক্ষিতা-

রেখেছেন এবং যদি চার্নককে দিয়ে তাকে না তাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে তিনি নবাবের কাছে নালিশ করবেন। যাতে আমাদের জাতের কলঙ্ক আর না বাড়ে সেই উদ্দেশ্যে আমি তাঁকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে উপস্থিত মতো নিরস্ত করলাম।

এই ভদ্রলোক এবং আরো অনেক লোক আমাকে বলেছেন যে যখন চার্নক পাটনায় থাকতেন তখন নবাবের কাছে এই নালিশ করা হয়েছিল যে তিনি (চার্নক) একজন হিন্দু রমণীকে রক্ষিতা রেখেছেন। সে মহিলার স্বামী তখনো জীবিত ছিলেন কিম্বা সবেমাত্র মারা গেছেন। সেই নারী তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে এবং আসবার সময় স্বামীর সব টাকাকড়ি ও অনেক দামী জহরত চুরি করে নিয়ে এসেছে। এই শুনে নবাব চার্নককে ধরে আনবার জন্য ১২ জন সিপাহী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু চার্নক পালিয়ে যাওয়ায় তাঁরা তাঁর উকিলকে ধরে দুমাস জেলে আটকে রেখে দেয়। আর সিপাইরা দিনরাত কুঠির ফটকের সামনে ধর্না দিয়ে বসে থাকে। তার ফলে চার্নক নগদ তিন হাজার টাকা, পাঁচ থান খুব উৎকৃষ্ট পশমি কাপড় (Broad cloth) এবং কতকগুলি তলোয়ার নবাবকে উপহার দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলে। এইরকম ঘটনা তার আগে বহুবার কাশিমবাজারে ঘটেছে—একথা আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি। সে অথবা সেই মহিলাটি পরলোকগত হলে কোম্পানীর নামে একটা কলঙ্ক রটনা হবে।

...যেহেতু হেজেস ছিলেন চার্নকের পরম শত্রু, তাই চার্নক সম্পর্কে তাঁর কাহিনীতে আস্থা রাখা যায় না। কোম্পানীর এই 'প্রাচীন কর্মচারী'কে অপদস্থ করার জন্যই নানারকম বিদ্বেষপ্রসূত গুজব তিনি ডায়েরীতে লেখেন বলে অনুমান করা যায়।

ক্যাপটেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন—যাঁর স্মৃতিচারণ ছড়িয়ে আছে ৩৫ বছর সময় ব্যাপী—ছিলেন গালগপ্পোর রাজা।...এই অবৈধ বাণিজ্যকারী ক্যাপ্টেন হ্যামিল্টন সাহেব কারো সম্বন্ধে পারতপক্ষে একটাও ভাল কথা বলেন নি এবং তিনি ছিলেন প্রচুর গুজব ও কুৎসার খনি বিশেষ। চার্নক সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এখানে তুলে ধরা যেতে পারে, কারণ বেশ মজাদার গালগপ্পোর গুণ এতে পাওয়া যায়।

'...দেশটি পৌত্তলিকতায় ছেয়ে থাকায় মৃত স্বামীদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীদের আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করার রীতি এখানে প্রচলিত। মোগল যুদ্ধের আগে চার্নক তাঁর সাধারণ সিপাইদের নিয়ে একটি অল্পবয়সী বিধবার এইরকম শোচনীয়

পরিণাম দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিধবাটির সৌন্দর্য্যে এতই মুগ্ধ হন যে তিনি তাঁর সিপাইদের হুকুম করেন জোর করে ঐ জল্লাদদের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে আনতে এবং তাকে শেষে নিজের গৃহে নিয়ে যান। বহু বছর তাঁরা সুখে অতিবাহিত করেন এবং তাঁদের কয়েকটি সন্তান হয়। চার্নক কলকাতায় বসবাস শুরু করার পরে মহিলার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার পরিবর্তে চার্নককেই মহিলা পৌত্তলিকতায় দীক্ষিত করেন।...'

সন্দেহ নেই, হিন্দু বিধবা সম্বন্ধে হ্যামিল্টনের গল্পটি হেজেসের কুৎসাপূর্ণ কাহিনীর অপর এক ভাষ্য। তবে হ্যামিল্টনের এইটুকু ধন্যবাদ প্রাপ্য যে তিনি চার্নককে দিয়ে একজন ব্রাহ্মণ বিধবাকে সতীদাহ থেকে উদ্ধার করিয়ে তার সঙ্গে কোনো অবৈধ সম্পর্ক বা দ্বি-বিবাহের অপরাধ না ঘটিয়ে সারাজীবন সুখেস্বাচ্ছন্দে বাস করিয়েছেন।

...কোম্পানীর রেকর্ডে একমাত্র যেখানে চার্নকের স্ত্রীর নামের উল্লেখ আছে এবং তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে, সেখানে কোনো রকম অসূয়া বা তিক্ততার ইঙ্গিত নেই।

স্যার এডওয়ার্ড লিটনটন ও তাঁর কলকাতাস্থ কাউন্সিলে তাঁদের একটা ভুল তারিখ যুক্ত চিঠিতে 'হুগলি' ১৬ নভেম্বর ১৬৮০ (১৭০০), – নানা বিষয়ের মধ্যে দেশীয়দের বিবাহ করা প্রসঙ্গে কোর্টের এক মন্তব্য বা আদেশের উত্তরে লেখেন – "...দেশীয় মহিলাদের গ্রহণ করতে গেলে অনেক সময় বিরাট গণ্ডগোলেও পড়তে হয়। যদিও তারা গরিব ও অল্প বয়সেই বিবাহিত এবং স্বামীর সঙ্গেও সহবাস থাকে না, কিন্তু এ ধরণের ঘটনা হলেই তাদের স্বামীরা সরকারের কাছে আবেদন করে থাকে – যার পরিণামে খেসারত ও ঝামেলার অন্ত থাকে না। যেমন জব চার্নকের বেলায় ঘটেছে। যে মহিলাকে তিনি রেখেছিলেন তিনি যদিও দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের, তবু তাঁকে নিয়ে পাটনায় কোম্পানীকে দীর্ঘদিন নানা ঝামেলা ও খেসারতিতে পড়তে হয়েছিল। পরে কাশিমবাজারেও এ ধরণের আরো ঘটনা।...'

...স্যার এডওয়ার্ড লিটনটনের বক্তব্য অবশ্যই হ্যামিল্টনের সতীদাহের গল্প ও হেজেসের কুৎসাকে ধুলিসাৎ করে দেয়। এ সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ১৬৭৮-এ বা তার কিছু আগে জব চার্নক একজন নিম্নগোত্রীয়া ভারতীয় মহিলাকে বিবাহ করেন ও তাঁর সঙ্গে সুখে বৈবাহিক জীবন যাপন করেন।"

জব চার্নক ॥ পি. থনকপ্পন নায়ার।

শ্রী নায়ারের এই মূল্যবান গবেষনাতেটি চার্নক-গৃহিণী সমস্যায় সম্পূর্ণ সমাধান হয়েছে বলে মনে হয় না আমাদের। প্রশ্ন জাগে—পাটনার কোম্পানীকে দীর্ঘদিন ধরে ঝামেলা এবং খেসারতিতে জড়িয়ে পড়তে হল কেন? তাহলে কি মাত্র একটি হিন্দু রমণী নয়, একাধিকবার একাধিক হিন্দু রমণীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি? দীর্ঘদিন ধরে ঝামেলা ও খেসারতি চুকিয়ে পাটনার সমস্যা যদি মিটেই গেল, তাহলে কাশিমবাজারেও এ-ধরণের আরো ঘটনা ঘটল কি করে?

তিনি একবার একজায়গায় লিখলেন নিম্নগোত্রীয়া ভারতীয় মহিলাকে বিয়ে করার কথা। একটু পরেই লিখেছেন—মাদ্রাজের সেন্ট মেরি গির্জায় চার্নক তাঁর তিন কন্যাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাদান করেছিলেন আগস্ট ১৯, ১৬৮৯-এ। কিন্তু সেখানকার রেজিষ্টারে সেই তিনকন্যার জননীর কোন নামোল্লেখ নেই। সেই প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য—'এতে প্রমাণ হয় যে চার্নক তাঁর হিন্দু স্ত্রীর সঙ্গে আইনসঙ্গত ভাবে বিবাহিতা ছিলেন না।' আইনসঙ্গতভাবে বিবাহিতা নয় এমন হিন্দু রমণীর গর্ভজাত তিনটি কন্যাকে তখনকার তিন উচ্চপদস্থ ইংরেজ বিয়ে করলেন, এটা কি সম্ভব?

নির্ঘণ্ট

॥ সহায়ক গ্রন্থ ॥

ফিরিঙ্গী বণিক ॥ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়
সিরাজউদ্দৌলা ॥ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়
বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল) ॥ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
বৃহৎ বঙ্গ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন
কলিকাতার ইতিহাস ॥ সুবল মিত্র
কলিকাতা সেকালের ও একালের ॥ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় ॥ হরিহর শেঠ
কলিকাতার কথা ॥ প্রমথনাথ মল্লিক
ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা ॥ সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
পলাশীর যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
পলাশীর পর বক্সার ॥ তপনমোহন চট্টোপাধায়
মুর্শিদাবাদ কাহিনী ॥ নিখিলনাথ রায়
গোকুল চন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলকাতা ॥ রাজেন্দ্রকুমার মিত্র
কলকাতা কালচার ॥ বিনয় ঘোষ
টাউন কলকাতার কড়চা ॥ বিনয় ঘোষ
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ॥ বিনয় ঘোষ
কলিকাতাস্থ তন্তু-বণিক জাতির ইতিহাস ॥ নগেন্দ্রনাথ শেঠ
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং ॥ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
রাসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী ॥ পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর
ক্লাইভ চরিত ॥ মেকলে
বাদশাহী আলম ॥ বিনয় ঘোষ
ক্লাইভ চরিত ॥ সত্যচরণ শাস্ত্রী
জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী ॥ নারায়ণ দত্ত
কলকাতার পথঘাট ॥ প্রাণতোষ ঘটক
কালিকট থেকে পলাশী ॥ সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপান্থের কলকাতা ॥ শ্রীপান্থ
কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত ॥ বিনয় ঘোষ
হুগলী জেলার ইতিহাস ॥ সুধীরকুমার মিত্র
Calcutta Past & Present ॥ Kathlen Blechynden
Calcutta in Urban History ॥ Pradip Sinha
The men who ruled India ॥ Philip woodruff

House of Jagat Seth ॥ J. H. Little
Life of Robert Clive ॥ John malcolm
Unpublished Records ॥ Rev. J. Long
Bengal Nawabs ॥ Jadunath Sarkar
History of Bengal ॥ Calcutta University
Fifty Report ॥ W. K. Firminger
Calcutta & its Neighbourhood ॥ Rev J. Long
The early Annals of the English in Bengal ॥ C. R. Wrion

———

পূর্ণেন্দু পত্রী

পুরনো কলকাতার কথাচিত্র



কলকাতা নিয়ে আমাদের
াহিত্যে অনেক মূল্যবান রচনা
আছে। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টি-
ভঙ্গী থেকে কলকাতার কোন
ধারাবাহিক ইতিহাস নেই।
আজ থেকে ২৪ বছর আগে
পূর্ণেন্দু পত্রী যখন সমুদ্র-
গুপ্ত ছদ্মনামে 'শহর কল-
াতার আদিপর্ব' বইটি লিখে-
ছিলেন, তখন তার দ্রুত
সংস্করণগুলো প্রমাণ করে-
ছিল একই সঙ্গে পাঠক
মাজের স্বীকৃতি এবং বইটির
গুরুত্ব। তাঁর এই সাম্প্রতিক
বইটি আরও অনেক বেশী
পরিশ্রমের ফসল এবং আরো
অনেক বেশী তথ্যপূর্ণ। ইতি-
াসের মত গুরুগম্ভীর বিষয়ও
যে তাঁর কলমের ছোঁয়ায়
কবিতার মত সুললিত এবং
সুখপাঠ্য হয়ে উঠবে, সেটা
কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়।
পর্তুগীজরা ভারতের মাটিতে
পা দিচ্ছে থেকে শুরু হয়ে,
লাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভের
প্রথম স্বদেশ যাত্রায় বইটি
আখ্যানভাগ শেষ। মা...
য়েছে ভারতবর্ষ ...
দেশের তোলপাড়খান-...খানে
াজপুরুষদের আর সেই ...
প্রবল লড়াইই ফাঁকে ফাঁকে
অথব ফুঁড়ে কলকাতা
জ... একটা শহরের জেগে
...র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।
...্যেক বাঙালী পরিবারে এই
...ই হয়ে উঠবে একটা স্থায়ী
সম্পদ।